সীরাত বিশ্বকোষ

(১ম খণ্ড)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

موسوعة سير الانبياء

باللغة البنغالية

المجلد الاول

সীরাত বিশ্বকোষ

(১ম খণ্ড)

হযরত আদম (আ)—হযরত ইয়াকূব (আ)

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ
(১ম খণ্ড)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় রচিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
রজব ১৪২১
আশ্বিন ১৪০৭
অক্টোবর ২০০০
ইবিবি প্রকাশনা : ৩৪
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৯৩
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.২৪
ISBN : ৯৮৪-০৬-০৫৮২-৮

বিষয় : জীবনচরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ন কম্পিউটার
২০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাঁধাই
আল আমিন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH : The Encyclopaedia of Sirah in Bangali, 1st vol. edited by The Board of Editors and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project.
Price Tk. 350.00

US$: 15·00

লেখকবৃন্দ

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল

মাওলানা সিরাজ উদ্দীন আহমদ

মাওলানা ফয়সল আহমদ জালালী

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

ডঃ রফিক আহমদ

মহাপরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-র প্রতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানবজাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের জীবন ও কর্মে।

হযরত রাসূলে কারীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের জীবন ও কর্ম তথা সঠিক জীবন-চরিত জানা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের জানামতে বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত নবী-রাসূলদের জীবন ও শিক্ষা সম্বলিত কোন প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, সীরাত ও প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় সেগুলি ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে আরবী, উর্দূ, ফারসী প্রভৃতি ভাষায়। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার উপর আরো গবেষণা চালাইয়া বিশ্বকোষের আঙ্গিকে সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে নবী-রাসূল ও সাহাবীদের জীবন ও শিক্ষামালা সংরক্ষণ ও জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরার এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। সীরাত বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড ইহারই প্রথম ফসল। নবী-রাসূলদের জীবনীর উপর আরো ১টি খণ্ড, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন ও কর্মের উপর ১০টি খণ্ড এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরো ১০টি খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা সম্মুখে লইয়া আমরা অগ্রসর হইয়াছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের পাঠক সমীপে আন্তরিক দোআ ও মুনাজাতের অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ১ম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও যেসব ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবন্ধকার ও গবেষক কাজ করিয়াছেন আমি তাঁহাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। প্রকল্পের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকলকে আহসানুল জাযা দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীদের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেই সব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে আমরা উহা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকিলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরো সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন।

মওলানা আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ! সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে বহু আকাংক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইল। আর ইহার মাধ্যমে আমরা বিশ্বকোষ জগতের এক নূতন অঙ্গনে পদার্পণ করিলাম। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি হাম্দ ও শোকর পেশ করিতেছি। সেই সঙ্গে সালাত ও সালাম প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন-নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁহার ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, ইহা একটি জীবন দর্শন, সেই সঙ্গে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দীর পরিক্রমায় সৃষ্ট এইসব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শন, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংকলন।

বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরেজী, আরবী, উর্দূ, ফারসী ও তুর্কীসহ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ ইতিমধ্যেই সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় তেইশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের, বিশেষ করিয়া ইহার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমানদের জন্য তাহাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, তাহযীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাহাদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে।

অতঃপর ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর হইতে পর্যায়ক্রমে ইহার পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ১৯৯৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সর্বমোট ২৮ টি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনার সমাপ্তি পর্যায়ে ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে (১৯৯৫-২০০০) ২২ খণ্ডে সমাপ্ত সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশনার নিমিত্ত একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষের অন্তর্গত হিসাবে ধরা হয় সর্বপ্রথম আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম, অতঃপর আম্বিয়াকুলের সর্দার সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এবং তদীয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সামগ্রিক জীবন-চরিত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ লক্ষাধিক নবী-রসূলকে সমগ্র মানব সমাজের পথপ্রদর্শনের জন্যই পৃথিবী বক্ষে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসব নবী-রসূলের আনীত সহীফাও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবন-চরিতকেই বিশেষভাবে উম্মাহ, অতঃপর সমগ্র মানবমণ্ডলীর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহ্‌র জন্য সহজ হয়। আম্বিয়াকুল সর্দার হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাইতো "আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি" (সূরা য়ূনুসঃ ১৬ আয়াত) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হেদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে উম্মতের সামনে পেশ করিতে দেখি। আর কেনইবা করিবেন না, যাঁহার জীবনকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে অনুসরণীয় দৃষ্টান্তমূলক জীবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)। ঠিক তেমনি মুসলিম মিল্লাতের জনক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর-হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন-চরিতের মধ্যে, কেবল তাহাই নয় বরং তাঁহার অনুসারীদের মধ্যেও এই উম্মতের জন্য আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া কুরআনুল কারীম ঘোষণা দিয়াছে। বলা হইয়াছেঃ "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৬০ ঃ ৪)। কুরআনুল কারীমে প্রতিনিধি স্থানীয় দু'জন নবী ও তাঁহাদের অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলা হইলেও মূলত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সকলের মধ্যেই গোটা মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রহিয়াছে। তাঁহারা ছিলেন আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা।

অতএব আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের সীরাত তথা জীবন-চরিতকে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সংরক্ষণের স্বার্থেই উম্মাহ্র সচেতন আলিম-উলামা ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জীবনের একটি বিরাট অংশ, এমনকি কেহ কেহ তাঁহাদের জীবনের প্রায় সমস্তটাই ইহার পেছনে ব্যয় করেন। ইঁহাদের মধ্যে ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, ইব্ন সা'দ, আল-বালাযুরী, ইব্ন হায্ম, ইব্ন আবদি'ল বার্র, সুহায়লী, সুলায়মান ইব্ন মূসা আল-আনদালুসী, ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, ইব্ন কায়্যিম, ইব্ন কাছীর, আল-মাকরিযী, আল-কাসতাল্লানী, আল-হালাবী, আয্- যুরকানী সমধিক খ্যাত ও প্রসিদ্ধ। আধুনিক সীরাতবিদদের মধ্যে আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, মুহাম্মাদ আহমাদ জাদ আল-মাওলা, ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, আবূ যুহরা, মুহাম্মাদ আতিয়্যা আল- আবরাশী, মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্তাহ ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইয্যাত দারওয়াযা, আবদুর রহমান আশ- শারকাবী, আবদুর রাযযাক নাওফাল, মুহাম্মাদ জামালুদদীন মাসরুর, কাযী সুলায়মান মানসূরপূরী, আবদুর রঊফ দানাপুরী, মানাজির আহসান গীলানী, আল্লামা শিবলী নুমানী, সাইয়েদ সুলায়মান নদভী, হিফ্যুর রহমান সিউহারবী, মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ইদরীস কানধলবী, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আকরম খাঁ, আবদুল খালেক, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ বিখ্যাত। আলহামদু লিল্লাহ্! সীরাত রচয়িতাদের এই ধারা আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষ রচনার প্রধানতম উৎস আল-কুরআন, অতঃপর ইহার বিভিন্ন তাফসীর, হাদীছ গ্রন্থ ও ইহার বিবিধ ভাষ্য, সর্বশেষ বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিপুল সীরাত গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় এই সব গ্রন্থ সংগ্রহে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এমনকি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমরা কতকগুলি সীরাত গ্রন্থ সংগ্রহে সক্ষম হই নাই। তদুপরি বিষয়টি গবেষণা-বহুল ও পরিশ্রমসাপেক্ষ বিধায় ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লেখক ও গবেষক পাইতেও আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অধিকন্তু সীরাত বিশ্বকোষ-এর একজন লেখক ও গবেষককে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে কমপক্ষে আরবী, উর্দূ, ইংরেজী ও বাংলা এই চারিটি ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়। ফলে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা পূরণ করিয়া কাজ করিতে হওয়ায় আমাদের পক্ষে প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। কিছুটা বিলম্ব হইলেও অবশেষে ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষের অন্তত ১ম খণ্ডটি যে আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইল সেজন্য আমরা পুনরায় করুণাময় আল্লাহ্র দরবারে আমাদের অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের নিকট নানাভাবে ঋণী। তন্মধ্যে সর্বাগ্রে সম্পাদনা পরিষদের পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি ডঃ সিরাজুল হকসহ সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, যাঁহারা নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও ইহার পেছনে নিরলস শ্রম দিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার নজীর রাখিয়াছেন। সীরাত বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও গবেষকবৃন্দকেও আমরা তাঁহাদের অমূল্য খেদমতের জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি।

এতদসঙ্গে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সম্মানিত মহাপরিচালক, সচিব, অর্থ, পরিকল্পনা ও প্রকাশনা পরিচালক, লাইব্রেরীয়ান ও প্রেস ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সঙ্গে বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা, প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে তাঁহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন ও ইহার উত্তম জাযা প্রদান করুন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রয়াস বিধায় মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিয়া ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, তথ্য সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে আমাদেরকে সাহায্য করিবেন। পরবর্তী খণ্ডগুলির কাজ যাহাতে সফলভাবে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য সকলের নিকট আমরা দোআপ্রার্থী।

ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير.

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ভূমিকা

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ·

সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই এবং শান্তি তাঁহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি। (২৭ ঃ ৫৯)

বিশেষত সেই সর্বশেষ মহানবীর প্রতি যাহাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করা হইয়াছিল (৩৩ ঃ ৪৫-৪৬) অশেষ দরূদ ও অযুত সালাম তাঁহার প্রতি।

বিশ্বকোষ জ্ঞান জগতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভাণ্ডার। ইংরেজী Encyclopaedia-কে বাংলায় বিশ্বকোষ বলা হয়। ইহা গ্রীক শব্দ enkyklios (বৃত্তাকারে বা চক্রাকারে) paideia (শিক্ষা) হইতে নির্গত। ইহার অর্থ বিদ্যা শিক্ষা চক্র বা পরিপূর্ণ জ্ঞান সংগ্রহ। আরবীতে ইহাকে "দাইরাতুল মা'আরিফ" অথবা "আল-মাওসূ'আ" বলা হয়। বিশ্বকোষ সাধারণত নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে রচিত হয়, আবার জ্ঞানের বিশেষ কোন শাখার ব্যাপক বর্ণনা সম্বলিত গ্রন্থও বিশ্বকোষ নামে পরিচিত। এরিস্টোটল স্বীয় শাগরিদদের ব্যবহারের জন্য তাঁহার সময় পরিজাত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তথ্যসমূহ বিষয় পরম্পরায় কতগুলো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাচীন রোমের খ্যাতনামা পণ্ডিত মার্কাস টেরেন্টিয়াস ভ্যারো (১১৬-২৭ খৃ.পূ.) সাহিত্য অলংকার, গণিত, ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা, সংগীত বিদ্যা, স্থপতি বিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে Disciplinarum Liberia IX নামে বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার Imagines নামক গ্রন্থে গ্রীস ও রোমের সাত শত বিশেষ ব্যক্তির জীবনী সংকলন করিয়াছিলেন যাহা বিশ্বকোষ হিসাবে গণ্য। খৃষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকে বিভিন্ন বিষয়ে আরবী ভাষায় বিশ্বকোষ রচনা আরম্ভ হয়। আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইব্ন যাকারিয়া আর-রাযী (৮৬৫-৯২৫ খৃ.) ১৬ খণ্ডে "কিতাবুল হাবী" নামে চিকিৎসা বিষয়ে একটি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইব্ন 'আবদ রাব্বিহি (৮৬০-৯৪০ খৃ.) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ২৫ খণ্ডে "আল-ইকদুল ফারীদ" নামে বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছিলেন। আবুল ফারাজ আল-ইসফাহানী (৮৯৭-৯৬৭ খৃ.) ২১ খণ্ডে "কিতাবুল আগানী" নামে সঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষ প্রণয়ন করিয়া বিখ্যাত হন। প্রাচ্যের খ্যাতনামা চিকিৎসা বিশারদ 'ঈসা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-জুরজানী (মৃ. ১০১০ খৃ.) চিকিৎসা বিষয়ে আরবীতে "আল-মিআতুস সানা'আতিত তিব্বিয়া" নামে এক শত খণ্ডে একটি বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছিলেন।

আর এক শতাব্দী পর নানা বিষয়ে বিশ্বকোষ রচিত হইতে থাকে। যে সকল মহৎ মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় অবদান রাখিয়াছেন তাঁহাদের জীবন চরিত সম্বলিত গ্রন্থাদিও প্রণীত হয়। ইয়া'কূব ইব্ন 'আবদুল্লাহ আল-হামাওবী (১১০০-১১৬৬ খৃ.) "মু'জামুল উদাবা" বা "ইরশাদুল-আরীব ইলা মা'রিফাতিল-আদীব" নামে সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একখানি বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছেন। ইব্নুল কিফ্তী (মৃ. ১২৪৮ খৃ.) তাঁহার "কিতাব আখবারিল 'উলামা বিআখবারিল হুকামা" শীর্ষক বিরাট গ্রন্থে চারশ চৌদ্দজন চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের জীবনী ও কর্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইব্ন খাল্লিকান (১২১১-১২৮২ খৃ.) একটি জীবনী বিশ্বকোষ "ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান" নামে সকংলন করিয়াছিলেন, যাহাতে ৬৮৫ জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী স্থান পাইয়াছে। ফিলিস্তিনী বিদ্বান সালাহুদ্দীন খালীল আস-সাফাদী

(১২৯৭-১৩৬৩ খৃ.) তাঁহার "আল-ওয়াফী বিল-ওয়াফায়াত" নামক গ্রন্থে ১৪০০০-এরও অধিক জীবনী সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূলগণ (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবনী সম্পর্কে অবহিত হওয়া অতীব প্রয়োজন। ইহার মধ্যে রহিয়াছে তাহাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় ও পথ-নির্দেশনা। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ.

"তাহাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা" (১২ ঃ ১১১)।

মুসলিম মনীষিগণ এই প্রয়োজনকে সামনে রাখিয়া নবী-রাসূল (আ)-গণের জীবনী সংকলন করিয়াছেন। আছ-ছা'লাবী ও কিসাঈ-এর "কাসাসুল আম্বিয়া" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ইমাম তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খৃ.) 'তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক' নামক বিরাট ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যাহাতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে তাঁহার সময় পর্যন্ত (৩১০/৯২২ সাল পর্যন্ত) বিশ্বের বিস্তারিত ইতিহাস সনদ ভিত্তিক রচিত হইয়াছে। ইহাও একটি বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পবিত্র জীবন ও কর্ম সম্পর্কে প্রথম যে কয়টি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে সীরাতু ইব্ন ইসহাক ও সীরাতু ইব্ন হিশাম প্রসিদ্ধ। সীরাত অর্থ জীবন-চরিত ও যুদ্ধের ঘটনাবলী। উপরিউক্ত দুই গ্রন্থে মহানবী (স)-এর গাযওয়া (যুদ্ধ)-এর বিবরণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এইজন্য এইগুলিকে "কিতাবুল মাগাযী" (যুদ্ধের বিবরণী সম্বলিত পুস্তক) হিসাবেও গণ্য করা হয়। সহীহ হাদীছ গ্রন্থসমূহে "কিতাবুল মাগাযী" নামে অধ্যায় রহিয়াছে, "আস-সিয়ার"-ও যাহার অন্তর্ভুক্ত, এমনকি ফিক্হ গ্রন্থগুলিতেও যুদ্ধ সংক্রান্ত আহকাম নামক অধ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

পরবর্তী কালে 'সীরাত' শব্দটি শুধু জীবন-চরিতের জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। বিশেষত মহানবী (স)-এর পবিত্র জীবনী যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে সীরাত নামে অভিহিত করা হয়। ইব্ন ইসহাক ও ইব্ন হিশাম-এর সীরাত ছাড়াও, যেমন শিবলী নু'মানীর 'সীরাতুন-নাবী' (উর্দূ) গ্রন্থ। ইংরেজীতে ৪ খণ্ডে Encyclopaedia of Seerah গ্রন্থটি আফযালুর রহমানের সম্পাদনায় লন্ডন হইতে ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। আরবীতে 'তাবাকাত' নামে কিছু গ্রন্থ পাওয়া যায়। সেইগুলি নিঃসন্দেহে বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ। যেমন ইব্ন সা'দ (মৃ. ২৩০/৮৪৫)-এর 'আত-তাবাকাতুল- কুবরা। এই গ্রন্থে মহানবী (স)-এর পবিত্র জীবনীসহ ৪,২৫০ জনের (প্রায় ৬০০ জন মহিলাসহ) জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই ধরনের আরো তাবাকাত রহিয়াছে। যেমন ইব্ন সাল্লাম আল-জুমাহী-এর 'তাবাকাতুশ্ শু'আরা' এবং আল্লামা সুয়ূতী (মৃ. ৯১১ খৃ.)-এর আত্-তাবাকাতুল-মুফাস্সিরীন। এইগুলিও বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ, কোনটিতে কবিদের জীবনী, কোনটিতে মুফাস্সিরদের জীবনী এবং কোনটিতে ব্যাকরণবিদদের জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহানবী (স)-এর সাহাবীগণ (রা) তাঁহার কাছ হইতে সরাসরি শিক্ষাপ্রাপ্ত মহান এক মানব গোষ্ঠী, যাঁহাদের সম্বন্ধে নবী করীম (স)-এর উক্তি হইল ঃ

اكْرِمُوْا اَصْحَابِىْ فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ.

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান করো। কেননা তাঁহারা তোমাদের মধ্যকার উত্তম মানব' (মুসনাদে আহ্মাদ)।

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ اَصْحَابِيْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ اَبْغَضَهُمْ.

"সাধারণ, সাবধান! তোমরা আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাহাদেরকে (তিরস্কারের) লক্ষ্যবস্তু বানাইও না। যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে সে আমার প্রতি ভালোবাসা বশেই তাহাদেরকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষবশত তাহাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে" (তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মাদ)।

মুসলিম জীবনীকারগণ সকল সাহাবী (রা)-এর জীবনী সংরক্ষণ করিতে না পারিলেও বহু বিশিষ্ট সাহাবী (রা)-এর জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইব্নুল আছীর (১১৬০-১২৩৪ খৃ.) রচিত উসদুল-গাবা, যাহাতে ৭০০০ সাহাবী (রা)-এর জীবনী সংরক্ষিত আছে ও ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (৭৭৩-৮২৫/১৩৭২-১৪৪৯) সংকলিত "আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা" উল্লেখযোগ্য।

মহানবী (স)-এর হাদীছসমূহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মুহাদ্দিছগণ নিরলস সাধনা করিয়া এই হাদীছসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রতিটি হাদীছই 'ইসনাদ' যুক্ত অর্থাৎ যাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের নাম সনদরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। হাদীছের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য কতক মনীষী হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনী সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন এবং "আসমাউর রিজাল" নামে একটি হাদীছ সংক্রান্ত পৃথক জ্ঞানের শাখা উদ্ভাবন করেন। এই শাস্ত্রে প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীছ বর্ণনাকারীর জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ৩৭-৩৮)। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বর্ণিত হাদীছগুলির সত্যাসত্য নির্ধারণ। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন জাতির এই ধরনের জীবন-চরিত সংগ্রহের সন্ধান মিলে না। এই ক্ষেত্রে ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, যাহাবী আল-মিযযী ও ইব্নুল-'ইমাদ প্রমুখ জীবনীকারদের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি দেশে ও সমাজে শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে জীবন-চরিত সাহিত্য বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে।

বাংলায় সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (২ খণ্ডে) ও বৃহৎ ইসলামী বিশ্বকোষ (২৮ খণ্ডে) ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বিশেষ এক পদক্ষেপ। এই মহৎ কাজটি সমাপ্তির পর নবী-রাসূল (আ)-গণের এবং সাহাবীদিগের (রা) পবিত্র জীবনী সম্বলিত সীরাত বিশ্বকোষ (২২ খণ্ডে) প্রকাশের পরিকল্পনা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গ্রহণ করিয়াছে।

মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্যই আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণ (আ)-কে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা মানব কুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁহাদের ঈমান, 'আকীদা, ইখলাস্ (নিষ্ঠা), সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, আখলাক (চরিত্র), ইবাদত, 'ইলম-প্রজ্ঞা উচ্চতম পর্যায়ের যাহার কোন তুলনা হয় না। তাঁহাদের অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের অনুসরণ ব্যতীত সফলতা, শান্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি হাসিল করা যায় না। তাঁহাদের জীবনী জানা না থাকিলে তাঁহাদের অনুসরণ অসম্ভব। তাঁহাদেরকে অনুসরণ না করিয়া পৃথিবীতে কিয়ৎ পরিমাণ উন্নতি লাভ সম্ভব হইলেও আখিরাতের জীবনে সাফল্য লাভ তাঁহাদের আনুগত্য ছাড়া সম্ভব নয়। সেখানে নাজাত ও শান্তি পাইতে হইলে নবীগণের আনুগত্য ও অনুসরণ করিতে হইবে। কুরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে ঃ

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ.

"বল, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের অনুগত হও। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে জানিয়া রাখ, আল্লাহ্ কাফিরদিগকে ভালবাসেন না" (৩ ঃ ৩২)।

সীরাত বিশ্বকোষের প্রয়োজনীয়তা এইসব কারণে মুসলিম বিশ্বে বহুকাল হইতে অনুভূত হইয়া আসিয়াছে।

হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত নবী-রাসূল (আ)-গণের জীবনীমূলক তথ্য সংগ্রহ করা খুব সহজ নয়। তাঁহাদের জীবনী সম্পর্কে জানার যে সকল উৎস রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম সারিতে আসমানী কিতাবসমূহ। বর্তমান বিশ্বে উহাদের মধ্যে তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর ও আল-কুরআনুল করীম বিদ্যমান রহিয়াছে। একমাত্র আল-কুরআনুল করীমই সংরক্ষিত। তাহাতে যাহা যেভাবে নাযিল হইয়াছিল ঠিক সেইভাবেই আজিও সংরক্ষিত। অন্য আসমানী কিতাবসমূহ নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংরক্ষিত নয়, এইগুলি প্রক্ষিপ্ত ও মিশ্রণ দোষে আক্রান্ত। নবী-রাসূল (আ)-গণের জীবনী এই গ্রন্থাদি হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। তাফসীরকারগণ নবী-রাসূল (আ)-গণের জীবনী সম্পর্কে তাঁহাদের তাফসীরে যেই সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার এক বিরাট অংশ এই আসমানী কিতাবগুলি (বর্তমানে যাহা আছে) হইতে সংগৃহীত, সেইগুলিকে 'ইসরাঈলিয়্যাত' বলিয়া অভিহিত করা হয়। একমাত্র কুরআন মজীদই নবী-রাসূল (আ)-গণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন করিয়াছে। কুরআন মজীদে নবী-রাসূল (আ)-গণের মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছেন। তাহাও ধারাবাহিকভাবে নয়। কুরআন মজীদ হিদায়াতের উৎস গ্রন্থ। সেই প্রেক্ষিতে যেখানে যাহা প্রয়োজন, কেবল তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। হাদীছ শরীফ নবী-রাসূল (আ)-গণের জীবনী সম্পর্কে জানার আরেকটি উৎস। সেইগুলিতেও নবী-রাসূল (আ)-গণের জীবনের কিছু কিছু অংশমাত্র বিবৃত হইয়াছে। পূর্ববর্তী জীবনীকারগণও এই উৎসগুলিকে প্রয়োজনমত ব্যবহার করিয়াছেন। কুরআন মজীদ নবী-রাসূলগণের পূত-পবিত্র জীবনের কিছু কিছু অংশ সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে। অন্যান্য উৎসে তাঁহাদের কাহারো কাহারো জীবন সম্পর্কে কিছু বিরূপ ও অসঙ্গত বর্ণনা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সেইগুলি কুরআন মজীদ খণ্ডন করিয়াছে। সীরাত বিশ্বকোষ রচনায় এই সকল বিষয়ের প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে, যাহাতে মানুষ নবী-রাসূলগণের পবিত্র জীবনী হইতে যথার্থ শিক্ষালাভ করিতে পারে।

বাংলা ভাষায় বিক্ষিপ্তভাবে নবী-রাসূল (আ)-গণের জীবনী কিছু কিছু রচিত হইয়াছে। একই গ্রন্থে নবী-রাসূলগণের জীবনী এই প্রথম। বিজ্ঞ নিবন্ধকারগণ সম্পাদনা পরিষদের নির্দেশ ও পরামর্শ মোতাবেক বিশ্বকোষের জন্য নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আল-কুরআন ও উহার তাফসীর, হাদীছ সীরাত, তারীখ প্রভৃতি ইসলামী উৎস ছাড়াও অন্যান্য উৎস, যথা বাইবেল, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Encyclopaedia Britannica, Encyclopedia Americana, Collier's Encyclopaedia, Encyelopaedia of World Biography ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে তথ্যাদি অতি সতর্কতার সহিত সংগৃহীত হইয়াছে।

মানুষ ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নয়। মানুষের কোন রচনাই পরিপূর্ণভাবে ভুল-ত্রুটিমুক্ত হইতে পারে না। কাজেই আমাদের এই প্রচেষ্টাও সম্পূর্ণ নির্ভুল হইবে, তাহা নয়। ভবিষ্যতে পাঠকদের পরামর্শ ও সমালোচনার নিরিখে গ্রন্থটি আরও বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা হইবে ইনশাআল্লাহ।

'নবী' শব্দটি 'নাবা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ-সংবাদ, খবর ইত্যাদি। সংবাদ ও বার্তাবাহক হইলেন নবী। কাহারও মতে শব্দটি নাবওয়াতুন হইতে নির্গত। অর্থ উন্নত বা উচ্চ মর্যাদাবান বস্তু। নবী সাধারণ মানুষের তুলনায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এই হিসাবে তাঁহাকে নবী বলা হয়। আন-নাবিয়্যুন শব্দের অর্থ সরল ও স্পষ্ট পথও হইতে পারে। নবীগণ নিজেরা সরল ও স্পষ্ট পথে চলেন এবং মানুষকে সরল ও স্পষ্ট পথে চলিতে আহ্বান করেন। তাই তাঁহাদিগকে নবী বলা হয় (ইব্ন মানযূর, লিসানুল আরাব, ১খ., পৃ. ১৬৪)।

শারীআতের পরিভাষায়, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে স্বপ্ন অথবা.ইলহাম অথবা ফেরেশতার মাধ্যমে যাঁহার প্রতি বিশেষ ধরনের ওহী নাযিল করা হইয়াছে, তিনি নবী (মুফতী আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল ফিক্হ, পৃ. ৫২১)। নবীগণের প্রতি দীন প্রচারের দায়িত্বও অর্পিত হইয়াছে।

রাসূল-এর শব্দমূল "রা-সীন-লাম", অর্থ দূত, প্রেরিত ব্যক্তি, বার্তাবাহক। রাসূল অর্থ রিসালাতও কেহ কেহ বলিয়াছেন। আভিধানিক অর্থে রাসূল এমন ব্যক্তি, যিনি তাঁহার নিকট প্রেরিত বার্তার অনুসরণ করেন (ইব্ন মানযূর, লিসানুল 'আরাব, ১১খ., পৃ. ২৮৪)। শরী'আতের পরিভাষায় রাসূল এমন এক মানুষ আল্লাহ তা'আলা যাঁহার প্রতি শরী'আতের বিধান ওহীর মাধ্যমে নাযিল করিয়াছেন এবং একই সাথে শরীআতের বিধান প্রচারের দায়িত্বও প্রদান করিয়াছেন (মুহাম্মাদ আলী আস্-সাবূনী, আন্-নুবুওয়্যা ঃ ওয়াল আমবিয়া, পৃ. ১৭)। কাহারও মতে তিনি রাসূল যিনি আল্লাহ তা'আলার বিধি-বিধান মানুষের কাছ পৌঁছাইবার লক্ষ্যে আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত ও মনোনীত (আন্-নাসাফী, শারহু আকাইদ, পৃ. ৪০)।

প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে, যে সকল পয়গাম্বরের প্রতি কিতাব বা সহীফা নাযিল করা হইয়াছে এবং যাঁহাদিগকে নূতন শরী'আত দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা রাসূল। সকল রাসূলই নবী। নবীগণ (আ) পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রচলিত শরী'আতের অনুসরণ করেন এবং মানুষের মধ্যে তাহা প্রচার করেন। কাজেই প্রত্যেক নবী রাসূল নহেন। নবী-রাসূলগণ সকলেই জ্ঞানী, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন। সর্বোপরি তাঁহারা সকলেই নিষ্পাপ। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদিগকে মহৎ আদর্শে ও উন্নত চরিত্রে বিভূষিত করিয়াছেন। তাঁহারা সকল সৎ গুণের অধিকারী। তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে

মানুষের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। সত্য প্রচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের কর্ম। তাঁহারা সব কিছুই আল্লাহ্র নির্দেশে করিয়াছেন। আল্লাহ তাঁহাদের প্রতি যেই দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করিয়াছেন তাহা পালন করিতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র অলসতা প্রদর্শন করেন নাই। প্রয়োজনে এইজন্য তাঁহারা তাঁহাদের জীবন কোরবান করিয়াছেন।

নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহ্র দান। তিনি তাঁহার বান্দাদিগের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ইহা দান করেন। নিজের চেষ্টায় ও সাধনায় উহা হাসিল করা যায় না। কুরআনে মাজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ۔

"আল্লাহ ফেরেশতাদিগের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হইতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা" (২২ ঃ ৭২)।

নিজের যোগ্যতায় নবী-রাসূল হওয়া যায় না। ইহা হইল আল্লাহ তা'আলার মনোনয়ন। নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মানুষ যখন পাপ-পংকিলতায় লিপ্ত হইয়া মনুষ্যত্বহারা হইয়া যায়, স্রষ্টার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক থাকে না, এমনকি সে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে বিবিধ অমূলক ধারণা পোষণ করে এবং তাঁহার সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করিতে থাকে তখন মানব সমাজে ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসে। সমাজের এই দুর্দিনে নবী-রাসূলগণের আগমন অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। তখন মহান আল্লাহ্ তাঁহার খাস রহমতে মানবজাতিকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করিবার জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মানুষের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা মহান আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীর সঠিক পরিচয় লাভ করিতে মানুষ সক্ষম হয় না। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়া মানুষকে সঠিক পথে চলার দিশা প্রদান করেন এবং তাঁহার নিজের কিছু পরিচয় প্রদান করিয়া মানুষকে তাঁহার নৈকট্য লাভের সুযোগ দান করেন। কাজেই নবী-রাসূলদের আবির্ভাব আল্লাহ্র অসীম করুণারই প্রকাশ। এইজন্যই ইমাম রাযী (র) তাঁহার তাফসীরে কাবীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন,

من اَنْكَرَ النبوة والرسالة فهو فى الحقيقة ما عرف اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ۔

"যে ব্যক্তি নবুওয়াত ও রিসালাত অস্বীকার করিল, সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র মা'রিফাত হইতেই বঞ্চিত রহিল" (মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী, তারজুমানুস-সুন্নাহ, ৩খ., পৃ. ১৫৫)।

নবী-রাসূলের আগমন না হইলে মানুষ বলিতে পারিত, আমরা জানিতে পারি নাই বলিয়াই তো সত্যপথে পরিচালিত হইতে পারি নাই। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔

"আমি সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যাহাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে" (৪ ঃ ১৬৫)।

আল্লাহ তা'আলা এইজন্য প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

"এবং প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন তাহাদের রাসূল আসিয়াছে তখন ন্যায়বিচারের সহিত তাহাদের মীমাংসা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতি জুলুম করা হয় নাই" (১০ ঃ ৪৭)।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ.

"এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথপ্রদর্শক" (১৩ ঃ ৭)।

নবী ও রাসূল (আ)-গণের সংখ্যা সম্পর্কে হাদীছে উল্লেখ আছে। ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (র) তাঁহার মুসনাদে হযরত আবূ যার গিফারী (রা) হইতে একটি হাদীছ সংকলন করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বলিলেন, হযরত আদম (আ)। আমি বলিলাম, তিনি কি নবীও ছিলেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, হাঁ, তিনি আল্লাহ্র সাথে বাক্যালাপকারী নবী। অতঃপর আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাঁহাদের মধ্যে রাসূলগণের সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন, তিন শত দশের কিছু অধিক"। আরেকটি রিওয়ায়াত হযরত আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, "হযরত আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল, নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি বলিলেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে রাসূল হইলেন তিন শত পনর জন। একটি বড় দল" (মিশকাতুল-মসাবীহ, কানপুর, ভারত, পৃ. ৫১১)। কোন কোন বর্ণনায় দুই লক্ষ চব্বিশ হাজারের উল্লেখও পাওয়া যায় (আন্-নাসাফী, শারহুল আকাইদ, পৃ. ১৩১)। কুরআনে মাজীদে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ.

"আমি প্রেরণ করিয়াছি অনেক রাসূল, যাহাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলিয়াছি; এবং অনেক রাসূল, যাহাদের কথা তোমাকে বলি নাই" (৪ ঃ ১৬৪)।

কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে মাত্র ২৫ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল এবং হযরত মুহাম্মাদ (স) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল। তাঁহার পর আর কোন নবী প্রেরিত হইবেন না।

কুরআন মজীদে যেই সকল নবী-রাসূল (আ)-এর উল্লেখ আছে, তাঁহাদের উপর বিস্তারিত ও দৃঢ় ঈমান আনা অপরিহার্য। যাহাদের নাম উল্লেখ নাই তাঁহাদের উপরও ইজমালী ঈমান আনিতে হইবে। রাসূলগণের মধ্যে পাঁচজন হইলেন "উলুল 'আয্ম" (দৃঢ়তার অধিকারী) রাসূল ঃ হযরত নূহ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মাদ (স)। নবী-রাসূলগণ সকলেই তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদির বিবেচনায় সমপর্যায়ের হইলেও তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য রহিয়াছে। আল-কুরআনুল কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ.

"এই রাসূলগণ, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি" (২ ঃ ২৫৩)।

তাহা সত্ত্বেও আমাদের জন্য নবী হিসাবে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য করা ঠিক নহে। নবী-রাসূলগণ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র খলীফাও ছিলেন। জমহুরের মতে, নবুওয়াত ও রিসালাত পুরুষদিগের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা নবুওয়াত ও রিসালাত অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব ও জটিল কর্তব্যের ব্যাপার। তাই পুরুষগণই এই দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সম্যকভাবে উপযোগী। আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوْحِىْ اِلَيْهِمْ.

"তোমার পূর্বে আমি যাহাদেরকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছি, তাহারা সকলেই ছিল পুরুষ" (১৬ ঃ ৪৩)।

এই কথা নিঃসন্দেহে ও নির্দ্বিধায় বলা চলে, মানুষের পার্থিব জীবনের ও পরকালীন জীবনের উন্নতি-অগ্রগতি, সুখ-শান্তি, নাজাত-পরিত্রাণ একমাত্র রাসূল ও নবীগণের অনুসরণের মাধ্যমেই হাসিল করা সম্ভব। মানুষকে আল্লাহ তাঁহার যেই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা করিবার জন্যও নবী-রাসূলগণের মত পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। সর্বোপরি আল্লাহ্‌র নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও ভালবাসা পাওয়ার জন্য নবী-রাসূলগণের আনুগত্য ও অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য। এই উদ্দেশে তাঁহাদের পবিত্র জীবনী সঠিকভাবে জানা মানুষের কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ "সীরাত বিশ্বকোষ" রচনার প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। যাঁহারা এই প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মরহুম জনাব আবদুল হক ফরীদী ও মরহুম জনাব আহমাদ হুসাইন অন্যতম দুই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তাঁহারা এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন দেখিয়া যাইতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহারা ইহার বাস্তবায়নের দৃঢ় আশা পোষণ করিয়াছিলেন এবং সেই লক্ষ্যে উপদেশ ও দিকনির্দেশনাও দিয়াছিলেন। আল্লাহ তাঁহাদিগকে উহার পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করুন। এই প্রকল্পের সঙ্গে যাঁহারা জড়িত আছেন, সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রকল্প পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক এবং আরো অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, তাঁহারা সকলেই একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য এই প্রকল্পের বাস্তবায়নের নিমিত্তে পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের সকলকে জাযায়ে খায়র দান করুন এবং এই প্রকল্পকে সফলতার সঙ্গে সমাপ্ত করার তৌফিক দান করুন।

প্রকাশিতব্য সীরাত বিশ্বকোষের প্রথম তিন খণ্ডে থাকিবে নবী ও রাসূলগণের পবিত্র জীবনী, পরবর্তী দশ খণ্ড বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জন্য নির্ধারিত এবং সর্বশেষ দশ খণ্ডে সাহাবায়ে কিরামদের (রা) জীবনী স্থান পাইবে। এই মূল্যবান গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে ইনশাআল্লাহ উহা আমাদের জাতীয় জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলিবে এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসাবে গণ্য হইবে।

আমরা আল্লাহ্‌র সহায়তা কামনা করি। তাঁহার রহমতের উপরই আমাদের একমাত্র ভরসা।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে

আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন

সূচীপত্র

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِى الأَلْبَابِ .

"তাঁহাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা" (১২ ঃ ১১১)।

১

হযরত আদম (আ)

حضرت ادم عليه السلام

হযরত আদম (আ)

উপক্রমণিকা

হযরত আদম (ادم) আলায়হিস্ সালাম একাধারে মানবজাতির আদি পিতা, এই পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত খলীফা (প্রতিনিধি) এবং প্রথম নবী ও রাসূল। মানবজাতির এবং নবুওয়াত ও রিসালাতের সূচনা হয় তাঁহার মাধ্যমে। তাঁহার বংশধর হিসাবেই মানুষকে আরবী, উর্দূ, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় 'আদমী' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

নবী-রাসূলগণ যেহেতু শিষ্টাচার ও সভ্যতারই পয়গামবাহক, তাই আদম (আ)-কে মানব সভ্যতারও পথিকৃতরূপে অভিহিত করা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার জীবনেতিহাস আলোচনাকালে যথাস্থানে বরাতসহ তাহা বিবৃত হইবে। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে বিশ্ব সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হইল।

বিশ্ব সৃষ্টির বিবরণ

আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা যেমন একক লা-শরীক, তেমনি তাঁহার গুণাবলীতেও তিনি অনন্য। তাঁহার অসংখ্য গুণবাচক নামসমূহের একটি হইতেছে ঃ البديع। কোনরূপ পূর্ব নমুনা ব্যতীতই সম্পূর্ণ নূতনভাবে উদ্ভাবনকারী, যাঁহার সৃষ্টিকর্মে কোনরূপ উপায়-উপকরণ বা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। আল্লামা রাগিব ইস্পাহানী তদীয় বিখ্যাত মুফরাদাতুল কুরআনে লিখিয়াছেন ঃ

"কোনরূপ পূর্ব নমুনার অনুকরণ-অনুসরণ ব্যতিরেকে উদ্ভাবন করাকে ইবদা' বলা হয়।"

"আর বাদী' শব্দটি যখন আল্লাহ্র ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন এই البديع। অর্থ হয় সেই সত্তা যিনি কোন যন্ত্রপাতি, উপায়-উপকরণ, স্থান-কাল-পাত্র ব্যতিরেকেই সৃষ্টি করিয়াছেন, অস্তিত্বে আনয়ন করিয়াছেন" (মুফরাদাত)।

একই অর্থে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা এবং যখন তিনি কোন কিছু করিতে সিদ্ধান্ত করেন তখন উহার জন্য শুধু বলেন, 'হও' আর অমনি উহা হইয়া যায়" (২ ঃ ১১৭)।

বিশ্ব সৃষ্টি সংক্রান্ত কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করিলে ইহার দ্বিবিধ তত্ত্ব পাওয়া যায়। কোন কোন আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া তারপর আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেন। যেমন ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ .

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনসংযোগ করেন এবং উহাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (২ : ২৯)।

تَنْزِيْلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى .

"যিনি পৃথিবী ও সমুচ্চ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে উহা (কুরআন) অবতীর্ণ" (২০ : ৪)।

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَنْدَادًا . وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ . ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ . فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ .

"বল, তোমরা কি তাঁহাকে অস্বীকার করিবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে এবং তোমরা তাঁহার সমকক্ষ দাঁড় করাইতেছ? তিনি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করিয়াছেন অটল পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং উহাতে রাখিয়াছেন কল্যাণ এবং চারিদিনের মধ্যে উহাতে ব্যবস্থা করিয়াছেন খাদ্যের সমভাবে যাচ্ঞাকারীদের জন্য। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যাহা ছিল ধূম্রপুঞ্জবিশেষ। অনন্তর তিনি উহাকে ও পৃথিবীকে বলিলেন, তোমরা উভয়ে আস (আল্লাহ্‌র বিধানের অনুগত হইয়া) ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। ইহারা বলিল, আমরা আসিলাম অনুগত হইয়া। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ব্যক্ত করিলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করিলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করিলাম সুরক্ষিত। ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা" (৪১ : ৯-১২)।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا . وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَاءً ثَجَّاجًا . لِنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا .

"আমি কি করি নাই ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক? আমি সৃষ্টি করিয়াছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়। তোমাদের নিদ্রাকে করিয়াছি বিশ্রাম এবং রাত্রিকে করিয়াছি আবরণস্বরূপ এবং দিবসকে করিয়াছি জীবিকা আহরণের সময়। আর আমি নির্মাণ করিয়াছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুস্থিত

সপ্ত আকাশ এবং সৃষ্টি করিয়াছি প্রোজ্জ্বল দীপ এবং বর্ষণ করিয়াছি মেঘমালা হইতে প্রচুর বারি, যাহাতে তদ্দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান" (৭৮ ঃ ৬-১৬)।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ـ

"নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মহাস্রষ্টা মহাজ্ঞানী" (১৫ ঃ ৮৬; আরো দ্র. ৩৬ ঃ ৮১)।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ـ

"পৃথিবীর সবকিছুই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন" (২ ঃ ২৯)।

আবার বহু আয়াতে আকাশরাজি সৃষ্টির কথা প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে যাহাতে ধারণা হইতে পারে যে, আকাশমালাই পৃথিবীর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ـ

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আকাশমণ্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, আর সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকার ও আলো" (৬ ঃ ১)।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ

"তিনিই যথাবিধি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন" (৬ ঃ ৭৩)।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাহাতে উহাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, যাহা তাঁহারই আজ্ঞাধীন তাহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন। জানিয়া রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁহারই। মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্" (৭ ঃ ৫৪; আরও দ্র. ১১ ঃ ৭; ১৪ ঃ ১৯ ও ৩২; ২৫ ঃ ৫৯; ২৭ ঃ ৬; ২৯ ঃ ৪৪; ৩৬ ঃ ৮১; ৩০ ঃ ৮; ৩৯ ঃ ৩৮, ৪৫ ঃ ২২, ৫৭ ঃ ৪; ৬৪ ঃ ৩; ৬৫ ঃ ১২ ইত্যাদি)।

এখানে ছয় দিনে সৃষ্টি সংক্রান্ত আয়াতসমূহের দিন (اليوم) শব্দটির ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ ইহা যে দুনিয়ার ২৪ ঘন্টার দিন নহে তাহা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. ই.ফা. প্রকাশিত আল-কুরআনুল কারীম ৭ ঃ ৫৪-এর টীকায়, পৃ. ২৩৪)।

আল-কুরআনের সূরা হজ্জে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ـ

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট একদিন তোমাদের গণনার সহস্র বৎসরের সমান" (২২ ঃ ৪৭)। অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ.

"এমন একদিনে যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বৎসর" (৭০ ঃ ৪)।

বলা বাহুল্য, সূরা আ'রাফ (৭ ঃ ৫৪)-এ ছয় দিনে সৃষ্টি সংক্রান্ত আয়াতের টীকায় মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী 'প্রাক-সৃষ্টি যুগের সেই দিনগুলি যে আমাদের কয়েক ঘন্টার পৃথিবী ও সূর্যের গতি ভিত্তিক দিন ছিল না', তাহাই বলিয়াছেন।

আল্লামা ইউসুফ আলীও তদীয় কুরআন অনুবাদের টীকায় (১৯৩৪ সালে প্রকাশিত) 'ইয়াওম' বলিতে দিন বুঝাইবার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াও শেষ পর্যন্ত ছয় দিন বলিতে সৃষ্টির বিবর্তনের সুদীর্ঘ ছয়টি মেয়াদ বুঝানো হইয়াছে বলিয়া তিনিও মন্তব্য করিয়াছেন।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (মৃ. ৭৭৪ হি.) 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে বলেন, "তাফসীরকারগণ উক্ত ছয় দিনের পরিমাণ সম্পর্কে দ্বিবিধ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। জমহূর মুফাসসিরীন ঐ দিনগুলো আমাদের প্রাত্যহিক ছয়দিন বলিয়া মনে করেন। অপরদিকে ইব্ন আব্বাস, মুজাহিদ, দাহ্হাক, কা'ব আহবার উহাকে আমাদের দিবস হিসাবে এক হাজার বৎসরের এক এক দিন বলেন। ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবী হাতিম এই রিওয়ায়াতসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) জাহমিয়াদের বিরুদ্ধে লিখিত গ্রন্থে এই মতের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। ইব্ন জারীর এবং পরবর্তী যুগের কিছু সংখ্যক আলিমও এই মতের সমর্থক (১খ, পৃ. ১২)।

মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) বলেন ঃ "বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবারাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকিতে পারে। যেমন জান্নাতের দিবারাত্রি সূর্যের পরিক্রমণ অনুযায়ী হইবে না" (মা'আরিফুল কুরআন', সংক্ষেপিত, পৃ. ৪৪৫, মদীনা মুনাওয়ারা সং.)।

বিশুদ্ধ রিওয়ায়ত অনুযায়ী, যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হইয়াছে উহা রবিবার হইতে শুরু করিয়া শুক্রবার শেষ হয়, শনিবারে জগৎ সৃষ্টির কাজ হয় নাই (ইব্ন কাছীর)।

সূরা হা-মীম সাজদার (৪১) নবম ও দশম আয়াতে দুইদিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি এবং দুই দিনে পাহাড়-পর্বত, সাগরমালা, খনি, উদ্ভিদ, মানুষ, জীব-জানোয়ার সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। যেমন ঃ

خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ.

"তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন দুই দিনে" (৫১ ঃ ৯)।

وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ.

"ইহাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন চারি দিনে" (৪১ ঃ ১০)।

যে দুই দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হইয়াছে উহা ছিল রবিবার ও সোমবার, দ্বিতীয় যে দুই দিনে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম, পাহাড় পর্বত, নদ-নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয় তাহা ছিল মঙ্গল ও বুধবার।

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ.

"অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করিলেন" (৪১ ঃ ১২)।

বলাবাহুল্য, এই দুই দিন হইবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

ইব্ন জারীর সৃষ্টি শুরুর প্রথম দিন সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের বরাতে বলেন ঃ

"তাওরাতপন্থীরা (অর্থাৎ ইয়াহূদীরা) বলে, আল্লাহ্ সৃষ্টি শুরু করেন রবিবারে। ইনজীল অনুসারী খৃস্টানরা বলে, আল্লাহ সৃষ্টি শুরু করেন সোমবারে। আমরা মুসলমানগণ বলি, আল্লাহ্ সৃষ্টি শুরু করেন শনিবার দিন, যেমনটি রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে আমাদের নিকট পর্যন্ত তথ্য পৌছিয়াছে।"

ইমাম ইব্ন কাছীর সাহাবী আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীছও উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা শনিবারে মাটি সৃষ্টি করেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ১২)। তারপর তিনি লিখেন ঃ

"সুতরাং সৃষ্টিকার্য ছয় দিনেই সম্পন্ন হয় এবং ঐদিনগুলোর শেষ দিন ছিল শুক্রবার। এই জন্য মুসলমানগণ উহাকে সাপ্তাহিক ঈদরূপে গ্রহণ করে- যে দিনটি হইতে আমাদের পূর্বেকার আহলে কিতাবকে আল্লাহ্ বিচ্যুত করিয়া দিয়াছিলেন" (পূ. গ্র/১খ, পৃ. ১৩)।

সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কিত এই বিবরণটি ঈষৎ গরমিলসহ বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে (তু. পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, আদি পুস্তক)। এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যেখানে 'কুন' (বা 'হও') বলামাত্র সব কিছু হইয়া যায়, সেখানে সৃষ্টি কার্যে এই ছয় দিন বা ছয়টি বিশাল মেয়াদকাল অতিবাহিত হইল কেন? হযরত সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র) এই সম্পর্কে বলেন ঃ

"মহান আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরতে নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সবকিছু সৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্তু মানুষকে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মসম্পর্কতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই হইতে ছয় দিন ব্যয় করা হইয়াছে' [মা'আরিফুল কুরআন (সংক্ষেপিত), পৃ. ৪৪৫]।

সূরা আম্বিয়ার একটি আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী প্রথমে অঙ্গা-অঙ্গিভাবে একত্রে মিশিয়া ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ اَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ.

"যাহারা কুফরী করে তাহারা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশিয়াছিল ওৎপ্রোতভাবে, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করিয়া দিলাম এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিলাম পানি হইতে, তবুও কি উহারা ঈমান আনিবে না" (২১ঃ ৩০)ঃ

সৃষ্টির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া।

আদম (আ) পৃথিবীর আদি মানব

হযরত আদম (আ) যে পৃথিবীর আদি মানব এবং সমগ্র মানব জাতির আদি পিতা তাহা কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত ও মহানবী (স)-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"আল্লাহ্র নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও', ফলে সে হইয়া গেল" (৩ ঃ ৫৯)।

অর্থাৎ আদম (আ) পিতা ও মাতা ব্যতীতই আল্লাহ্র কুদরতে সৃষ্ট, সরাসরি মাটি হইতে। আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

"তিনিই তোমাদেরকে এক বক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও উহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যাহাতে সে তাহার নিকট শান্তি পায়" (৭ ঃ ১৮৯)।

অন্য আয়াতে তাঁহার স্ত্রী হাওয়াকেও তাঁহারই দেহ হইতে সৃষ্টির উল্লেখ করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নরনারী ছড়াইয়া দেন" (৪ ঃ ১)।

উক্ত আয়াতের পাদটীকায় তাফসীর উছমানীতে বলা হইয়াছে ঃ হযরত আদম (আ) হইতে প্রথমে হযরত হাওয়াকে তাঁহার বাম পাঁজর হইতে সৃষ্টি করেন। তারপর তাঁহাদের দুইজন হইতে সমস্ত নরনারী সৃষ্টি করিয়া বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া দেন। ফলে মূলত এক অভিন্ন প্রাণ ও ব্যক্তি হইতেই আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত মানবজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৫৮)।

প্রায় ঐ একইরূপ বক্তব্য আসিয়াছে অন্য আয়াতে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا.

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার" (৪৯ ঃ ১৩)।

সুতরাং পৃথিবীর তাবৎ মানবই যে একই ব্যক্তি ও এক অভিন্ন দম্পতি হইতে বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের আদি পিতা আদম (আ), তাহা কুরআন শরীফের বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন আয়াতে মানবজাতিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বনী আদম বা আদম-সন্তান বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (দ্র. ৭ ঃ ২৭, ৩১, ৩৫, ৩৬ ঃ ৬০-৬১)।

শাফা'আত সংক্রান্ত হাদীছে রহিয়াছে, কিয়ামতের দিন সমবেত মানবমণ্ডলী আদম (আ)-এর নিকট গিয়া আবেদন করিবে ঃ

"হে আদম! আপনি মানবজাতির আদি পিতা। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার পক্ষ হইতে 'রূহ' আপনার মধ্যে ফুঁকিয়া দেন। তাঁহার ফেরেশতাকূল দিয়া আপনাকে সিজদা করাইয়াছেন। তাঁহার জান্নাতে আপনাকে বাস কতিে দিয়াছেন। আমরা কী মহাসংকটে রহিয়াছি তাহা কি আপনি লক্ষ্য করিতেছেন না? আপনি কি আপনার প্রতিপালকের দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করিবেন না"? (বুখারী, ১খ, পৃ. ৪৭০, পারা-১৩, কিতাবুল আম্বিয়া, আদম ও তদীয় বংশধরগণের সৃষ্টি সংক্রান্ত অধ্যায়)।

আল-কুরআনে আদম (আ) প্রসঙ্গ

মানব সৃষ্টি আর আদম (আ)-এর সৃষ্টির কথা আল-কুরআনের বর্ণনায় মূলত এক ও অভিন্ন ব্যাপার। কেননা, কুরআন তথা আসমানী সমস্ত কিতাবের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আদম (আ)-ই হইতেছেন প্রথম মানব। কুরআন শরীফের পঁচিশটি স্থানে 'আদম' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন ঃ ২ ঃ ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫ ও ৩৭; ৩ ঃ ৩৩, ৫৯; ৫ ঃ ২৭; ৭ ঃ ১১, ১৯, ২৬, ৩১, ৩৫ ও ১৭২; ১৭ ঃ ৬১ ও ৭০; ১৮ ঃ ৫০; ৯ ঃ ৫৮; ২০ ঃ ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২০ ও ১২১; ৩৬ ঃ ৬০।

আদিপুস্তক

উক্ত আয়াতসমূহে তাঁহার সৃষ্টির বিবরণ, সৃষ্টির উপাদান, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তাঁহাকে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশতাদের নিকট ঘোষণা দান, ফেরেশতাগণের উক্তি ও সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার জবাব, আল্লাহ্ পাক কর্তৃক আদম (আ)-কে জ্ঞান ও মর্যাদা দান, আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতাগণ কর্তৃক আদম (আ)-কে সিজদা করা ও ইহাতে আযাযীলের অস্বীকৃতি, কুযুক্তি উত্থাপন এবং পরিণামে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত হওয়া, আদম (আ)-এর জান্নাতে অবস্থান ও সঙ্গীরূপে স্ত্রী হাওয়াকে লাভ, শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাতে আদম ও হাওয়া দম্পতির নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ ও পরিণামে জান্নাত হইতে পৃথিবীতে অবতরণ, তাঁহাদের তওবা কবুল হওয়া, তাঁহাদের বংশবিস্তার, হাবীল-কাবীলের দ্বন্দ্ব ও তাহাদের কুরবানী, কাবীল কর্তৃক হাবীলকে হত্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

আদম (আ)-এর নাম সম্পর্কে

আদম শব্দটির আরবী বা অনারবী হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অভিমত হইল উহা হিব্রুভাষায় ادما শব্দ হইত গৃহীত- যাহার অর্থ পৃথিবী। কেননা, পৃথিবীর মাটি হইতে তিনি সৃষ্ট (দায়েরাতুল মা'আরিফ, আরবী, ১খ, পৃ. ৪৫)। আবূ মনসূর জাওয়ালি বলেন, আদম, সালিহ, শু'আয়ব ও মুহাম্মাদ (সা) ব্যতীত সকল নবীর নামই অনারবী।

জাওহারী বলেন, আদম শব্দটি আরবী (দায়েরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়া = আরবী ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্র. আদম প্রসঙ্গ)।

ইমাম আবূ জা'ফর তাবারী (র) বলেন, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ্ ফেরেশতা আযরাঈল (আ)-এক পৃথিবীতে পাঠাইলেন। তিনি পৃথিবীর উপরিভাগের যে মাটি লইয়া যান উহা দ্বারাই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়। পৃথিবীর উপর আস্তরণ বা ভূ-ত্বককে যেহেতু আরবীতে اديم (আদীম) বলা হইয়া থাকে, সে জন্য তাঁহার নামকরণ করা হয় আদম (آدم)।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা)-ও বলেন, আদম (আ)-কে যেহেতু আদীমুল আরদ (ভূত্বক) হইতে সৃষ্টি করা হয় এই জন্যই তাঁহার নাম আদম রাখা হয়।

হযরত আলী (রা) বলেন, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয় আদীম বা ভূ-ত্বক হইতে। তাহাতে উত্তম-অধম, কল্যাণকর ও অকল্যাণকর সবকিছুই ছিল। এই জন্যই তুমি আদম সন্তানদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখিতে পাও। তাহাদের মধ্যকার কেহ বা পুণ্যবান ও কল্যাণকর, আবার কেহ পাপাচারী ও অকল্যাণকর (তাফসীরে তাবারী, আরবী), (সূরা বাকারার ৩১নং আয়াতের তাফসীর)। রাগিব ইসফাহানী বলেন,

"আদম-মানবজাতির আদি পিতা, তাঁহার এইরূপ নামকরণের কারণ হইল তাঁহার দেহ 'আদীমুল আরদ' বা ভূ-ত্বক হইতে সৃষ্ট। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ তাঁহার দেহের ادمة বা গো-ধুম বর্ণের জন্য তাঁহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে (আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ঃ ১৪, দ্র. আদম, দারু'ল-মা'রিফা, কায়রো)।

কেহ কেহ আবার আদম শব্দটি اُدْمٌ (আদ্ম) অথবা ادمة শব্দ হইতে গৃহীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উহার অর্থ সমন্বিত ও সংমিশ্রিত। এই অর্থ দ্বারা আদম (আ)-এর মধ্যে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের সমন্বয় ও সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে বুঝায়। কেননা মাটি ও পানির মিশ্রণে তাঁহার খামীর প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

কেহ কেহ আবার ادم শব্দটি ادمة শব্দ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ অনুসরণযোগ্য। কিন্তু যামাখশারী ادم শব্দটি আরবী বলিলেও নিম্নোক্ত কারণে শব্দটি অনারব বলিয়া

প্রতীয়মান হয়। শব্দটির বহুবচন اوادم এবং ইহার اويدم বা ক্ষুদ্রত্ববোধকরূপ همزة দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শব্দটি অন-আরবী, অন্যথায় উভয়রূপেই আদ্যাক্ষর অপরিবর্তিত থাকিত।

হিব্রু ভাষায় ادم শব্দের অর্থ মানবজাতি। ফিনিশীয় এবং সাবাঈ ভাষায়ও শব্দটির একই রূপ। ইংরেজী সাহিত্য ও অন্যান্য ভাষায় ادم ও حواء শব্দ ইন্‌জীল এবং তাওরাতের মাধ্যমে প্রচলিত হইয়াছে। বাইবেলের আদিপুস্তকে উল্লিখিত আছে যে, আদম তাঁহার স্ত্রীর নাম حواء এই জন্য রাখিয়াছিলেন যে, তিনি জীবকূলের মাতা (আরও দ্র. হিব্রু, বিশ্বকোষ, হাওওয়া নিবন্ধ)। آدم এবং آدوم حواء -এর অর্থ যে কোন বিষয়ের জন্মদাতা, গোত্র বা জাতির বড় নেতা এবং আদি পুরুষ।যেমন দক্ষিণাত্যের ওয়ালী উর্দু কবিদের বাবা আদম ছিলেন।' আরও তু. ১৮৮৪, পৃ. ৩৯৬। (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফা প্রকাশিত, ১খ, নিবন্ধ আদম, পৃ. ২৪)।

আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য

কুরআন শরীফের সূরা বাকারায় সর্বপ্রথম যেখানে আদম (আ) সৃষ্টি প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হইয়াছে সেখানেই তাঁহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ‎.

"(স্মরণ কর সে সময়ের কথা), যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলিলেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করিতেছি" (২ ঃ ৩০)।

ইমাম তাবারী বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিব। এই ব্যাখ্যা হাসান ও কাতাদার অভিমতের সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পৃথিবীর প্রথম বাসিন্দা ছিল জিন্ন জাতি। তাহারা এখানে ফিৎনা-ফাসাদ, হানাহানি ও খুন-খারাবীতে লিপ্ত হইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের শাস্তি বিধানের জন্য ফেরেশতাদের একটি বাহিনীসহ ইবলীসকে পাঠাইলেন। ইবলীস ও তাহার সাথী ফেরেশতাগণ তাহাদেরকে হত্যা করিল এবং বিভিন্ন সাগরের দ্বীপে ও পাহাড়-পর্বতে তাড়াইয়া দিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ও মানবজাতিকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিলেন। সেই হিসাবে উক্ত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ আমি পৃথিবীতে জিন্ন জাতির স্থলাভিষিক্ত সৃষ্টি করিব- যাহারা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া পৃথিবীতে বসবাস করিবে এবং তাহা আবাদ করিবে।

ইব্‌ন যায়দ-এর সূত্রে ইউনুস (র) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাগণকে বলিলেন ঃ আমি মনস্থ করিয়াছি পৃথিবীতে এমন একটি নূতন জাতি সৃষ্টি করিব যাহারা পৃথিবীতে আমার খলীফা (প্রতিনিধি) হইবে। ঐ সময় ফেরেশতাগণ ছাড়া আল্লাহ্র আর কোন মাখলুক ছিল না বা পৃথিবীতে অন্য কোন সৃষ্ট জীবও ছিল না। আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাগণকে খবর দিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথিবীতে তাঁহার খলীফা সৃষ্টি করিবেন। তাহারা সেখানে তদীয় সৃষ্টিকূলের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের বিধান কার্যকরী করিবে।

ইব্‌ন মাসঊদ (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে বর্ণিত আছে যে, ঐ খলীফার প্রকৃতি কী হইবে ফেরেশতাগণের এইরূপ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন ঃ তাহার কতক সন্তান এমনও হইবে যাহারা পৃথিবীতে ফিত্না-ফাসাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি, খুনাখুনিতে লিপ্ত হইবে।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) হইতে উদ্ধৃত উক্ত রিওয়ায়াত অনুসারে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হইবে, আমি পৃথিবীতে আমার মাখলূকসমূহের মধ্যে আইন পরিচালনার্থ আমার খলীফা নিয়োগ করিব। সেই খলীফা হইবে আদম এবং তাহার সেই সব সন্তানরা যাহারা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবে এবং সৃষ্টিকূলের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করিবে। তবে ফাসাদ সৃষ্টি ও অন্যায় কার্যাদি সংঘটিত হইবে খলীফা ভিন্ন অন্য আদম সন্তানদের দ্বারা। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন ঃ খলীফার বংশধরদের মধ্যকার একটি অংশ ফিৎনা-ফাসাদ, বিদ্বেষ, হানাহানি ও খুনাখুনিতে লিপ্ত হইবে। এখানে লক্ষ্যণীয়, এই জবাবে ফিৎনা-ফাসাদ, হানাহানি ও খুনাখুনির সহিত খলীফার বংশধরদের একাংশকেই কেবল সম্পৃক্ত করা হইয়াছে, স্বয়ং খলীফাকে বা তদীয় সৎকর্মশীল বংশধরগণকে এই অপবাদ হইতে আল্লাহ্ তা'আলা মুক্ত রাখিয়াছেন (তাফসীর তাবারী, ১খ, সূরা বাকারার ৩০তম আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে)। তাফসীরে মা'আলিমু'ত-তানযীলের ভাষায় খলীফা প্রেরণের উদ্দেশ্য ঃ

সেই নতুন সৃষ্টি হইবে পৃথিবীতে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ, যাহাতে সে তাঁহার বিধান কার্যকরী করে এবং তাঁহার ফয়সালাসমূহকে বাস্তবায়িত করিতে পারে।

এতদসংক্রান্ত মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীর ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেন,

"মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ায় কোন ধর্মই মাটির মানুষকে আল্লাহ্‌র খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের মত এমন সুমহান মর্যাদায় অভিষিক্ত করেনি। জাহেলী ধর্ম ও মতবাদের কথাতো বলাই বাহুল্য, খোদ ইহুদী ধর্ম এবং তার বিকৃত সংস্করণ তথা খৃষ্ট ধর্মও এক্ষেত্রে ইসলাম থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে বাইবেলে শুধু বলা হয়েছে- 'সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষান নাই, আর পৃথিবীতে কৃষিকর্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। আর পৃথিবী হইতে কুজ্জটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলসিক্ত করিল। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলেন। তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল' (আদি পুস্তক ২ ঃ ৫-৭)।

"যেন অন্যান্য প্রাণী যেভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছিল, 'আদম' নামের এক প্রাণীও অনুরূপ অস্তিত্ব লাভ করল। বেশীর চেয়ে বেশী তার কর্ম ছিল ভূমি কর্ষণ। কোথায় সুদীর্ঘ ও অন্তঃসারশূন্য এ বিবরণ যেখানে মানুষকে আবদ্ধ করা হয়েছে হালচাষের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আর কোথায় কুরআনের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ও সর্বাঙ্গীন বিবরণ যেখানে মানুষকে আসীন করা হয়েছে খিলাফতে ইলাহীর অনন্য

মর্যাদায়" (তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু, ইফা, পৃ. ৬৯; সূরা বাকারার ৩০নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পাদটীকা নং-১১০)।

আল্লাহ্‌র খিলাফতের তাৎপর্য

পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় মিসরীয় মুফাস্‌সির সাইয়েদ কুতুব শহীদ (র) বলিয়াছেন,

"অর্থাৎ যখন মহান আল্লাহর সর্বোচ্চ ইচ্ছা এই নতুন সৃষ্টির হাতে পৃথিবীর দায়দায়িত্ব ন্যস্ত করার বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলেছে, তিনি পৃথিবীর বুকে মানুষের হাতকে ক্ষমতাশালী করে দিয়েছেন। তার কাছে ন্যস্ত করেছেন নব নব উদ্ভাবন ও আবিষ্কার। বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণ ও সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান শক্তি ও খনিজ দ্রব্যাদি উত্তোলন এবং গোটা সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে আপন অনুগত করার খোদায়ী ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা। এটাই ছিল আল্লাহ কর্তৃক তার কাছে অর্পিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

"আর আল্লাহ মানুষকে সকল সুপ্ত শক্তি, যোগ্যতা ও প্রতিভা দান করলেন যাতে সে পৃথিবীর শক্তিকে এবং সকল খনিজ দ্রব্য ও কাঁচা মালকে ব্যবহার করতে পারে। আর আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দিতে যে প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার প্রয়োজন, তাও তাকে দিলেন।

"আর পৃথিবী ও গোটা সৃষ্টিজগতকে পরিচালনাকারী প্রাকৃতিক শক্তি এবং এই নতুন সৃষ্টিকে (মানুষকে) এবং তার শক্তি ও ক্ষমতাকে পরিচালনাকারী প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় সাজুয্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, যাতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে সংঘাত না বেধে যায় এবং এই বিশাল বিশ্বে মানুষের শক্তি ধ্বংস হয়ে না যায়।

"তখন মানুষ অর্জন করলো এক সুমহান মর্যাদা। এই প্রশস্ত পৃথিবীতে মানুষ হয়ে দাঁড়ালো এক পরম সম্মানিত ও মর্যাদাবান সৃষ্টি।

"এ সবই হলো মহান আল্লাহ্‌র 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি বা খলীফা পাঠাতে মনস্থ করেছি' এই উক্তির কিছু ব্যাখ্যা। সচেতন স্নায়ুমণ্ডল ও উন্মুক্ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এবং এই নব্য সৃজিত প্রতিনিধির হাতে এই বিশাল পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে এ উক্তির উপরিউক্ত ব্যাখ্যাই দেওয়া যায়" (তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, বাংলা অনু., সূরা বাকারার ৩০ তম আয়াতের ব্যাখ্যায়, ১খ, পৃ. পৃ. ১০৬।

ফেরেশতাগণের মন্তব্য

তাহারা বলিল, "আপনি কি সেখানে এমন কাহাকেও সৃষ্টি করিবেন যে অশান্তি ঘটাইবে ও রক্তপাত করিবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস ও স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।" তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ 'আমি জানি যাহা তোমরা জান না'।

ফেরেশতাকুলের এই উক্তি আপত্তি, অহঙ্কার কিংবা তাঁহাদের আদম-সন্তানদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত ছিল না। যেমন ইব্ন কাছীর বলিয়াছেন ঃ

ইহা আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তিসূচক বা মানব সন্তানদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত ছিল না যেমনটি কোন তাফসীরকার ধারণা করিয়াছেন (মুখতাসার তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ, পৃ. ৪৯)।

ইহার যুক্তিও তিনি ব্যাখা করিয়াছেন এইভাবে ঃ বস্তুত তাহারা ইহার রহস্য জানিবার জন্যই এই প্রশ্ন করে (তাফসীর ইব্ন কাছীর-উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

আল্লাহ তা'আলা তখন 'আমি জানি তোমরা যাহা জান না' বলিয়া ফেরেশতাদের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন। ইব্ন কাছীর তাঁহার এই কথার ব্যাখ্যাস্বরূপ লিখেন ঃ অর্থাৎ তোমরা জান না, অচিরেই তাহাদের মধ্যে নবী-রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানদের উদ্ভব হইবে [কাসাসুল আম্বিয়া (আরবী), পৃ.১ ১-৪]।

মাটি সংগ্রহের জন্য পৃথিবীতে ফেরেশতা প্রেরণ

তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে মানব সৃষ্টির জন্য পৃথিবী মাটি লইয়া যাওয়ার জন্য ফেরেশতাকুল শিরোমণি জিবরাঈল ও মীকাঈলকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন। মাটি তখন আল্লাহর দোহাই দিয়ো তাহার অঙ্গহানি না করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহারা দুই জনই পরপর খালি হাতে পৃথিবী হইতে ফিরিয়া যান এবং আল্লাহ্র দোহাই দিয়া পৃথিবীর অনুরোধে তাঁহাদের এ ব্যাপারে অসামর্থ্যের কথা আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করেন। অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে মালাকুল মওত আযরাঈল পৃথিবীতে নামিয়া আসেন এবং পৃথিবীর আল্লাহ্র দোহাই দিয়া তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পৃথিবীর নানাবর্ণের নানা ধরনের মাটি লইয়া যান। পৃথিবীর 'আল্লাহ্র দোহাই'-এর জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ্র দোহাই শুনিয়া আমি কি তাঁহার হুকুম পালন না করিয়াই ফিরিয়া যাইব? তাহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। উক্ত মাটি ভিজান হইলে তাহা এঁটেল মাটিতে طين لازب পরিণত হয়। অতঃপর তাহা বিকৃত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া পর্যন্ত পতিত অবস্থায়ই থাকে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ

"আমি মানুষকে ছাঁচে ঢালা কর্দমের ঠনঠনে শুষ্ক মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি" (১৫ ঃ ২৬)।

উক্ত আয়াতে ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দিলেন, আমি মৃত্তিকা দ্বারা একটি মানুষ সৃষ্টি করিব। তাহাকে আমি যখন পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করিব এবং তাহার মধ্যে রূহ সঞ্চার করিব তখন তোমরা তাহার সম্মানার্থে সিজদাবনত হইবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বরকতপূর্ণ কুদরতী হাতে আদমের অবয়ব সৃষ্টি করিলেন, যাহাতে ইবলীস তাহার ব্যাপারে অহঙ্কার করিতে না পারে। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত আদমের ঐ অবয়ব পড়িয়া রহিল। ফেরেশতাগণ তাহার পার্শ্ব দিয়া অতিক্রমকালে তাহাকে অত্যন্ত সমীহ করিতেন, কিন্তু

ইবলীসের গায়ে জ্বালা ধরিয়া যাইত। ইবলীস আদমের দেহকে লক্ষ্য করিয়া বলিত, কী কাজের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে? সে ঐ দেহের মুখ দিয়া প্রবেশ করিয়া উহার পশ্চাৎদেশ দিয়া বাহির হইত এবং ফেরেশতাগণকে অভয় দিয়া বলিত, 'ইহাকে দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যাইও না। ইহা একটি ফাঁপা জিনিস, আমি তাহাকে বাগে পাওয়া মাত্রই উহার সর্বনাশ করিয়া ছাড়িব।"

অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী আদমের দেহে রূহ সঞ্চারের সময় উপস্থিত হইল তখন তিনি ফেরেশতাগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ আমি উহাতে রূহ্ সঞ্চার করিলে তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে।

যথা সময়ে যখন তাহাতে রূহ সঞ্চার করা হইল এবং রূহ তাহার মস্তকে পৌছিল তখন আদম (আ) হাঁচি দিয়া উঠিলেন। ফেরেশতাগণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিনে ঃ বলুন, আল-হামদুলিল্লাহ! তিনি আল-হাম্‌দুলিল্লাহ বলিলেন, তখন আল্লাহ তাহার উদ্দেশ্যে বলিলেন ঃ.رحمك ربك অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন। রূহ যখন তাঁহার চক্ষে প্রবেশ করিল তখন তিনি জান্নাতের ফলফলাদি দেখিতে পাইলেন। রূহ তাহার বুকে ও পেটে প্রবেশ করিলে তাহার ক্ষুধা ও আহার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল। রূহ তাঁহার পদদ্বয়ে পৌছিতে না পৌঁছিতেই আদমের দেহ জান্নাতের ফল আহরণের উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল।

আদম (আ)-এর সালাম

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক হাদীছে হযরত আদম (আ) কে সৃষ্টির অব্যবহিত পরের একটি বর্ণনা রহিয়াছে এইভাবে। নবী করীম (স) বলেন ঃ

"আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ যাও, ঐ যে ফেরেশতাগণ বসিয়া রহিয়াছে উহাদেরকে সালাম দাও। তাহারা কী জবাব দেয় তাহা শুনিবে। কেননা, উহাই হইবে তোমার ও তোমার সন্তানদের অভিবাদন। তিনি গিয়া বলিলেন, আস্‌সালামু আলায়কুম। জবাবে তাহারা বলিলেন, আসসালামু আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তাঁহারা রহমতুল্লাহ শব্দটি যোগ করিলেন। তারপর যাহারাই জান্নাতে প্রবেশ করিবে, তাহারা তাঁহারই আকৃতির হইবে। অতঃপর মানুষের আকৃতি খর্ব হইতে হইতে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে" (আল-আদাবুল মুফরাদ, ৪৪৭ নং অধ্যায়, হাদীছ নং ৯৭৮, পৃ. ২৫৪; ১৯৭৬ সালে তাশখন্দে মুদ্রিত, ইফা মুদ্রিত মৎকৃত অনুবাদ, ২খ, পৃ. ৪৯১-৪৮২; বুখারী ২খ, পৃ. ১১৯-২০; কিতাবুল ইসতিযান, বাব-বাদউস সালাম; মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত ও সিফাতু নাঈমিহা ওয়া আহলিহা)।

আদম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

আল্লাহ তা'আলা নূরের তৈরী ফেরেশতা ও আগুনের তৈরী জিন্ন জাতির উপর কেন আদমকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলেন, কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিলেন, কেনই-বা মানবজাতির মধ্যে অশান্তি সৃষ্টিকারী

রক্তপাতকারী থাকা সত্ত্বেও এই কাঁদামাটির সৃষ্টি মানুষকেই খলীফা (প্রতিনিধি) বানাইয়া দুনিয়ায় পাঠাইবার জন্য বাছিয়া লইলেন, তাহার কারণও বর্ণিত হইয়াছে আল-কুরআনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِىْ بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ·

"আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপর সে সমুদয় ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, এই সমুদয়ের না আমাকে বলিয়া দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও" (২ ঃ ৩১)।

ফেরেশতাগণের জ্ঞানভাণ্ডারে সে জ্ঞান ছিল না। তাই তাহাদের পক্ষে তাহা বলা সম্ভবত হয় নাই। তাহারা লা জবাব হইয়া গেলেন। তাঁহাদের তখনকার অবস্থা এইভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ·

"তাহারা বলিল, আপনি মহান, পবিত্র! আপনি আমাদেরকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নাই। আপনিই জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময় " (২ ঃ ৩১)।

সুতরাং ফেরেশতাকুলের উপর আদম (আ)-এর সুস্পষ্ট প্রাধান্য সূচিত হইল। শুধু বস্তুসমূহের নামই আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে শিক্ষা দিয়াছিলেন এমন নহে। আল্লামা রাগিব আল-ইসফাহানীর ভাষায় ঃ "নামকের পরিচয় চিত্র অন্তরে ও মস্তিষ্কে ধারণ ব্যতীত নামের পরিচয় অর্জন সম্ভব নহে" (আল-মুফদারাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ: ২৪৪)।

মওলানা আশরফ আলী থানবী (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর বাহ্যিক পরিচয় ও লক্ষণাদি এবং এইগুলির বৈশিষ্ট্যাবলী তাঁহাকে ব্যাপকভাবে শিক্ষা দিয়াছেন" (দ্র. তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, সূরা বাকারার ৩১তম আয়াত)। অন্যান্য বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থেও অনুরূপ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, "আরবী ভাষায় যাত, নাফ্স, 'আইন ও ইসম শব্দগুলি সমার্থক"। তাফসীরে কাশ্শাফে আছে, "আল্লাহ তা'আলা আদমকে ঐ সমস্ত নামের 'নামকসমূহের' জ্ঞান দান করিলেন।" বায়যাবী বলেন, "তিনি তাঁহাকে বস্তুসমূহের নাম, সত্তা, গুণাবলী, ধর্ম, সেই সাথে যাবতীয় জ্ঞানের সূত্র ও নীতিমালা এবং প্রযুক্তির নিয়মকানুন ও এই গুলির উপকরণাদির ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন।" ইমাম রাযী (র) তাফসীরে কাবীরে লিখেন, "আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে প্রতিটি বস্তুর বিবরণ, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান দান করিলেন"।

আল্লামা মাযহারী তা'বীল হিসাবে তাঁহার নিজস্ব একটি মত প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত আয়াতে উল্লিখিত اسماء (নামসমূহ) শব্দের দ্বারা আল্লাহ্‌র সত্তা ও গুণবাচক নামসমূহ বুঝান হইয়াছে। এইগুলির সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক ইল্‌ম তিনি পাইয়া গিয়াছিলেন এবং প্রতিটি গুণের সহিত এমন পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল যে, যখন যে গুণের প্রতি তিনি নিবিষ্ট হইতেন, মুহূর্তেই তাহা তাঁহার সত্তায় পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইত। উদাহরণস্বরূপ যখন তাহার উপর الاول (আল-আওয়াল্) গুণবাচক পবিত্র নামটির বিভাসন ঘটিল তখন প্রতিটি বস্তু তাঁহার মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

অনুরূপভাবে الاخر (আল-আখিরু) নামটির বিভাসনের প্রসঙ্গও অনুরূপ (দ্র. তাফসীরে মাজেদী, সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

সাম্প্রতিক কালের মিসরীয় তাফসীর (আরবী) 'ফী যিলালিল কুরআন'-এর লেখক সায়্যিদ কুতব শহীদ এই নামসমূহ শব্দের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন এইভাবে ঃ

মানুষের জ্ঞানগত শ্রেষ্ঠত্ব

"এ পর্যায়ে আমরা যেন অন্তর্চক্ষু দিয়া দেখতে পাচ্ছি যে, যা ফেরেশতারা দেখেছিলেন, খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণকালে যে গুপ্ত রত্নভাণ্ডার আল্লাহ্ মানুষকে দিয়েছিলেন তার কিছুটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। সে জিনিসটা হচ্ছে নাম দ্বারা নির্দিষ্ট জিনিসকে চিহ্নিত করার ক্ষমতা। ব্যক্তি ও বস্তুর নামকরণের ক্ষমতা এবং সেই নামকে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর সংকেত চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া। পৃথিবীতে মানুষের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা, মানুষ এভাবে নামকে জিনিসের সঙ্কেত হিসাবে ব্যবহার করতে না পারলে কিরূপ জটিলতা দেখা দিত তা' কল্পনা করলেই এই ক্ষমতার মূল্য কত তা আমরা বুঝতে পারি। পারস্পরিক লেনদেন ও মনোভাব ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে কী দুঃসহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো, তা' একটু চিন্তা করলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। একটি জিনিস সম্পর্কে দু'জনে আলোচনা করতে চাইলে ঐ জিনিসটা হাযির করতে হতো। নচেৎ পুরো কথাটাই দুর্বোধ্য থেকে যেতো। মনে করুন একটা পাহাড় সম্পর্কে কথা বলতে হলে বক্তা ও শ্রোতাকে সশরীরে সোজাসুজি পাহাড়ের কাছে চলে যেতে হতো। কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা বলতে হলে সেই ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির করে নিতে হতো। এভাবে এ সমস্যা এত কঠিন আকার ধারণ করতো যে, আল্লাহ্ মানুষকে নাম ব্যবহারের ক্ষমতা না দিলে তাদের গোটা জীবনটাই দুর্বিসহ হয়ে উঠতো" (ফী যিলালিল কুরআন, ১খ, পৃ. ১০৫-১০৬, বাংলা অনু., সূরা বাকারা ৩০-৩৩ আয়াতের ব্যাখ্যায়)। সুতরাং হযরত আদমের জ্ঞান কেবল বস্তুসমূহের নামের জ্ঞান ছিল না, ছিল ব্যাপক জ্ঞান-যাহা এই মহাবিশ্বে আল্লাহ্র প্রতিনিধিরূপে দায়িত্ব পালনের জন্য অপরিহার্য ছিল (দ্র. তফসীরে উসমানী, ১খ, ২৪-২৫)।

ফেরেশতাগণের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি ও উহার স্বীকারোক্তি

আদমকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা খলীফারূপে কেন প্রেরণ করা হইবে এবং ফেরেশতাগণই বা কী করিয়া আদম সন্তানের দুর্বলতা উপলব্ধি করিলেন, তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন মওলানা হিফযুর রহমান। তিনি বলেন, "এটা মনে করা ভুল যে, এ স্থলে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা এ উদ্দেশ্যে ছিল যে, তাঁরা আল্লাহ্র সাথে বাদানুবাদ করতে বা তাঁর সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিদ্রান্বেষণ করতে চেয়েছিলেন, বরং তাঁরা আদম সৃষ্টির তাৎপর্য এবং তাঁকে খলীফা বানানোর রহস্য কি তা জানতে চেয়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এরূপ বাকভঙ্গির উপর তাদেরকে সাবধান করে দেন। অতঃপর তাদের সেই জিজ্ঞাসার, যার মধ্যে আদমকে হেয় প্রতিপন্ন করার আভাস ছিল, উত্তর এমনভাবে দেন যাতে ফেরেশতারা শুধু আদমের শ্রেষ্ঠত্বই স্বীকার করেনি, বরং নিজেদের দুর্বলতা ও পশ্চাৎপদতা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছিল। যেহেতু মহা প্রজ্ঞাশীল আল্লাহ্র নৈকট্যে তাঁরা ছিলেন তাই

তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রশ্নের উদ্দেশ্য তাদেরকে পরীক্ষা করা নয়, বরং এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া যে, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা মাহাত্ম্য বর্ণনার আধিক্যের উপর নয়, ইল্‌ম-এর উপর নির্ভর করে। কেননা বিশ্ব পরিচালনা ইল্‌ম ব্যতীত সম্ভব নয়। অতএব যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা আদমকে পরিপূর্ণ ইল্‌ম-এর অধিকারী করেছেন তখন নিঃসন্দেহে তিনিই দুনিয়ার প্রতিনিধিত্বের অধিক যোগ্য। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাতে তাঁরা দুনিয়ায় সমস্ত কামনা-বাসনা ও রিপুর তাড়না থেকে মুক্ত। তাই এ সমস্ত ব্যাপারে তাঁদের কোন ধারণাই নেই, আর আদমকে যেহেতু এ সমস্ত ব্যাপারে মুখোমুখি হতে হবে তাই এ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা তার জন্যে একটি স্বাভাবিক ঘটনা। মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রকৃতই তাঁকে ঐ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তার জন্য যা কিছু জানার প্রয়োজন ছিল সবকিছুই তাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

"মোটকথা হযরত আদম (আ)-কে জ্ঞান নামক গুণ দ্বারা গুণান্বিত করায় ফেরেশতারা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর খিলাফতের যোগ্যতাকে স্বীকার করে নিতে। তাঁরা একথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, যদি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র খলীফা করা হতো তাহলে বিশ্বসৃষ্টির যাবতীয় রহস্য থেকে আমরা মূর্খই রয়ে যেতাম এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা সৃষ্টির পরতে পরতে যে সমস্ত জ্ঞান সন্নিবেশিত করেছেন তা অনবহিত রয়ে যেতাম। এ জন্যে যে, না আমাদের পানাহারের প্রয়োজন আছে, সে জন্য জমির নীচে সংরক্ষিত রিযিক ও ধনভাণ্ডারের অন্বেষণ করব, না আমাদের ডুবে যাওয়ার আশংকা আছে যে, সে জন্য বিভিন্ন প্রকারের নৌযান উদ্ভাবন করব এবং না আমাদের রোগ-ব্যাধির আশঙ্কা আছে যে, সে জন্য বিভিন্ন প্রকারের ঔষধের বৈশিষ্ট্য ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, প্রাকৃতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, মহাকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা, বস্তুগত জ্ঞান প্রভৃতি অগণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করব। এটা শুধু মহান সৃষ্টি মানবের জন্যেই সাজে যে, তারা পৃথিবীতে 'আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি' হবে এবং ঐ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রহস্যাদি আয়ত্ত করে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবে" (কাসাসুল কুরআন, ১খ, ইফা প্রকাশিত পৃ. ১৮-২১, সংক্ষেপিত ও ঈষৎ সম্পাদিত)।

কিন্তু যে ইবলীস আদম সৃষ্টির সূচনা হইতেই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছিল, আদম অবয়বে পদাঘাত করিয়া যে তাহার বিদ্বেষ চরিতার্থ করিত, তাহার সম্মুখে ঐ মহা সত্যটি উদ্ঘাটিত হইল না। তাই ফেরেশতাগণ যেখানে আল্লাহ্‌র আদেশ পাওয়ামাত্র সিজদায় পড়িয়া গেলেন, ইবলীস তখন অন্য পথ ধরিল। তাহার জন্য অন্য পরিণতি অপেক্ষা করিতেছিল। আল-কুরআনের ভাষায়

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

"যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলিলাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল, সে অমান্য করিল ও অহঙ্কার করিল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হইল" (২ঃ ৩৪)।

ইবলীসের দম্ভ ও তাহার পরিণতি

আল্লাহ্ তা'আলা যাহির-বাতিন অন্তর-বাহির সবকিছু অবগত থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববাসীর জ্ঞাতার্থে ইবলীসকে তাঁহার নির্দেশ পালন না করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ কূটতর্ক ও ইহার পরিণতিতে করুণ পরিণতির কথাও আসমানী কিতাবসমূহে বর্ণনা করেন। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ.

"তিনি বলিলেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কী তোমাকে নিবৃত্ত করিল যে, তুমি সিজদা করিলে না? সে বলিল, আমি তাহার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ আমাকে অগ্নি দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকে কর্দম দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এই স্থান হইতে নামিয়া যাও, এখানে থাকিয়া অহঙ্কার করিবে ইহা হইতে পারে না। সুতরাং বাহির হইয়া যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত" (৭ ঃ ১২-১৩)।

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ . اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ يٰاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ.

"তখন ফেরেশতাগণ সকলে একত্রে সিজদা করিল, ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে অস্বীকার করিল। আল্লাহ্ বলিলেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হইল যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইলে না?' সে বলিল, আপনি গন্ধযুক্ত কর্দমের শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হইতে যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি তাহাকে সিজদা করিবার নহি। তিনি বলিলেন, তবে তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও; কারণ তুমি তো অভিশপ্ত এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত অবশ্যই তোমার প্রতি রহিল লা'নত" (১৫ ঃ ৩০-৩৪)।

এইভাবে মহান আল্লাহ্ তা'আলার একটি আদেশ অমান্য করায় আসমানে-যমীনে আযাযীলের দীর্ঘকালের ইবাদত-বন্দেগী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল।

শয়তানের অবকাশ প্রার্থনা ও দম্ভোক্তি

قَالَ اَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ . ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ.

"সে (ইবলীস) বলিল, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি বলিলেন, যাহাদিগকে অবকাশ দেওয়া হইয়াছে তুমি অবশ্যই তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইলে। সে বলিল, আপনি আমাকে শাস্তি দান করিলেন, এইজন্য আমিও আপনার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয়ই ওঁৎ পাতিয়া থাকিব। অতঃপর আমি তাহাদের নিকট আসিবই তাহাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক হইতে এবং আপনি তাহাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাইবেন না। তিনি বলিলেন, এই স্থান হইতে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। মানুষের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করিবই" (৭ ঃ ১৪-১৮)।

কুরআন শরীফের অন্যত্র ঐ একই ঘটনার বিবরণ আসিয়াছে ভিন্নশব্দে ঃ

قَالَ يَاإِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ۔ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۔ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ۔ وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِيْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۔ قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۔ اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ ۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۔ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ ۔ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔

"তিনি বলিলেন, হে ইবলীস! আমি যাহাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করিলাম তাহার প্রতি সিজদাবনত হইতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? সে বলিল, আমি উহা হইতে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন কর্দম হইতে। তিনি বলিলেন, তুমি এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত এবং তোমার উপর লা'নত স্থায়ী হইবে, কর্মফল দিবস পর্যন্ত। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন উত্থান দিবস পর্যন্ত। তিনি বলিলেন, 'তুমি অবকাশ-প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হইলে অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত'। সে বলিল, 'আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি উহাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করিব, তবে উহাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নহে'। তিনি বলিলেন, 'তবে ইহাই সত্য, আর আমি সত্যই বলি, তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করিবই'।" (৩৮ ঃ ৭৫-৮৫)।

কুরআন শরীফের অন্যত্র শয়তানের দম্ভোক্তিটি বিবৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِيْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔

"সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করিলেন, তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপকর্মটি অবশ্যই শোভন করিয়া তুলিব এবং আমি উহাদের সকলকেই বিপথগামী করিব, তবে উহাদের মধ্যে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত" (১৫ ঃ ৩৯-৪০)।

তাহারই বিভ্রান্তকরণের কৌশল কত ব্যাপক হইবে, তাহার বর্ণনা রহিয়াছে সূরা আ'রাফের ১৪ হইতে ১৮ নং আয়াতে।

আল্লাহ্ তা'আলা ও পূণ্যবান আদম সন্তানদের ব্যাপারে তাঁহার গভীর আস্থার কথা উল্লেখ করিয়া শয়তানের অনুসারীদের কঠোর পরিণতির কথা বর্ণনা করেন এই ভাবে ঃ

اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۔ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۔ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۔

"বিভ্রান্তদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে, তাহারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনই ক্ষমতা থাকিবে না। অবশ্যই জাহান্নাম তাহাদের সকলেরই প্রতিশ্রুত স্থান, উহার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণী আছে" (১৫ ঃ ৪২-৪৫)।

হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি ও বেহেশতে বসবাসের আদেশ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۔

"এবং আমি বলিলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর' ...." (২ ঃ ৩৫)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, "আয়াতের বিন্যাস হইতে বুঝা যায়, হাওয়া (আ) আদম (আ)-এর জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই সৃষ্টি হইয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, হাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে আদম (আ)-এর জান্নাতে প্রবেশের পর, যেমনটি সুদ্দী হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) ও সাহাবীগণের অনেকের বরাতে বর্ণনা করেন। এই বর্ণনায় বলা হয় ঃ ইবলীস জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হয় এবং আদম (আ)-কে জান্নাতে বসবাস করিতে দেওয়া হয়। তিনি তখন জান্নাতে একাকী ঘোরাফেরা করিতেন, তাঁহার সাথে বসবাসের জন্য তাঁহার স্ত্রী ছিলেন না। একবার তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার শিয়রে একজন নারী উপস্থিত, যাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বাম পাজর হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? হাওয়া বলিলেন, আমি নারী। আদম বলিলেন, তুমি কেন সৃষ্টি হইয়াছ? হাওয়া বলিলেন, যাহাতে আপনি আমার সহিত বসবাস করেন এবং শান্তি লাভ করেন। ফেরেশতাগণ তখন আদমের বিদ্যার দৌড় কি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে দেখার উদ্দেশ্যে আদমকে প্রশ্ন করিলেন, এর নাম কি হে আদম? জবাবে আদম বলিলেন, হাওয়া। ফেরেশতাগণ বলিলেন, তাহার হাওয়া নামকরণের কারণ কি? আদম (আ) বলিলেন, সে حيى বা জীবিত বস্তু হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া তাহার নামকরণ করা হইয়াছে" (মুখতসর তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ, ৫৪, মুহাম্মদ আলী সাবূনী সম্পা.)।

আদম-হাওয়া কোন্ জান্নাতে ছিলেন?

এ সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। জমহূর উলামার মতে, উহা সেই জান্নাতুল মাওয়া যাহার ওয়াদা মুত্তাকী বান্দাদের জন্য করা হইয়াছে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে তাঁহারা এই মত পোষণ করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْنَا يٰادَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ・

"আমি বলিলাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সহধর্মিনী জান্নাতে বসবাস কর" (২ ঃ ৩৫)।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদীছে আছে ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত লোককে একত্র করিবেন। যখন জান্নাতকে মুমিনদের জন্য সুসজ্জিত অবস্থায় প্রস্তুত করা হইবে তখন তাহারা আদম (আ)-এর নিকট গিয়া বলিবেন, পিত! আমাদের জন্য জান্নাতের দ্বার উন্মোচন করুন। তখন তিনি বলিবেন, তোমাদেরকে তোমাদের পিতার অপরাধ ভিন্ন অন্য কিছুই জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত করে নাই।" ইব্ন কাছীর (র) 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' গ্রন্থে হাদীছটি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ঐ জান্নাত যে জান্নাতুল মাওয়া ছিল এ ব্যাপারে এই উক্তিটিই শক্তিশালী প্রমাণ।

পক্ষান্তরে অন্য একদল আলিম তাঁহাদের একটি গাছ ছাড়া সকল গাছের ফলমূল খাওয়া, সেখানে তাঁহাদের নিদ্রা যাওয়া, সেখান হইতে তাঁহাদের বহিষ্করণ, সেখানে ইবলীসের প্রবেশ এবং ওয়াস-ওয়াসা প্রদান, আদমের অপরাধ ও তাঁহার প্রভূর আদেশ মান্যকরণ প্রভৃতি কারণে মনে করেন যে, উহা জান্নাতুল মাওয়া হইতে পারে না। নিশ্চয়ই উহা দুনিয়ায় অন্য কোন বাগান হইবে।

উবায়্য ইব্ন কাব, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা), ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ, সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না, ইব্ন কুতায়বা প্রমুখ হইতে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। কাযী মুনযির ইব্ন সাঈদ বালূতী তদীয় তফসীরে এই অভিমতই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র একখানা পুস্তকও রচনা করিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) ও তদীয় সঙ্গীগণও এরূপ মত পোষণ করিতেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন উমার আর-রাযী ইব্ন খাতীব আর-রাঈ তদীয় তাফসীর গ্রন্থে আবুল কাসিম বালখী ও আবূ মুসলিম ইস্পাহানী হইতে এবং কুরতুবী তদীয় তাফসীর গ্রন্থে মুতাযিলা ও কাদরিয়াদের অনুরূপ মত রহিয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাওরাতের বর্ণনাও অনুরূপ (পবিত্র বাইবেলে, পৃ. ৩)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যাহারা বলেন, আদম ও হাওয়া (আ) দুনিয়ার কোন বাগানেই ছিলেন, তাহারা যুক্তি দেন যে, তাঁহারা যদি চিরস্থায়ী জান্নাতেই বসবাস করিতেন, তাহা হইলে—ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলভক্ষণে চিরস্থায়ী জান্নাতের তাঁহারা অধিকারী হইবেন—ইবলীসের এইরূপ বলার কী কারণ থাকিতে পারে।

আবার যাহারা বলেন, তাঁহারা স্থায়ী জান্নাতে বা জান্নাতুল মাওয়ায় বসবাস করিতেন, তাহারা বলেন, তাঁহারা যদি ঐ এই অস্থায়ী দুনিয়ার কোন অস্থায়ী বাগানেই বসবাস করিতেন, তাহা হইলে যেখানে স্থায়িত্ব বলিয়া কিছুই নাই সেখানে শাজারাতু'ল-খুল্দ বা স্থায়ী বৃক্ষের কথা আসে কোথা

হইতে? আবার কোন কোন তাফসীরকার বলেন, উহা চিরস্থায়ী জান্নাত—জান্নাতুল মাওয়াও নহে, পৃথিবীর কোন বাগানও নহে, আল্লাহ্ তা'আলা উর্ধ্ব জগতে তাঁহাদের জন্য এক বিশেষ জান্নাত সৃষ্টি করিয়াছিলেন (আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮-১০)।

নিষিদ্ধ ফল কোনটি ছিল?

জান্নাতে বসবাসের আদেশ দানের সাথে সাথে আদম ও হাওয়া (আ)-এর প্রতি কঠোরভাবে একটি নিষেধাজ্ঞাও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে জারী করা হইয়াছিল। তাহা ছিল এইরূপ ঃ

وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

"কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; হইলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে" (২ ঃ ৩৫ ও ৭ ঃ ১৯)।

এই নিষিদ্ধ বৃক্ষ ও ইহার ফলটি কী ছিল তাহা নিয়াও তাফসীরবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, উহা ছিল আঙ্গুর। ইব্ন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, শা'বী, জা'দা ইব্ন হুবায়রা, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স, সুদ্দী প্রমুখ হইতে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ইব্ন আব্বাস, হাসান বাসরী, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে, ইয়াহূদীদের ধারণা, উহা ছিল গম। ওয়াহ্ব বলেন, এমন একটি শস্যফল যাহা সমুদ্রের ফেনার চাইতেও কোমল এবং মধুর চাইতেও সুমিষ্ট। সুফিয়ান ছাওরী হযরত হুসায়ন (حصين) হইতে বর্ণনা করেন, উহা হইতেছে খেজুর। ইব্ন জুরায়জ (র) হযরত মুজাহিদের সূত্রে বর্ণনা করেন, উহা হইতেছে ডুমুর ফল। কাতাদা ও ইব্ন জুরায়জের উহাই অভিমত। আবুল আলিয়া বলেন, উহা এমন একটি বৃক্ষ ছিল যাহা ভক্ষণে বায়ু নিঃসরণ হইত আর জান্নাতে বায়ু নিঃসরণ ছিল অশোভনীয় (কাসাসুল আম্বিয়া, ইব্ন কাছীর, পৃ. ২০-২১)।

আল্লামা ইব্ন জারীর এই প্রসঙ্গে তাঁহার আলোচনায় একটি সিদ্ধান্তমূলক মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, "সঠিক কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা আদম (আ) ও হাওয়াকে একটি সুনির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে বারণ করেন। ঐ জাতীয় সমস্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে তিনি বারণ করেন নাই। তাঁহারা উহা ভক্ষণ করেন। সুনির্দিষ্টভাবে ঐ বৃক্ষটি কী ছিল তাহা আমাদের জানা নাই। কেননা আল্লাহ তাআলা তদীয় বান্দাগণের জন্য আল-কুরআন বা মহানবী (স) সহীহ হাদীছে উহার কোন দলীল-প্রমাণ বর্ণনা করেন নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা গম গাছ ছিল, কেহ বলিয়াছেন, উহা ছিল আঙুর গাছ, কেহ বলিয়াছেন ডুমুর গাছ। ইহার যে কোনটিই হইতে পারে। উহা এমন একটি বিষয় যাহার জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তির কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা বা ইহা জ্ঞাত না থাকার কারণে ইহার জ্ঞানহীন ব্যক্তির কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা নাই" (মুখতাসার ইব্ন কাছীর, সূরা বাকারার ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়, পৃ. ৫৫)।

ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সায়্যিদ কুতব (র) বলেন, "সম্ভবত ঐ গাছটিকে পার্থিব জীবনের যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।"

এই নিষিদ্ধ করণের যুক্তিও সায়্যিদ কুতব ব্যাখ্যা করেন এইভাবে, "কিছু নিষিদ্ধ জিনিস না থাকলে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির অস্তিত্ব বুঝা যায় না এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষকে ইচ্ছাশক্তিহীন পশুপাখি থেকে পৃথক করা যায় না। মানুষ কতটা ধৈর্য সহকারে আল্লাহ্র সাথে কৃত অংগীকার ও বিধিনিষেধ মেনে চলতে পারে তার পরীক্ষা নিষিদ্ধ জিনিস ছাড়া হতে পারে না। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচন ক্ষমতাই হলো মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করার মাপকাঠি। যাদের ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বাছবিছার করার ক্ষমতা নাই এবং নির্বিচার জীবন যাপন করে তারা দেখতে মানুষ হলেও আসলে পশু" (ফী যিলালিল কুরআন, বঙ্গানুবাদ, ১খ, পৃ. ১০৯)।

শয়তানের শত্রুতার ব্যাপারে সতর্কবাণী ঃ

يَا اٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۔

"হে আদম! নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদিগকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দেয়। দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাইবে" (২০ ঃ ১১৭)।

সাথে সাথে জান্নাতে তাঁহাদের জন্য রক্ষিত সুখ-শান্তির কথাটাও বলিয়া দেওয়া হয়,

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۔ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۔

"তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হইবে না, নগ্নও হইবে না এবং সেখানে পিপাসার্তও হইবে না, রৌদ্রক্লিষ্টও হইবে না" (২০ ঃ ১১৮-১১৯)।

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ۔

"অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলিল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা" (২০ ঃ ১২০)?

অন্যত্র তাহার এই কুমন্ত্রণার কথা বিবৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ ۔ وَقَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ ۔ فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ ۔

"পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এইজন্যেই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন। সে তাহাদের উভয়ের নিকট শপথ করিয়া বলিল, আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্খীদের একজন। এইভাবে সে তাহাদেরকে প্রবঞ্চনার দ্বারা অধঃপতিত করিল" (৭ ঃ ২০-২২)।

এই প্রসঙ্গে আদম (আ) ও ইবলীসের মধ্যকার ঐ সময়ের কথোপকথন চমৎকারভাবে বিধৃত হইয়াছে আল্লামা ইদরীস কান্দেহলভীর বর্ণনায়। তিনি লিখেন, "হযরত আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন বৃক্ষের কথা বলিতেছ হে? জবাবে শয়তান তাঁহাকে সেই বৃক্ষের কথাটি বলিল যাহার নিকট যাইতে আল্লাহ তাআলা আদম (আ)-কে নিষেধ করিয়াছিলিন। তখন তিনি বলিলেন,

ইহা তো নশ্বরত্ব ও পতনের বৃক্ষ। অবিনশ্বরতা ও অমরতত্ত্বের বৃক্ষ নহে, বরং ইহা হইতেছে অপমানিত ও লজ্জিত হওয়ার বৃক্ষ। আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও তাঁহার দরবারে সম্মান বৃদ্ধির পরিবর্তে তাঁহার হইতে দূরত্ব বৃদ্ধি ও অপদস্থ হওয়ার হেতু। আর এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা উহার নিকটে যাইতে বারণ করিয়াছেন। এই বৃক্ষে তোমার কথিত ফায়দাসমূহ নিহিত থাকিলে পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই আমাদেরকে বারণ করিতেন না।"

প্রত্যুত্তরে শয়তান বলিল, "তোমাদের প্রভু তোমাদের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া ইহার ফল খাইতে বারণ করেন নাই, বরং তোমরা যাহাতে চির অমর অথবা ফেরেশতায় পরিণত না হও সেই জন্যই তিনি বারণ করিয়াছেন, যাহাদের না আছে পানাহারের দুশ্চিন্তা আর না আছে স্ত্রী-পুত্রের ভাবনা। তোমরাও যদি তাহা হইয়া যাও তাহা হইলে খিলাফতের গুরুদায়িত্ব কী করিয়া পালিত হইবে? পৃথিবীর খিলাফতের দায়িত্ব তো স্ত্রী-পুত্র-পরিজন, পানাহার ও আয়-উপার্জনের ব্যস্ততার মাধ্যমেই পালন করিতে হইবে। আর ইহা বলাই বাহুল্য যে, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া ব্যস্ত থাকিলে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী কখন হইবে? তোমাদের দ্বারা খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করানোই যেহেতু তাঁহার উদ্দেশ্য, তাই নিজের নিকট হইতে তোমাদেরকে দূরে পাঠাইয়া দিতেছেন। আর এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণে যেহেতু আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ ঘটে, তাই তোমাদেরকে ইহা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে। অধিকন্তু বেহেশতে মৃত্যু নাই। তোমাদেরকে কেবল খিলাফতের রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশে অস্থায়ীভাবে কিছু দিন বেহেশতে বসবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তারপর তিনি তাঁহার নৈকট্য হইতে দূরে পৃথিবীতে প্রেরণ করিবেন। সেখানে যাইয়া তোমাদের ও তোমাদের সন্তান-সন্ততির নানারূপ ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে হইবে। অবশেষে সকলেরই মৃত্যু হইবে। পৃথিবীতে যাওয়ার ও খিলাফত লাভের পর আল্লাহ তা'আলার এই নৈকট্য আর তোমাদের ভাগ্যে জুটিবে না" (মাআরিফুল কুরআন, কান্দেহলভী, ১খ, পৃ. ৯৬-৯৭)।

আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে একটি হাদীছে বর্ণনা করেন ঃ

ان فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مأة عام لا يقطعها شجرة الخلد .

"জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে, আরোহী তাহার ছায়ায় শতাব্দীকাল ধরিয়া পথ পরিক্রমার পরও সে উহা অতিক্রম করিয়া শেষ করিতে পারিবে না। উহাই শাজারাতুল খুলদ্ বা কথিত অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ" (আহমাদ, জিলদ ২, পৃ. ৪৫৫; আবু দাউদ তায়ালিসী, তদীয় মুসনাদে, পৃ. ৩৩২)।

নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى .

"যখন তাহারা উভয়ে উহা হইতে ভক্ষণ করিল, তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল" (৭ ঃ ২২; তু. ২০ ঃ ১২১)।

এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের ব্যাপারে হাওয়াই তাঁহার স্বামীর তুলনায় অগ্রণী ছিলেন এবং তিনিই তাঁহাকে তাহা ভক্ষণে উৎসাহিত করিয়াছিলেন (কাসাসুল আম্বিয়া, ইবন কাছীর, পৃ. ২৫)। আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত বুখারীর একটি হাদীছেও ইহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে, যাহাতে নবী করীম (স) বলেন ঃ

لو لا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن انثى زوجها ۰

"বনূ ইসরাঈলরা না হইলে গোশত দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ার ব্যাপারটা কখনো ঘটিত না, আর হাওয়া না হইলে মহিলারা তাহাদের স্বামীর ব্যাপারে কখনও খিয়ানতও করিত না" (বুখারী, আম্বিয়া, পৃ. ৪৬৯; কাসাসুল আম্বিয়া, ইবন কাছীর, পৃ. ২৬-এ উদ্ধৃত)।

বাইবেলের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হাওয়াকে যে প্রাণী নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল সে ছিল সর্প। বিশালাকৃতি ও সুসজ্জিত রূপ লইয়া সে হাওয়ার কাছে আগমন করে। তাহার প্ররোচনায় হাওয়া নিজেও নিষিদ্ধ ফল খান এবং আদম (আ)-কেও ইহা খাওয়ান। এ সময় তাঁহাদের চক্ষু খুলিয়া যায় এবং তাঁহারা দিব্যি উপলব্ধি করিতে পারেন যে, তাঁহারা উলঙ্গ ও বিবস্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন। কাল বিলম্ব না করিয়া ডুমুর ফলের পাতা দ্বারা লজ্জা নিবারণে প্রবৃত্ত হন। ওয়াহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্‌ও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

তাহাদের পোশাক বা আবরণ ছিল একটি দীপ্তি বা আলোকরশ্মি যাহা তাহাদের উভয়ের লজ্জাস্থানকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল। ইব্‌ন আবী হাতিম (র) উবায়্য ইব্‌ন কা'ব (রা) হইতে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে নবী করীম (স) বলেন ঃ

ان الله خلق ادم رجلا طوالا كثير شعر الراس كانه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه ناول ما بدأ منه عورته فلما نظر الى عورته جعل فى الجنة فاخذى شعره شجرة فنازعها فناده الرحمن عز وجل يا آدم متى تفر فلما سمع كلام الرحمن قال يارب لا ولكن استحياء۰

"আল্লাহ তা'আলা আদমকে দীর্ঘদেহী ও ঘন চুলবিশিষ্ট মানুষরূপে সৃষ্টি করেন। তাঁহার দেহ ছিল খর্জুর বৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ। তিনি যখন বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিলেন তখন তাহার বস্ত্রাভরণ খসিয়া পড়িল। এই প্রথমবারের মত তাঁহার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়। তিনি যখন তাঁহার লজ্জাস্থানের দিকে তাকাইলেন তখন দ্রুতবেগে বেহেশতের মধ্যে দৌড়াইত শুরু করিলেন। একটি বৃক্ষশাখায় তাঁহার কেশদাম আটকাইয়া গেল। তিনি তাহা সজোরে টানিলেন। তখন পরম দয়াময় আল্লাহ তাঁহাকে ডাক দিয়া বলিলেন, হে আদম! তুমি আমা হইতে পলায়ন করিতেছ? দায়ময়ের সেই আহবান শুনিয়া আদম জবাব দিলেন, প্রভু! না, বরং লজ্জাবশত" (ইবন কাছীর, বিদায়া, ১খ, ৭৮)।

সুফিয়ান ছাওরী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে সূরা আ'রাফের উপরিউক্ত আয়াতের (আয়াত নং ২২) ব্যাখ্যায় বর্ণনা করেন ঃ জান্নাতের বৃক্ষপত্র বলিতে এখানে ডুমুর গাছের পাতাই বুঝান হইয়াছে। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর উহা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

كأنه مأخوذ من اهل الكتاب وظاهر الا ية يقتضى اعم من ذلك وبقعد بر تسليمه فلا يهر والله اعلم.

সম্ভবত ইহা আহলে কিতাব্ হইতে গৃহীত। আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক অর্থাৎ জান্নাতের যে কোন বৃক্ষপত্রই ইহার অর্থ হইতে পারে। কিন্তু যদি ধরিয়াই নেওয়া হয় যে, উহা ডুমুরের পাতা ছিল তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

আদম (আ)-এর অধস্তন বংশধরগণ

আদম (আ)-এর সন্তান-সন্তুতির আলোচনা প্রসঙ্গে কথিত তাওরাতের (বাইবেলের) বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ইব্ন কাছীর (র) বলেন ঃ শীছ-এর জন্মকালে আদম (আ)-এর বয়স ছিল ১৩০ বৎসর। তারপর তিনি আরও ৮০০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তাঁহার ১৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র আনুশের জন্ম হয়, তারপর তিনি আরও ৮০৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। আনূশের ৯০ বৎসর বয়সে তৎপুত্র কীনানের জন্ম হয়। তারপর আনূশ আরও ৮১৫ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। কীনানের ৭০ বৎসর বয়সে তৎপুত্র মাহ্লাঈলের জন্ম হয়। তারপরও কীনান আরও ৮৪০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। মাহ্লাইলের ৬৫ বৎসর বয়সে তৎপুত্র য়ারদ-এর জন্ম হয়। তারপর মাহলাঈল আরও ৮৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। য়ারদ ১৬২ বৎসর বয়সে উপনীত হইলে তৎপুত্র খানূখ জন্মগ্রহণ করেন। তারপরও য়ারদ আরও ৮০০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। খানূখের ৬৫ বৎসর বয়সে মাত্শালিহ্ -এর জন্মগ্রহণ করেন। তারপর খানূখ আরও ৮০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। মাত্শালিহের ১৮৭ বৎসর বয়সে তৎপুত্র লামাকের জন্ম হয়। তারপরও মাত্শালিহ্ আরও ৭৮২ বৎসর জীবিত থাকেন। লামাকের ১৮২ বৎসর বয়সে তৎপুত্র নূহ (আ)-এর জন্ম হয়। লামাক তাঁহার পরেও ৫৯৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। নূহ্ (আ) ৫০০ বৎসরে উপনীত হইলে তদীয় তিন পুত্র সাম, হাম ও য়াফিছ-এর জন্ম হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ৮৮-৮৯)।

উক্ত হিসাবকে যথার্থ বলিয়া ধরিয়া নিলে আদম (আ)-এর জন্ম সাল হইতে নূহ (আ)-এর ৫০০ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কাল ছিল ঃ ১৩০+১৬৫+৯০+৭০+৬৫+১৬২+৬৫+১৮৭+১৮২+ ৫০০= ১৬১৬ বৎসর। নূহ (আ) যেহেতু আয়ু পাইয়াছিলেন আরও চারি শত পঞ্চাশ বৎসর, তাই উহাও হিসাবে ধরিয়া হয় মোট ২০৬৬ বৎসর। বাইবেলের বর্ণনা বলিয়া কথিত উক্ত বিবরণটি উদ্ধৃত করিয়া আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) মন্তব্য করেন ঃ "উক্ত ইতিহাসপঞ্জী আসমানী কিতাবের বর্ণনারূপে সংরক্ষিত থাকার ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। বহু সীরাতবিদ এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া এ ব্যাপারে আহলি কিতাবদের বক্তব্যের সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনায় যে অবিবেচনাপ্রসূত অতিরঞ্জন রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। অনেকে এই বর্ণনাটিতে ব্যাখ্যাচ্ছলে অনেক সংযোজন করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রচুর ভুল রহিয়াছে"(প্রাগুক্ত)।

বাইবেলের আদিপুস্তকের ৪, ৫, ১১, ২১ ও ২৫তম অধ্যায়ে প্রদত্ত বর্ণনার ভিত্তিতে বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মরিস বুকাইলী হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত কুড়ি পুরুষের নাম, তাহাদের জন্মসন, আয়ুষ্কাল এবং তৎকালে আদম (আ)-এর জন্মের পর কত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহার যে ছক আঁকিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ (নামগুলি যেহেতু আমদের একান্তই অপরিচিত ভাষার, তাই মরিস বুকাইলীর পুস্তকে উদ্ধৃত রোমান হরফে লিখিত নামগুলির সাথে অনুবাদক আখতার- উল-আলমের অনুবাদ পুস্তকে ব্যবহৃত বাংলা প্রতিবর্ণায়নকেই বাছিয়া নেওয়া নিরাপদ বিবেচনা করিয়াছি)।

আদম (আ)-এর অধস্তন বংশধরগণ ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত কুড়ি পুরুষ

		হযরত আদমের সৃষ্টির কত বৎসর পর জন্ম	আয়ুষ্কাল	হযরত আদমের সৃষ্টির কত বৎসর পর মৃত্যু
১।	হযরত আদম	*	৯৩০	৯৩০
২।	শেথ (শীছ আ)	১৩০	৯১২	১০৪২
৩।	ইনোশ	২৩৫	৯০৫	১১৪০
৪।	কৈনন	৩২৫	৯১০	১২৩৫
৫।	মহলেল	৩৯৫	৮৯৫	১২৯০
৬।	জেরদ	৪৬০	৯৬২	১৪২২
৭।	ইনোক	৬২২	৩৬৫	৯৮৭
৮।	মথুশেলহ্	৬৮৭	৯৬৯	১৬৫৬
৯।	লামাক	৮৭৪	৭৭৭	১৬৫১
১০।	হযরত নূহ (আ)	১০৫৬	৯৫০	২০০৬
১১।	শেম (শাম)	১০৫৬	৬০০	২১৫৬
১২।	অর্ফকষদ	১৬৫৮	৪৩৮	২০৯৬
১৩।	শেলহ	১৬৯৩	৪৩৩	২১২২
১৪।	এবর	১৭২৩	৪৬৪	২১৮৭
১৫।	পেলেগ	১৭৫৭	২৩৯	১৯৯৬
১৬।	রিয়ু	১৭৮৭	২৩৯	২০২৬
১৭।	স্বরূগ	১৮১৯	২৩০	২০৪৯
১৮।	নাহোর	১৮৪৯	১৪৮	১৯৯৭
১৯।	তেরহ	১৮৭৮	২০৫	২০৮৩
২০।	হযরত ইবরাহীম	১৯৪৮	১৭৫	২১২৩

এই ছকটি পেশ করার পর মরিস বুকাইলি সুস্পষ্টভাবে লিখেন ঃ "উল্লেখ্য যে, এই ছকে ব্যবহৃত পরিসংখ্যান বাইবেলের আদিপুস্তকের পুরোহিতদের রচিত পাঠ হইতেই প্রাপ্ত, এই জাতীয় তথ্যাদির যাহা একমাত্র উৎস। বাইবেলের বর্ণনানুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইবরাহীম (আ) আদম (আ)-এর ১৯৪৮ বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন (The Bible the Quran and Science, তাজ কোম্পানী, দিল্লী, পৃ. ৪৭)।

লূক লিখিত সুসমাচারের বর্ণনা মোটামুটি উক্তরূপ। তবে তাহাতে ১৩ নং ক্রমিকে কৈননের নাম উক্ত হইয়াছে এবং তৎপরবর্তী শেলহ-এর নাম ১৪ নম্বরে আসিয়াছে। ফলে লূকের বর্ণনায় ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত বংশলতিকা ২১ পুরুষে পৌছিয়া গিয়াছে। মথি লিখিত সু-সমাচারের ইবরাহীম (আ)-এর পূর্ববর্তী বংশলতিকা অনুপস্থিত। কিন্তু লূক ও মথি উভয়ের বর্ণনার মধ্যে ইবরাহীম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত বংশলতিকার ব্যাপারে যথেষ্ট গরমিল পরিলক্ষিত হয়। ঐ বংশলতিকা বর্ণনায় দুইটি ধাপ আছে। প্রথম ধাপে ইবরাহীম (আ) হইতে দাউদ (আ) পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ধাপে হযরত দাউদ (আ)-এর পর হইতে ঈসা (আ) পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। তুলনামূলকভাকে পার্থক্যটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরার মানসে মরিস বুকাইলি পাশাপাশি ছক আঁকিয়াছেন নিম্নরূপ ঃ

প্রাক-দাউদ বংশতালিকা

মথির বর্ণনানুসারে ঃ	লূকের বর্ণনানুসারে
মথি ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বের	(১) আদম
কোন নাম উল্লেখ করেন নাই	(২) শীছ
	(৩) ইনোস
	(৪) কৈনান
	(৫) মাহালালীল
	(৬) জেরদ
	(৭) ইনোক
	(৮) মেথুশেলহ
	(৯) লামেক
	(১০) নূহ
	(১১) শেম (শাম)
	(১২) অর্ফকষদ
	(১৩) কৈনান
	(১৪) শেলহ

(১৫) ইবর

(১৬) পেলেগ

(১৭) রিয়ু

(১৮) স্বরূগ

(১৯) নাহুর

(২০) তেরহ

(২১) ইবরাহীম

দাউদ (আ)-উত্তর ঈসা (আ)-এর বংশতালিকা

মথির বর্ণনানুসারে	লূক-এর বর্ণনানুসারে
১। ইবরাহীম (আ)	(২২) ইসহাক (আ)
২। ইসহাক (আ)	(২৩) ইয়াকূব (আ)
৩। ইয়াকূব (আ)	(২৪) ইহূদা
৪। এহুদা	(২৫) পেরস
৫। পেরস	(২৬) হেযরন
৬। হেযরন	(২৭) অর্নি
৭। রাম	(২৮) অদমান
৮। আম্মীনাদব	(২৯) আম্মীনাদব
৯। নহশোন	(৩০) নহশোন
১০। সলমোন	(৩১) সালা
১১। বোয়স	(৩২) বোয়স
১২। ওবেদ	(৩৩) ওবেদ
১৩। যিশয়	(৩৪) যিশয়
১৪। দাউদ (আ)	(৩৫) দাউদ (আ)

লক্ষণীয়, উক্ত ছকে উভয় বর্ণনার মধ্যে যেমন নামগত বিস্তর ফারাক রহিয়াছে, তেমনি রীতিমত একটি পুরুষেরও তারতম্য হইয়া গিয়াছে। মথির বর্ণনায় যেখানে ইবরাহীম (আ) হইতে দাউদ (আ) পর্যন্ত ১৪ পুরুষ দেখান হইয়াছে, সেখানে লূকের বর্ণনায় তাহা ১৫ পুরুষ।

দাঊদ (আ) হইতে ঈসা (আ) পর্যন্ত বংশতালিকা ঃ

মথির বর্ণনানুসারে	লূকের বর্ণনানুসারে
১৪। দাঊদ (আ)	৩৫। দাঊদ (আ)
১৫। সুলায়মান (আ)	৩৬। নাথান
১৬। রহবিয়াম	৩৭। মওথ
১৭। আবিয়	৩৮। মিন্না
১৮। আসা	৩৯। মিলিয়া
১৯। যিহোশাফ্ট	৪০। ইলিয়াকিম
২০। যোরাম	৪১। যোনম
২১। উযিয়	৪২। ইউসুফ
২২। যোথম	৪৩। যুদা
২৩। আহস	৪৪। শামাউন
২৪। যিকনিয়	৪৫। লেবি
২৫। মনঃশি	৪৬। মওত
২৬। আমোস	৪৭। যোরীম
২৭। যোশিয়	৪৮। ইলীয়েশর
২৮। যিকনিয়	৪৯। ইউসা
ইয়াহূদীদের বাবিল দেশে নির্বাসন	৫০। এর
২৯। শলটিয়েল	৫১। ইলমাদস
৩০। সরুব্বাবিল	৫২। কোষম
৩১। অবীহূদ	৫৩। আদ্দী
৩২। ইলীয়াকিম	৫৪। মল্কি
৩৩। আসোর	৫৫। নেরি
৩৪। সাদোক	৫৬। শল্টিয়েন
৩৫। আখীম	৫৭। সরুব্বাবিল

৩৬। ইলীহূদ

৩৭। ইলিয়াসর

৩৮। মওন

৩৯। ইয়াকূব

৪০। ইউসুফ

৪১। যীশু (ঈসা আ)

৫৮। রীষা

৫৯। যোহানা

৬০। যুদা

৬১। যোশেখ

৬২। শিমিয়ি

৬৩। মওথিয়

৬৪। মাট

৬৫। নাগ

৬৬। ইষলি

৬৭। নহুম

৬৮। আমোষ

৬৯। মওথিয়

৭০। ইউসুফ

৭১। যান্নায়

৭২। মলকি

৭৩। লেবি

৭৪। মওত

৭৫। এলি

৭৬। ইউসুফ

৭৭। যীশু (হযরত ঈসা)

উক্ত বংশলতিকাটি একান্তই ইসরাঈলী উৎস তথা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম হইতে প্রাপ্ত। এতদ্ব্যতীত এই সংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। লোক পরম্পরার গড়পড়তা বয়স অনুমান করিয়া আদম (আ)-এর যুগ নির্ণয়ের প্রয়াস পাইবার কোনই উপায় নাই। তাই ফরাসী পণ্ডিত মরিস বুকাইলী উক্ত ছকগুলি উদ্ধৃত করার পর বিভিন্ন পর্যায়ের উপর বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক তাঁহার বিখ্যাত The Bible The Quran & Science পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

"বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এতদসংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান যে আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে একেবারে অগ্রহণযোগ্য তা অন্যরা তো বটেই খোদ ভ্যাটিকান কাউন্সিলও স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁরা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এই ধরনের তথ্য পরিসংখ্যানকে সেকেলে বলে সর্বসম্মত অভিমত প্রকাশ করেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে বাইবেলের নতুন নিয়মের (ইঞ্জিল) সুসমাচারগুলিতে অবলীলায় বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে সঙ্গতিবিহীন এইসব সেকেলে তথ্য ও পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং যাঁরা মনে করেন যে, সুসমাচারসমূহের বর্ণনা ঐতিহাসিকভাবে সঠিকত্বের দাবিদার, তাঁদের সে দাবি যে কতটা ভিত্তিহীন, এই থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়" (বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, পৃ. ১৫০, আখতার-উল-আলম অনূদিত)।

"লূক তদীয় সুসমাচারে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বপুরুষের যে তালিকা তুলিয়া ধরিয়াছেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচারে তাহা আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে" (Bible Quran & Science, পৃ. ১০০)।

১৮৬৩ সালে ইয়াহূদী-খৃস্টধর্ম ও তাহাদের শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ভারতীয় আলিম মওলানা রহমতুল্লাহ কীরানভী (১২৩৩ হি.-১৩০৮ হি./১৮১৮ খৃ.-১৮৯১ খৃ.) কর্তৃক লিখিত বিখ্যাত 'ইযহারুল হক' গ্রন্থের চারটি খণ্ডে বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মে যে অসংখ্য বিকৃতি এবং বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণে যে অসংখ্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয় তাহা বিস্তারিতভাবে তুলিয়া ধরেন, যাহাতে বাইবেলের অনির্ভরযোগ্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। সেই গ্রন্থ হইতে এই সংক্রান্ত কেবল দুইটি ছকই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

ইতোপূর্বে আমরা আল্লামা ইবন কাছীর (র)-এর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া এবং মরিস বুকাইলীর 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে উদ্ধৃত বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মের বরাতে আদম (আ) হইতে পরবর্তী দশ পুরুষ নূহ (আ) পর্যন্ত অধস্তন পুরুষগণের কাহার কোন বয়সে সন্তানের জন্ম হইয়াছিল তাহার বর্ণনা দিয়া আসিয়াছি। এবার নিম্নে ছকটি লক্ষ্য করুন ঃ

আদম (আ) হইতে নূহ (আ) (প্লাবন) পর্যন্ত কাহার কত বৎসর বয়সে সন্তানের জন্ম হয়

		বাইবেলের হিব্রু ভাষ্যমতে	সামারিয়ান ভাষ্যমতে	গ্রীক ভাষ্যমতে
১।	হযরত আদম (আ)	১৩০ বৎসর	১৩০ বৎসর	২৩০ বৎসর
২।	হযরত শীছ (আ)	১০৫ "	১০৫ "	২০৫ "
৩।	কৈনান	৭০ "	৭০ "	১৭০ "
৪।	সাবালাবীল	৬৫ "	৬৫ "	১৬৫ "
৫।	য়ারদ	১৬২ "	৬২ "	১৬২ "
৬।	ইনূক (ইদরীস আ)	৬৫ "	৬৫ "	১৬৫ "

৭।	মেথু শালেহ	১৮৭ "	৬৭ "	১৮৭ "
৮।	লামাক	১৮২ "	৫৩ "	১৮৮ "
৯।	নূহ (আ)	৬০০ "	৬০০ "	৬০০ "
	মোট ঃ	১৬৫০ "	১৩০৭	২২৬২

(টীকা ঃ ইযহারুল হক, আরবী, ২খ, পৃ. ৪৩১, রিয়াদ মুদ্রণ ১৯৮৯ খৃ.; ঐ, ইংরেজী ভাষ্য, ওলী রাযীকৃত, রিয়াদ ১৯৯২ খৃ., ২খ, পৃ. ৬২)।

নূহ (আ)-এর প্লাবন হইতে ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম পর্যন্ত।

	হিব্রু বাইবেলের ভাষ্যমতে	সামানিয়ান বাইবেলের ভাষ্যমতে	গ্রীক বাইবেলের ভাষ্যমতে
সাম	২ বৎসর	২ বৎসর	২ বৎসর
আর্ফখশদ	৩৫ "	১৩৫ "	১৩৫ "
কৈনান	–	–	১৩০ "
সালাহ	৩০	১৩০	১৩০
ইবর	৩৪	১৩৪	১৩৪
পেলেগ	৩০	২৩০	১৩০
রিযূ	০২	১৩২	১৩২
সরূগ	৩০	১৩০	১৩০
নহুর	২৯	৭৯	৭৯
তারেহ (ইবরাহীম (আ) -এর পিতা আযর)	৭০	৭০	৭০
মোট ঃ	২৯০	৯৪২	১০৭২

উক্ত ছকটি আপন কিতাবে সন্নিবেশিত করিয়া মওলানা রহমতুল্লাহ কীরানভী (র) লিখেন ঃ "এই মতপার্থক্যও এতই অধিক যে, উক্ত ভাষ্যগুলির মধ্যে সাযুজ্য বিধান কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে এবং যেহেতু হিব্রু ভাষ্যমতে ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম মহাপ্লাবনের ২৯২ বৎসর পর বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং নূহ (আ) মহাপ্লাবনের পর ৩৫০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন, যাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আদিপুস্তক, নবম পরিচ্ছেদ-এর ২৮তম শ্লোকে রহিয়াছে, এই হিসাবে নূহ (আ)-এর ওফাতের সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ৫৮ বৎসর হইতে হয়, যাহা ঐতিহাসিকগণের সর্ববাদীসম্মত মতের বিরোধী। গ্রীক এবং সামারিয়ান ভাষ্যও উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কেননা প্রথমোক্ত ভাষ্যমতে ইবরাহীম

(আ)-এর জন্ম নূহ (আ)-এর ইন্তিকালের ৭২২ বৎসর পূর্বেকার ঘটনা এবং দ্বিতীয়োক্ত ভাষ্যমতে উহা ছিল ৫৯২ বৎসর পূর্বের কথা।

ছক আঁকিলে দাঁড়ায় এইরূপ ঃ

	গ্রীক ভাষ্য	সামেরিয়ান ভাষ্য	হিব্রু ভাষ্য
ক। নূহ (আ)-এর মহাপ্লাবন হইতে তাহার ইনতিকাল পর্যন্ত	৩৫০	৩৫০	৩৫০
খ। মহাপ্লাবন হইতে ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম পর্যন্ত	১০৭২	৯৪২	২৯২
অতএব (গ) নূহ (আ)-এর ইনতিকাল হইতে			
ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম পর্যন্ত	১০৭২-৩৫০	৯৪২-৩৫০	২৯২-৩৫০
	৭২২ বৎসর	৫৯২ বৎসর	৫৮ বৎসর

অর্থাৎ ঐ সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ৫৮ বৎসর (ইযহারুল হক, আরবী, ২য় খণ্ডের পাদটীকায়, যাহা ডঃ মুহাম্মাদ আবদুল কাদির খলীল মালাক্কায়ী কর্তৃক লিখিত, পৃ. ৪৩৫)।

উপরন্তু গ্রীক ভাষ্যে অর্ফখষদ ও শালেহ-এর মধ্যে এক পুরুষ বর্ধিত করা হইয়াছে (তিনি হইলেন কৈনান, যাহার কথা ইতোপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে), হিব্রু ও সামেরিয়ান ভাষ্যে তাহার কোন উল্লেখ নাই। লূক তদীয় সুসমাচার গ্রন্থে গ্রীক বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাই ঈসা (আ)-এর বংশলতিকার বর্ণনায় তিনি কৈনানের নাম বর্ধিত করিয়াছেন। উক্ত অসঙ্গত মতানৈক্যের দরুন খৃষ্টীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐতিহাসিকগণ ঐ কারণেই উক্ত ভাষ্যত্রয়কে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং অনির্ভরযোগ্য ঠাওরাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, উক্ত সময়ের ব্যবধান ছিল ৩৫২ বৎসরের। অনুরূপভাবে বিখ্যাত ইয়াহূদী ঐতিহাসিক ইউসীকস উহার উপর আস্থা স্থাপন করেন নাই। তিনি বলেন, উক্ত মেয়াদ ছিল ৯৯৩ বৎসর, যেমনটি হেনরী স্কট-এর বাইবেলের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে (ইযহারুল হক, আরবী, ২খ, পৃ. ৪৩৫-৪৩৬; কুরআন ছে বাইবেল তক, মওলানা তকী উছমানী কৃত উর্দূ ভাষ্য, ২খ, পৃ. ১৮, ৭ম সং, ১৪১০ হি., করাচী; ঐ, ইংরেজী ভাষ্য, ওলী রাযীকৃত, ২খ, পৃ. ৬৩-৬৪, ২য় সং, রিয়াদ, ১৪১২/১৯৯২)।

আদম (আ)-এর বয়স বা সময়কাল নির্ণয় অথবা তাঁহার বংশধরদের তালিকা বর্ণনায় বাইবেলের বর্ণনা যে আদৌ গ্রহণযোগ্য নহে, উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। গোটা খৃষ্টান জগতের সম্মুখে উপরিউক্ত পুস্তক দুইখানা-ইযহারুল হক ও The Bible The Quran & Science চ্যালেঞ্জরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইবন হিশাম (মৃত্যু ২১৮ হি./৮২৮ খৃ.) তাঁহার সীরাত গ্রন্থে আদম (আ) হইতে মুহাম্মাদ (স) পর্যন্ত নিম্নরূপ বংশতালিকা উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

(১) আদি পিতা হযরত আদম (আ)

↓

(২) হযরত শীছ (আ)

↓

(৩) ইয়ানিশ (আনূশ)

↓

(৪) কায়নাথ

↓

(৫) মাহলীল

↓

(৬) ইয়ারূদ

↓

(৭) আখনূখ অর্থাৎ (হযরত ইদরীস (আ)

↓

(৮) মাতুশালাখ

↓

(৯) লামাক

↓

(১০) নূহ (আ)

↓

(১১) সাম

↓

(১২) আর ফাখশাজ

↓

(১৩) শালেখ

↓

(১৪) আয়বার (পূর্বোক্ত তালিকায় ইবরবা এবর নামে যিনি উক্ত হইয়াছেন; অন্যমতে ইহার নাম আবের)। তাবারীর মতে ফালেগ ও আবেরের মাঝখানে কায়আন নামক আরেক পূরুষ ছিলেন। তবে

তিনি যাদুকর ছিলেন বলিয়া তওরাতে তাহার নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে" (পাদটীকা সীরাতুন্নবী, ইবন হিশাম, ইফা. প্রকাশিত, ১খ, পৃ. ৫)।

↓

(১৫) ফালেখ (মতান্তরে (ফালেগ)

↓

(১৬) রাউ (রিয়ু)

↓

(১৭) সারূগ

↓

(১৮) নাহুর

↓

(১৯) তারেহ (আযার)

↓

(২০) ইবরাহীম (আ)

↓

(২১) ইসমাঈল (আ)

↓

(২২) নাবিত

↓

(২৩) ইয়াশজাব

↓

(২৪) ইয়ারুব

↓

(২৫) তায়রাহ

↓

(২৬) নাহুর

↓

(২৭) মুকাওয়াম

↓

(২৮) উদাদ

↓

(২৯) উদ্

↓

(৩০) আদনান

↓

(৩১) মাআদ

↓

(৩২) নিযার

↓

(৩৩) মুদার

↓

(৩৪) ইলয়াস

↓

(৩৫) মুদরাকা (আসল নাম আমির)

↓

(৩৬) খুযায়মা

↓

(৩৭) কিনানা

↓

(৩৮) নাদর

↓

(৩৯) মালিক

↓

(৪০) ফিহ্র (আসল নাম কুরায়শ, মতান্তরে ফিহ্র, উপাদি কুরায়শ; কুরায়শ বংশের আদি পুরুষ)

↓

(৪১) গালিব

↓

(৪২) লুআই

↓

(৪৩) কা'ব

↓

(৪৪) মুররা

↓

(৪৫) কিলাব

↓

(৪৬) কুসাই

↓

(৪৭) মুগীরা (আব্দ মানাফ)

↓

(৪৮) হাশিম (আসল নাম আমর)

↓

(৪৯) শায়বা (আসল নাম আবদুল মুত্তালিব)

↓

(৫০) আবদুল্লাহ

↓

(৫১) মুহাম্মাদ, আল্লাহ্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম (ইবন হিশাম, সীরাতুন নবী, পৃ. ৩-৭)।

লক্ষণীয়, হযরত আদম (আ) হইতে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত বিশ পুরুষের বংশতালিকায় উক্ত সময়ের ব্যবধান দেখান হইয়াছে প্রায় ২০০০ বৎসর।

মোটামুটি যতদূর জানা যায়, ঈসা (আ)–এর ১৮০০ বৎসর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আগমন ঘটে। বাইবেলের আদিপুস্তকের তথ্যানুসারে আদম (আ) কমবেশী ঈসা (আ)-এর ৩৮০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন (The Bible The Quran & Science, P. 47)। লূকের বর্ণনানুসারে ঈসা (আ) আদম (আ)-এর ৭৭তম অধস্তন পুরুষ; অথচ ইবন হিশামের উদ্ধৃত বংশতালিকায় তাঁহার ৫৭০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণকারী আমাদের নবী করীম (স)-কে ৫১তম অধস্তন পুরুষরূপে দেখান হইয়াছে। অথচ হিসাবমতে ৭৭ পুরুষ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৩৮০০ বৎসর হইলে ৫১তম পুরুষ পর্যন্ত পৌছিতে লাগে ৩৮০০-৭৬=৫০×৫০=২৫০০ বৎসর। কিন্তু কার্যত আমরা এই ব্যবধান পাইতেছি ৩৮০০+৫৭০=৪৩৭০ বৎসরের।

অপরদিকে যদি আমরা লূকের পরিবর্তে মথির বর্ণনার উপর নির্ভর করি, তাহা হইলে ঈসা (আ) পর্যন্ত ৪১ প্রতি দুই পুরুষের ব্যবধান গড়ে প্রায় ৯৫ বৎসর (৩৮০০-৪০)। এই হিসাবে ৫১তম পুরুষ পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান দাঁড়ায় প্রায় ৪৭৫ বৎসর। পক্ষান্তরে লূকের বর্ণনামতে আমাদের নবী করীম (স)-এর জন্মসাল হওয়া কথা ছিল, তাহার প্রকৃত জন্মসাল (৫৭০)-এর ১৮৭০ বৎসর পূর্বে, অন্যদিকে মথির বর্ণনা অনুসারে তাঁহার জন্মসাল হওয়া উচিত ছিল আরও ৩৮০ বৎসর পরে। সুতরাং বাইবেলের কোন বর্ণনাই যথার্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

এখানে আরেকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। প্রথম দিকের বংশধরগণ যত দীর্ঘ আয়ু লাভ করিয়াছেন, শেষ দিকের বংশধরগণ তেমনটি লাভ করেন নাই। সুতরাং মথির বর্ণনানুসারে ঈসা (আ) ৪১তম পুরুষ হইলে আমাদের নবী (স)-এর জন্মগ্রহণের বক্তব্যকে কোনমতেই মানিয়া নেওয়া যায় না। এই কারণেই "ফাদার কানেসগিয়েসার তাঁর পুস্তকে এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, "কেউ যেন যীশুখৃস্ট সংক্রান্ত বাইবেলের কোন সুসমাচারের বর্ণনাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করেন। কেননা বাইবেলের লেখকগণ কোন বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অথবা কোন বিশেষ বিষয়ের মোকাবেলা করার প্রয়োজনেই হয়তো বা নিজ নিজ জনপদে প্রচলিত লোককাহিনীকে এভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন" (The Bible The Quran & Science, P. 47 পৃ. ৬৪)।

ফরাসী পণ্ডিত মরিস বুকাইলীর পুস্তকের অসংখ্য স্থানে তাই বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মকে "আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত নহে, বরং পণ্ডিত ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞদের রচনা" অবৈজ্ঞানিক ও অনির্ভরযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। এই কারণেই মহানবী (স) ইসরাঈলীদের রিওয়ায়াত সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন ঃ

لاتصدقوا اهل الكتاب ولا تكذ بوهم .

"আহ্লি কিতাবদের বর্ণনাকে সত্য বা মিথ্যা বলিতে যাইও না" (মিশকাত, বুখারী, পৃ. ২৮; বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান-আখতার-উল-আলম অনূদিত, পৃ. ৮২)।

সূরা বাকারার ৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী মহাম্মাদ শফী (র) বলেন, "আদম (আ)-কে বিশেষ গাছ বা উহার ফল খাইতে নিষেধ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাকে এ ব্যাপারেও সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাপে লিপ্ত করিয়া না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আ)-এর তাহা খাওয়া আপাতদৃষ্টিতে পাপ বলিয়া মনে হয়। অথচ নবীগণ পাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবীগণের যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ থাকার কথা যুক্তি ও রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সর্বসম্মত অভিমতেও নবীগণ ছোটবড় যাবতীয় পাপ হইতে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ নবীগণকে গোটা মানবজাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল। যদি তাঁহাদের দ্বারাও আল্লাহ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট-বড় কোন পাপকাজ সম্পন্ন হইত, তবে নবীগণের বাণী ও কার্যাবলীর উপর আস্থা ও বিশ্বাস উঠিয়া যাইত। যদি নবীগণের উপর আস্থা ও বিশ্বাস না থাকে তবে দীন ও শরীআতের স্থান কোথায়? অবশ্য কুরআন পাকের অনেক আয়াতে কতক নবী (আ) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রহিয়াছে যাহাতে মনে হয় যে, তাঁহাদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হইয়াছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে এজন্য তাঁহাদেরকে সর্তক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হযরত আদম (আ)-এর ঘটনাও এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে উম্মতের সর্বসম্মত মত এই যে, ভুলবশত বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবীদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হইয়া থাকে। কোন নবী জানিয়া শুনিয়া বা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেন নাই। এ ক্রটি ইজতিহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এবং তাহা ক্ষমার যোগ্য। শরীআতের পরিভাষায় ইহাকে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভুল ও ক্রটি-বিচ্যুতি সেসব বিষয়ে হইতেই পারে না যাহার সম্পর্ক ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রচার এবং শরীআতের বিধি-বিধানের সহিত রহিয়াছে এবং তাঁহাদের ব্যক্তিগত কাজকর্মে এ ধরনের ভুল-ক্রটি হইতে পারে। হযরত আদম (আ)-এর এই ঘটনা সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(১) হযরত আদম (আ) কে যখন নিষেধ করা হইয়াছিল, তখন এক নির্দিষ্ট গাছের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই তাহা করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দিষ্ট ছিল না, বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন হাদীছে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (স) একখণ্ড রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ হাতে নিয়া ইরশাদ করিলেন, "এ বস্তু দুইটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম"। এ কথা সুস্পষ্ট যে, শুধু ঐ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ড ব্যবহারই হারাম ছিল না যে দুইটি হুযুর (সা)-এর হাতে ছিল, বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এই হুকুম, কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হইতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণ খণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল যেগুলি সে সময় তাঁহার হাতে ছিল। অনুরূপভাবে হযরত আদম (আ)-এর হয়তো এ ধারণা হইয়াছিল যে, যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া নিষেধ করা হইয়াছিল, এ নিষেধের সম্পর্ক ঐ গাছটিতেই সীমাবদ্ধ। শয়তান এ ধারণা তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল এবং কসম খাইয়া বিশ্বাস জন্মাইল যে, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্খী। তোমাদেরকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দেই না যাহা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হইয়াছিল তাহা অন্য গাছ।

তাহা ছাড়া এমনও হইতে পারে যে, শয়তান এ কুমন্ত্রণা তাঁহার অন্তঃকরণে সঞ্চারিত করিয়াছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনা পর্বের সহিত সম্পৃক্ত ছিল। যেমন সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার হইতে বিরত রাখা হয়, কিন্তু সময় ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার্য গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। সুতরাং এখানে আপনি শক্ত সমর্থ হইয়াছেন। এখন সে বিধিনিষেধ কার্যকর নয়।

আবার এ সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, শয়তান যখন আদম (আ)-কে সেই গাছের উপকারিতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিতেছিল, যেমন সেই গাছের ফল খাইলে আপনি অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জান্নাতের নেয়ামতাদি ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারিবেন। তখন তাঁহার সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁহার মনে ছিল না। কুরআন শরীফের فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (আদম ভুলিয়া গেল এবং আমি তাহার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাই নাই) আয়াতও এ সম্ভাবতা সমর্থন করে। যাহাতে এ ধরনের বহু সম্ভাবনা থাকিতে পারে। তবে সারকথা এই যে, হযরত আদম (আ) বুঝিয়া শুনিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেন নাই, বরং তাঁহার দ্বারা ভুল হইয়া গিয়াছিল, যাহা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়। অবশ্য আদম (আ) স্বীয় ভুলের জন্য তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তাঁহাকে মাফ করিয়া দেওয়া হয়ে (তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, মাদীনা মুনাওয়ারা থেকে মুদ্রিত, পৃ. ৩১)।

উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনার জন্য আদম (আ)-এর চেয়ে ইবলীসকেই অধিকতর দায়ী করিয়াছেন (দ্র. ২ ঃ ১২০, ২ ঃ ৩৬, ৭ ঃ ২১, ২২)। উপরিউক্ত আয়াতসমূহের প্রত্যেকটিতেই শয়তানকে আদম (আ)-কে প্ররোচিত করার জন্য দায়ী করা হইয়াছে এবং আদম (আ)-এর পদস্খলন বলিয়া ঐ ঘটনাকে অবিহিত করা হইয়াছে, পাপ বলা হয় নাই।

আদম ও হাওয়ার দুনিয়ায় অবতরণ

পূর্ব সতর্কীকরণ সত্ত্বেও নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের জন্য আল্লাহ আদম (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ (৭ ঃ ২২)

وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ․

"আমি কি তোমাদেরকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইতে বারণ করি নাই এবং আমি কি তোমাদেরকে বলি নাই যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু" (৭ ঃ ২২)।?

আদম (আ) ও হাওয়া (আ) তাঁহাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র শিখানো তওবার বাণী দ্বারা দোআ করিলেন ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ․

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব" (৭ ঃ ২৩)।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

"তোমরা সকলেই এখান হইতে নামিয়া যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসিবে তখন যাহারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। যাহারা কুফরী করিবে ও আমার নির্দেশসমূহ অমান্য করিবে, তাহারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে" (২ ঃ ৩৮-৯)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শায়খুল হিন্দ মওলানা মাহমূদুল হাসান (র) লিখিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর তওবা তো কবুল করিলেন কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে জান্নাতে পুনর্গমনের নির্দেশ দিলেন না, বরং পৃথিবীতে বসবাসের যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহাই বহাল রাখিলেন। কেননা উহাই ছিল তাঁহার হিকমতের অনুকূল। যেহেতু আদম (আ)-কে দুনিয়ার খলীফা মনোনীত করা হইয়াছিল, বেহেশতের জন্য নহে, সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা বলিয়া দিলেন, যাহারা আমার আদেশ পালনকারী হইবে, পৃথিবীতে বসবাস তাহাদের জন্য ক্ষতিকর হইবে না বরং লাভজনকই হইবে। তবে যাহারা নাফরমান তথা আল্লাহ্র আদেশ অমান্যকারী হইবে, তাহাদের জন্য জাহান্নাম, আর এই পার্থক্য বিধানের জন্য সমুচিত ক্ষেত্রও এই পৃথিবীই (ফাওয়াইদে শায়খুল হিন্দ, তাফসীর উছমানী, টীকা নং ৬১, ২ ঃ ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)। এই ব্যাখ্যায় উল্লিখিত প্রথম নির্দেশটি ছিল এইরূপ ঃ

قُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ.

"আমি বলিলম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নামিয়া যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল" (২ ঃ ৩৬)।

লক্ষণীয়, এখানে 'তোমরা নামিয়া যাও' আদেশে বহুবচন বোধক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ.

"তিনি বলিলেন, তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু" (২০ ঃ ১২৩)।

এখানে দ্বিবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া আদম (আ) ও ইবলীসকে বুঝান হইয়াছে। ইব্ন আবী হাতিম হযরত ইব্ন আব্বাস (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ "আদম (আ)-কে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী দাহ্না নামক স্থানে নামাইয়া দেওয়া হয়।" পক্ষান্তরে হাসান হইতে বর্ণিত আছে ঃ "আদম (আ)-কে ভারতবর্ষে, হাওয়াকে জিদ্দায়, ইবলীসকে দাস্তিমসানে, যাহা বসরা হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এবং সর্পকে ইসফাহানে নামাইয়া দেওয়া হয়।" ইব্ন আবী হাতিমেরও অনুরূপ একটি বর্ণনা রহিয়াছে। আস-সুদ্দী (র) বলেন, "আদম (আ) ভারতবর্ষে অবতরণ করেন এবং তাঁহার সহিত

হাজরে আসওয়াদও অবতীর্ণ হয়। আদম (আ)-এর হাতের মুষ্টিতে তখন জান্নাতের লতাপাতা ছিল যাহা তিনি ভারতবর্ষে রোপণ করেন, ফলে সেখানে সুগন্ধি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়" (কাসাসুল আম্বিয়া, ইব্ন কাছীর, পৃ. ২৯)।

ইব্ন উমার (রা)-এর বর্ণনায় আদম (আ) সাফায় এবং হাওয়া মারওয়ায় অবতরণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইব্ন আবূ হাতিমও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১)।

আবদুর রায্যাক হযরত আবূ মূসা আশ্‘আরী (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা যখন আদম (আ)-কে জান্নাত হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া দিলেন তখন তাঁহাকে সর্বপ্রকার কাজ শিক্ষা দেন। তিনি তাঁহাকে জান্নাতের ফলমূল পাথেয়স্বরূপ সাথে দিয়া দেন। তোমাদের এইসব ফলমূল হইতেছে জান্নাতের সেই ফলমূলেরই অংশ। তবে হাঁ, তোমাদের এই ফলমূলগুলি পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়, কিন্তু সেগুলি ছিল অপরিবর্তিত ও অবিকৃত" (হাকিম, ২খ, পৃ. ৪৫৩)।

সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে ঃ "সর্বোত্তম দিন, যাহাতে সূর্যোদয় হয়, জুমু'আর দিন। কেননা এই দিনেই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়, এই দিনেই তাঁহাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয় এবং এই দিনেই তাঁহাকে জান্নাত হইতে বাহির করা হয়"।

আদম (আ)-এর তওবা

আবূ হাতিম হযরত উবায়্য ইব্ন কা'ব (রা) বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা করেন যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করেন, আমি যদি তওবা করি এবং আপনার দিকে রুজু হই তাহা হইলে কি আমি বেহেশতে ফিরিয়া যাইতে পারিব? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হাঁ। এই প্রসঙ্গেই আয়াত নাযিল হয় ঃ

فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ٠

"অতঃপর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হইতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হইল। আল্লাহ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (২ ঃ ৩৭)।

মুজাহিদ, কাতাদা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে যে, সেই বিশেষ প্রার্থনা বাক্য ছিল সূরা আ'রাফের ২৩ নং আয়াতে বর্ণিত বাক্যগুলি ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ٠

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব" (৭ ঃ ২৩; তাফসীর তাবারী, জিলদ ১, পৃ. ২৪৪-২৪৫)।

হাকেম তদীয় মুস্তাদরাক গ্রন্থে সাঈদ ইব্ন জুবায়র-ইব্ন আব্বাস (র) সূত্রে উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ "আদম (আ) বলিলেন ঃ আপনি কি আমাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেন নাই? জবাবে তাঁহাকে বলা হইল ঃ হাঁ। তিনি প্রশ্ন করিলেন ঃ আপনি কি আমার মধ্যে আপনার রূহ ফুঁকিয়া দেন

নাই?' জবাবে বলা হইল ঃ হাঁ। তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন ঃ আমি যদি তওবা করি, আপনি কি আমাকে জান্নাতে ফিরাইয়া নিবেন? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ হাঁ (হাকেম, ২খ, পৃ. ৫৪৫)। হাকেম উহা সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (ইবন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩১)।

হাকেম হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (র) বর্ণিত রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আদমের যখন পদস্খলন হইল তখন তিনি বলিলেন, প্রভু! মুহাম্মাদ (স)-এর উসীলায় আমি আপনার নিকট যাঞ্চা করিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ তুমি মুহাম্মাদকে কেমনে চিনিতে পারিলে অথচ এখনও আমি তাহাকে সৃষ্টি করি নাই? জবাবে আদম (আ) বলিলেন ঃ যখন আপনি স্বহস্তে আমাকে সৃষ্টি করিলেন এবং আমার মধ্যে আপনার 'রূহ' ফুঁকিয়া দিলেন তখন আমি মাথা উঠাইয়া আরশের পায়াসমূহের মধ্যে লিখিত দেখিতে পাইলাম ঃ لا اله الا الله محمد رسول الله তখন আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম যে, নিশ্চয়ই আপনার সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় সত্তা ব্যতীত অন্য কাহাকেও আপনি আপনার পবিত্র নামের সহিত সম্পর্কিত করেন নাই। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ তুমি যথার্থই বলিয়াছ হে আদম! নিশ্চয় তিনি আমার কাছে সৃষ্টি জগতের সকলের তুলনায় প্রিয়। যখন তুমি তাঁহার উসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ, তখন আমি তোমাকে মাফ করিয়া দিলাম। মুহাম্মাদ না হইলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করিতাম না (হাকিম, মুস্তাদরাক, জিলদ ২, পৃ. ৬১৫)। হাদীছটির মূল উৎস আল-মুসতাদরাক, ২খ., পৃ. ৬১৫ এবং তাবারানীর মুজামুস সাগীর, পৃ. ২০৭। উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে ইহা বায়হাকীর দালাইলুন নুবুওয়্যা, বাব মা জাআ ফীমা তাহাদ্দাছা বিহি (স) বিনি'মাতি রব্বিহি; ইব্ন আসাকির, ২খ., পৃ. ৩২৩; হায়ছামীর মাজমা'উয যাওয়াইদ, ৮খ., পৃ. ২৫৩ প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে। হাকেম ইহার সনদসূত্র যথার্থ বলিয়া মত ব্যক্ত করিলেও তাহা যথার্থ নহে। হাদীছের যথার্থতা যাচাইকারী ইমামগণ, যথা ইমাম যাহাবী, ইব্ন কাছীর (তারীখ, ২খ., পৃ. ৩২৩), ইব্ন হাজার আসকালানী, ইব্ন হিব্বান, আবূ নু'আয়ম,ইব্ন তায়মিয়্যা প্রমুখ ইমামগণ ইহাকে জাল হাদীছ (মনগড়া) ও বাতিল রিওয়ায়াত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইমাম বায়হাকী, ইবনুল জাওযী, তাহাবী প্রমুখ উক্ত রিওয়ায়াতের কতক রাবীর কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন (বিস্তারিত দ্র. নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছিদ দা'ঈফা ওয়াল-মাওদূআহ, ৪র্থ সং.,বৈরূত-দামিশ্ক ১৩৯৮ হি., ১খ., পৃ. ৩৮-৪৭, নং ২৫)। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে আদম (আ)-কে আল্লাহর শিখানো দোআটি ছিল ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٧ : ٢٣) ·

আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর বাদানুবাদ

আদম (আ) কর্তৃক নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ, বেহেশত হইতে তাঁহার নির্গমন ও এই পৃথিবীতে আগমন বাহ্যত তাঁহার অপরাধ ও শাস্তি মনে হইলেও ইহাই ছিল মহান কুশলী স্রষ্টার অভিপ্রায়। এই ব্যাপারে হযরত মূসা (আ) কর্তৃক আদি পিতা আদম (আ)-এর অভিযুক্ত হওয়া এবং সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁহার জবাব দানের বিবরণও এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে বলা হইয়াছে যে, নবী করীম (স) বলেন ঃ মূসা (আ) আদম (আ)-এর সহিত বিতর্কে বলিলেন ঃ আপনিই মানব জাতিকে আপনার ত্রুটির কারণে

বেহেশত হইতে বহিষ্কার করিয়াছেন এবং তাহাদের দুর্ভাগ্য-দুর্গতির কারণ হইয়াছেন। আদম (আ) বলিলেন ঃ হে মূসা! তুমি সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তাঁহার রিসালাত ও বাক্যালাপের জন্য নির্বাচিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছেন। তুমি কি এমন একটি ব্যাপারে আমাকে দোষারোপ করিতেছ যাহা আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আদম (আ) বিতর্কে মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হন। বুখারীর এক রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (স) এই কথাটি ২ বার এবং অন্য রিওয়ায়াতে ৩ বার বলিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ উল্লেখ করেন আদম (আ) মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিলের কথা উল্লেখের সময় সাথে সাথে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন ঃ "আমি আগের, নাকি যিকর (তাওরাত) আগের?" জবাবে মূসা (আ) বলিলেন ঃ না, বরং যিকর (তাওরাত) আগের। এই বর্ণনায় আরও আছে, মূসা (আ) আদম (আ) কে বলিয়াছিলেন ঃ "আপনি সেই আদম যাহাকে আল্লাহ স্বহস্তে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার ফেরেশতা দিয়া আপনাকে সিজদা করাইয়াছেন, আপনাকে জান্নাতে বসবাস করাইয়াছেন। তারপর আপনি সেই কাজটি করিলেন, যাহা আপনি করিয়াছিলেন"। আহমদের অন্য বর্ণনায় আছে, আদম (আ) ঐ সময় মূসা (আ) কে প্রশ্ন করেন ঃ "আমার সৃষ্টির পূর্বেই কি তুমি আমার ব্যাপারে উহা লিখিত পাও নাই?" মূসা (আ) তাহা স্বীকার করিলেন। এইভাবে আদম (আ) মূসাকে পরাস্ত করিলেন (আহমাদ, ২খ. ৩৯২)।

ইব্‌ন আবূ হাতিমের বর্ণনায় আছে, আদম (আ) মূসা (আ)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাওরাত আমার জন্মের কত আগে লিখিত হইয়াছিল? মূসা (আ) বলেন ঃ চল্লিশ বৎসর আগে। আদম (আ) আবার প্রশ্ন করেন ঃ তাহাতে কি পাও নাই ঃ وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى (আদম তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করে এবং ভ্রমে পতিত হয়, ২০ ঃ ১২১? জবাবে মূসা (আ) বলিলেন ঃ হাঁ। তখন আদম (আ) বলিলেন ঃ যে কাজটি আমি করিব বলিয়া আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বৎসর পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা আমি কেন করিলাম এইজন্য তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছ?" রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আদম মূসার উপরে জয়ী হইলেন। ইমাম মুসলিমও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (মুসলিম, হাদীছ নং ২৬৫২; কাসাসুল আম্বিয়া, ইবন কাছীর, পৃ. ৩৬)।

বায়হাকীর বর্ণনায় আদম (আ)-এর জবাবী বাক্যটি আরও জোরদারভাবে বর্ণিত হইয়াছে এইভাবে ঃ "তুমি এমন একটি ব্যাপারে আমাকে তিরস্কার করিতেছ যাহা মহান আল্লাহ কর্তৃক পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল" (বায়হাকী, ফী আল-আসমা ওয়াস-সিফাত ১খ, ৩১৬)।

মূসা ও আদম (আ)-এর এই বাদানুবাদ কোথায় কিভাবে হইয়াছিল সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে।

(১) য়াযীদ ইবন হুরমুয-এর বর্ণনায় عند ربهما (তাঁহাদের প্রতিপালকের দরবারে) কথাটি আছে।

(২) মুহাম্মাদ ইবন সীরীন-এর বর্ণনায় আছে التقى ادم موسى। (মূসা ও আদমের সাক্ষাৎ হয়)।

(৩) আম্মার ও শা'বীর বর্ণনায় আছে لقى موسى ادم [আদম (আ) মূসা (আ)–এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন)]।

(৪) হযরত উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আছে ঃ মূসা (আ) আদম (আ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

(৫) আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে ঃ قال موسى يا رب أرنى ادم (মূসা বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে আদমকে দেখাইয়া দিন)।

ফাতহুল বারীতে হাফিয ইবন হাজার বলেন, উক্ত ঘটনা কখনকার তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হয়তোবা উহা মূসা (আ)-এর আমলের ঘটনা। মূসা (আ)-এর মুজিযাস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তখন আদম (আ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন এবং তিনিই তাহাকে কথা বলান অথবা তাঁহার জন্য আদম (আ)-এর কবর উন্মোচিত করিয়া দেন এবং তাঁহার কাশ্‌ফ হয়। তখন তাঁহারা দুইজন কথোপকথন করেন অথবা তাঁহাকে আদম (আ)-এর রূহ দেখাইয়া দেন, যেমনটি নবী করীম (স)-কে মি'রাজ রজনীতে নবী-রাসূলগণের রূহ দেখান হইয়াছিল অথবা তাঁহাকে স্বপ্নে আদম (আ)-কে দেখান হয়। আর নবী-রাসূলগণের স্বপ্নও ওহীবিশেষ যদিও তাহা পরবর্তী কালে সংঘটিত হয়। ইহা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, যেমনটি ইসমাঈল যাবীহুল্লাহ (আ)-এর ব্যাপারে ঘটিয়াছিল অথবা ইহা মূসা (আ)-এর ইন্তিকালের পরে সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আলমে বারযাখে এই সাক্ষাৎকার ঘটে। প্রথম আসমানে তাঁহাদের উভয়ের রূহের সাক্ষাৎ হয়। ইবন আবদিল বারর ও কাসিবী এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন। ইব্‌ন উমার (রা) বর্ণিত হাদীছে তো এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, মূসা (আ) যখন বলিলেন ঃ 'আপনিই আদম?' আদম (আ) বলিলেন ঃ আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি মূসা। উহা নিশ্চয়ই পরে সংঘটিত হয় নাই। উহা পরকালে সংঘটিত হইবে। হাদীছেঅতীত বাচক শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই অর্থে উহা নিশ্চিতভাবেই সংঘটিত হইবে। ইবনুল জাওযী বারযাখে তাঁহাদের সাক্ষাতের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আবার উহা একটি রূপক বা মিছাল হওয়ার কথাটাও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তখন উহার অর্থ হইবে, যদি তাঁহাদের দুইজনের সাক্ষাৎ হইত, তবে অবশ্যই তাহাদের মধ্যে উক্তরূপ বাক্যালাপ হইত (ফাতহুল বারী, ১১খ, পৃ. ৫১৫; দারুর রায়্যান বিত-তুরাছ, ২য় সং, কায়রো ১৯৮৯)।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দিহলাবী (র) বলেন ঃ উহার সারমর্ম হইল, স্বপ্নে কোন ফেরেশতা বা পুণ্যবান লোকের কাছে অজ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির জ্ঞানলাভের মতো রূহের জগতে মূসা (আ) হযরত আদম (আ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উক্ত ঘটনাগর্ভে নিহিত বিষয়াদি জানিয়া লইয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর জন্য ইল্‌ম-এর এই দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন (তা'লীকুস সাবীহ 'আলা মিশকাত মাসাবীহ্, ইদ্রিস কান্দেহলাবী, পৃ. ৭৭)।

তওবা কবুলের পর তিরস্কার নিষিদ্ধ

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, আদম (আ)-এর নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ কোন অপরাধ ছিল না, তবুও তাঁহার মত মর্যাদাসম্পন্ন সত্তা এবং আদি মানব ও আদি নবীর পক্ষে তাহা শোভনীয় হয় নাই বিধায় তাঁহার এই কর্মটিকে عصيان (পদস্খলন) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। একই আয়াতের غوى শব্দটির অর্থে জীবন বিস্বাদ হইয়া যাওয়া। কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদগণ আয়াতে উক্ত غوى শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. কুরতুবী, ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায়)। ইবনুল আরাবী শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন ঃ কুরআন শরীফের উক্ত আয়াত

আলোচনা প্রসঙ্গ বা এই সংক্রান্ত উক্ত হাদীছের আলোচনা প্রসঙ্গ ছাড়া আজ আমাদের মধ্যকার কাহারও জন্য আদম (আ)-এর অপরাধ প্রসঙ্গ আলোচনা করা জায়েয নহে। নিজেদের পক্ষ হইতে যেখানে নিজদের নিকটবর্তী কালের এবং নিজেদের প্রায় সমপর্যায়ের পিতৃপুরুষগণের সম্পর্কে এইরূপ আলোচনা জায়েয নহে, সেখানে আমাদের আদি পিতা এবং সবচাইতে সম্মানিত পিতা ও সর্বপ্রথম নবীর ব্যাপারে এইরূপ নিন্দাসূচক আলোচনা কীরূপে জায়েয হইতে পারে- যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কৈফিয়ত গ্রহণ করিয়া তাঁহার তওবা কবুল করিয়া তাঁহাকে ক্ষমাও করিয়া দিয়াছেন? এই কারণেই আবূ নসর কুশায়রী (র) বলেন ঃ কুরআনে ব্যবহৃত উক্ত শব্দের কারণে আদম (আ)-কে গুনাহগার ও পথভ্রষ্ট বলা জায়েয নহে। কুরআন পাকের যেখানেই কোন নবী অথবা রাসূল সম্পর্কে এরূপ ভাষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা হয় অনুত্তম (خلاف أولى) বুঝানোর জন্য, না হয় নবুওয়াত পূর্ববর্তী অবস্থা বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই কুরআনী আয়াতে ও হাদীছ রিওয়ায়াতের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে নিজেদের পক্ষ হইতে এরূপ বিষয়ের অবতারণা করার বৈধতা বা অনুমতি নাই (কুরতুবী, ২০ ঃ ১২২,-এর তাফসীর প্রসঙ্গে; তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মদ শফী, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

দাউদ (আ)-কে আদম (আ)-এর আয়ু দান

হাকেম আবূ ইয়ালা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছ উদ্ধৃত করেন যাহাতে বলা হইয়াছে ঃ "সর্বপ্রথম আদম (আ)-এর দেহের যে অংশে রূহ সঞ্চারিত হয় তাহা হইল তাঁহার চক্ষু ও নাসারন্ধ্র। তখন তিনি হাঁচি দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ يرحمك ربك (তোমার প্রভু তোমার প্রতি সদয় হউন)। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ হে আদম! উহাদের দিকে (ফেরেশতাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) যাও এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে বল ঃ আস্‌সালামু 'আলায়কুম। তারপর লক্ষ্য কর তাহারা কী বলে। আদম তাহাদের নিকট গেলেন এবং তাহাদেরকে সালাম দিলেন। জবাবে ফেরেশতাগণ বলিলেন ঃ ওআলায়কাস্ সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ ইহাই তোমার এবং তোমার সন্তানদের অভিবাদন পদ্ধতি। তখন আদম বলিলেন ঃ হে প্রভু পরোয়ারদিগার! আমার সন্তান কী? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ আমার হাত গ্রহণ কর হে আদম! আদম বলিলেন ঃ আমি আমার প্রভুর ডান হাত বাছিয়া নিতেছি এবং আমার প্রভুর উভয় হাতই ডান হাত এবং বরকতময়। অতপর আল্লাহতা'আলা তদীয় হাতের তালু প্রসারিত করিলেন। আদমের অনাগতকালের সকল সন্তানকেই পরম দয়াময়ের হাতের তালুর মধ্যে দেখা গেল। তাহাদের অনেকের মুখমণ্ডলই দীপ্তিময়। তন্মধ্যে এক ব্যক্তির দীপ্তি আদমের অত্যন্ত পছন্দ হইল। তিনি বলিলেন ঃ 'প্রভূ! একে?' জবাবে আল্লাহতা'আলা বলিলেন ঃ তোমারই সন্তান দাউদ।

আদম (আ) তখন জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ প্রভু। আপনি তাহার জন্য বয়স কী পরিমাণ বরাদ্দ করিয়াছেন? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ আমি তাহার জন্য ষাট বৎসর আয়ু বরাদ্দ করিয়াছি। আদম বলিলেন ঃ প্রভু! আমার আয়ু হইতে তাহার আয়ু পূর্ণ করিয়া দিন-যাহাতে তাহার আয়ু শত বৎসর হয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাই করিলেন এবং তাহাকে সাক্ষীও রাখিলেন। তারপর যখন আদমের আয়ু

গত হইল আল্লাহ তা'আলা তখন মৃত্যুর ফেরেশতাকে প্রেরণ করিলেন। তখন আদম (আ) তাঁহাকে বলিলেন ঃ আমার আয়ুর চল্লিশ বৎসর কি অবশিষ্ট নাই? ফেরেশতা তাঁহাকে বলিলেন ঃ আপনি কি তাহা আপনার পুত্র দাউদকে দান করেন নাই? আদম অস্বীকার করিলেন, ফলে তাঁহার সন্তানরাও অস্বীকার করে। তিনি বিস্মৃত হইলেন, তাই তাঁহার সন্তানরাও বিস্মৃত হয় (আবূ ইয়ালা, মুসনাদ, ১১খ., ৪৫৩)।

তিরমিযীর এতদসংক্রান্ত বর্ণনাটি এইরূপ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করার পর তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইলে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যাহারা সৃষ্টি হইবে তাঁহার সেই অনাগত সন্তানগণ বাহির হইয়া পড়িল। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মধ্যকার প্রতিটি মানুষের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করিলেন। তারপর সেইগুলিকে আদমের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। আদম (আ) বলিলেন ঃ প্রভু! ইহারা কাহারা? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উহারা হইতেছে তোমারই সন্তান-সন্তুতি। তিনি এক ব্যক্তির দিকে তাকাইয়া তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী জ্যোতির ঔজ্জ্বল্যে বিমোহিত হইলেন। আদম বলিলেন ঃ প্রভু! এই ব্যক্তিটি কে? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ এই ব্যক্তি হইতেছে তোমার বংশধরদের শেষ দিকের একজন, তাহার নাম দাউদ। আদম পুনরায় বলিলেন ঃ আপনি তাহার জন্য কী পরিমাণ আয়ু বরাদ্দ করিয়াছেন? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ ষাট বৎসর। আদম বলিলেন ঃ প্রভু! আমার আয়ু হইতে তাহার বয়স আরও চল্লিশ বৎসর বাড়াইয়া দিন। যখন আদমের বয়স পূর্ণ হইল, তখন তাঁহার কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা আসিলেন। তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ আমার আয়ুর চল্লিশ বৎসর কী অবশিষ্ট রহিয়া যায় নাই? ফেরেশতা বলিলেন ঃ আপনি কি উহা আপনার সন্তান দাউদকে দান করেন নাই? আদম অস্বীকার করিলেন, তাই তাঁহার সন্তানরাও অস্বীকৃতিপ্রবণ। আদম বিস্মৃত হইলেন, তাই তাঁহার সন্তানরাও বিস্মৃতিপ্রবণ।

তিরমিযী বর্ণনাটিকে হাসান সহীহ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (কাসাসুল আম্বিয়া (ইবন কাছীর), পৃ. ৪৩)। ইবন আবী হাতিম (র) হযরত আবূ হুরায়রা বর্ণিত এই রিওয়ায়াতে আরও বর্ণনা করিয়াছেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা আদমের বংশধরগণকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন ঃ ইহারা তোমার সন্তান। তখন তাহাদের মধ্যে কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগগ্রস্ত, অন্ধ এবং নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত লোকজন দেখিতে পাইয়া আদম বলিলেন ঃ প্রভু! আমার সন্তানদিগকে এইরূপ করিলেন কেন? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ যাহাতে তাহারা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে। তারপর দাউদের ঘটনাটি তিনি উল্লেখ করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৮১)।

ইমাম-আহমাদ (র) হযরত আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টির সময় তাঁহার ডান কাঁধে আঘাত করিলেন এবং এইভাবে তাঁহার শ্বেত শুভ্র একদল সন্তানকে নির্গত করিলেন। তাহাদেরকে মুক্তার ন্যায় দেখাইতেছিল। তারপর তিনি তাঁহার বাম কাঁধে আঘাত করিলেন এবং এইভাবে তাঁহার একদল কৃষ্ণকায় সন্তানকে নির্গত করিলেন। তাহাদেরকে কয়লার

ন্যায় দেখাইতেছিল। তারপর তাঁহার ডান পার্শ্ববর্তীদের সম্পর্কে বলিলেন ঃ ইহারা জান্নাতী, আমি কোনও পরোয়া করি না আর বাম পার্শ্ববর্তীদের সম্পর্কে বলিলেন ঃ 'ইহারা জাহান্নামী, আমি কোনও পরোয়া করি না।

ইব্‌ন আবিদ দুনিয়ার রিওয়ায়াতে হাসান হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁহার ডান পার্শ্বদেশ হইতে জান্নাতীগণকে এবং তাঁহার বাম পার্শ্বদেশ হইতে জাহান্নামীদেরকে নির্গত করেন। তাহারা ভূ-পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হয়। তাহাদের মধ্যে অন্ধ, বধির ও অন্যান্য ব্যাধিগ্রস্তরা ছিল। আদম (আ) বলিলেন, প্রভু! আমার সন্তানদেরকে সমান করিয়া সৃষ্টি করিলেন না কেন? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমার শুকরিয়া আদায় করা হউক উহাই আমার ইচ্ছা।

আবু হাতিম ইবন হিব্বান উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত রিওয়ায়াতে এই তথ্য আছে ঃ এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আর তখন তাঁহার হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ ছিল, তুমি তোমার ইচ্ছামত দুই হাতের একটি বাছিয়া নাও। আদম বলিলেন, আমি আমার প্রভুর দক্ষিণ হস্ত বাছিয়া লইলাম এবং আমার প্রভুর উভয় হস্তই দক্ষিণ হস্ত (তাঁহার শানের উপযুক্ত) ও বরকতময়। তারপর আল্লাহ তা'আলা উভয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। তখন উভয় হস্তে আদম ও তাঁহার সন্তান-সন্তুতিকে দেখা গেল। আদম বলিলেন, প্রভু! উহারা কাহারা? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উহারা তোমার সন্তান-সন্তুতি। প্রত্যেকটি মানুষের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাহাদের আয়ু লিপিবদ্ধ ছিল। তাহাদের মধ্যকার এক ব্যক্তিকে সর্বাধিক উজ্জ্বল দীপ্তিময় দেখা গেল। তাহার আয়ু কেবল চল্লিশ বৎসর লিখিত ছিল। আদম বলিলেন, সে কে? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তোমার সন্তান দাঊদ, আর তাঁহার আয়ু আল্লাহ তা'আলা কেবল চল্লিশ বৎসর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আদম বলিলেন, প্রভু! ইহার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিন। আল্লাহতা'আলা বলিলেন ঃ তাহার জন্য উহাই নির্ধারিত করা হইয়াছে। তখন আদম বলিলেন, আমি আমার নিজ আয়ু হইতে তাহার জন্য ষাট বৎসর দিয়া দিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উহা হইতেছে তোমার ও তাহার মধ্যকার ব্যাপার। তুমি জান্নাতে বসবাস কর। তারপর আদম আল্লাহ যত দিন চাহিলেন ততদিন জান্নাতে বসবাস করিলেন। তারপর সেখান হইতে অবতরণ করিলেন।

আদম তাঁহার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকেন। অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁহার নিকট আসিলেন। আদম তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ আপনি সময়ের পূর্বেই আসিয়াছেন। আমার জন্য তো হাজার বৎসর আয়ু বরাদ্দ করা হইয়াছে। মৃত্যুর ফেরেশতা বলিলেন ঃ হাঁ, তাহা সত্য বটে, তবে আপনি আপনার পুত্র দাঊদের জন্য তাহা হইতে ষাট বৎসর দান করিয়া ফেলিয়াছেন। আদম তাহা অস্বীকার করিয়া বসিলেন। এজন্য তাহার সন্তানদের মধ্যেও অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা দেয়। আদম বিস্মৃত হন, সুতরাং তাহার সন্তানদের মধ্যেও বিস্মৃতি প্রবণতা দেখা দেয়। সেই দিন হইতেই লিপিবদ্ধ করার এবং সাক্ষী রাখার আদেশ দেওয়া হয় (ইব্‌ন হিব্বান, হাদীছ নং ৬১৩৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ৮২)।

কিন্তু পূর্বোল্লিখিত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত অন্য হাদীছে দাঊদ (আ)-এর বয়স চল্লিশ বৎসরের স্থলে ষাট বৎসর বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

আল্লাহ্কে রব বলিয়া স্বীকারোক্তি

আল্লাহতা'আলা কুরআন শরীফে ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ...

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তাহারা বলে, হাঁ, অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রহিলাম। ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম। কিংবা তোমরা যেন না বল, আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করিয়াছে, আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করিবেন" (৭ ঃ ১৭২-৩)?

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)–কে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত আদমের পৃষ্ঠে বুলাইয়া তাঁহার সন্তানদিগকে নির্গত করেন এবং বলেন, ইহাদিগকে জান্নাতের জন্য এবং জান্নাতীদের আমলসহ সৃষ্টি করিয়াছি। তারপর তিনি পুনরায় তাঁহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া আরও অনেক বংশধরকে নির্গত করিলেন এবং বলিলেন ঃ ইহাদিগকে জাহান্নামের জন্য এবং জাহান্নামীদের আমলসহ সৃষ্টি করিয়াছি। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা হইলে আর আমল দিয়া কী হইবে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ "যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তিনি তাহাকে জান্নাতীদের আমল করার তৌফিক দেন, জান্নাতীদের আমল করা অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয় এবং উহার দ্বারাই সে জান্নাতে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে যখন তিনি কোন বান্দাকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তাহাকে তিনি জাহান্নামের আমল করার আবকাশ দেন। জাহান্নামীদের আমলে রত থাকা অবস্থায়ই সে মৃত্যুবরণ করে এবং উহার দ্বারাই সে জাহান্নামে প্রবেশ করে (আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ ইমাম মালিক সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ খ., ৮৩)।

হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর এ সংক্রান্ত বর্ণনায় আরও কিছু তথ্য রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহাদের সন্তানদিগকে নির্গত করিয়া তাহাদের সকলকে একত্র করেন, তাহাদিগকে বিভিন্নরূপ করেন, তারপর তাহাদিগকে অবয়ব দান করেন, তারপর তাহাদিগকে বাকশক্তিসম্পন্ন করেন। তাহারা বাক্যালাপ করে। তারপর তিনি তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের সত্তার উপর সাক্ষী করেন এই বলিয়া যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা সকলে বলিল ঃ হাঁ (আপনি আমাদের প্রতিপালক)।

তখন আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, আমি তোমাদের উপর সপ্ত আকাশ, সপ্ত যমীন এবং তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী রাখিতেছি, যেন কিয়ামতের দিন তোমরা বলিতে না পার যে, তোমরা ইহা জ্ঞাত ছিলে না। জানিয়া রাখ, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। আমি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নাই এবং আমার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিও না। অচিরেই আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিব। তাঁহারা তোমাদিগকে আমার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন। আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাবসমূহ নাযিল করিব। তাহারা বলিল, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আমাদের প্রভু ও মাবুদ, আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোন প্রতিপালক ও মাবুদ নাই। তাহারা সকলে ইহা স্বীকার করিল। আদম (আ)-কে তাহাদের উপর তুলিয়া ধরা হইল, তিনি তাহাদের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে ধনী-গরীব, সুশ্রী-কুশ্রী সকলকেই দেখিলেন। তিনি বলিলেন ঃ প্রভু! আপনার বান্দাদের সকলকে আপনি যদি সমান করিয়া সৃষ্টি করিতেন। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ আমি চাহিয়াছি যাহাতে (নি'মাতসমূহের জন্য) আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৮৪)।

তিনি নবীগণকে প্রত্যক্ষ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যকার কেহ কেহ উজ্জ্বল প্রদীপের মত চমকাইতেছিলেন। রিসালাত ও নবুওয়াত সম্পর্কে তাঁহাদের নিকট হইতে স্বতন্ত্র একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল, যাহা তাঁহার নিম্নোক্ত বাণীতে বিধৃত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا .

"স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম; তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার নিকট হইতেও গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার" (৩৩ ঃ ৭)।

উবাই (রা) হইতে বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া ইমাম রাযী (র) বলেন, "সেদিন আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল আদম-সন্তানকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের অবয়ব দান করেন বা শক্তিসম্পন্ন করেন। তাহারা কথা বলে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। সাথে সাথে তাহাদিগকেই তাহাদের সম্পর্কে সাক্ষী রাখেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? জবাবে তাহারা বলেন, হাঁ। এই অঙ্গীকার গ্রহণের স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে ঃ

(১) কাহারো মতে, উহা রূহের জগতে ঘটিয়াছিল;

(২) কাহারো মতে, আদম (আ)-এর দুনিয়ায় আগমনের পর উক্ত ঘটনাটি ঘটে;

(৩) কেহ কেহ আরাফাতের "নামান" নামক স্থানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ইব্ন আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহ তা'আলা নামানে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন অর্থাৎ আরাফাতে (তানযীমুল আশতাত, ১খ, পৃ. ১১৩, ইসলাহী কুতুবখানা, দেওবন্দ)। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখে (বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৮৩; ইবন আব্বাস বর্ণিত হাদীছ)।

বান্দাদেরকে সাক্ষী রাখার তৎপর্য

আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ "আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষী রাখিলেন" (৭ ঃ ১৭২)।

এই সাক্ষী রাখার ব্যাপারটি কী ছিল তাহার ব্যাখ্যা সম্পর্কেও বিভিন্ন মত রহিয়াছে। (১) কেহ কেহ ইহাকে রূপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন তাফসীর বায়যাবীতে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের কাছে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের বিবেক-বুদ্ধিতে এই যোগ্যতা ও সহজাত শক্তি প্রদান করেন যে, তাহারা আল্লাহ্র একত্ববাদ সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়। ফলে তাহারা এ সমস্ত সত্তার সমপর্যায়ে উন্নীত হইয়া যায় যাহাদিগকে আল্লাহ তা'আলা اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রভু নই?) বলার সাথে সাথে জবাব দিয়াছিল, بَلٰى (হাঁ), আপনি আমাদের প্রতিপালক! আল্লাহকে রব বা প্রতিপালকরূপে চিনিয়া লওয়ার শক্তি প্রদানের পর তাহারা যে উহাতে সক্ষম ও সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে, উহাকেই উক্ত আয়াতে اشهاد বা সাক্ষী রাখা বলা হইয়াছে। (২) অনেকের মতে এই অঙ্গীকার শাব্দিকভাবেই করা হইয়াছিল, রূপক অর্থে নহে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীছে উহাই ব্যক্ত হইয়াছে এইভাবে ঃ "নবী করীম (স) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদমের সন্তানদের নিকট হইতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে থাকা অবস্থায় অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, অতঃপর তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার সমস্ত বংশধরকে নির্গত করেন। তারপর তাঁহার সম্মুখে তাহাদিগকে ছড়াইয়া দেন। তারপর তাহাদের সহিত সামনাসামনি কথোপকথন করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নহি? তাহারা বলে, হাঁ, আমরা অবশ্যই সাক্ষী রহিলাম (সুনান নাসাঈর বরাতে বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, জিলদ ১, পৃ. ৮৩)।

সহীহ্ হাদীছের এই বর্ণনা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আসলেই আক্ষরিক অর্থে সাক্ষী রাখার ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল। তালীকুস সাবীহ ফী শারাহ মিশকাতিল মাসাবীহ গ্রন্থে এরূপই উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লামা শাব্বীর আহ্মাদ উছমানী (র) তদীয় তাফসীরে লিখেন, "সৃষ্টির উষালগ্নে প্রদত্ত সেই খোদায়ী শিক্ষার প্রভাবেই সর্বযুগের পৃথিবীর সর্বএলাকার আদম সন্তানদের মধ্যে সাধারণভাবে আল্লাহ্র প্রভুত্বের বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা বিদ্যমান দেখা যায়। ইহা সুস্পষ্ট যে, সৃষ্টির শুরুর সেই উষা লগ্নে গোটা মানবজাতিকে নিশ্চয়ই রবুবিয়তের এই আকীদা-বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল (তাফসীরে উছমানী, ৭ ঃ ১৭২ আয়াতের পাদটীকা)।

আল্লাহকে রব হিসাবে স্বীকার করিবার সেই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ আছে বলিয়াও কোন কোন মনীষী উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ "আমার সেই অঙ্গীকারের কথা সুস্পষ্ট স্মরণ আছে যে দিন আমার প্রভু পরয়ারদিগার আমার নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আমি সুস্পষ্টরূপে তাহাদিগকেও চিনিতে পারি যাহারা সেই দিন আমার ডান দিকে ও আমার বাদ দিকে উপস্থিত ছিলেন।" সাহল ইব্ন আবদুল্লাহ তস্তরী (র) বলেন, "আমি কি তোমাদের রব নহি" দিবসের সেই অঙ্গীকারের কথা আমার স্মরণ আছে (আল- ইয়াওয়াকীতুল জাওয়াহির গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত রহিয়াছে)।

হযরত যুন্-নূন মিসরী (র)-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "উহা যেন এখনও আমার কানে বাজিতেছে।" কেহ কেহ তো উহাকে এমনি ঘটনা বলিয়া ধারণা করিয়াছেন যেন উহা মাত্র গতকল্য ঘটিয়াছে (তাফসীর রূহুল মাআনী, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে)।

একটি সংশয় নিরসন

'আলাস্তু বিরাব্বিকুম' দিবসের আলোচনাসম্বলিত আয়াত ও হাদীছের বর্ণনায় বাহ্যত একটি বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়, যাহাতে সাধারণ পাঠকগণ বিভ্রান্ত হইতে পারেন। ব্যাপারটি এই যে, আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, আদম সন্তানদিগকে আদম সন্তানদেরই পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত করা হইয়াছিল (দ্র. ৭ ঃ ১৭২)। পক্ষান্তরে হাদীছের বর্ণনায় আছে ঃ "অতঃপর তিনি আদমের পৃষ্ঠদেশে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া দিলেন এবং তাঁহার মধ্য হইতে তাঁহার বংশধরগণকে নির্গত করিলেন"। তাহা হইলে ব্যাপারটি আসলে কী ঘটিয়াছিল? আদম সন্তানদিগকে আদমেরই পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত করা হইয়াছিল, নাকি তাহাদেরই পরস্পরের পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত করা হইয়াছিল?

প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা এই যে, আদম (আ)-এর প্রত্যক্ষ সন্তান অর্থাৎ তাঁহার নিজ পুত্র-কন্যাগণকে তাঁহারাই পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত করা হয়। এভাবে ধারাবাহিকতাসহ সকলেই সকলের পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে নির্গত হয়। তাই কুরআন ও হাদীছের উভয় বর্ণনাই সঠিক। সর্বপ্রথম নির্গমন যেহেতু আদমেরই পৃষ্ঠদেশ হইতে হইয়াছিল তাই হাদীছে সেভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে আয়াতের বর্ণনায় মধ্যবর্তী সন্তানদের মধ্য হইতে পরবর্তী সন্তানদের নির্গমনের উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনই বৈপরিত্য নাই। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র) প্রণীত হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগা এবং আল-ইয়াওয়াকীত ওয়াল-জাওয়াহির প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে (তালীসকু সাবীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ-এর বরাতে তানযীমুল আশতাত-হাল্লি আবীসাতিল মিশকত, ১ খ., ১১৫)।

ইবন কাছীর (র) হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে ষাট হাত উচ্চতাবিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করেন। তারপর কমিতে কমিতে মানবাকৃতি আজিকার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে (বুখারী ও মুসলিমের বরাতে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৮৫)।

এক বর্ণনা হইতে জানা যায়, তাঁহার দেহের প্রস্থ ছিল সাত হাত (আহমাদ, ২ থ., ৫৩৫)। এতদ্ব্যতীত এক রিওয়ায়াতে তো স্পষ্টভাবে আছে, ستون ذراعافى السحاد ষাট হাত উর্ধদিকে)। হযরত শায়খ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেন ঃ আদম (আ)-এর এই দৈহিক উচ্চতা বেহেশতে ছিল। যখন তাঁহাকে পৃথিবীতে নামাইয়া দেওয়া হয় তখন তাহা সঙ্গতভাবে হ্রাস করিয়া দেওয়া হয় (বদরে আলম মীরাঠী, তর্জমানুস্ সুন্নাহ, ১খ, ৪৬৯, ইফাবা প্রকাশিত)।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত ঃ "পৃথিবীতে আদম (আ)-এর সর্বপ্রথম খাদ্য ছিল গম। জিবরাঈল (আ) তাঁহার কাছে সাতটি গমের দানাসহ উপস্থিত হন। আদম (আ) তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ উহা কি? জিবরাঈল (আ) বলিলেন ঃ উহা সেই নিষিদ্ধ ফল যাহা ভক্ষণ করিতে বেহেশতে আপনাকে বারণ করা হইয়াছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনি তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ উহা দ্বারা আমি কী করিব? জবাবে জিবরাঈল (আ) বলিলেন ঃ উহা আপনি ভূমিতে বপন করিবেন। সে মতে তিনি তাহা বপন করেন। এই বর্ণনায় আছে ঃ ঐ দানাসমূহের প্রত্যেকটির ওজন ছিল লক্ষ দানার চেয়েও বেশী। ঐ দানাগুলি বপনের পর ফসল উৎপন্ন হয়, তিনি উহা কর্তন করিয়া ঘরে উঠান, মাড়াইয়া পিষিয়া আটা বানান। অতঃপর মণ্ড বা খামীর করিয়া রুটি প্রস্তুত করেন। এইভাবে বহু রকম ক্লেশ ও পরিশ্রমের পর উহা ভক্ষণ করেন (তারীখ তাবারী, ১খ, ১২৮)। ইহাই ছিল আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ব-সতর্কবাণীর তাৎপর্য ,যাহাতে তিনি আদম (আ)-কে বলিয়া দিয়াছিলেন ঃ

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ·

"শয়তান যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাইবে।"

ইবন আসাকির কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীছ হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "আদম ও হাওয়াকে পৃথিবীতে একত্রে নামাইয়া দেওয়া হয়। তখন তাঁহাদের পরণে ছিল জান্নাতের বৃক্ষপত্র। একত্র হওয়ার পর উত্তাপক্লিষ্ট আদম বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হাওয়াকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ হে হাওয়া! তাপ আমাকে ক্লিষ্ট করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তখন জিবরাঈল তুলা লইয়া আসিয়া হাওয়াকে উহা দ্বারা সূতা কাটিতে বলেন এবং উভয়কে কাপড় বয়ন শিখাইয়া দেন (আল-বিদায়া ও ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৭৪)। এইভাবে পৃথিবীতে তাঁহাদের বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রথম পরিহিত পোশাক ভেড়ার লোমের দ্বারা নির্মিত ছিল বলিয়া অন্য রিওয়ায়াতে উল্লিখিত হইয়াছে! প্রথমে ভেড়ার দেহ হইতে পশম খসাইয়া তারপর উহা হইতে সূতা কাটেন। তারপর আদম (আ) তাঁহার নিজের জন্য একটি জোব্বা এবং হাওয়া (আ)-এর জন্য একটি কামীস ও একটা ওড়না তৈয়ার করেন" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ, ৮৫)।

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ·

আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেনঃ জান্নাতের যে বৃক্ষপত্রে আদম ও হাওয়া (আ) সর্বপ্রথম লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, উহা ছিল ডুমুর বৃক্ষের পত্র (৭ ঃ ২২ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে)। ইবন কাছীর এই বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন, সম্ভবত উহা আহলে কিতাবগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য। আয়াতের বাহ্যিক অর্থ সুনির্দিষ্ট কোন বৃক্ষের প্রতি ইঙ্গিতবহ নহে, ব্যাপক অর্থে উহা ব্যবহৃত। আর উহা মানিয়া লইলেও কোন ক্ষতি নাই। আল্লাহই সম্যক অবগত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৭৩)।

আদম ও হাওয়া (আ) জান্নাতে কোন সন্তান লাভ করিয়াছিলেন কি না তাহা লইয়া মতানৈক্য রহিয়াছে। ইবন কাছীর (র) বলেন ঃ জান্নাতে ঐ দম্পতি যুগলের কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল

কিনা তাহা লইয়া সীরাতবিদগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন ঃ জান্নাতে তাঁহাদের কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই। আবার অন্যরা বলিয়াছেন ঃ না, বরং সেখানেই তাঁহাদের সন্তানের জন্ম হইয়াছে। কাবিল এবং তাহার ভগ্নীটির জন্ম জান্নাতেই হইয়াছিল।

ইমাম ইবন জারীর তাবারী (র) তদীয় ইতিহাস গ্রন্থে হাওয়ার গর্ভে বিশ দফায় চল্লিশজন সন্তানের জন্মগ্রহণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন ইসহাক তাহাদের নামসমূহও বর্ণনা করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৮৯; আল-কামিল ফিত-তারীখ, ১খ, ৪২)। আবার কহে কেহ এক শত কুড়ি দফায় প্রত্যেক দফায় একজন পুত্র সন্তান ও একজন কন্যা সন্তান মোট দুই শত চল্লিশজন সন্তানের জন্ম লাভের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বপ্রথম দফায় কাবীল এবং তাহার যমজ ভগ্নী একলীমা এবং সর্বশেষ দফায় আবদুল মুগীছ এবং তদীয় যমজ ভগ্নী উম্মুল মুগীছ জন্মগ্রহণ করেন। তারপর ক্রমান্বয়ে তাহাদের সন্তান-সন্তুতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যাহার কথা আল্লাহ তা'আলা ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাবে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۔

"হে মানব! তোমারা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন" (৪ ঃ ১)।

ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, চারি লক্ষ সন্তান-সন্তুতি ও অধস্তন বংশধর না দেখিয়া আদম (আ) এই পৃথিবী হইতে বিদায় নেন নাই (কাসাসুল আম্বিয়া, ইবন কাছীর, পৃ. ৫৭)। তাঁহার এই সন্তান-সন্তুতির মধ্যে তাঁহার পুত্র শীছ (আ) ছিলেন অনন্য মর্যাদার অধিকারী। হাবীলের নিহত হওয়ার পর আদম (আ) এতই ভাঙ্গিয়া পড়েন যে, আওযাঈ-হাস্‌সান-ইবন আতিয়্যা বর্ণিত রিওয়ায়াতে আছে ঃ আদম (আ) জান্নাতে অবস্থান করেন এক শত বৎসর। বর্ণনান্তরে ষাট বৎসর; জান্নাত হারানোর দুঃখে আক্ষেপ করিয়া কান্নাকাটি করিয়া কাটান চল্লিশ বৎসর (ইব্‌ন আসাকিরের বরাতে কাসাসুল আম্বিয়া, ইবন কাছীর প্রণীত, পৃ. ২৯)।

শীছ শব্দের অর্থ هبة الله বা আল্লাহ্‌র দান। পুত্র বিরহে শোকাতুর আদম (আ) আল্লাহ্‌র এই দান পাইয়া অনেকটা শান্ত হইয়াছিলেন। এই শীছ (আ) পরবর্তীতে আসমানী গ্রন্থধারী রাসূলও হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মর্যাদা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল।

আদম (আ)-এর পুত্র শয়তানের দাস?

আদম-হাওয়া (আ)-এর সন্তান-সন্তুতির আলোচনা প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ বর্ণিত এক হাদীছে আছে, হুযূর (স) বলেন ঃ হাওয়ার সন্তানগণ বাঁচিত না। একবার হাওয়ার গর্ভে

সন্তান আগমন করিলে শয়তান তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, তুমি উহার নাম আবদুল হারিছ রাখিয়া দাও। তাহা হইলে সে বাঁচিবে। সে মতে তিনি তাহার আবদুল হারিছ বলিয়া নামকরণ করিলেন এবং সত্য সত্যই এই সন্তানটি বাঁচিয়া যায়। উহা ছিল শয়তানের প্ররোচনা ও নির্দেশ (কাসাসুল আম্বিয়া (উর্দু খুলাসাতুল আম্বিয়ার অনুবাদ), গদ্যানুবাদ মোহাম্মদ হাসান এফ.এম.এম.এ, বি-এড, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আন্দর কিল্লা চট্টগ্রাম, ১ম প্রকাশ ১৯৪, পৃ. ৪৫; আহমদ ৫খ, ১১)।

তিরমিযী, ইবন জারীর, ইবন আবী হাতিম, ইবন মারদূয়ায়হ প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ ও মুফাসসিরও তাঁহাদের তাফসীরে এই হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। হাকেম ও তদীয় 'মুস্তাদরাক' কিতাবে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাকেম তো রীতিমত উহার "সনদ সহীহ, যদিও বুখারী মুসলিম (র) উহা রিওয়ায়াত করেন নাই" বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিরমিযী বলিয়াছেন ঃ হাদীছটি হাসান-গরীব পর্যায়ের, উমার ইবন ইবরাহীমের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে উহা আমরা প্রাপ্ত হই নাই। কেহ কেহ আবদুস সামাদ সূত্রে বর্ণনা করিলেও উহাকে মারফূ' পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেন নাই অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীরূপে নহে, সাহাবীর উক্তিরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন (তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৭৭)। আল্লামা ইবন কাছীর (র) হাদীছটির সূত্র সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত টানিয়াছেন এইভাবে ঃ স্পষ্টতই উহা কা'ব আহবার সূত্রে প্রাপ্ত, স্পষ্টতই রাবী উহা ইসরাঈলী উপাখ্যান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৮৯)। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনার কারণ হইতেছে হারিছ শয়তানের একটি নাম। তাই আবদুল হারিছ অর্থ শয়তানের দাস। আল্লাহ্র খিলাফতের মর্যাদা লাভকারী এবং শয়তানের তাযিমী সিজদাপ্রাপ্ত সম্মানিত আদম (আ)-এর সন্তানের এরূপ নামকরণ সহজে মানিয়া লওয়া যায় না।

এজন্য হাসান বসরী (র), যে সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্ত হাদীছ বলিয়া কথিত রিওয়ায়াত বর্ণনা করা হইয়াছে, সেগুলির ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যদি উক্ত বর্ণনাটিকে মরফূ' হাদীছ বলিয়া মানিয়া লইতেন তাহা হইলে ভিন্নতর ব্যাখ্যার আশ্রয় লইতেন না।

আল্লামা ইবন কাছীর (র) একটি যুক্তির দ্বারাও উক্ত বর্ণনাটির মারফূ' হাদীছ হওয়ার বিষয়টি নাকচ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি হইল ঃ আল্লাহ তা'আলা অদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে মানব জাতির উৎসমূলরূপে এবং তাঁহাদের দ্বারা অগণিত মানব-মানবী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন। এমতাবস্থায় হাওয়ার সন্তান বাঁচিত না তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে! নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, উহাকে নবী করীম (স)-এর হাদীছ বলাটা ভ্রম প্রমাদ, ইহাকে মওকূফ বা সাহাবীর উক্তি আখ্যা দেওয়াই বিশুদ্ধতর। আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে উহাই লিখিয়াছি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৯০)।

হাবীল-কাবীলের ঘটনা ঃ পৃথিবীর প্রথম নরহত্যা

কুরআন শরীফে হাবীল-কাবীলের ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবৃত হইয়াছে। কেননা ইহাই ছিল পৃথিবীতে হানাহানি ও ভ্রাতৃ-হননের সর্বপ্রথম ঘটনা।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আদি মাতা হাওয়া (আ) প্রতিবারে দুইজন করিয়া সন্তান প্রসব করিতেন। উহাদের একজন পুত্র সন্তান এবং অন্য জন কন্যা সন্তান।

ফার্সী 'খুলাসাতুল আম্বিয়া' অবলম্বনে রচিত উর্দু কাসাসুল আম্বিয়া কিতাবের (মূল ফার্সী ভাষ্য হাজী মুহাম্মদ সাঈদ, উর্দু গ্রন্থাবলীর বিখ্যাত প্রকাশক, খালাসীটোলা, কোলকাতা, উর্দু ভাষ্য তদীয় পুত্র হাজী মুহাম্মদ শফী'র এবং অপর উর্দু ভাষ্যটি গোলাম নবী কুমিল্লায়ী, প্রকাশক অধুনালুপ্ত কুরআন মঞ্জিল, বাবু বাজার, ঢাকা, বাংলা কাসাসুল আম্বিয়া পুঁথি উহা অবলম্বনেই রচিত। —জালালাবাদী)। বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আদম (আ) ও হাওয়া দম্পতি ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস শুরু করিলে হাওয়া গর্ভবতী হন এবং প্রথমবারের মত একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেন। পুত্রটির নাম রাখা হয় কাবীল এবং কন্যাটির নাম রাখা হয় একলিমা। কন্যাটি অত্যন্ত রূপবতী ছিল। দ্বিতীয় দফায় তাঁহার গর্ভে যে যমজ পুত্র-কন্যার জন্ম হয় তাহাদের নাম রাখা হয় যথাক্রমে হাবীল ও গাযা। গাযা ততটা রূপবতী ছিল না। তাহাদের যখন বিবাহের বয়স হইল তখন একদা হযরত জিবরাঈল (আ) আদম (আ)-এর নিকট আগমন করিয়া বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি সালাম জানাইয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে, আপনি যেন হাবীলের সাথে কাবীলের যমজ ভগ্নির এবং কাবীলের সাথে হাবীলের যমজ ভগ্নির বিবাহের ব্যবস্থা করেন। সেমতে আদম (আ) তাঁহার উভয় সন্তানকে ডাকিয়া আল্লাহ্র নির্দেশের কথা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেন। কিন্তু কাবীল বাঁকিয়া বসিল এবং সে তাহার রূপবতী যমজ ভগ্নি একলিমাকে কোনমতেই হাতছাড়া করিতে রাজি হইল না। সে বলিল, আপনি যেহেতু হাবীলকে অধিক ভালবাসেন এইজন্য এরূপ বলিতেছেন। এইভাবে সর্বপ্রথম কাবীলই পৃথিবী বক্ষে পিতৃ-আদেশ অমান্য করিল। কিন্তু আদম (আ) তাহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া শেষ পর্যন্ত হাবীলের সহিত একলিমার বিবাহ দেন। কাবীল তাহাতে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে এবং হাবীলকে চাপ দিতে থাকে যেন তিনি একলিমাকে তালাক দেন, যাহাতে সে একলিমাকে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু হাবীল কোনক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, একলিমা আমার বৈধ স্ত্রী। আমার পিতা আল্লাহ্র হুকুমে আমার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন। এমতাবস্থায় কোনক্রমেই আমি পিতৃ আদেশ ও আল্লাহ্র আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারি না। যখন তাহাদের এই বাদানুবাদের কথা আদম (আ)-এর কর্ণগোচর হইল তখন তিনি তাহাদের সান্ত্বনার জন্য উভয়কে আল্লাহ্র দরবারে কুরবানী পেশ করিতে নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে বলিয়া দিলেন, যাহার কুরবানী আল্লাহ্র দরবারে কবুল হইবে, একলিমা তাহারই অধিকারে থাকিবে। সে মতে হাবীল একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা এবং কাবীল কিছু নিকৃষ্ট শস্য কুরবানীরূপে উৎসর্গ করিয়া মিনার পাহাড় শীর্ষে রাখিয়া দিলেন, যাহার বর্ণনা রহিয়াছে কুরআনের এই আয়াতে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ٠

"আদমের দুই পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাহাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করিয়াছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হইল এবং অন্য জনের কবুল হইল না" (৫ ঃ ২৭)।

মোটকথা, উভয় ভ্রাতাই কুরবানী করিলেন এবং মিনার পাহাড় চূড়ায় নিজ নিজ কুরবানী রাখিয়া তাহা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেন। এমন সময় ধুম্রবিহীন একটি আগুনের হল্কা আসিয়া উট পাখির মত হাবীলের কুরবানীকে গ্রাস করিল। কাবীলের কুরবানী সেখানে পড়িয়াই রহিল। তখন কাবীল হাবীলের প্রতি আরও ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল ঃ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ "আমি অবশ্যই তোকে হত্যা করিব"। এবারে হাবীল বলিলেন, اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন"। উহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া কাবীল হাবীলকে হত্যা করে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৯৩)।

কাহিনী আকারে উপরে উদ্ধৃত হাবীল-কাবীলের সংঘাতের উক্ত ঘটনা এইরূপই বাংলা, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় 'কাসাসুল আম্বিয়া'র বদৌলতে লোকায়ত সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। পুঁথি সাহিত্য ছাড়াও অধুনা প্রকাশিত পুঁথিভিত্তিক গদ্য পুস্তকাদিতেও উক্ত কাহিনীর এই বিবরণ দেশব্যাপী প্রচারিত হইতেছে (দ্র. আদি ও আসল কাছাছুল আম্বিয়া, কৃত এম. এন. ইমদাদুল্লাহ্, এম. এ., বি.এ. অনার্স, রয়েল সাইজে ২ খণ্ডে প্রকাশিত, ৬৪০ পৃষ্ঠা কলেবর, প্রকাশক বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিমিটেড, ৬. প্যারীদাস রোড, ঢাকা)। কিন্তু মৌলিক তাফসীর, হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহের বর্ণনার আলোকে পর্যালোচনা না করিলে মূল বক্তব্য যথার্থ হইলেও উহাকে কাহিনীসুলভ অতিরঞ্জনের ছাপ রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা, তাফসীর তাবারী, ইবন কাছীর (র) কৃত বিশ্বকোষ পর্যায়ের ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' প্রভৃতি গ্রন্থে হাবীলের সহিত একলিমার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

সুদ্দী, আবু মালিক, ইবন আব্বাস ও ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, কাবীল বয়সে হাবীলের চাইতে বড় ছিল। যমজ ভগ্নির রূপে বিমোহিত হইয়া সে বিবাহের ব্যাপারে পিতৃ-আদেশ অমান্য করে এবং তাহাকে বিবাহের ব্যাপারে নিজের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালায়। আদম (আ) তাহাদের উভয়কে কুরবানী করার পরামর্শ বা আদেশ দেন। তারপর তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় চলিয়া যান।

আদম (আ) মক্কায় চলিয়া যাওয়ার পর হাবীল-কাবীল দুই ভাই কুরবানী দেন। হাবীলের অনেক মেষ ছাগল ছিল। তিনি একটি হৃষ্টপুষ্ট পশু কুরবানী দিলেন। পক্ষান্তরে কাবীল তাহার ক্ষেতের নিম্ন মানের এক আঁটি ফসল উৎসর্গ করিল। আকাশ হইতে আগুন আসিয়া হাবীলের কুরবানীকে গ্রাস করিল, কিন্তু কাবীলের উৎসর্গীকৃত ফসল পড়িয়া রহিল। আগুন তাহা স্পর্শ করিল না। তখন কাবীল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং বলিল, আমি তোমাকে হত্যা করিব যাহাতে তুমি আমার ভগ্নিকে বিবাহ করিতে না পার (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ম জিলদ, পৃ. ৮৬; তাফসীর তাবারী, ৬খ, পৃ. ১৯১)।

এই উক্তি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, একলিমার সাথে হাবীলের বিবাহ হয় নাই। রাবী আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, "আল্লাহ্র কসম! নিহত ব্যক্তি (অর্থাৎ হাবীল) তাহাদের উভয়ের মধ্যে

অধিকতর বলিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তাহার সংযম তাহাকে ভ্রাতার উপর হাত তোলা হইতে বিরত রাখে (প্রাগুক্ত)।

আবু জাফর বাকির (র)-এর এক বর্ণনামতে, আদম (আ)-এর উপস্থিতিতেই তাঁহার উক্ত পুত্রদ্বয়ের কুরবানী প্রদান এবং হাবীলের কুরবানী কবুল হওয়ার ও কাবীলের কুরবানী কবুল না হওয়ার ঘটনা ঘটে এবং তিনি তাহা অবলোকনও করিয়াছিলেন। এই সময় কাবীল তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া বলে, আপনি তাহার পক্ষে দু'আ করিয়াছেন বলিয়াই তাহার কুরবানী কবুল হইয়াছে, আমার পক্ষে দু'আ করেন নাই বলিয়া আমার কুরবানী কবুল হয় নাই। ঐ সময়ই সে হাবীলকে হত্যার হুমকি দেয়।

হাবীল নিজেকে নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিয়া বলেন, তোমার কুরবানী কবুল না হওয়ার জন্য আমি দায়ী নই। আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি কেবল মুত্তাকী লোকদের কুরবানী কবুল করেন। আল্লাহ ভীতির পথ অবলম্বন করিলে তোমার কুরবানীও কবুল হইত। তুমি তাহা কর নাই। তাই তোমার কুরবানী কবুল হয় নাই। ইহাতে আমার কী অপরাধ (তাফসীর মাআরিফুল কুরআন, ১ম জিলদ, মুফতী মুহাম্মদ শফী, সূরা মায়িদার ২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

আল্লাহ্র আদেশ শরীয়তের বিধান সকলের শিরোধার্য হওয়া উচিত—স্বয়ং পিতার মুখে তাহা শুনিয়াও কাবীল তাহা গ্রাহ্য করে নাই। আদম (আ) কেবল পিতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আল্লাহ্র প্রথম নবীও। তাই শুধু পিতারূপে আদেশ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, নবীসুলভ প্রজ্ঞাও তিনি এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন এবং কুরবানী প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের সমান সুযোগ উভয় পুত্রকেই প্রদান করেন। সে পরীক্ষায়ও যখন কাবীল উত্তীর্ণ হইতে পারিল না, বরং তাহার চক্ষের সম্মুখেই হাবীলের কুরবানী কবুল হইল এবং নিজের অগ্রহণযোগ্যতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন তাহার সংযত ও নিবৃত্ত হইয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সে নিবৃত্ত হইল না, বরং রাগে, ক্ষোভে ও অপমানে তাহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল। তাহার মধ্যে জিঘাংসা ও পশুপ্রবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। সে পিতার সম্মুখেই আপন সহোদর ভাইকে হত্যার প্রকাশ্য হুমকি দিয়া বসিল ঃ لَاَقْتُلَنَّكَ 'আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করিব।'

এই ক্ষেত্রে হাবীলের যেহেতু কোন অপরাধ ছিল না, তাই তিনি পাল্টা রাগ করিয়া তাহার চাইতে দুর্বলতর প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন মুত্তাকী, পিতৃভক্ত, সচ্চরিত্রের অধিকারী। তিনি অত্যন্ত সংযতভাবে বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় কুরবানী কবুল হওয়া না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া ভাইকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। পরোক্ষে অগ্রজকে আল্লাহভীতি অবলম্বনের আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু কাবীলের জিদ আরও বৃদ্ধি পাইল। অগত্যা হাবীল তদীয় অগ্রজের এই সীমালঙ্ঘন ও তাহার প্রাণসংহারী প্রচেষ্টার মুখেও চরম ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিবেন বলিয়া নিজের সংকল্পও ঘোষণা করিলেন এইভাবে ঃ "আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুলিলেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলিব না; আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি" (৫ ঃ ২৮)।

কিন্তু এতসব উপদেশ সত্ত্বেও কাবীলের পাপাচারী মন টলিল না। সে তাহার সংকল্পে অটল থাকিল। সর্বশেষে তিনি তাহাকে জাহান্নামের শাস্তির কথাটাও স্মরণ করাইয়া দিলেন ঃ "তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং অগ্রবর্তী হও, ইহাই আমি চাহি এবং ইহা যালিমদের কর্মফল" (৫ ঃ ২৯)।

কিন্তু তারপরেও কাবীল নিবৃত্ত হইল না। "অতঃপর তাহার চিত্ত ভ্রাতৃ হত্যায় তাহাকে প্ররোচিত করিল। ফলে সে তাহাকে হত্যা করিল। তাই সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল" (৫ ঃ ৩০)।

সেই ক্ষতির পরিমাণ যে কী বিপুল হযরত ইবন মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীছে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এইভাবে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتل .

"রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, অন্যায়ভাবে নিহত প্রত্যেকটি ব্যক্তির একটি দায়ভাগ আদমের প্রথম সন্তানটির উপর বর্তায়। কেননা হত্যার রীতি সেই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়াছিল" (আহ্মাদ, জিলদ ১, পৃ. ৩৮৩, ৪৩০ ও ৪৩৩)। এই ব্যাপারে কুরআন শরীফেও সতর্কবাণী রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ·

"নরহত্যা অথবা দুনিয়া ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করিল" (৫ ঃ ৩২)।

হাবীল-কাবীলের মনোমালিন্যের কারণ

কুরআন মাজীদে আদমের দুই পুত্রের বিবরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তাহাদের এক ভাই অপর ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। এমনিভাবে কোন কোন হাদীছে ও (উদাহরণস্বরূপ দ্র. আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, আত-তাবারী, তাফসীর, কায়রো সং, ১০খ, ২৩০; রিওয়ায়াত ১১৭৬৭-১১৭৬৯) 'ইবনায় আদাম' বা আদমের পুত্রদ্বয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও মুফাস্সিরগণ ইহা দ্বারা হযরত আদম আলায়হিস সালামের দুই পুত্র হাবীল (নিহত) এবং কাবীল (হন্তা)-কেই বুঝান হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খুব সম্ভব এই ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের তথ্যসূত্র হইল ইসরাঈলী রিওয়ায়াত, বিশেষত তাওরাত (দ্র. বাইবেলের আদিপুস্তক, ৪ ঃ ১০-১৬ প্রভৃতি)। সেখানে তাহাদের নাম হাবীল ও কাবীল বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে (দ্র. আদিপুস্তক, ৪ ঃ ১-১৬)। উহাকেই 'আরবীকরণের সময়ে হাবীল ও কাবীলরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই আত-তাবারী তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে প্রত্যেক জায়গায়ই কাবীলকে কাইনরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন (আত-তাবারী, তারীখ, নির্ঘণ্ট)। কোন কোন মুফাস্সির (যথা হাসান ও দাহহাক প্রমুখ) ابنى ادم কথাটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়া উহা

দ্বারা বানূ ইসরাঈল-এর ঘটনা বুঝানো হইয়াছে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (দ্র. আত-তাবারী, তাফসীর, গবেষণা সম্পা. মাহমূদ শাকির, কায়রো, ১০খ, ২২০, রিওয়ায়াত ১১৭২১; আর-রাযী, তাফসীর কাবীর, কায়রো ১৩১৮ হি, ৩খ, ৪০২; আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৬খ, ১১১)। কিন্তু সাহাবী, তাবিঈ ও মাফাস্সিরগণের অধিকাংশের মত হইল, উক্ত কথাটি দ্বারা হযরত আদম (আ)-এর ঔরসজাত দুই পুত্রকেই বুঝানো হইয়াছে (দ্র. আত-তাবারী, ১০খ, ২২০)। স্বয়ং কুরআন-হাদীছের কিছু বর্ণনা (কাক প্রেরণ করা প্রভৃতি) দ্বারা ইহার সমর্থন পাওয়া যায় (প্রাগুক্ত বরাত)।

কুরবানীর কারণ সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। স্বয়ং কুরআন মাজীদে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয় নাই, বরং اذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا "উভয়ে যখন নিজ নিজ কুরবানী পেশ করিয়াছিল" (৫ঃ৮২)-এর দ্বারা বাক্য শুরু করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, উভয়ের মধ্যে কুরবানী কবুল হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। আত-তাবারী বিভিন্ন সাহাবী (রা) ও তাবিঈ (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই কুরবানী তাহারা স্বেচ্ছায় অথবা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের আওতাধীনে করিয়াছিলেন (আত-তাবারী, ১০খ, পৃ. ২০৩-এর বরাতে ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫খ, পৃ. ২৩৬)। মওলানা হিফযুর রহমানও কুরআনে তাহাদের বিবাহ কাহিনীর কোন উল্লেখ না থাকার কথাটা উল্লেখ করিয়া উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের মনোমালিন্যের কারণ যে বিবাহ না হইয়া কেবল কুরবানী কবুল হওয়া না হওয়া জনিত মনোমালিন্যও হইতে পারে সে দিকেই প্রকারান্তরে ইঙ্গিত করিয়াছেন (দ্র. কাসাসুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ, ১খ, ৫৬)।

কাবীল কর্তৃক ভাইকে হত্যা

কাবীলের মনে ভ্রাতৃ-হত্যার জন্য জিঘাংসাভাব জাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু ইতোপূর্বে হত্যাকর্ম তো পৃথিবীতে আর কোন দিন ঘটে নাই। তাই হত্যার প্রক্রিয়াও তাহার জানা ছিল না। কীভাবে তাহার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিবে এইজন্য তাহার চিন্তার অবধি ছিল না। এমতাবস্থায় ইবলীস উপস্থিত হইল। মুহূর্তে সে একটি মানুষের রূপ ধারণ করিয়া কাবীলের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিতে লাগিল এবং কাবীলের দৃষ্টির অগোচরে একটি কৃত্রিম সাপ বানাইয়া পথের উপর ছাড়িয়া দিল। সাপটি ধীরে ধীরে মানবরূপী ইবলীসের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অমনি সে যমিন হইতে বৃহৎ একখণ্ড পাথর উঠাইয়া সর্পের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। পাথরের আঘাতে তৎক্ষণাৎ সর্পটি মারা গেল। ইহা কাবীলের চোখের সম্মুখেই ঘটিল। ইব্ন জুরায়জের বর্ণনায় সাপের স্থলে পাখির কথা উল্লেখ রহিয়াছে (তাফসীর মাযহারী, ৩খ, পৃ. ৮১)।

কাবীলের সমস্যা দূরীভূত হইয়া গেল। হত্যা করিবার উপায় সে শিখিয়া ফেলিল। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া সে নিজেও বৃহদাকার পাথর হাতে লইয়া ঘুমন্ত হাবীলের মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। সঙ্গে সঙ্গে হাবীলের মৃত্যু ঘটিল। কাসাসুল আম্বিয়ার বর্ণনামতে, এই ঘটনাটি ঘটে হযরত আদম (আ)-এর মক্কা শরীফে হজ্জ করিতে যাওয়াকালীন অনুপস্থিতির সুযোগে। কিন্তু ইব্ন কাছীর (র)-এর বর্ণনায় উহা ঘটে হযরত আদম (আ)-এর আপন বাড়িতে উপস্থিত

থাকাকালে। তাঁহার বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে ঃ "একদা রাত্রিবেলা যখন হাবীলের চারণভূমি হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইতেছিল, তখন চিন্তিত পিতা আদম (আ) কি কারণে বিলম্ব হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য কাবীলকে চারণভূমিতে পাঠাইলেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৮৬; কাসাসুল আম্বিয়া, আরবী, ইব্ন কাছীর, পৃ. ৫৩)।

সেমতে কাবীল চারণভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন সত্য সত্যই হাবীল সেখানেই ছিলেন। কাবীল তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার কুরবানী কবুল হইল, আমারটা হইল না।

জবাবে হাবীল বলিলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ·

"আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ হইতেই কবুল করিয়া থাকেন।"

তিনি এই বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তাকওয়া হইতেছে কবুলিয়তের পূর্বশর্ত। তুমি যদি তাকওয়া অবলম্বন করিয়া কবুলিয়তের সেই পূর্বশর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ হও, তবে তাহাতে আমার অপরাধ কি? কাবীলের কাছে উহার কোন সদুত্তর ছিল না। এইজন্য লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে তাহার ক্রোধ ও জিঘাংসাই বৃদ্ধি পায় এবং হস্তস্থিত একটি লৌহদণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করে।

ইব্ন কাছীর (র)-এর বাকভঙ্গি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উহা সর্ববাদীসম্মত মত নহে। তাই তিনি আরও লিখেন, কাহারও কাহারও মতে সে তাহার দিকে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে যাহা তাহার মস্তিষ্কে পতিত হইয়া তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে। তখন হাবীল নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, বরং সে তাহাকে সজোরে গলা চাপিয়া ধরিয়া শ্বাসরুদ্ধ করে এবং তারপর হিংস্র প্রাণীদের মত কামড়াইয়া তাঁহার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলে। এইভাবে হাবীলের মৃত্যু হয়। আল্লাহই সম্যক অবগত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৮৬)।

দামিশকের উত্তরে অবস্থিত কাসিউন পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহাকে রক্ত গুহা বলিয়া অভিহিত করা হইত। বর্তমানে ইহা "আরবাঈন" নামে পরিচিত। কাবীল হাবীলকে উক্ত স্থানে হত্যা করিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি রহিয়াছে। এই জনশ্রুতির কথা আহলে কিতাব সূত্রে প্রাপ্ত। উহা কতটুকু সত্য তাহা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

হাফিয ইব্ন আসাকির (র) তদীয় গ্রন্থে 'আহমাদ ইব্ন কাছীর' (র)-এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে একটি আশ্চর্যজনক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'তিনি (আহমদ ইবন কাছীর) একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদা নবী করীম (স) আবু বাক্র (রা) ও হাবীলকে স্বপ্নে দেখেন। তিনি ঐ সময় হাবীলকে আল্লাহ্র নামে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, সত্য সত্যই ঐ স্থানটি তাঁহার হত্যাস্থল কিনা? তিনি শপথ পূর্বক তাহা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, তিনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানটিকে যেন তিনি দু'আ কবুলের স্থানরূপে গ্রহণ করিয়া লন। আল্লাহ তাআলা তাহার সেই দুআটি কবুলও করেন। হাফিয ইবন কাছীর (র) মন্তব্য করেন যে, ইহা একটি স্বপ্নমাত্র (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৮৭)।

হাবীলকে হত্যার পরিণতিতে কাবীলের কি সর্বনাশ সাধিত হইল তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের বাণী ঃ

فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۔

"ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইল"। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সায়্যিদ কুতব শহীদ বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ধ্বংসের গহ্বরে নিপতিত হইল। নিজের সাহায্যকারী ও সাথী ভাইকে হারাইল। কেননা খুনীর জীবন কখনও সুখের হয় না। সে আখিরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ফলে সে হত্যা সংক্রান্ত তাহার প্রথম পাপ ও পরবর্তীতে পাপে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। অতঃপর তাহার অপরাধের ফলশ্রুতিতে মৃত ভাইয়ের শবদেহ পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইয়া অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিল। আল্লাহ তা'আলার সুগভীর প্রজ্ঞা সেই দুর্ধর্ষ খুনীর সম্মুখে তাহার একটি অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া দিল। সে ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন-কাফনে অক্ষম হইয়া পড়িল, এমনকি ক্ষুদ্র কাক যাহা পারে তাহাও সে পারে না এমন লজ্জাকর অবস্থায় সে নিপতিত হইল (ফী যিলালিল কুরআন, ২খ, পৃ. ৮৭৭; সূরা মায়িদার ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে)।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উছমানী (র) তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাখ্যায় বলেন ঃ "পার্থিব ক্ষতি তো এই যে, এমন একজন পুণ্যবান ভাই যিনি তাহার বাহুবল হইতে পারিতেন, তাঁহাকেই সে হারাইল আর নিজে উম্মাদ হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। হাদীছে আছে, যুলুম এবং ঘনিষ্ঠজনদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করা এমন দুইটি পাপ যাহার শাস্তি আখিরাতের পূর্বে এই দুনিয়াতেও ভোগ করিতে হয়। আর পারলৌকিক ক্ষতি এই যে, যুলুম, ঘনিষ্ঠ জনদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ, ইচ্ছাকৃতভাবে নরহত্যা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দ্বার উম্মোচন করায় পৃথিবীতে এই জাতীয় যাবতীয় পাপের উদ্বোধনকারীরূপে সেই সকল পাপে তাহার একটি অংশ থাকিয়া যাইবে, যাহা স্পষ্টভাবে হাদীছে উক্ত হইয়াছে (সূরা মাইদার ৩০ নং আয়াতের তর্জমার পাদটীকায়, তাফসীরে উছমানী, ১খ, পৃ. ৫২২, পাদটীকা ১০৮)।

প্রথম লাশ দাফন

পৃথিবীতে যেহেতু ইতোপূর্বে কোন মানুষের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে নাই, তাই হাবীলের লাশ কাবীলের জন্য এক মহা সমস্যা হইয়া দেখা দিল। লাশ এইভাবে পড়িয়া থাকিলে তাহা পিতা-মাতা ও অন্যান্য ভাই-বোনের গোচরে আসিবে। হাবীলকে যেহেতু সে প্রকাশ্যেই হত্যার হুমকি দিয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি তাহার বিদ্বেষ ও কোপানলের কথা অজ্ঞাত ছিল না, তাই এই লাশ দেখামাত্র যে কেহ চক্ষু বুঁজিয়া বলিয়া দিবে যে, ইহা একমাত্র কাবীলেরই কাজ হইতে পারে। তাই দুশ্চিন্তায় কাবীল দিক-বিদিক জ্ঞান হারাইয়া ফেলিল এবং লাশ কাঁধে তুলিয়া এদিক-সেদিক ছুটিতে লাগিল। ভাইয়ের লাশ লইয়া কাবীলের উদ্ভ্রান্তভাবে বেড়াইবার এই মেয়াদ কেহ চল্লিশ দিন, আবার কেহ এক বৎসর কাল দীর্ঘ ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (তাফসীর মাযহারী, ৩খ, পৃ. ৮১; বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৮৮)।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ سَوْءَةَ اَخِيْهِ قَالَ يٰوَيْلَتٰى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ·

"অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠাইলেন, যে তাহার ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তাহা দেখাইবার জন্য মাটি খনন করিতে লাগিল। সে বলিল, হায়! আমি কি এই কাকের মতও হইতে পারিলাম না, যাহাতে আমার ভ্রাতার মৃতদেহ গোপন করিতে পারি? অতঃপর সে অনুতপ্ত হইল" (৫ : ৩১)।

আস-সুদ্দী কতক সাহাবীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা দুইটি সহোদর কাক প্রেরণ করিয়াছিলেন। উভয় কাক সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাহাদের একটি অপরটিকে হত্যা করে। হত্যাকর্ম সম্পন্ন করার পর হন্তা কাকটি মাটি খনন করিয়া তাহার মৃত ভাইয়ের দেহটি গর্তে নিক্ষেপ করিল এবং তারপর তাহা মাটি চাপা দিল। তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কাবীল বলিয়া উঠিল, হায়! আমি কি ঐ কাকটির মতও হইতে পারিলাম না যে, আমার ভাইয়ের লাশটি লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন করিয়া ফেলি! তখন সে কাকের অনুসরণে ঐরূপই করিল এবং হাবীলের মৃতদেহ দাফন করিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৮৮; তাফসীর তাবারী, ৬খ, পৃ. ১৯৭; তাফসীর রূহুল মা'আনী, ৬খ, পৃ. ১১৫-১১৬)।

এই ঘটনার পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আল্লামা হিফযুর রহমান লিখেন, হাবীল ছিলেন আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র আর কাবীল ছিল অভিশপ্ত। তাই হাবীলের পবিত্র মৃতদেহের যাহাতে অবমাননা না হয়, আদম সন্তানগণের মৃত্যুর পর যাহাতে সম্মানজনকভাবে তাহাদের মৃতদেহ দাফনের সুন্নাত বা রীতি প্রবর্তিত হয় এবং কাবীলকে যেন তাহার লজ্জাজনক অপরাধের দরুন এই দুনিয়ায়ও লাঞ্ছিত অপমানিত হইতে হয়, সে তাহার নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতার কথা যাহাতে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতে পারে তজ্জন্য এই ব্যবস্থা করা করা হইয়াছিল। এইজন্য আপন অপরাধ গোপন করার মত সাধারণ জ্ঞানটুকুও তাহার মনে উদ্রেক হয় নাই, বরং এমন একটি প্রাণীকে এই ব্যাপারে তাহার পথিকৃত করা হইল যাহার ধূর্ততা ও সহজাত নোংরামী সর্বজন বিদিত। ফলে শেষ পর্যন্ত কাবীলকে এই খোদোক্তি করিতে হয় : 'হায়! আমি এই কাকটির মতও হইতে পারিলাম না' (হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৬২)!

কাবীলের পরিণতি

মুজাহিদ (র)-এর বরাতে আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, "ভ্রাতৃ হত্যার দিনই কাবীলকে তাৎক্ষণিকভাবে উহার শাস্তি দেওয়া হয়। তাহার নলাকে তাহার উরুর সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, তাহার মুখমণ্ডলকে সূর্যের দিকে করিয়া দেওয়া হয়। সূর্য যে দিকে আবর্তিত হইত তাহার মুখমণ্ডলকে সেদিকেই ঘুরাইয়া দেওয়া হইত। ইহা ছিল তাহার পাপের আশু ফলস্বরূপ এবং তাহার দ্রোহ ও আপন ভ্রাতার প্রতি বিদ্বেষের পরিণতি।" রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "আখিরাতের প্রাপ্য শাস্তি ছাড়াও দুনিয়ার ত্বরিৎ শাস্তি লাভের জন্য বিদ্রোহ ও নিকট আত্মীয়তা সম্পর্ক ছেদনের মত পাপ আর

হয় না"(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ , পৃ. ৮৮; আরও দ্র. আবূ দাউদ (৪৯০২), তিরমিযী (২৫১১), ইবন মাজা (৪২১১), আহমাদ, ৫খ, পৃ. ৩৬, ৩৮ ও ৩৮ এবং আল-আদাবুল-মুফরাদ, অধ্যায় ৩৩, হাদীছ নং ৬৭, তাশখন্দ মুদ্রণ ১৩৯০/১৯৭০)।

বাইবেল পুরাতন নিয়মের আদি পুস্তকে কাবীলের পরিণতি বর্ণিত হইয়াছে এইভাবে ঃ "এরপর একদিন মাঠে থাকার সময় কয়িন তার ভাই হেবলের সঙ্গে কথা বলছিল, আর তখন সে হেবলকে আক্রমণ করে মেরে ফেলল। তখন সদাপ্রভু কয়িনকে বলেন, তোমার ভাই হেবল কোথায়? কয়িন বলল, আমি জানি না। আমার ভাইয়ের দেখাশোনার ভার কি আমার উপর? তখন সদাপ্রভু বললেন, এ তুমি কি করেছ? দেখ, জমি থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত আমার কাছে কাঁদছে। জমি যখন তোমার হাত থেকে তোমার ভাইয়ের রক্তগ্রহণ করবার জন্য মুখ খুলেছে, তখন জমির অভিশাপই তোমার উপর পড়ল। তুমি যখন জমি চাষ করবে, তখন তা আর তোমাকে তেমন ফসল দেবে না। তুমি পলাতক হয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে। তখন কয়িন সদাপ্রভুকে বলল, এই শাস্তি আমার সহ্যের বাইরে। আজ তুমি আমাকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিলে, যার ফলে আমি তোমার চোখের আড়াল হয়ে যাব। পলাতক হয়ে আমি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াব, ফলে যার সামনে আমি পড়ব সে-ই আমাকে খুন করতে পারে। তখন সদাপ্রভু তাকে বললেন, তাহলে যে তোমাকে খুন করবে, তার উপর সাত গুণ প্রতিশোধ নেয়া হবে। এই বলে সদাপ্রভু কয়িনের জন্য এমন একটা চিহ্নের ব্যবস্থা করলেন যাতে কেউ তাকে হাতে পেয়েও খুন না করে" (আদিপুস্তক, ৪ ঃ ৮-১৫, সৃষ্টির আদিতে, প্রকাশক বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা)।

বাইলেলের এই বর্ণনা বিভ্রান্তিকর। ইবন কাছীর (র) বলেন, আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী-খৃস্টান সমাজ যাহাকে তৌরাত বলিয়া মনে করে তাহাদের গ্রন্থে আমি দেখিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা কাবীলকে তাৎক্ষণিক শাস্তি না দিয়া অবকাশ দিয়াছিলেন এবং সে এডেনের পূর্ব দিকে অবস্থিত নূদ অঞ্চল বসবাস করে যাহাকে তাহারা কান্নীম নামে অভিহিত করিয়া থাকে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৮৮)। বর্তমান বাইবেলেও এই বক্তব্য বিদ্যমান আছে। কাবীলের বংশতালিকা প্রমাণ করে যে, তাৎক্ষণিকভাবে কাবীল শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়া ধ্বংস হইয়া যায় নাই, বরং সুদীর্ঘ কাল পৃথিবীতে বসবাস করিয়া বংশ বিস্তার করিয়াছে।

পুত্র বিরহে আদম (আ)

এই প্রথমবারের মত পৃথিবীতে মানুষের মৃত্যু, তাহাও আবার নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানের মৃত্যু। তাই পুত্র বিরহে আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) অত্যধিক বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হাবীল হত্যার সময় আদম (আ) হজ্জ উপলক্ষে মক্কা শরীফে ছিলেন। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর অনেক খোঁজ করিয়াও তিনি হাবীলের কোন সন্ধান পাইলেন না। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারাও ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। কাবীলের অন্যায় জিদ এবং খুনের হুমকির কথা তাঁহার জানা ছিল। তাই হাবীলের ব্যাপারে তাঁহার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। তাবারী ও ইব্ন কাছীর (র) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থাবলীতে হাবীলের মৃত্যুতে আদম (আ)-এর শোকগাথা উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

"বদলে গেছে জনপদ সব বদলেছে তার বাসিন্দারা
পৃথ্বী আনন ধুসরিত বীভৎস আজ বসুন্ধরা
রঙিনেরা রঙ হারালো সুস্বাদুরা স্বাদের খ্যাতি
লাবণীদের লাবণ্য নেই নেই চেহারায় রূপের ভাতি"।

জবাবে আদম (আ)-এর উদ্দেশ্যে ধ্বনিত হলো ঃ

"হাবীলের পিতা! দুইজনই আজ নিহতের পর্যায়ে
জীবিত হন্তা নিহতেরই মত মরিতেছে তড়পায়ে।
জিঘাংসা বশে হলো যেন কাজ তাহার হস্ত দিয়া
আর্ত কণ্ঠে ফুকারি ফিরিছে সাদা শঙ্কিত হিয়া"।

(তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়ার রুসুল-ওয়াল-মুলূক, ১০খ, পৃ. ২২০; ইবন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৫, কায়রো ১৯৯৭ খৃ.)।

ইব্ন কাছীর (র) তদীয় গ্রন্থে পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন ঃ "উক্ত পংক্তিগুলি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। যতদূর মনে হয়, শোকার্ত আদম (আ) বিলাপ ছলে তাঁহার নিজের ভাষায় কিছু বলিয়াছিলেন। পরর্বর্তীতে কোন কবি তাহা এইভাবে কবিতায় রূপ দান করিয়াছেন। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ. পৃ. ৮৮)। উর্দূ দায়িরাতুল মা'আরিফ গ্রন্থে ও ইসলামী বিশ্বকোষে উক্ত ঘটনার বিবরণ প্রদান ও উক্ত শোকগাথা উদ্ধৃত করার পর মন্তব্য করা হইয়াছে ঃ "উক্ত ঘটনার এই সকল বিবরণ হাদীছ ও যুক্তির মৌল নীতিমালা অনুযায়ী সত্য নহে" (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৫খ, পৃ. ২৩৭)।

মা হাওয়া (আ) সংক্রান্ত কিছু কথা

কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

يَا يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً.

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি তাহা হইতে তাহার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়া দেন" (৪ ঃ ১)।

উক্ত আয়াত হইতে আমরা জানিতে পারিলামঃ (১) একটিমাত্র মানুষ অর্থাৎ হযরত আদম (আ) হইতে গোটা মানবজাতির সৃষ্টি; (২) হাওয়া (আ) তাঁহারই দেহপিঞ্জর হইতে নির্গত; (৩) হাওয়া বিশ্বের গোটা মানবজাতির মহীয়সী জননী। মহানবী (স) বলেন, "স্ত্রীলোকদের সহিত উত্তম আচরণ করিবে, কেননা নারীকে পাঁজর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে" (বুখারী ও মুসলিম)।

ইব্‌ন ইসহাকের মতে ইহার অর্থ হইল, হাওয়াকে আদমের বাম পাঁজর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুরতুবী ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'স্ত্রীলোককে মূলত পাঁজরের সাথে তুলনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, স্ত্রীলোকের সৃষ্টির সূচনা পাঁজর থেকেই হইয়াছে এবং ইহাদের অবস্থা পাঁজরের। মত যদি ইহাদের বক্রতাকে সোজা করিতে চাও তবে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। অতএব পাঁজরের বক্রতা সত্ত্বেও যেমন তাহা থেকে কাজ নেওয়া হয় এবং ত্রুটি (বক্রতা) দূর করার চেষ্টা করা হয় না, তেমনি স্ত্রীলোকদের সাথেও নম্র ও সহানুভূতিশীল আচরণ করিতে হইবে। যদি তাহাদের সাথে রূঢ় আচরণ করা হয় তবে তাহাদের সাথে সম্বন্ধ মধুর হওয়ার চাইতে বরং আরো তিক্ত হইবে (ফতুহুল বারী, ৬খ, পৃ. ২৮৩-এর বরাতে হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, বাংলা অনু, ১খ, পৃ. ৩৩; ইফা প্রকাশিত, ১ম সং, ১৯৯০ খৃ.)। কুরতুবীর এই বর্ণনায় পাঁজর হইতে স্ত্রীলোক সৃষ্টিকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করিয়া যে রূপক অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট।

বাইবেলের বর্ণনায় রহিয়াছে ঃ "পরে সদাপ্রভু বললেন, 'মানুষটির পক্ষে একা থাকা ভাল নয়। আমি তার জন্যে একজন উপযুক্ত সঙ্গী তৈরী করব। সদাপ্রভু মাটি থেকে যেসব ডাঙ্গার জীবজন্তু ও আকাশের পাখি তৈরী করেছিলেন সেগুলো সেই মানুষটির কাছে আসলো। সদাপ্রভু দেখতে চাইলেন তিনি সেগুলোকে কি বলে ডাকেন। তিনি সেইসব জীবন্ত প্রাণীগুলোকে যেটির যে নামে ডাকলেন সেটির সেই নামই হল। তিনি প্রত্যেকটি পোষ মানা ও পোষ না মানা এবং আকাশের পাখির নাম দিলেন। কিন্তু সেগুলোর মধ্যে সেই পুরুষ মানুষটির অর্থাৎ আদমের কোন উপযুক্ত সঙ্গী দেখা গেল না। সেইজন্য সদাপ্রভু আদমের উপর একটা গভীর ঘুমের ভাব আনলেন। আর তাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর একটা পাঁজর তুলে নিয়ে সেই ফাঁকা জায়গাটা বন্ধ করে দিলেন। আদম থেকে তুলে নেওয়া সেই পাঁজরটা দিয়ে সদাপ্রভু একজন স্ত্রীলোক তৈরী করে তাকে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন। তাকে দেখে আদম বললেন, এবার হয়েছে। এর হাড়-মাংস আমার হাড়-মাংস থেকেই তৈরী। পুরুষ লোকের দেহের মধ্য থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে বলে একে 'স্ত্রীলোক' বলা হয়। এজন্যেই মানুষ মা-বাবাকে ছেড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে এক হয়ে থাকবে আর তারা দু'জন একদেহ হবে" (আদি পুস্তক ২ ঃ ১৮- ২৫)।

কুরআন, হাদীছ ও বাইবেলের উক্ত বর্ণনা হইতে আক্ষরিক অর্থেই হাওয়া যে আদম (আ)-এর পাঁজর হইতে সৃষ্ট এবং মানবজাতির পরম সম্মানিত আদিমাতা তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইবেলের বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, মা হাওয়াই প্রথমে শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেন এবং তিনিই আদম (আ)-কে নিষিদ্ধ ফল খাইতে প্রলুব্ধ করেন। পক্ষান্তরে আল-কুরআনের বর্ণনায় নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার ব্যাপারে শয়তানের প্ররোচনাকেই দায়ী করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে আদম ও হাওয়া (আ) দুইজনকে সমপর্যায়ে রাখিয়া এমনভাবে ঘটনাটি বিবৃত করা হইয়াছে, যাহাতে এই অপরাধের জন্য কেহ কাহারও উপর নির্ভরশীল বা কেহ কাহারও অগ্রণী বা কেহ কাহারও চাইতে বেশী অপরাধী ছিলেন এমনটি বুঝা যায় না। যেমন আল্লাহ পাক বলিয়াছেন ঃ

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ٠

"কিন্তু শয়তান উহা হইতে তাহাদের পদস্খলন ঘটাইল এবং তাহারা যেখানে ছিল সেখান হইতে তাহাদেরকে বহিস্কৃত করিল" (২ঃ ৩৬)।

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ٠

"শয়তান তাহাদের উভয়কে কুমন্ত্রণা দিল" (৭-২০)।

বরং শয়তানের কুমন্ত্রণা ছিল শিকাররূপে। অন্যত্র আদম (আ)-এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছেঃ

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ

"অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রণা দিল" (২০ ঃ ১২০)।

বরং আরও সুস্পষ্টভাবে আদম (আ)-এর প্রতিই বিস্মৃতি, দৃঢ়তার অভাব এবং বিচ্যুতি আরোপ করা হইয়াছে। যেমন ঃ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ٠

"আমি তো ইতোপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল! আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই" (২০ ঃ ১১৫)।

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى ٠

"আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল" (২০ ঃ ১২১)। এমতাবস্থায় নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়া জান্নাত হারোনোর জন্য কেবল মা হাওয়াকে দায়ী করা বাস্তবসম্মত নহে।

আদম (আ)-এর বর্ণনা প্রসঙ্গে ময়ুর, সাপ প্রভৃতি বাইবেলীয় কাহিনী বহুল প্রচলিত। বলা হইয়া থাকে যে, সাপের মুখ গহবরে প্রবেশ করিয়া শয়তান বেহেশতে প্রবেশ করিয়া মা হাওয়াকে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য প্ররোচিত করিয়াছিল। ওস্ওয়াসা বা প্ররোচনা দেওয়ার জন্য শয়তানের বেহেশতে প্রবেশের আদৌ কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা তাহার কিয়ামত পর্যন্ত দীর্ঘায়ূ এবং প্ররোচনা দানের শক্তি তাহার প্রার্থনা অনুযায়ী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন, যাহা কুরআন শরীফের উদ্ধৃতিসহ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং সে বেহেশতের বাহির হইতেও প্ররোচিত করিতে সক্ষম ছিল। উপরন্তু সাপের মুখে প্রবিষ্ট শয়তানকে দেখিতে মানব চক্ষু ব্যর্থ হইলেও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে বেহেশতের জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা প্রহরীগণের দৃষ্টি এভাবে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। মানবীয় দৃষ্টি সীমাবদ্ধতা ও অক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যে এরূপ কল্প-কাহিনী গ্রীক ও ভারতীয় উপকথার মত করিয়া রচিত তাহা সহজেই বোধগম্য। তাই আল্লামা হিফযুর রহমান সিউহারভী (র) যথার্থই লিখিয়াছেন ঃ

"তাওরাত ও ইঞ্জীলে সাপ-ময়ূরের কাহিনী বা এই জাতীয় অন্য যে সব উপাখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে তার উল্লেখ পবিত্র কুরআন বা হাদীছের কোথাও নেই। এই সব ইসরাঈলী কাহিনী সম্পূর্ণ

বানোয়াট ও মনগড়া। এগুলোর ভিত্তি না ইলমে সহীহ্-এর উপর প্রতিষ্ঠিত আর না এগুলো বিবেক-বুদ্ধি ও ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত। কোন কোন মুফাসসির অবাধে এ সব কাহিনী বর্ণনা করে থাকেন, যার মারাত্মক কুফল এই যে, শুধু সাধারণ মানুষই না, বরং বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এ ধারণা পোষণ করে বসে থাকেন যে, অন্যান্য ইসলামী রিওয়ায়াতের মত এগুলোরও বুঝি কোন সঠিক ভিত্তি রয়েছে" (কাসাসুল কুরআন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৪৫, ইফা প্রকাশিত ১ম সংস্করণ, ১৯৯০ ইং)।

আদম (আ)-এর ইনতিকাল

আদম (আ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিলে তিনি তাঁহার পুত্রদের কাছে জান্নাতী ফলমূল খাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। পিতার অন্তিম বাসনা পূরণের মানসে তাঁহার পুত্রগণ ফলমূলের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন। পথে তাহাদের এমন কতিপয় ফেরেশতার সহিত সাক্ষাত হয় যাহাদের সহিত আদম (আ)-এর কাফন, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, কয়েকটি কুড়াল-কোদাল এবং মাটি বহনের ঝুড়ি ছিল। ফেরেশতাগণ আদম-সন্তানদের গন্তব্যস্থল ও যাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিল তাঁহারা জানান যে, তাঁহাদের অসুস্থ পিতা জান্নাতী ফল খাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করিয়াছেন। তাই তাঁহারা সেই ফলমূলের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। ফেরেশতাগণ জানাইলেন যে, এখন আর সেই সময় নাই। আদম (আ)-এর মৃত্যু আসন্ন। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদেরকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তারপর সত্যসত্যই ফেরেশতাগণ ঐ সমস্ত বস্ত্রসম্ভারসহ আদম (আ)-এর নিকট গিয়া উপস্থিত হন। ফেরেশতাদের এরূপ আগমনে মা হাওয়া (আ) তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আঁচ করিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয় স্বামীকে জড়াইয়া ধরিলেন। আদম (আ) বলিলেন, তুমি সরিয়া যাও। কেননা তোমার পূর্বেই আমার ডাক পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাকে ও আমার পরোয়ারদিগার ফেরেশতাগণকে একান্তে মিলিত হইতে দাও।

এই সময় ফেরেশতাগণ তাঁহার রূহ কবয করেন। তারপর তাঁহাকে গোসল দেওয়াইয়া কাফন পরাইয়া, সুগন্ধি মাখাইয়া, কবর খনন করিয়া যথারীতি জানাযা পড়িয়া দাফন করা হয়। কবরের উপর মাটিচাপা দেওয়ার পর তাহারা আদম-সন্তানদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ "হে আদম-সন্তানগণ! ইহাই হইতেছে তোমাদের দাফনের রীতি" (আহমদ, ৫খ, পৃ. ১৩৬)। ইবন কাছীর (র) তদীয় 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে উবাই ইব্ন কাব (রা)-এর মুখে শ্রুত বিবরণ রূপে ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করেন ঃ 'এই বর্ণনাকে তাঁহার সহিত সম্পর্কিত করার ব্যাপারটি সহীহ' ১খ, পৃ. ৯১)। ইব্ন আসাকির (র) বর্ণনা করেন ঃ ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর জানাযায় চারবার তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন (হাকেম, ১খ, ৩৮৫)।

আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত মারফূ হাদীছ হইতে জানা যায় যে, লওহে মাহ্ফূযে আদম (আ)-এর বয়স এক হাজার বৎসর লিপিবদ্ধ ছিল। অপরদিকে তাওরাতে আছে, আদম (আ) নয় শত ত্রিশ বৎসরকাল আয়ু লাভ করেন। ইবন কাছীর (র) বলেন ঃ তওরাতের বর্ণনাকে যদি সংরক্ষিত ও বিশুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা হইতেছে আদম (আ)-এর পৃথিবীতে অবতরণের পরবর্তী আয়ুর সৌর বৎসর। চান্দ্র হিসাবে উহার মেয়াদ হয় নয় শত সাতান্ন বৎসর।

ইহার সহিত তৎপূর্বকার বেহেশতে অবস্থানকালীন তেতাল্লিশ বৎসর যোগ করিলে সর্ব সাকুল্যে এক হাজার বৎসরই হয়। ইবন জারীর (র) প্রমুখ এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন। আদম (আ)-এর মৃত্যুর ঐ দিনটি ছিল শুক্রবার (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৯১-৯২)।

আদম (আ)-এর শবদেহ কোথায় দাফন করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। মশহুর হইল, ভারতবর্ষ তথা সরন্দীপের যে পাহাড়ে সর্বপ্রথম তাঁহাকে অবতরণ করান হইয়াছিল, সেখানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। কেহ কেহ মক্কা শরীফের জাবালে আবূ কুবায়সকে তাঁহার দাফনস্থল বলিয়াছেন। আবার এরূপও কথিত আছে যে, নূহ (আ) মহাপ্লাবনকালে আদম (আ) ও মা হাওয়ার কফিন জাহাজে তাঁহার সহিত রাখিয়াছিলেন এবং মহাপ্লাবন শেষে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস তাঁহাদেরকে দাফন করেন (তারীখ তাবারী, ১খ, পৃ. ১৬১)।

আতা খুরাসানী বলেন, আদম (আ)-এর মৃত্যুতে গোটা বিশ্ব জগৎ তাঁহার শোকে সপ্তাহ ব্যাপী ক্রন্দন ও শোক পালন করে। ইব্ন ইসহাক বলেন, আদম (আ)-এর মৃত্যুতে এক সপ্তাহ পর্যন্ত চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ লাগিয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ, পৃ. ৯১)।

তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পরে মা-হাওয়াও (আ) ইনতিকাল করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৯২)।

হযরত শীছ (আ)-কে দায়িত্ব অর্পণ ও অন্তিম উপদেশ

আদম (আ)-এর অন্তিম শয্যায় তদীয় প্রিয়তম পুত্র শীছ (আ) তাঁহার সেবা-যত্নের জন্য সব সময় পিতার নিকটে অবস্থান করিতেন। তাঁহার অপর ভাইগণ যখন পিতার অন্তিম অভিলাষ পূরণের জন্য ফলমূল সংগ্রহের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়েন, তখনও তিনি পিতার নিকটই ছিলেন। পুত্রদের ফলমূল লইয়া আসিতে বিলম্ব হইলে তিনি শীছ (আ)-কে বলিলেন ঃ সম্ভবত তাহারা আমার জন্য ফলমূল সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। এজন্য বিলম্ব ঘটিতেছে। তুমি বরং অমুক পাহাড়ে গিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ কর, হয়তো বা তাহাতে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

শীছ (আ) বলিলেন, পিতা! আপনি মানবকূলের আদিপুরুষ। আমারও পিতা। আপনি আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র ও মকবূল বান্দা। আপনি নিজে যদি আল্লাহ্‌র দরবারে হাত তুলেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ব্যর্থ মনোরথ করিবেন না। প্রত্যুত্তরে আদম (আ) বলিলেন ঃ নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়া আমি যে অপরাধ করিয়াছি, সেইজন্য আমি আল্লাহ্‌র দরবারে লজ্জিত, তুমিই বরং দু'আ কর, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাহা কবূল করিবেন।

সেমতে শীছ (আ) দু'আ করিলেন। সত্য সত্যই সেই দু'আ কবূল হইল। জিবরাঈল (আ) খাঞ্চা ভর্তি বেহেশতী ফলমূল এক অপূর্ব সুন্দরী বেহেশতী হূরের মাথায় চাপাইয়া লইয়া হাযির হইলেন। হূরটি যখন মুখের ঘোমটা খুলিয়া আদম (আ)-এর সম্মুখে আসিল তখন আদম (আ)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে জিবরাঈল জানাইলেন ঃ একমাত্র শীছ ছাড়া আপনার অপর সকল পুত্র কন্যা যেহেতু জোড়ায় জোড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাই শীছের সহিত বিবাহের উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলা ইহাকে প্রেরণ

করিয়াছেন। সেমতে শীছের সহিত ঐ বেহেশতী হূরের বিবাহ হয় এবং হূরটি যেহেতু আরবীভাষী ছিলেন তাই তাঁহার বংশধরগণ বংশানুক্রমিকভাবে আরবীভাষী হন এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (স)-ও তাঁহার অধস্তন পুরুষ। এ হূরের আনীত ফলমূল আদম (আ) তাঁহার উপস্থিত সন্তানদেরকেও খাইতে দেন। ঐ ফলমূল যাহারা খাইয়াছিলেন তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। অপর বর্ণনামতে, ঐ হূর তারপর বেহেশতে ফিরিয়া যায়।

ঐ সময় আদম (আ) পুত্রদের উদ্দেশ্য বলেন যে, তাঁহার অন্তিম সময় উপস্থিত। তাঁহার পরে শীছই হইবেন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং সকলে যেন তাঁহাকে অভিভাবকরূপে মান্য করেন এবং তাঁহার নির্দেশনা অনুসারে জীবন-যাপন করেন। অন্য কথায়, ইনতিকালের পূর্বেই আদম (আ) তদীয় পুত্র শীছ (আ)-এর অভিষেক সম্পন্ন করিলেন (দ্র. তর্জমা উর্দু কাসাসুল আম্বিয়া (বৃহৎ কলেবর), গোলাম নবী কুমিল্লায়ী, পৃ. ২০-২১)।

হাবীল ও কাবীলের পর শীছই ছিলেন আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। শীছ (আ)-এর জন্মগ্রহণের পর আদম ও হাওয়া (আ)-এর পুত্র বিরহ বেদনা অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। এইজন্য জন্মের পর হইতেই তিনি পিতা-মাতার অতি আদরের সন্তান। শীছ শব্দের অর্থই হইতেছে 'আল্লাহ্র দান'। মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বলেন, "আদম (আ)- এর মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিলে তিনি শীছকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাঁহাকে দিরারাত্রির প্রহরসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানদান করেন এবং পরবর্তী কালে ঘটিতব্য মহাপ্লাবনের ব্যাপারে অবহিত করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৯১)।

নবুওয়তী ধারার একটি চিরাচরিত নিয়ম হইল, পূর্ববর্তী নবী ইনতিকালের পূর্বেই তাঁহার পরবর্তী নবী সম্পর্কে আপন উম্মতদেরকে অবহিত করিবেন। আদি মানব ও আদি নবী হযরত আদম (আ) তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই যোগ্যতম পুত্র শীছ (আ)-কে স্থলাভিষিক্ত করিয়া সেই ধারারই সূত্রপাত করিয়া যান।

আদম (আ)-এর নবুওয়াত ও রিসালাত

নবী হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে কুরআনুল করীমে আদম (আ)-এর উল্লেখ না থাকিলেও পরোক্ষভাবে তাঁহার উল্লেখ আছে।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন" (৩ ঃ ৩৩)।

উক্ত আয়াতে নবী ও রাসূলরূপে নূহ ও ইরাহীম (আ)-এর সহিত সমপর্যায়ে আদম (আ)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উছমানী বলেন, "আল্লাহ তা'আলার এই মনোনীতকরণ ও নির্বাচিতকরণ জনিত সম্মানদান, যাহাকে আমরা 'নবুওয়াত' অভিধায় অভিহিত করিয়া থাকি" (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৬৯, পাদটীকা ৮)।

হযরত আবূ যার গিফারী (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে ঃ

قلت يا رسول الله ارأيت آدم نبيا كان قال نعم نبيا ورسولا يكلم الله قبيلا ٠

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী কে? তিনি বলিলেন, আদম (আ)। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি নবী ছিলেন? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ হাঁ, নবী ছিলেন। তাঁহার সাথে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কথা বলিয়াছেন" (আহমাদ, ৫খ, ১৬৬, ১৭৮, ১৭৯)।

উক্ত হাদীছখানা উদ্ধৃত করিয়া আবূ বকর জাবির আল-জাযাইরী লিখেন, উক্ত মরফূ' হাদীছে আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলার কালাম-ধন্য ও ওহীপ্রাপ্ত নবীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (আবূ বাক্র আল-জাযাইয়ী, আকীদাতুল-মুমিন, পৃ. ২৬৬; মাকতাবাতুল কুল্লিয়াতিল আযহারিয়া, ১ম সং, কায়রো, ১৩৯৭ হি.)।

মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী এতসম্পর্কে আরও স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন ঃ ইহা নিশ্চিত যে, আদম (আ) নবীগণের অন্তর্ভুক্ত। ইহা জমহুর উলামার সর্ববাদীসম্মত অভিমত। কোন আলেমই এই মতের বিরোধিতা করেন নাই। তবে তিনি রাসূল ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। তাঁহার নবুওয়াত সম্পর্কে আল-কিতাব ও সুন্নাহতে বর্ণনা আসিয়াছে। তবে আল-কুরআনে উহার সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। তাই আদম (আ) সম্পর্কে ঠিক ঐভাবে নবুওয়াতের উল্লেখ করা হয় নাই যেমনটি অন্যদের ব্যাপারে, যেমন ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা ও ঈসা (আ) প্রমুখ নবীগণের ব্যাপারে করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছেন এবং ঐ সম্বোধনের মাধ্যমে তাঁহাকে শরীআত দান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি তাঁহার প্রতি আদেশ করিয়াছেন, নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য অনেক কিছুকে হালাল এবং অনেক কিছুকে হারাম করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি কোন রাসূল বা বাহক না পাঠাইয়া তিনি এই সমস্ত করিয়াছেন। উহাই তাঁহার নবুওয়াত বা তিনি নবী হওয়ার অর্থ, যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি (আন-নবুওয়াতু ওয়াল আম্বিয়া, পৃ. ১২৪-১২৫, ২য় সংস্করণ, মক্কা ১৪০০/১৯৮০)।

আলিমগণের অনেকেই তাঁহাকে 'রাসূল' বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তিনি তদীয় সন্তান-সন্তুতি ও বংশধরগণের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন। অন্য আলিমগণ তাঁহাকে 'নবী' বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের দলীল হইতেছে সহীহ মুসলিমের বর্ণিত শাফাআত সংক্রান্ত হাদীছ যাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, কিয়ামতে মহা পেরেশানীর দিনে ওষ্ঠাগতপ্রাণ হইয়া লোকজন নূহ (আ)-এর কাছে ছুটিয়া যাইবে এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবে ঃ "আপানিই পৃথিবী বক্ষে প্রেরিত প্রথম রাসূল"। আদম (আ) যদি রাসূলই হইতেন তাহা হইলে এরূপ বলা হইত না।

যাঁহারা তাঁহাকে রাসূল বলিয়া থাকেন তাঁহারা ইহার জবাব দেন এইভাবে, যে মহাপ্লাবনের পর মানবজাতির পৃথিবীতে নূতনভাবে পুনর্বাসনের পর তিনিই প্রথম রাসূল, উক্ত কথা দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এবম্বিধ যুক্তি প্রদর্শনের পর আল-জাযাইরী তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন

এইভাবে ঃ তবে তিনি যে রাসূল ছিলেন এই অভিমতই অগ্রগণ্য" (আকীদাতুল মুমিন, পৃ. ১২৫)। এ ব্যাপারে আরও দলীল নিম্নে উক্ত হইল ঃ

(১) আল্লাহ তা'আলা আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে প্রেরণকালে বলিয়া দেন ঃ

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"পরে যখন আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসিবে, তখন যাহারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করিবে তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না" (২ ঃ ৩৮)।

উক্ত আয়াতে هُدًى বা নির্দেশনা প্রেরণের কথা বলিয়া আসলে তিনি যে নবুওয়াত বা রিসালাতের দায়িত্ব লাভ করিবেন সেই আশ্বাসই দেওয়া হইয়াছিল।

(২) অন্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে সেই কথাটিই বলা হইয়াছে এইভাবে ঃ

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى.

"আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হইল। ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার তওবা কবুল করিলেন ও তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন" (২০ ঃ ১২১-১২২)।

মুহাম্মাদ আলী সাবূনীর ভাষায় ঃ "এই মনোনীতকরণই ছিল তাঁহাকে নবুওয়াত ও রিসালাত দান করা (আন্-নুবুওয়াতু ওয়াল আম্বিয়া, পৃ. ১২৫)।

(৩) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন আমিই হইব আদম-সন্তানদের তথা সমস্ত মানবজাতির সর্দার। ইহা আমার অহংকার নহে। আমার হাতেই থাকিবে আল্লাহ্র প্রশস্তির পতাকা। ইহা আমার অহংকার নহে। সেদিন আদমসহ সকল নবীই আমার পতাকাতলে থাকিবেন" (মুসনাদে আহমাদ, ৩খ, পৃ. ২)।

ইব্ন মাজা এবং তিরমিযীও হাদীছটি রিওয়ায়াত করিয়াছেন এবং তিরমিযী ইহাকে রীতিমত 'হাসান-সহীহ' পর্যায়ের হাদীছ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (মাহমূদ মুহাম্মাদ খাত্তাব সুবকী কৃত আদ-দীন আল-খালিস, ১খ, পৃ. ৭৪, ৪র্থ সং, কায়রো)।

তাবারীর বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ "আল্লাহ তা'আলা যখন আদমকে পৃথিবীর রাজত্ব দান করিলেন তখন তিনি তাঁহাকে নবুওয়াতও দান করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার সন্তানদের প্রতি রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহার প্রতি একুশখানা সহীফা (পুস্তিকা) অবতীর্ণ করেন। তিনি স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করেন এবং জিব্রাঈল (আ) তাঁহাকে এগুলি শিক্ষা দান করেন" (দ্র. তাবারীর-তারীখ, ১খ, পৃ. ১৫০; আল-মুনতাসার, ১খ, পৃ. ২২১)।

কুরআন শরীফে যেমন নবী-রাসূলগণের সকলের নাম উল্লিখিত হয় নাই, তেমনি কোন্ কোন্ রাসূল বা নবীর প্রতি কোন্ কোন্ কিতাব অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহারও বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয় নাই এবং ইজমালীভাবে বলা হইয়াছে ঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ـ

"নিশ্চয় আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাহাদের সঙ্গে দিয়াছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাহাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে" (৫৭ ঃ ২৫)।

'শরহ উমদা'-এর বরাতে মওলানা আবদুল হক হক্কানী দেহলবী (র) লিখেন ঃ মোট আসমানী কিতাবের সংখ্যা ১০৪। তন্মধ্যে ছোট ছোট ৫০টি হযরত শীছ (আ), ৩০টি হযরত ইদরীস (আ), ১০টি হযরত ইবরাহীম (আ) এবং ১০টি হযরত আদম (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে। আর প্রধান প্রধান চারিখানা চারিজন নবীর প্রতি নাযিল হইয়াছে" (ইসলামী আকীদা, পৃ. ৯৭, অনুবাদ ঃ মওলানা আবদুস সুবহান, ইফা প্রকাশিত, ১ম সং, ১৯৮১)।

আদম (আ)-এর শরী'আত ও আমল

সভ্যতার আদি যুগে আদম (আ)-এর সহীফাগুলি তো বটেই, পূর্ববর্তী যুগের তাবৎ নবী-রাসূলগণের প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাব ও সহীফাগুলি বিকৃতি, বিস্মৃতি ও বিলুপ্তির শিকার হইয়াছে। সায়্যিদ সুলায়মান নদভীর ভাষায় ঃ "এ কথা আমরাও মানি, যুগে যুগে পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পয়গাম দুনিয়ায় এসেছে, কিন্তু আমরা বারবার বলেছি এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকে প্রমাণ করেও দেখিয়েছি যে, বিশেষ বিশেষ যুগ বা বিশেষ বিশেষ দেশের জন্যই তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা ছিলেন সাময়িক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে সাময়িক পয়গাম্বর। আর এজন্যই তাঁদের পয়গামসমূহ চিরদিনের জন্য সুসংরক্ষণের ইন্তেজাম হয়ে উঠেনি, ছিন্ন হয়ে গেছে এগুলোর মূল সূত্র" (নবী চিরন্তন, অনুবাদ আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ২য় সং, বুক সোসাইটি, ঢাকা ১৯৭৯ খৃ.)।

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত বক্তব্যটি আদি মানব এবং সর্বপ্রথম নবী আদম (আ) এবং তাঁহার শরী'আত ও সহীফাগুলির ব্যাপারে সর্বাধিক প্রযোজ্য। তাই তাঁহার শরী'আতের কাঠামো কী ছিল বা তাঁহার ইবাদাত ও 'আমলের নমুনা কী ছিল তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বলা এক সুকঠিন ব্যাপার। তবে এতদসংক্রান্ত রিওয়ায়াতসমূহ হইতে ইহার কিছু কিছু আঁচ করা যায়।

হাম্‌দ ও সালাম

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর সহীহ ইব্‌ন হিব্বান হইতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একখানা হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ "রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার মধ্যে রূহ ফুঁকিলেন তখন তিনি হাঁচি দিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন ঃ আলহামদু লিল্লাহ্ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)। তিনি তাঁহার আদেশক্রমেই হাহমদ বা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিলেন। তখন তাঁহার প্রতিপালক তাঁহার উদ্দেশে বলিলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি সদয় হউন হে আদম! ঐ

পাশে উপবিষ্ট ফেরেশতামণ্ডলীর দিকে যাও এবং তাহাদেরকে সালাম দাও। তখন তিনি গিয়া তাহাদেরকে সালাম দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ আস্সালামু 'আলায়কুম। তাহারা বলিলেন ঃ ওয়া 'আলায়কুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি। তারপর তিনি তাঁহার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তখন তিনি বলিলেন; ইহাই তোমার ও তোমার সন্তানদের মধ্যকার সম্ভাষণ" (কাসাসুল আম্বিয়া, ইবন কাছীর, পৃ. ৪৪ ও আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)। বুখারীর রিওয়ায়াতেও অনুরূপ বক্তব্য রহিয়াছে।

উক্ত বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইল যে, সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে আদম (আ)-এর সর্বপ্রথম ইবাদতটি ছিল 'আলহামদু লিল্লাহ' বলিয়া সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে হাম্দ বা স্তুতিবাদ।

আল্লামা ছা'লাবীর ভাষায় ঃ 'হাঁচি দেওয়া শেষ হইতে না হইতেই আদমের রূহ তাঁহার মুখ ও রসনায় সঞ্চারিত হইল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে শিক্ষা দিলেন যেন তিনি বলেন, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। সুতরাং উহাই ছিল তাঁহার মুখ নিঃসৃত সর্বপ্রথম বাণী' (আরাইস, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৯)।

পৃথিবী ব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত সালাম ও তাহার জবাব দানের শিষ্টাচার পূর্ণ বিধানটিও যে সৃষ্টির সূচনালগ্ন হইতেই চলিয়া আসিতেছে উপরিক্ত বর্ণনা দ্বারা তাহাও নিশ্চিতভাবে জানা গেল।

বিবাহ ও দেনমোহর

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, হাওয়াকে সৃষ্টির পর আদম (আ) তাহার দিকে হস্ত প্রসারিত করিলে ফেরেশতাগণ বলিলেন, থামুন আদম, একটু থামুন। আদম (আ) বলিলেন, আবার থামিতে হইবে কেন? হাওয়াকে তো আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। ফেরেশতাগণ বলিলেন, তাহার মোহরানা আদায়ের পরই কেবল তিনি আপনার জন্য বৈধ হইবেন। আদম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কিভাবে আদায় করিতে হইবে। ফেরেশতাগণ বলিলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি তিনবার দুরূদ পাঠ করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহাম্মাদ কে? ফেরেশতাগণ তাঁহার পরিচয় দিলেন এইভাবে ঃ আপনার সন্তানদের মধ্য হইতে তিনি হইতেছেন সর্বশেষ নবী, মুহাম্মাদের সৃষ্টি না হইলে আপনাকে সৃষ্টি করা হইত না (ছা'লাবী, আরাইস, পৃ. ৩১)।

বলা বাহুল্য, তিনি তখন তাঁহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান আখেরী নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করিয়াই মোহরানা আদায় করেন। ইহার পর হাওয়াকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া তিনি দাম্পত্য জীবন শুরু করেন। এইভাবেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দুরূদ উচ্চারিত হয় এবং মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে বিবাহের সূচনা হয়। খুলাসাতুল আম্বিয়া (পৃ. ১৩) গ্রন্থে বলা হইয়াছে, আদম (আ)-এর সহিত হাওয়া (আ) বিবাহের মোহর ছিল মহান আল্লাহ্র প্রশংসা, তাসবীহ, তাহলীল, পবিত্রতা বর্ণনা ও কলেমা শাহাদাত।

তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা

পৃথিবীতে অবতরণের পর আদম (আ) একটি হাঁচি দিলে তাঁহার নাক হইতে টাটকা রক্ত ঝরিতে লাগিল। মাটিতে সেই রক্ত গড়াইয়া পড়িলে উহা কয়লার মত কালো বর্ণ ধারণ করে। উহা দেখিয়া আদম ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়েন। কেননা এরূপ দৃশ্য ইতোপূর্বে তিনি কখনও দেখেন নাই। জান্নাতের সুখস্মৃতি তাঁহার স্মৃতিপটে জাগরূক হইয়া উঠিল। তখন তিনি মূর্ছা গেলেন। একাদিক্রমে চল্লিশটি বৎসর তাঁহার ক্রন্দনে ক্রন্দনে অতিবাহিত হইল। উহার পর আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি আসিয়া আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশে ও পেটে হাত বুলাইয়া উহা তাঁহার বক্ষের উপর রাখিলেন। ইহাতে আদমের ভীতি-বিহবলতা দূর হইল এবং তিনি অনেকটা স্বস্তি বোধ করিলেন।

হযরত শাহর ইব্ন হাওশাব (রা) বলেন, আমার নিকট এই বিবরণ পৌঁছিয়াছে যে, পৃথিবীতে আগমনের পর আদম (আ) লজ্জায় তিন শত বৎসর পর্যন্ত মাথা উঠাইয়া তাকান নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আদম-হাওয়া জান্নাতের নিয়ামতরাজি হারাইয়া দুই শত বৎসর পর্যন্ত কান্নাকাটি করিয়া কাটান। চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহারা কোনরূপ পানাহার করেন নাই। আদম ও হাওয়া এক শত বৎসর পরস্পর মিলিত হন নাই। তারপর যখন আল্লাহ তদীয় বান্দা আদমের প্রতি দয়া করিতে মনস্থ করেন তখন তাঁহাকে কতিপয় কলেমা শিক্ষা দেন (ছা'লাবী, আরাইস, পৃ. ৩৬)।

আদম (আ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ, সালাত ও হজ্জ আদায়

মসজিদ নির্মাণ ও উহা আবাদ করা একটি অতীব পূণ্য কাজ। কুরআন শরীফের আয়াতে মসজিদ আবাদ করাকে প্রকৃত ঈমানদার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের কাজ বলিয়া (৯ ঃ ১৮) উল্লেখ করা হইয়াছে। হাদীছে আছে ঃ

انَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ـ

"যে ব্যক্তি কোন মসজিদ নির্মাণ করিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করিবেন।" এই পূণ্য কাজটিও সর্বপ্রথম আদি পিতা হযরত আদম (আ) স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে করিয়াছিলেন। অবশ্য কা'বার নির্মাণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ আছে। আল-আযরাকী তদীয় 'আখবার মাক্কা' গ্রন্থে লিখেন ঃ "ফেরেশতাগণ সর্বপ্রথম কা'বা নির্মাণ করেন। হযরত আদম (আ)-এর জন্ম তখনও হয় নাই"। এই উক্তির স্বপক্ষে তিনি হযরত যায়নুল 'আবিদীন (র) বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা আছে।

আন্-নাওয়াবী তদীয় 'তাহ্যীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত' গ্রন্থে খণ্ড পৃ. উল্লেখ করেন যে, ফেরেশতাগণই সর্বপ্রথম কা'বা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তারপর হযরত আদম কা'বা নির্মাণ করেন। ইহার সমর্থনে আল-বায়হাকী দালাইলুন্-নুবুওয়া গ্রন্থে মারফূ' হাদীছ পেশ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ

(স) বলেন, আল্লাহ পাক জিবরাঈলকে হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর নিকট প্রেরণ করিয়া কা'বা নির্মাণ করার আদেশ দেন। তাঁহারা আল্লাহ্র আদেশ পালনার্থেই কা'বা নির্মাণ করেন। নির্মাণ শেষে কা'বা তাওয়াফ করার নির্দেশও তিনি দিয়াছিলেন। অতঃপর বহুকাল অতিবাহিত হইবার পর হযরত নূহ্ (আ) কা'বায় হজ্জ পালন করেন।

আল-আযরাকী হইতে এরূপ আরেকটি মতও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আদম (আ) কা'বা নির্মাণ করেন এবং তিনি তাঁহার বক্তব্যের অনুকূলে দুইটি রিওয়ায়াত উল্লেখ করেন। বিখ্যাত হাদীছবেত্তা আবদুর রায্যাক স্বীয় গ্রন্থ 'আল-মুসান্নাফ'-এ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, হযরত আদম (আ) পাঁচটি পাহাড়ের দ্বারা কা'বা নির্মাণ করেন। পাহাড়গুলি হইল লুবনান, তূরে যীতা, তূরে সায়না, আল-জূদী ও হিরা।

আল-মুহিব্ব আত-তাবারীর ভাষ্য মুতাবিক কা'বার ভিত্তি নির্মাণে হিরা পর্বতের পাথর ব্যবহার করা হয়। হযরত আদম (আ)-এর পর তদীয় পুত্র শীছ (আ) দ্বিতীয়বার কা'বা নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন (শিফাউল গিরাম, ১খ, পৃ. ৯২-৯৩; দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩১, কাবা শরীফ শীর্ষক নিবন্ধ)।

সূরা আল ইমরানের আয়াতে (৯৬) বলা হইয়াছে ঃ "নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যাহা মানবজাতির জন্য নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাই হইতেছে ঐ ঘর যাহা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়।"

উহার তাফসীরের সারসংক্ষেপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র) বলেন, মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহটি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে নির্ধারিত করা হয় তাহা ঐ গৃহ যাহা বাক্কা তথা মক্কায় অবস্থিত। অতএব কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম ইবাদতগৃহ। উহার অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম ঘরটি ইবাদতগৃহরূপে নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে পৃথিবীর বুকে না কোন ইবাদতগৃহের অস্তিত্ব ছিল, না কোন বাসগৃহের অস্তিত্ব ছিল। হযরত আদম (আ) ছিলেন আল্লাহ্র নবী। তাঁহার ব্যাপারে ইহা অকল্পনীয় নহে যে, আপন বাসগৃহ নির্মাণের পূর্বেই তিনি আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য গৃহ নির্মাণকে অগ্রাধিকার দিবেন। এই কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা), মুজাহিদ, কাতাদা, সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী ও তাবিঈর মতে, কা'বাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ। আবার ইহাও অসম্ভব নহে যে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইবাদতের জন্য সর্বপ্রথম কা'বা গৃহই নির্মিত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত অভিমতটি হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে।

বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তাহাদেরকে কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। গৃহ নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইলে তাঁহাদেরকে উহার তাওয়াফ করার আদেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয়, হে আদম! আপনিই পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম মানব এবং এই ঘরটিই

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদত গৃহ, যাহা মানবজাতির জন্য নির্ধারিত হইয়াছে (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১১৪; ইব্ন কাছীরের বরাতে)। কোন কোন হাদীছের ভাষ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত নূহ (আ)-এর যুগে সংঘটিত মহাপ্লাবন পর্যন্ত হযরত আদম (আ) নির্মিত এ কাবা গৃহখানা অক্ষত ছিল (দ্র. ঐ)।

বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত আরো একখানা হাদীছে আছে যে, হযরত আবূ যার (রা) একদা হুযুর (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? হুযুর (স) বলিলেন ঃ মসজিদুল হারাম (কা'বা গৃহ)। আবূ যার (রা) পুনরায় প্রশ্ন করেন, তারপর কোনটি? হুযুর (স) বলেন, বায়তুল মাকদিস। দুই মসজিদের নিমার্ণকালের ব্যবধান কত, এই মর্মে আবার প্রশ্ন করিলে তিনি জবাব দিলেন ঃ চল্লিশ বৎসর (পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫)।

এই ব্যাপারে ছা'লাবীর বর্ণনাটি এইরূপ ঃ "(আদম (আ)-এর তওবা ও ক্ষমা লাভের পর) আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত হইতে একটি ইয়াকূত পাথর নাযিল করিলেন এবং উহা বায়তুল্লাহ তথা কা'বা শরীফের স্থানে রাখিয়া কা'বার স্থান নির্ধারণ করিয়া দিলেন। উহার দুইটি দরজা ঃ পূর্বের দরজা এবং পশ্চিমের দরজা। ঐগুলিতে নূরের ফানুস স্থাপন করিলেন। তারপর আদম (আ)-এর প্রতি ওহীযোগে নির্দেশ দিলেন ঃ আমার আরশের ঠিক নীচে আমার একটি ঘর রহিয়াছে। তুমি ঐখানে গিয়া উহা তাওয়াফ কর, যেমনটি তাওয়াফ করা হইয়া থাকে আমার আরশের চতুষ্পার্শ্বে এবং সেখানে সালাত আদায় কর যেমনটি আমার আরশের চতুষ্পার্শ্বে সালাত আদায় করা হইয়া থাকে। সেখানেই তোমার দু'আ কবুল হইবে।

সেইমতে আদম (আ) ভারতবর্ষ হইতে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের জন্য মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পথ প্রদর্শনের জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐ যাত্রায় আদম (আ) যে সকল স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন সেইগুলিতে জনপদ গড়িয়া উঠে আর যে সমস্ত স্থানে তাঁহার পদচিহ্ন পড়ে নাই সেগুলি অনাবাদ ও উষর ভূমিতে পরিণত হয়। তিনি যখন আরাফাত প্রান্তরে গিয়া উপনীত হন এবং অবস্থান করেন তখন হাওয়া আরাফাত দিবসে আরাফাত প্রান্তরে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। সে দিন হইতে ঐ দিনটি আরাফাতের দিন এবং ঐ স্থানটি আরাফাত বলিয়া অভিহিত হয়। কেননা এ স্থানেই তাঁহাদের সাক্ষাত ও পুনর্মিলন হইয়াছিল। তারপর তাঁহারা উভয়ে মিনার দিকে যান। সেখানে আদম (আ-কে বলা হয় ঃ তোমার যাহা চাহিবার তাহা চাহিয়া লও। তিনি বলিলেন ঃ

اتمنى المغفرة الرحمة

"আমি মাগফিরাত (ক্ষমা) ও রহমত কামনা করি।" এই تمنى বা কামনা করা শব্দ হইতে মিনা শব্দটির উৎপত্তি এবং ঐ দিন হইতেই ঐ স্থানটি 'মিনা' নামে পরিচিতি লাভ করে। রিওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে ঃ তাঁহাদের গুনাহ মাফ হইল এবং তাঁহাদের তওবা কবুল করা হইল। সেখান হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন। মুজাহিদ (র) বলেন, তাহাদের গুনাহ মাফ করা

বা তওবা কবুল করা হয়, অতঃপর তাঁহারা হিন্দ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। আদম (আ) ভারত ভূমি হইতে চল্লিশ বার পদব্রজে মক্কায় হজ্জ করিতে যান। তখন মুজাহিদকে প্রশ্ন করা হয়, হে আবুল হাজ্জাজ! তিনি বাহন ব্যবহার করিলেন না কেন? মুজাহিদ বলিলেন, কোন বাহনই বা তাঁহাকে বহন করিতে পারিত! তাঁহার এক একটি পদক্ষেপ তো তিন দিনের পথ ছিল?

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বলেন, আদম (আ) যখন হজ্জ ও আনুষঙ্গিক সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করিলেন তখন ফেরেশতাগণ তাঁহার হজ্জ ও তওবা কবুলের জন্য অভিনন্দিত করিলেন।

দয়া প্রবণতা ও সন্তান বাৎসল্য

কুরআন শরীফে মানব ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ.

"আমি জিন জাতি ও মানব জাতিতে সৃষ্টি করিয়াছি এইজন্য যে, তাহারা আমার ইবাদত করিবে" (৫১ ঃ ৫৬)। এই আয়াতে আদম সৃষ্টির বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে। আদম দেহে আত্মা সঞ্চারের মুহূর্তে তিনি হাঁচির পর আলহামদু লিল্লাহ বলিলে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমার প্রতি তোমার প্রতিপালক রহমত বর্ষণ করুন হে আদম! দয়া-প্রবণতার জন্যই আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি" (আরাইস, পৃ. ২৯)।

সেই মুহূর্তে তাঁহার এই চেতনার উদ্ভব হয় যে, উদ্বেলিত অনুতপ্ত অন্তরে স্রষ্টার দরবারে কাকুতি-মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিতে হইবে। আদম (আ)-এর মধ্যে ঐ মুহূর্তে ঐ চেতনাটিও অনেকটা সহজাতভাবে জাগিয়া উঠে। আল্লামা ছা'লাবীর উদ্ধৃত বর্ণনায় ঐ কথাটি ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ "কোন কোন বর্ণনায় আছে, যখন আদমকে তাঁহার প্রভু বলিলেন, তোমার প্রতিপালক তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন হে আদম! আদম ঊর্ধ্ব দিকে হস্ত উত্তোলিত করিয়া উহা তাঁহার মস্তকে রাখিলেন এবং আহ্ উহ্ বলিয়া উঠিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলিলেন ঃ তোমার কী হইল হে আদম? তিনি বলিলেন, আমি তো ভুল করিয়া বসিয়াছি। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহা কোথা হইতে জানিতে পারিলে? আদম বলিলেন, 'রহমত তো' কেবল অন্যায়কারী ও অপরাধীদের প্রতিই হইয়া থাকে। সেই দিন হইতে উহা তাঁহার সন্তানদের রীতিতে পরিণত হইয়া যায় যে, যখনই তাহাদের কাহারও উপর কোন আপদ-বিপদ আপতিত হয়, তখনই তাহারা মস্তকে হাত রাখিয়া আহ্ উহ্ করিয়া উঠে" (আরাইস, পৃ. ২৯)।

আদি মানব আদম (আ)-এর চরিত্রে এই মমত্ববোধ সেই সৃষ্টির আদিম প্রভাতেই মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রূহের জগতে (মতান্তরের আরাফাত প্রান্তরে) যখন তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুণ্যবান ও পাপী বান্দাদের আত্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার ডানে-বামে উপস্থিত করা হয়, আর একটি অতি উজ্জ্বল আত্মার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, উনি তাঁহারই এক ভাবী বংশধর দাউদ (আ), আর তাঁহার আয়ু মাত্রই ষাট বৎসর, তখন ঐ স্বল্পায়ু সন্তানটির জন্য তাঁহার অন্তরে দয়ার

উদ্রেক হয়। তাঁহার নিজের জন্য নির্ধারিত আয়ু এক হাজার বৎসর জানিতে পারিয়া তিনি স্বেচ্ছায় চল্লিশটি বৎসর (বর্ণনান্তরে ষাট বৎসর) তাঁহার সেই ভাবী সন্তানকে দান করিয়া সৃষ্টির সূচনা লগ্নেই সন্তান বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন (দ্র. মুসনাদে আহমাদ, ১খ, ২৫২, ২৯৯; বায়হাকী, ১০খ, ১৪৬; ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৬)।

কুরবানী

কন্যা আকলিমার বিবাহ লইয়া কাবীল যখন জিদ ধরে তখন আদম (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক হাবীল ও কাবীল উভয়কেই আল্লাহ্র দরবারে কুরবানী পেশ করিবার নির্দেশ দান করেন, যাহা ইতোপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। উহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার কাল হইতেই কুরবানী প্রথা চালু হয়।

সন্তানদের প্রতি ওসিয়াত

মৃত্যুর পূর্বেই পুত্র-পরিজনের প্রতি প্রয়োজনীয় ওসিয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধানটিও আদম (আ)-এর যুগেই প্রবর্তিত হইয়াছিল। আদম (আ) তাঁহার ইনতিকালের পূর্বেই তাঁহার সন্তান-সন্ততিদের প্রতি তাঁহার পরবর্তী নবী শীছ (আ)-এর প্রতি অনুগত থাকিবার নির্দেশ দিয়া যান।

সাক্ষী রাখা ও দলীল লিখনের বিধান

সূরা আ'রাফের আয়াত উদ্ধৃত করিয়া ইতোপূর্বে আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ, ৮৩-তে উদ্ধৃত হাদীছসহ আদম (আ)-এর পুত্র দাঊদকে তাঁহার নিজ আয়ু হইতে ৪০ বৎসর দানের ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আয়াতে আছে ঃ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ.

"আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকেই তাহাদের নিজ সত্তা সম্পর্কে সাক্ষী রাখেন" (৭ ঃ ১৭২)। তারপর ঐ আয়াতের শেষভাগে স্পষ্টভাবে বলা আছে ঃ

قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ.

"তাহারা বলিল, হাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষী রহিলাম। ইহা এইজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, "আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম" (৭ ঃ ১৭২)।

মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকর মাংস নিষিদ্ধ ও বর্ণমালার ব্যবহার

হযরত (আ)-এর রিসালাত ও শরীআতের কথা হযরত আবূ যার (রা) বর্ণিত হাদীছের শেষ অংশে বর্ণিত ইহয়াছে ঃ "এবং তাঁহার প্রতি নাযিল করিয়াছেন মৃত জন্তু, রক্ত ও শূকর মাংস ভক্ষণের নিষেধাজ্ঞা এবং বর্ণফল একুশটি পাতায়" (ইব্নুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, বৈরূত)। উক্ত রিওয়য়াত হইতে জানা গেল যে, বর্ণমালাও তাঁহার নিকট প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিল।

মৌনতা অবলম্বন

সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে সাঈদ ইব্ন জুবায়র বর্ণিত একটি রিওয়ায়াতে প্রতীয়মান হয় যে, মৌনতা অবলম্বন বা স্বল্পবাক থাকার নির্দেশও হযরত আদম (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই রিওয়ায়াতটি এইরূপ ঃ "আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ)-কে পৃথিবীতে পাঠাইলেন, তখন (ক্রমে ক্রমে) তাঁহার সন্তান-সন্তুতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। একদা তাঁহার পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল এবং তাঁহার নিকটেই নানারূপ আলাপ-আলোচনা করিতে লাগিল। আদম (আ) কিন্তু একটিও কথা না বলিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। তখন তাহারা অনুযোগ করিয়া বলিল, হে আমাদের পিতা! আমরা কথাবার্তা বলিতেছি, অথচ আপনি একেবারে চুপচাপ, একটি কথাও বলিতেছেন না, ব্যাপার কী? জবাবে তিনি বলিলেন, হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহার নৈকট্য হইতে অমাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিতে গিয়া বলেন ঃ হে আদম! আমার সকাশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তুমি স্বল্পবাক থাকিবে" (ইবন জারীর তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৫৮-১৫৯; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৯৮; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম, ১খ, ২২১)।

আদম সৃষ্টি ও বিবর্তনবাদ

হযরত আদম (আ) যেহেতু পৃথিবীর আদি মানব, তাই তাঁহার জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির পূর্ণ বিবরণ আসমানী কিতাবসমূহের আলোকে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে ১৮৫৯ সালে লন্ডন হইতে প্রকাশিত বিজ্ঞানী ডারউইনের On the Origin of Species গ্রন্থের বক্তব্য আসমানী গ্রন্থসমূহের হিদায়াত বঞ্চিত বা তাহাদের অবিশ্বাসী শ্রেণীর লোকজনকে বিবর্তনবাদের এক নূতন ধূম্রজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাচীন যুগের বিভিন্ন প্রাণীর ফসিল পর্যালোচনা করিয়া ঐ তথাকথিত 'বিবর্তনবাদ' তত্ত্বে এমন একটি ধারণা দেওয়া হইয়াছে যে, ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে মানবজাতি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আদিতে এই মানুষ মানব আকারে ছিল না। বানর ও মানুষের অবয়বগত সামঞ্জস্য দর্শনে বিভ্রান্ত হইয়া এই তত্ত্বে বিশ্বাসিগণ উক্ত জাতি যে এক ও অভিন্ন পূর্ব প্রজন্ম হইতে সৃষ্ট এইরূপ একটি ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। তাদের এই অনুমানসর্বস্ব তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেননা ওহী তথা আসমানী হিদায়াত বা পথনির্দেশই অভ্রান্ত সত্য। এতদসত্ত্বেও সত্যানুসন্ধানী মানুষকে বিভ্রান্তমুক্ত রাখার উদ্দেশে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে, 'অন দি অরিজিন অব স্পেসিস' গ্রন্থের জন্য ডারউইনকে বিবর্তনবাদের প্রবর্তকের মর্যাদা দিয়া বিশ্বজোড়া আলোড়ন সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তিনি তাঁহার উক্ত পুস্তকটির ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ পর্যন্ত 'বিবর্তনবাদ' বা ইভ্যুলিউশন শব্দটির আদৌ ব্যবহার করেন নাই (মরিস বুকাইলী প্রণীত গ্রন্থের অনুবাদ 'মানুষের আদি উৎস, পৃ. ৩৫)।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের অসারতা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া ফরাসী পণ্ডিত মরিস বুকাইলী (বুকাই) বলেন ঃ "কোন একটা প্রাণীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন বা পার্থক্য তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, তারপর আর সব কিছুকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে সেই পার্থক্য বা পরিবর্তনকেই বড় করে তুলে ধরেছিলেন। অথচ কোন প্রাণী বিশেষের মধ্যকার কোন পরিবর্তন বা পার্থক্য কখনও সেই প্রাণীর নিজ প্রজাতিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। অন্য কথায়, কোন ধরনের পরিবর্তন এক প্রজাতিকে অন্য প্রজাতিতে পরিণত করতে পারে না" (মানুষের আদি উৎস, পৃ. ৬৬)।

উপরিউক্ত সত্যের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বৃটিশ রাজকীয় ডাকঘরের ডারউইনের শত বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ডাক টিকেটের মধ্যে। তাহাতে ডারউইনের দাবির দুই পার্শ্বে দুইটি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর ছবিও স্থান পায়। ঐ দুইটি ডারউইনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল ঃ " এই যে জনাব! মেহেরবানী করিয়া শুনুন, আপনার থিওরীকে এড়াইয়া গিয়া এই যে, আমরা কোটি কোটি বৎসর যাবৎ আদি কালের সেই একই প্রজাতিরূপে রহিয়া গিয়াছি" (মানুষের আদি উৎস, পৃ. ৭৮)।

মরিস বুকাইলী এই সত্যটিকে আরও স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন, "বিবর্তনের এই বিষয়টাকে আরেকটা বাস্তবতার সাথেও তুলনা করে দেখতে হবে। সেই বাস্তবতাটা হচ্ছে নানা ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং তেলা পোকার মত এক শ্রেণীর পোকা-মাকড়ের অস্তিত্ব। ঐ শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া ও পোকা-মাকড় যে তাদের আদিম যুগের অবয়ব নিয়েই এ যাবৎ টিকে রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই, যদিও এর মধ্যে একই প্রজাতিতে ভিন্নতা ঘটেছে এবং ঘটেছে প্রচণ্ডতর ব্যাপকতার সঙ্গেই। নব্য-ডারউইনবাদীরা প্রাণের এবং প্রজাতির বহুকরণের ব্যাপারটা শুধু লক্ষ্য করে গেছেন। কিন্তু একই প্রাণী প্রজাতির কমবেশি অভিন্ন থাকার মত সুস্পষ্ট অথচ অনড় একটি বিষয়কে তাঁরা যে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ফলে তাদের গোটা থিওরিটাই মাঠে মারা পড়েছে" (মানুষের আদি উৎস, পৃ. ৭৯)।

বিবর্তনবাদের আলোচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানী ও এইচ ক্লার্ক লিখেন ঃ "মানুষ স্তন্যপায়ী এবং ইহাও সন্দেহাতীত যে, মানুষের সহিত বিশেষ আকারের বানরের অবয়বগত বিশেষ মিল রহিয়াছে। ইহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু মানুষের শুধুমাত্র অবয়বগত মিল দেখিয়া অন্যান্য প্রাণীর সহিত উহার যথার্থ সম্পর্ক নির্ণয় করা বা বর্তমান পৃথিবীতে তাহার যথার্থ স্থান নির্ধারণ করা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে মানুষের যথাযথ রূপ নির্ধারণে অনেক জীববিজ্ঞানীই উদারতার দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করিয়া শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্রাণীর দেহগঠন কাজ তাহার মানসিক গঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাহা ব্যাখ্যা করার মত কোন পদার্থবিদ্যা বা রাসায়নিক জ্ঞান আজ পর্যন্ত আমরা পাই নাই। প্রতিটি রকমের ও জাতির জীবের মধ্যে বিশেষ ধরনের জটিল মনোগঠন লক্ষ্য করা যায়, যাহা ঐ বিশেষ প্রকারের জীবের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। প্রত্যেক প্রকার জীবের এই যে মনোগঠন তাহা তাহার দৈহিক গঠনের মতই গুরুত্বপূর্ণ" (The New Evolution, by H. clerk পৃ. ২৩)।

বিবর্তনের জন্য ফসিলকেই বিশ্বস্ততর ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। সরল জীবন হইতে ক্রমশ জটিল জীবনের দিকে যে বিবর্তন তাহা কেবল ফসিলের ইতিহাস হইতেই জানা যাইতে পারে। তাই স্বয়ং ডারউইন তদীয় 'অরিজিন অব স্পেসিস' গ্রন্থে বিজ্ঞানী Dundor-কে উদ্ধৃত করিয়াছেন এইভাবে ঃ "সরল জীবন হইতে ক্রমশ জটিল হইতে জটিলতর জীবনের দিকে যে বিবর্তন তাহা শুধু ফসিলের ইতিহাস হইতেই জানা যাইতে পারে। জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদের তুলনামূলক বিচারের দ্বারা তাহা পারিপার্শ্বিক প্রমাণ মাত্র, ঐতিহাসিক দলীল নির্ভর প্রমাণ নহে (ওরিজিন অফ স্পেসিস, প্যারা ২, পৃ. ৫২)।

আবার জি. জি সিম্পসন (১৯৪৪ সালে) বলেন ঃ বিভিন্ন প্রকার জীবের মধ্যে ক্রম সম্পর্কহীনতা এত বেশী এবং উচ্চ স্তরের জীবের মধ্যে এত প্রবল যে, এই সময়ে ক্রমসম্পর্ক পাওয়াই যায় না (দ্র. Tempo and mode in Evolution, P. 99)। এই বিভিন্ন জীবের মধ্যে অমিল থাকাই বিবর্তন তত্ত্বের পক্ষে একটি বিরাট বাধাস্বরূপ (অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম, পৃ. ১৪১।

এক রকম পাখী আছে যাহার লেজ সরীসৃপের মত। ইহা হইতে ধরিয়া লওয়া হয় যে, সরীসৃপ হইতেই পাখি সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা অনুমান মাত্র। ডাকবিল (duckbell) দুগ্ধপায়ী জীব ও সরীসৃপের মত। তাই বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, সরীসৃপ হইতেই উহার উদ্ভব ঘটিয়াছে (দ্র. অধ্যক্ষ আবুল কাসেম, বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম, বিবর্তনবাদ ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব, পৃ. ১৪১)?

জীব বিজ্ঞানের বিখ্যাত পণ্ডিত ডব্লিউ জে টিংকলও বিবর্তনবাদের প্রমাণ যে নির্ভরযোগ্য নহে তাহা স্বীকার করিয়াছেন এইভাবে ঃ "ইতোমধ্যেই আমরা দেখিয়াছি, কীভাবে অবস্থান বিবেচনার চাইতে স্তর মধ্যকার ফসিল দেখিয়া মাটিস্তরের বয়স নির্ণয় করা হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে যে, এই কারণে বর্তমান গবেষণার জন্য এই ভূ-তাত্ত্বিক রেকর্ডের মূল্য নেহায়েত কম। কেননা যদি মাটি স্তরের বয়স নির্ণয়ের জন্য ফসিল ব্যবহার করা হয় তবে আমরা অমনি উল্টা ঘুরিয়া বলিতে পারি না যে, মাটির স্তরের বয়স নির্ধারণ করা যাইবে। বিবর্তনবাদী ভূ-তাত্ত্বিক বিবর্তন তত্ত্বকে সত্য ও নির্ভুল ধরিয়া লইয়াই উহার ভিত্তিতে তথ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইয়া থাকেন যদ্দরুণ এই রকম বিবর্তনবাদীর পাওয়া তথ্য দিয়া প্রমাণ করা যায় না যে, সরল আকার হইতেই প্রাণী জগতের বিকাশ ঘটিয়াছে" (Fundamental of Zoology, P. 438)।

বির্তনবাদী পণ্ডিত দবজানিস্কি (Dobzhanski) একটি চমৎকার চিত্রকল্পের অবতারণা করিয়া অনুমান-নির্ভর বিবর্তনবাদের অবাস্তবতার প্রমাণ দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ "কল্পনা করুন যে, এই বাক্সের মধ্যে ছাপার টাইপ লইয়া একটি বানর ঝাঁকি দিতেছে। ঘটনাক্রমে কি ঐ টাইপগুলি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' পুস্তকটি রচনা করিতে পারে? প্রথম দৃষ্টিতেই এই অসুবিধা, যাহা স্বয়ং ডারউইনকেও অপ্রতিভ করিয়া তুলিয়াছিল, জীববিজ্ঞানের ভিতরের ও বাহিরের বহু চিন্তাবিদের নিকট অগ্রহণযোগ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভান করিয়া লাভ নাই যে, (বানরের উদাহরণ দিয়া) সেই অসুবিধাটুকুর সন্তোষজনক সমাধান করা হইয়াছে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক আবুল কাসেম তদীয় আলোচনার উপসংহারে লিখেন ঃ "উপরে যা বলা হয়, তাতে দেখা যাবে, বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বকে নস্যাৎ করবার শক্তি এখনও বিবর্তন তত্ত্ব পায়নি। বিশেষ সৃষ্টি তত্ত্বের সমর্থকরা বলেন, বিবর্তন যে হয় তা সত্য কিন্তু এটা হয় এক একটা প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধভাবে। এটা স্বীকার করে নিলে বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্ব তথা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। বিবর্তন তত্ত্বে যে বহু অলৌকিকতার অস্তিত্ব রয়েছে তাও আজ বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। বৃটিশ জীববিজ্ঞানী ডগলাস ডিওয়ার বলেন, বিবর্তন তত্ত্ব অলৌকিকতার অবসান কামনা করেছিল সত্য, কিন্তু তার দ্বারা তা সম্ভব হয়নি। এটা বিশেষ সৃষ্টিতত্ত্বের অলৌকিকতাকে নতুনভাবে পরিবেশন করেছে মাত্র" (আবুল কাসেম, বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম, পৃ. ১৪৩)।

ডারউইনের স্বীকারোক্তি

বিবর্তনবাদ তত্ত্ব যে একটা অনুমান-নির্ভর তত্ত্বমাত্র, প্রমাণিত সত্য নহে, স্বয়ং ডারউইন তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্যারিস হইতে প্রকাশিত এস ডারনেট লিখিত " ইভ্যুলিউশন অব দি লিভিং ওয়ার্ল্ড" পুস্তকে তাঁহার স্বলিখিত একটি স্বীকারোক্তিপত্রের ফটোকপিও মুদ্রিত হইয়াছে, যাহার মূল কপি বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়া লেখক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন (সূত্র এ ডি এম এস, ৩৭৭২৫ এফ ৬)।

১৮৬১ সালে টমাস হটন স্কয়ারকে লিখিত উক্ত পত্রে ডারউইন স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন যে, বিবর্তনবাদের ব্যাখ্যায় সত্য সত্যই তিনি ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য উক্ত পত্রে ডারউইন ইহাও বলিয়াছেন, "তবে আমি নেচার‍্যাল সিলেকশন বা প্রকৃতির নির্বাচন তত্ত্বে বিশ্বাসী। যদিও এই থিওরী অনুযায়ী কোন প্রজাতি এ যাবৎ পরিবর্তিত হইয়া অন্য আরেকটি প্রজাতিতে পরিণত হইয়াছে এমন একটি প্রমাণও আমি দেখাইতে পারিব না, তথাপি আমি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি..... ।"

উপরিউক্ত পত্রখানা উদ্ধৃত করিয়া ফরাসী বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী মন্তব্য করেন ঃ "উপরিউক্ত পত্রের বক্তব্য থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট। ডারউইন নেচারাল সিলেকশনের নামে যে থিওরীর কথা বলতেন তার দ্বারা একটি প্রজাতি পরিবর্তিত হয়ে পুরোপুরি অন্য একটা প্রাণীতে যে পরিণত হয় না, সে বিষয়ে তিনি সম্যক অবহিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, নিজস্ব উদ্দেশ্যমূলক পর্যবেক্ষণের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসাবে যখন তিনি নেচারাল সিলেকশনের আনুমানিক প্রভাবের কথা বলতেন, তখনও তিনি গোটা বিষয়টাকে নিছক একটা থিওরী বা তত্ত্ব হিসাবেই উপস্থাপন করতে চাইতেন। অথচ সংজ্ঞা হিসাবেই থিওরী বা তত্ত্ব হচ্ছে নিছক একটা ধারণা বা হাইপোথিসিস মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। এই ধরনের থিওরী বা তত্ত্ব সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের ঘটনার ব্যাখ্যায় সূত্র হিসাবে কাজ করে থাকে। মানবজ্ঞানের অগ্রযাত্রার একটা পর্যায় বা সময়কাল পর্যন্ত এ ধরনের কোন থিওরী উপযোগী বলে প্রতীয়মানও হইতে পারে। তবে কোন্ থিওরী কতটা সঠিক, তার প্রমাণ সাব্যস্ত হয় সময়ের ধারায়। সময়ের সেই বিচারে ডারউইন থিওরী যে সঠিক তত্ত্ব হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে সে কথা এখন আর বলা চলে না" (মানুষের আদি উৎস, পৃ. ৬৪)।

ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্ব যতই সেকেলে ও অবান্তর হউক না কেন, এক শ্রেণীর লোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এই কথাটি মরিস বুকাইলী ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাবে ঃ "দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, এই ডারউইনবাদকে যতটা না জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার চেয়ে অধিক মাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে আদর্শগত উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত হিসাবে। অধুনা আমরা বিবর্তনবাদের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক বেশী ওয়াকিফহাল। আর এটা সম্ভব হয়েছে জীবাশ্ম বিজ্ঞানসহ অপরাপর প্রকৃতি বিজ্ঞানের বহুবিধ সঠিক তথ্য ও প্রমাণ আবিষ্কারের দরুন। শুধু তাই নয়, ডারউইনের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রাপ্ত বংশগতি (জেনেটিক) ও জীববিজ্ঞান (বিশেষত মলিকুলার বায়োলজি) সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য জ্ঞান অর্জনে যে কারো পক্ষেই এখন একটা সহজ হয়ে পড়েছে। অথচ এখনও আমাদের কেউ কেউ শতাধিক বছর পূর্বেকার এই বিভ্রান্তিকর ডারউইন থিওরীকে নিয়েই বসে রয়েছে। শুধু তাই নয়, এখনো এই ডারউইন থিওরীর এমন সমর্থকও আছেন, যাহারা মনে করেন, এই থিওরী বাদ দেওয়া মানে তাদের আদর্শের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করা। সুতরাং ডারউইনের এই থিওরী আজকের যুগে যতই বাতিল বলে প্রমাণিত ও হাস্যকর বলে বর্জিত হোক না কেন, তারা যে কোন মূল্যেই যে তা আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইবেন, সেটাই স্বাভাবিক" (মানুষের আদি উৎস, পৃ. ৬৪-৬৫)।

বিবর্তন সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গিয়া অধ্যক্ষ আবুল কাসেম বৈজ্ঞানিক উদ্ধৃতিসহ যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেন ঃ "জীবদেহের কার্যপ্রকৃতি মূলত যন্ত্রের কার্য প্রকৃতি থেকে পৃথক। জীব প্রকৃতি মেসিনের স্বরূপ দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। মনে হয় জীবন একটি মৌলিক সত্তা। অধিকন্তু ইহা সৃষ্টিশীল। ইহা জীবদেহের স্বরূপগুলিকে এমনভাবে তৈরি ও ব্যবহার করে যাতে তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ সিদ্ধ হয়। এই কারণে সৃষ্টিধর্মী বিবর্তনবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই তত্ত্ব এমন একটি উদ্দেশ্যশীল শক্তি বা নীতির প্রমাণ দেয় যা জীবদেহ থেকে একটি আপাত দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করার তাগিদে ক্রমশ উন্নততর জীবনের বিকাশ সাধন করছে। অতীতে জীব বিজ্ঞান ডারউইন তত্ত্বকে অবলম্বন করে নাস্তিক্যবাদী ভাবের বিস্তার করেছিল। আধুনিক জীববিজ্ঞান আজ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে, জীবন বস্তুধর্মী যন্ত্র নয়, জীবন একটি মৌলিক ব্যাপার। অধিকন্তু এটা সৃষ্টিশীল ও উদ্দেশ্যশীল।

"আধুনিক দার্শনিক ও বিজ্ঞানীরা ভাবছেন বিবর্তন সত্য হলেও সেটা অন্ধভাবে ঘটছে না। এমন সুন্দর ও সুসমঞ্জস সৃষ্টি বিনা চিন্তায় বিনা পরিকল্পনায় সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি বিবর্তন ধারার মধ্যে একটি মহামন master mind কাজ করছে। এই মহামনই প্রত্যেকটি বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়ে একটা উদ্দেশ্যের দিকে সৃষ্টিকে পরিচালিত করছে। সুতরাং জীববিজ্ঞান আজ একটি মহামনের দিকে একটি উদ্দেশ্যশীল সত্তার দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে। অন্য কথায়, যে বিবর্তনবাদ নাস্তিকতার পোষক হিসাবে দেখা দিয়েছিল তারই আধুনিক রূপ আজ তাকে আস্তিকতার মাহাত্ম্যে উন্নত করে তুলে ধরছে" (বিজ্ঞান সমাজ ধর্ম, পৃ. ১৪৩-৪৪)।

আল-কুরআনে এই সত্যটিই ঘোষিত হইয়াছে মুমিনের দু'আরূপে ঃ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের প্রতি পালক! এই সৃষ্টিজগত তুমি অনর্থক সৃষ্টি কর নাই। তুমি পবিত্র, আমাদেরকে দোযখের শাস্তি হইতে রক্ষা করিও" (৩ : ১৯১)।

শেখ সাদী (র) সম্ভবত এই উপলব্ধি হইতেই বলিয়াছিলেন :

"বৃক্ষপত্রে কিশলয় দেখে তারে সজাগ সুজন

স্রষ্টার মহিমা কীর্তি প্রতিপত্রে রয়েছে লিখন।"

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা যে একটা মহান উদ্দেশ্যে আসমান-যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, কুরআন শরীফের বহু স্থানে উহার উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ.

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করি নাই। অনর্থক সৃষ্টি করার ধারণা তাহাদের যাহারা কাফির। সুতরাং কাফিরদের জন্য রহিয়াছে জাহান্নামের দুর্ভোগ" (৩৮ : ২৭)।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পর্কে বলেন,

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ. مَا خَلَقْنٰهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের মধ্যে কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই। আমি এই দুইটি অযথা সৃষ্টি করি নাই, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না" (৪৪ : ৩৮-৩৯)।

বিবর্তনবাদের আলোচেক বৈজ্ঞানিকগণ যে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা-সমালোচনায় কুরআনের উক্ত সত্য উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতেছেন ইহা একটি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

কয়েকটি প্রসঙ্গিক বিষয়

ফেরেশতা

বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত ফিরিশতা বা ফেরেশতা শব্দটির মূল ফার্সী রূপ হইতেছে ফেরেশ্‌তা বা ফারিশতা। উহাও ফার্সীর ব্যবহৃত রূপ। আসলে ফার্সী فرسادان ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দটি হইতে فرسته যাহার অর্থ প্রেরিত। তাঁহারা আল্লাহ্‌র নিকট হইতেই প্রেরিত এবং তাহার বার্তাবহনই তাঁহাদের প্রধান কাজ, সেই হেতু তাহাদের এইরূপ নামকরণ। ইহার আরবী প্রতিশব্দ : এক বচনে 'মালাক' এবং বহু বচনে 'মালাইকা' (লুগাতে কিশওয়ারী, পৃ. ৩৪৫) الوك ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। রাগিব ইস্পাহানীয় ভাষায়ঃ

উলূক শব্দের অর্থ রিসালত বা বার্তা পৌছাইয়া দেওয়া। তাই আরবী বাক্যে যখন বলা হয় وادنى তখন ইহার অর্থ হয় "অমুককে আমার বার্তা পৌছাইয়া দাও"। আরবী مالك শব্দটি

আসলে مألك অর্থাৎ বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত (আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, শিরো., পৃ. ২১)।

শব্দটি الوكة ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ইহার অর্থ বার্তা পৌঁছানো (রূহুল মাআনী)।

কুরআন শরীফেও সূরা যুখরুফ (৩৪ নং সূরা) ৮০ নং আয়াতে ফেরেশতা অর্থে رُسُلُنَا, আমার রাসূলগণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাফসীরে বায়যাবীতে আছে ঃ "যেহেতু তাঁহারা আল্লাহ্র ও মানুষের মধ্যে মাধ্যমস্বরূপ, সেই হিসাবে তাহারা আল্লাহ্র বার্তাবাহক অথবা মানুষের প্রতি তাঁহার দূতস্বরূপ"।

'তাফসীরে কাবীর'-এর বর্ণনামতে ঃ ইহারা সূক্ষ্ম বায়বীয় দেহধারী, বিভিন্ন রূপ বা আকৃতি ধারণে সক্ষম, তাহাদের আবাসস্থল আসমান। ইহা অধিকাংশ মুসলমানের মত।

বায়যাভী শরীফে ঈষৎ শাব্দিক পরিবর্তনসহ তাহাদের এই পরিচয়ই দেওয়া হইয়াছে।

মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (র) তদীয় তাফসীরে লিখেন ঃ

ফেরেশতাগণের উল্লেখ আল-কুরআনে

আসমানী কিতাব ও হিদায়াতে বিশ্বাসীদের জন্য ফেরেশতাদের অস্তিত্ব ও তাহাদের ভূমিকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন শরীফের অসংখ্য স্থানে ইহাদের আলোচনা আসিয়াছে। কুরআন শরীফের ১০টি স্থানে 'মালাকুন', তিনটি স্থানে 'মালাকান', দুইটি স্থানে 'মালাকায়ন' (দ্বি-বচনে), ৬৮টি স্থানে 'মালাইকা' এবং ৫টি স্থানে 'মালাইকাতুহু'-রূপে ইহার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় (মুহাম্মদ ফুওয়াদ আবদুল বাকী, আল-মু'জাম আল-মুফাহ্রাস, পৃ. ৬৭৪।

কাসাসুল আম্বিয়া প্রণেতা আবদুল ওয়াহ্হাব আনাজ্জার কুরআন শরীফের ৮৬টি সূরায় উক্ত মালাকুন বা মালাইকা শব্দের উল্লেখ ৮৮ বার রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন-যাহার চিত্র নিম্নরূপ ঃ

সূরার ক্রমিক নং	সূরার নাম	আয়াত নম্বরসমূহ
(২)	আল-বাকারা	৩০, ৩১, ৩৪, ৯ ১৬১, ১৭৭, ২১০, ২৪৮, ২৮৫
(৩)	আলে ইমরান	১৮, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৮০, ৮৭, ১২৪ ও
(৪	সূরা নিসা	৯৭, ১৩৬, ১৬৬, ১৭২
(৬)	সূরা আন'আম	৮, ৯, ৫০, ৯৩, ১১১, ১৯৮
(৭)	সূরা আ'রাফ	১১, ২০
(৮)	সূরা আনফাল	৯, ১২, ৫০
(১১)	সূরা হুদ	১২, ৩১

(১২)	সূরা ইউসুফ	৩১
(১৩)	সূরা রা'দ	১৩, ২৩
(১৫)	আল-হিজর	৭, ৮, ২৮, ৩০
(১৬)	সূরা নাহল	২, ২৮, ৩২, ৩৩, ৪৯
(১৭)	সূরা কাহ্ফ	৫০

উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতা আল্লাহ্র অতি নৈকট্যপ্রাপ্ত সম্মানিত সৃষ্টি। আল্লাহ্ তা'আলা নূরের দ্বারা তাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিভিন্ন আয়াতে তাহাদের বিবিধ বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন, সূরা ফাতিরে শুরুতেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ·

"সকল প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্রই, যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশতাদেরকে, যাহারা দুই দুই, তিন তিন অথবা চার চার পক্ষবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টিতে যাহা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৩৫ ঃ ১)।

বিভিন্ন স্তরের ফেরেশতাদের বিভিন্ন সংখ্যক পাখা বা ডানা বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ ডানাসমূহের সংখ্যা চারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, বরং কোন কোন ফেরেশতাকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক বেশি সংখ্যক ডানাও দান করিয়াছেন। যেমন বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম (সা) জিবরাঈল (আ)-কে ছয়শত ডানাবিশিষ্ট অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে, জিবরাঈল (আ)-কে মহানবী (সা) দুইবার ছয়শত ডানাসহ এমন অবস্থায় দেখিয়াছেন যে, গোটা দিগন্ত তাহার ডানাসমূহে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল [তাফহীমূল কুরআন, খ. ৪, পৃ. ২১৮ ও মুখতাসার, ইব্ন কাছীর (সাবূনী), ৩খ, পৃ. ১৩৮]।

সূরা আস-সাফ্ফাত-এর প্রারম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا · فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا · فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ·

"শপথ তাহাদের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ও যাহারা মেঘমালার কঠোর পরিচালক এবং যাহারা যিকির আবৃত্তিতে রত" (৩৭ ঃ ১-৩)।

উক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন ঃ

ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ ইহারা হইতেছেন ফেরেশতাগণ। ইহা ইব্ন আব্বাস (রা), মাসরূক, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, ইকরিমা, মুজাহিদ, সুদ্দী ও কাতাদা (র) প্রমুখেরও অভিমত।

কাতাদা (র) বলেন, ফেরেশতাগণ আকাশে সারিবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে (মুহাম্মদ আলী সাবূনী, মুখতাসার তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩ খ, পৃ. ১৭৫, পাদটীকাসহ, চতুর্থ মুদ্র,ণ বৈরূত, ১৪০১ হি.)।

মক্কার মুশরিকগণ ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলিয়া বিশ্বাস করিত। এই সূরায় তাই বিশেষভাবে ফেরেশতাদের আল্লাহ্র আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

মুসলিম শরীফে জাবির ইব্ন সামুরা (র) হইতে বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,

রাসূল (সা) বলিলেন ঃ তোমরা কি সেইরূপ সারিবদ্ধ হইবে না, যেমন ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রভুর সম্মুখে সারিবদ্ধ হইয়া থাকেন? আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ফেরেশতাগণ তাহাদের প্রভুর সম্মুখে কীভাবে সারিবদ্ধ হইয়া থাকেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ তাঁহারা অগ্রবর্তী সারি পূর্ণ করেন এবং সারি ঘনভাবে সন্নিবেশিত করেন অর্থাৎ একজন অপরজনের সঙ্গে গায়ে গা মিলাইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন (ইব্ন কাছীর)।

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ·

"মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও না" (৪ ঃ ১৭২)।

অন্যত্র আছে, তাহারা দিবারাত্রি আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমায় লিপ্ত থাকেন এবং তারপরও ক্লান্তি বোধ করেন না (দ্র. আল-কুরআন, ৪১ ঃ ৩৮)।

আল্লাহ্র দরবারে তাহাদের উচ্চ মর্যাদার কারণে বিভ্রান্ত মানুষ যুগে যুগে তাহাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা সন্তান বলিয়া ধারণা করিয়াছে, ঈসা মসীহ (আ)-কেও অভিহিত করিয়াছে তাঁহার পুত্র বলিয়া। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَجَعَلُوا الْمَلٰئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُوْنَ ·

"উহারা দয়াময় আল্লাহ্র বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী বলিয়া গণ্য করিয়াছে। ইহাদের সৃষ্টি কি উহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল? উহাদের উক্তি অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উহাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে" (৪৩ ঃ ১৯)।

আসলে নূরের সৃষ্টি এই ফেরেশতাকূলের তো পুরুষ বা নারী হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহারা আল্লাহ্র এক অনন্য সৃষ্টি। ফেরেশতাগণ যে আল্লাহ্র আনুগত্য ও নির্দেশ পালন ও প্রশংসার জন্য সদাপ্রস্তুত তাহার স্বীকৃতি ঐ সূরারই শেষ দিকে স্বয়ং তাহার ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে এই ভাবে ঃ

وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ · وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ · لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ·
لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ·

"আমাদের প্রত্যেকের জন্যই স্থান নির্ধারিত রহিয়াছে। আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী" (৩৭ ঃ ১৬৪-১৬৬)।

ইহার ব্যাখ্যায় ইব্ন কাছীর (র) বলেন ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক ফেরেশতার জন্য আসমানে নির্ধারিত স্থান ও ইবাদত ক্ষেত্র রহিয়াছে। তিনি সেই গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারেন না। ঐ নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই তাহাকে অবস্থান করিতে হয়।

দাহ্হাক (র) বলেন, মাসরূক (র) হযরত আইশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ পৃথিবী সন্নিহিত আকাশের এমন কোন স্থান নাই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সিজদা অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় নাই (মুখতাসার তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩খ, পৃ. ১৯৩, সাবূনী সম্পা.)।

اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ اِنَاثًا اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ․

"তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তিনি কি নিজে ফেরেশতাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলিয়া থাক" (১৭ ঃ ৪০)।

অন্যত্র ফেরেশতাগণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ․

"তাহাদিগকে আল্লাহ্ যে আদেশ করেন তাহারা তাহা অমান্য করে না এবং তাহারা তাহাই করে যাহার আদেশ তাহাদেরকে দেওয়া হইয়া থাকে" (৬৬ ঃ ৬)।

وَتَرَى الْمَلٰئِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ․

"এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখিতে পাইবে যে, উহারা আরশের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া উহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে" (৩৯ ঃ ৭৫)।

ফেরেশতাকুলের মধ্যে চারজন সর্বশ্রেষ্ঠ

(১) জিবরাঈল আলায়হিস সালাম ঃ তাঁহাকে 'রূহুল কুদুস' নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মর্যাদা, শক্তিমত্তা ও আমানতদারী বা বিশ্বস্ততার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন ঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ․ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ․ مُطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ․

"নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী—যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাহাকে সেথায় মান্য করা হয়, যে বিশ্বাসভাজন" (৮১ ঃ ১৯-২১)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সর্বোত্তম কাজ অর্থাৎ তাঁহার এবং তাঁহার সম্মানিত রাসূলগণের মধ্যে দৌত্যকর্মের জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করিয়াছেন। তাই তিনি পৃথিবীতে উহা লইয়া আগমন করিতেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

"নিশ্চয় আল-কুরআন জগতসমূহের প্রতিপালক হইতে অবতীর্ণ। জিবরাঈল ইহা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছে তোমার হৃদয়ে, যাহাতে তুমি সতর্ককারী হইতে পার" (২৬ ঃ ১৯২-১৯৪)।

সহীহ হাদীছের বর্ণনামতে, তিনি সৃষ্টিজগতের ইতিহাসে সর্বদীর্ঘ ও সর্বোত্তম সফর অর্থাৎ ইসরা ও মিরাজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফরসঙ্গীরূপে প্রথমে মক্কা শরীফের মাসজিদুল হারাম হইতে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত এবং তারপর সেখান হইতে সিদ্‌রাতুল মুন্‌তাহা পর্যন্ত সফর করেন, যাহা ঊর্ধ্ব জগতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে অবস্থিত (দ্র. আল-লু'লু' ও ওয়াল-মারজান (সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ চয়নিকা গ্রন্থ, ১খ, পৃ. ৩৫-৩৯; বুখারী, ১খ, ৯২-৯৪; মুসলিম, ১খ, ৯৯-১০১; আরও দ্র. তাফসীর গ্রন্থসমূহে সূরা ইস্‌রা-এর তাফসীর)।

(২) মীকাঈল (আ) ঃ 'আকীদাতুত তাহাবিয়া গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে আছে, "তাঁহার উপর বৃষ্টিপাতের দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে যদ্দ্বারা মর্তভূমি, বৃক্ষলতা এবং প্রাণী জগতের প্রাণ রক্ষা হয়" (শারহু আকীদাতিত-তাহাবিয়া, ২খ, পৃ. ৪০৮)।

(৩) আযরাঈল (আ) ঃ তিনি সৃষ্টিকূলের রূহ কবযের দায়িত্বে নিযুক্ত। এই কাজে তাঁহার সহযোগীরূপে আরও অনেক ফেরেশতা নিয়োজিত রহিয়াছেন। কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ.

"অবশেষে যখন তোমাদের কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায় এবং তাহারা কোন ত্রুটি করে না" (৬ ঃ ৬১)।

ইহাদের মধ্যেও একজন রহমতের এবং অপরজন আযাব বা শাস্তির ফেরেশতা। নেককার বান্দাদের জান কবযের জন্য সৌম্যমূর্তিসম্পন্ন রহমতের ফেরেশতাগণ এবং বদকার বা পাপচারীদের জান কবযের জন্য বীভৎস রূপধারী কঠোর প্রকৃতির আযাবের ফেরেশতাগণ আগমন করিয়া থাকেন, যাহার বিস্তারিত বিবরণ হাদীছের বর্ণনায় পাওয়া যায় (দ্র. সহীহ, মুসলিম, ৮খ, পৃ. ১৬২, বৈরূত সং)। আয়াতে 'আমার প্রেরিতরা কোন ত্রুটি করে না' বলিয়া এই সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, নেককার বান্দাদের জান কবযে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করিতে এবং পাপাচারীদের জান কবযে কঠোরতা অবলম্বনে ফেরেশতাগণ ত্রুটি করেন না বলা হইয়াছে (দ্র. আকীদাতুল মুমিন, পৃ. ১৯৩, আবূ বকর আল-জাযাইরী প্রণীত)।

(৪) ইসরাফীল (আ) ঃ কিয়ামতের সময় তিনি সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। তখন বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। পরে পুনরায় সিঙ্গায় ফুঁক দিবেন যাহাতে পুনরুত্থান বা হাশর সংঘটিত হইবে ও সৃষ্টিকূলের হিসাব-নিকাশ তথা বিচার সম্পন্ন হইবে।

'কিরামান কাতিবীন' বলিয়া ফেরেশতাগণের কথা কুরআন শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে এইভাবে ঃ

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ -كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ-

"অবশ্যই আছে তোমার জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ, সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তাহারা জানে তোমরা যাহা কর" (৮২ ঃ ১১-১২)।

অন্যত্র তাঁহাদের প্রসঙ্গ বলা হইয়াছে এইভাবে ঃ

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۔

"স্মরণ রাখিও, দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা তাহার (মানুষের) দক্ষিণে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে" (৫০ ঃ ১৭-১৮)।

কিয়ামতের দিন বেহেশতীগণকে অভ্যর্থনা জানানো বা দোযখীদিগকে দোযখের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়ার কাজ বা নবী-রাসূলগণের আনুগত্য করিয়া পার্থিব জীবন সুন্দরভাবে পরিচালনা করিয়া চিরস্থায়ী শান্তির আবাসভূমি বেহেশত লাভে ব্যর্থতার জন্য তিরস্কারও করিবেন এই ফেরেশতাগণ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۔ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۔ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۔ وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

"কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে। যখন উহারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হইবে তখন ইহার প্রবেশদ্বারগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা উহাদেরকে বলিবে, 'তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হইতে রাসূল আসে নাই, যাহারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করিত এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করিত'? উহারা বলিবে, 'অবশ্যই আসিয়াছিল'; বস্তুত কাফিরদের প্রতি

শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হইয়াছে। উহাদেরকে বলা হইবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর উহাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল! যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে ভয় করিত তাহাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। যখন তাহারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হইবে, ইহার দ্বারসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাহাদেরকে বলিবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।' তাহারা প্রবেশ করিয়া বলিবে, 'প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদের প্রতি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করিয়াছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করি'। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম! এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখিতে পাইবে যে, উহারা 'আরশের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া উহাদের প্রতিপালকের সপ্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে। আর তাহাদের বিচার করা হইবে ন্যায়ের সহিত। বলা হইবে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র প্রাপ্য" (৩৯ ঃ ৭১-৭৫)।

উক্ত আয়াতসমূহ হইতে জান্নাতের রক্ষী, জাহান্নামের রক্ষী এবং আরশবাহী ফেরেশতাকূলের অস্তিত্ব সম্পর্কেও স্পষ্টভাবে জানা গেল। জান্নাতের রক্ষীরূপে নিযুক্ত ফেরেশতাকূলের প্রধানের নাম রিদওয়ান এবং জাহান্নামের রক্ষীকূলের প্রধানের নাম মালিক (দ্র. আকীদাতু'ল-মু'মিন, পৃ. ১৯৪)।

কবরে মুনকার-নাকীর কর্তৃক মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের কথাও হাদীছে বিবৃত হইয়াছে।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী' (র) সূরা ইয়াসীন-এর ২৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুমিনকে কবরে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সে আল্লাহ্র অনুগ্রহে কালেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু"র উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং উহার সাক্ষ্য দিবে। তারপর يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ (১৪ ঃ ২৭) আয়াতটি তিলাওয়াত করিয়া তিনি বলেন, এই আয়াতে উহার কথাই বলা হইয়াছে। হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) ছাড়াও প্রায় চল্লিশজন সাহাবী হইতে এই বিষয়ে বহু হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্ন কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এইগুলি সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আত-তাছবীত ইনদাত তাব্রীত, শারহু'স্-সুদূর")।

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্জীবন লাভ, ফেরেশতাগণের প্রশ্নোত্তর এবং সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তিলাভের ব্যাপারটি কুরআন পাকের দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণিত ৭০ খানা প্রসিদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত (দ্র. মাআরিফুল কুরআন, উক্ত আয়াতের তাফসীরে)।

মানবজাতির হেফাযতে ফেরেশতাকূল

কুরআন-হাদীছের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মানবজাতির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও পালন করিয়া থাকেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ـ

"মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; উহারা আল্লাহ্র আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে" (১৩ ঃ ১১)।

সহীহ বুখারীর হাদীছে বলা হইয়াছে, ফেরেশতাগণের দুইটি জামাআত মানুষের হিফাযতের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন। একদল রাত্রির বেলায় এবং অপরদল দিনের বেলায় হিফাযতের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন। ফজরের ও আসরের সময় উভয় দল একত্র হইয়া থাকেন। ফজরের নামাযের পর রাত্রিকালের দায়িত্ব পালনকারিগণ বিদায় নেন এবং দিনের প্রহরিগণ দায়িত্বভার বুঝিয়া লন। আসরের নামাযের পর যখন ঐ দল বিদায় হইয়া যায় তখন রাত্রিবেলার প্রহরী ফেরেশতাগণ আসিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আবু দাউদের বর্ণনায় হযরত আলী (রা) হইতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের জন্য এমন হিফাযতকারী ফেরেশতা রহিয়াছেন যাহারা তাহার উপর প্রাচীর ভাঙিয়া পড়ারূপে নিপতিত হওয়া বা হিংস্র প্রাণী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া হইতে তাহাকে হিফাযত করিয়া থাকেন। তবে কাহারও নির্ধারিত ভাগ্য আসিয়া পড়িলে হিফাযতকারী ফেরেশতাগণ সরিয়া দাঁড়ান (রূহুল মা'আনী, ১৩খ, পৃ. ১১৩)।

হযরত উছমান (রা)-এর রিওয়ায়াতে ইব্নে জারীর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাগণ শুধু পার্থিব অনিষ্ট হইতেই নয়, পারলৌকিক ব্যাপারসমূহেও মানুষের হিফাযতের, তাহাদেরকে পাপকর্ম হইতে রক্ষার এবং পূণ্য কর্মে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার কাজে নিয়োজিত থাকেন, এমনকি তাহার দ্বারা কোন পাপকর্ম সাধিত হইলে তাহারা তাহাকে তওবার জন্য অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়া থাকেন। এতদসত্ত্বেও যদি সে পাপকর্মে লিপ্ত হয় এবং তওবা না করে তাহা হইলে তাহার পাপকর্ম লিপিবদ্ধ করেন (তু. পূ. গ্র.)।

আরশবাহী ফেরেশতাকুল

ইহারা আল্লাহ্র আরশ বহনের সৌভাগ্যের অধিকারী অত্যন্ত সম্মানিত ফেরেশতা। তাঁহাদের সংখ্যা চারিজন। কিয়ামতের সময় আরও চারিজন তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইবেন। কুরআন শরীফে তাঁহাদের কথা উল্লিখিত হইয়াছে এইভাবে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ

"যাহারা আরশ ধারণ করিয়া আছে এবং যাহারা ইহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া আছে তাহারা তাহাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সহিত এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে" (৪০ ঃ ৭)।

কিয়ামতের দিন আশরবাহী ফেরেশতার সংখ্যা আটজন হওয়ার কথাটি এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ۔

"এবং সেইদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করিবে তাহাদের উর্ধ্বে" (৬৯ ঃ ১৭)।

অনুরূপভাবে হাদীছে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারী ও ছিন্নকারীদের সংক্রান্ত এবং পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের প্রসঙ্গও বর্ণিত হইয়াছে (দ্র. আল-লু'লু' ওয়া'ল-মারজান, ৩খ, পৃ. ২০৮ ও ২খ, পৃ. ২২৭-২৮)।

সুতরাং ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আল্লাহ্ তা'আলা পূণ্যকর্মের তালিকায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۔

"বরং পূণ্য আছে কেহ আল্লাহ্তে, পরকালে, ফেরেশতাকূলে, সমস্ত কিতাবে এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করিলে" (২ ঃ ১৭৭)।

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۔

"স্মরণ রাখিও! দুই গ্রহণকারী ফেরেশতা তাহার ডানে ও বামে বসিয়া তাহার কর্ম নিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তাহার জন্য তৎপর প্রহরী তাহার নিকটেই রহিয়াছে" (৫০ ঃ ১৭-১৮)।

জিন্ন জাতি

কুরআন শরীফের ৭টি স্থানে জান্নরূপে এবং ২২টি স্থানে জিন্নরূপে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। মানব ও জিন্ন সৃষ্টির উপাদান সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ۔

"আমি তো মানুষ সৃষ্টি করিয়াছি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনা মৃত্তিকা হইতে এবং ইহার পূর্বে সৃষ্টি করিয়াছি জিন্ন অত্যুষ্ণ অগ্নি হইতে" (১৫ ঃ ২৬-২৭)।

লক্ষণীয়, উভয় স্থানেই মানুষ সৃষ্টির উপাদান শুষ্ক ঠনঠনা মাটি এবং জিন্ন সৃষ্টির উপাদান আগুন বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় আয়াতে জিন্ন জাতিকে মানবজাতির পূর্বেই সৃষ্টি করার উল্লেখ রহিয়াছে।

হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন ঃ ফেরেশতাগণ নূর হইতে সৃষ্টি, জিন্নজাতি আগুন হইতে সৃষ্টি এবং আদমকে সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই উপাদান হইতে যাহা তোমাদেরকে বর্ণনা করা হইয়াছে (মুসলিম, খ. পৃ.)।

তাফসীর বিশারদগণ বলেন, জিন্ন জাতিকে আদম (আ)-এর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়। তাহারও পূর্বে হিন্ ও বিন্ জাতির বাস ছিল এই পৃথিবীতে। আল্লাহ্ তা'আলা জিন্ন জাতিকে তাহাদের উপর

আধিপত্য দান করেন। তখন তাহারা পূর্বোক্ত জাতি দুইটিকে হত্যা করে এবং পৃথিবী বক্ষ হইতে উচ্ছেদ করিয়া নিজেরাই পৃথিবীতে বসবাস করিতে থাকে।

ইব্ন 'আব্বাস, ইব্ন মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী হইতে বর্ণিত আছে যে, সৃষ্টিকর্ম সমাপ্ত করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা যখন আরশে সমাসীন হইলেন তখন তিনি ইবলীসকে পৃথিবীর ফেরেশতাদের প্রধান নিযুক্ত করেন। সে ছিল ফেরেশতাদেরই জিন্ন নামক গোত্রের একজন। তাহারা জান্নাতের রক্ষী ছিল বলিয়া তাহাদেরকে জিন্ন বলা হইত। ইবলীস তাহার সঙ্গী ফেরেশতাগণকে সঙ্গে লইয়া জান্নাতের এই রক্ষীর দায়িত্ব পালন করিত। তখন তাহার অন্তরে এই ভাবের উদ্রেক হয় যে, ফেরেশতাদের উপর তাহার প্রাধান্য থাকার কারণেই সে এই মর্যাদার অধিকারী হইতে পারিয়াছে। দাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, জিন্ন জাতি যখন পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ ও রক্তপাত করিতে শুরু করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে ইবলীসকে তাহার ফেরেশতা বাহিনীসহ প্রেরণ করিলেন। তাহারা আসিয়া উহাদিগকে হত্যা করে এবং পৃথিবীর মূল ভূখণ্ড হইতে সাগরের দ্বীপমালায় তাড়াইয়া দেয়। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৯, ১খ, পৃ. ৫৫)।

ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়ার পূর্বে ইবলীসের নাম ছিল আযাযীল। সে ছিল পৃথিবীর অধিবাসী। চারি ডানা বিশিষ্ট ফেরেশতাদের সে সর্দার ছিল। পৃথিবী ও দুনিয়ার আকাশে তাহার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোত্রবংশের দিক হইতে সে অন্যান্য ফেরেশতাদের চাইতে অগ্রগণ্য ছিল। জ্ঞান-গরিমা, উদ্যম ও অধ্যবসায়ে সে ছিল সকল ফেরেশতার অগ্রণী।

হাসান বাসরী (র) বলেন ঃ ইবলীস এক মুহূর্তের জন্যও ফেরেশতা ছিল না, বরং সে ছিল জিন্নদের আদি পিতা, যেমনটি আদম (আ) মানবজাতির আদি পিতা। শাহ্র ইব্ন হাওশাব (র) ও অন্যরা বলেন, ফেরেশতাগণ যে জিন্ন জাতিকে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে তাহাকে তাঁহারা বন্দী করিয়া আসমানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ মত আদম (আ)-কে সিজদা না করার কারণে মর্যাদাহারা ও বিতাড়িত হইয়াছিল।

জিন্নরা মানুষের মত পানাহার ও বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যেও মুমিন ও কাফির তথা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় শ্রেণী রহিয়াছে। কেননা, কুরআন শরীফের সূরা জিন্ন-এ জিন্নদের ভাষ্যই উদ্ধৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

وَاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا . وَاَنَّا ظَنَنَّا اَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهٗ هَرَبًا . وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى اٰمَنَّا بِهٖ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا . وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا . وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا .

"আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক ইহার ব্যতিক্রম। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। এখন আমরা বুঝিয়াছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌কে পরাভূত করিতে পারিব না এবং পলায়ন করিয়াও তাঁহাকে ব্যর্থ করিতে পারিব না। আমরা যখন পথনির্দেশক বাণী শুনিলাম তাহাতে ঈমান আনিলাম। যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে তাহার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশঙ্কা থাকিবে না। আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালঙ্ঘনকারী; যাহারা আত্মসমর্পণ করে তাহারা সুচিন্তিতভাবে সত্য পথ বাছিয়া লয়। অপরপক্ষে সীমালঙ্ঘনকারীরা তো জাহান্নামেরই ইন্ধন" (৭২ ঃ ১১-১৫)।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে ঃ কুরআন পাকে যাহাদেরকে শয়তান বলা হইয়াছে, বস্তুত তাহারা দুষ্ট শ্রেণীর জিন্ন। জিন্ন ও ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব কুরআন ও সুন্নাহর অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। তাই ইহা অস্বীকার করা কুফরী (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, ৮খ, পৃ. ৫৭৪; সূরা জিনের তাফসীর প্রসঙ্গ)।

মানব ও জিন্ন জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য কুরআন শরীফের যে আয়াতে ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে যেমন জিন্ন ও মানব জাতিকে এক কাতারে এক সাথে রাখা হইয়াছে, তেমনি তাহাদের পুরস্কার-তিরস্কার সংক্রান্ত অন্য এক আয়াতেও তাহাদের কথা অভিন্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ. وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ.

"ইহাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায় গত হইয়াছে, তাহাদের মত ইহাদের প্রতিও আল্লাহ্‌র উক্তি সত্য হইয়াছে। ইহারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। প্রত্যেকের মর্যাদা তাহার কর্মানুযায়ী; ইহা এই জন্য যে, আল্লাহ্ প্রত্যেকের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না" (৪৬ ঃ ১৮-১৯)।

জিন্নদের আমলের প্রতিফল লাভ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। কাফির জিন্নদেরকে জান্নাত দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে, অথবা কেবল জাহান্নামের আগুন হইতে নিষ্কৃতি দিয়াই পুরস্কৃত করা হইবে, এই ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে। কেননা আয়াতে আছে ঃ

يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

"হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাহার প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি হইতে তোমাদেরকে রক্ষা করিবেন" (৪৬ ঃ ৩১)।

এখানে জান্নাতের সুসংবাদ তাহাদেরকে দেওয়া হয় নাই। ইমাম আবূ হানীফা (র) এই মত পোষণ করিতেন। আবার ইমাম মালিক ও ইব্ন আবী লায়লার মত অনেকেই মানুষের মত তাহাদেরকেও জান্নাত দ্বারা পুরস্কৃত করা হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আবুশ শায়খকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জিন্ন জাতি কি জান্নাতের সুখভোগ করিবে? জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইলহামস্বরূপ তাহাদের অন্তরে যিকর দান করিবেন, তাহারা উহা দ্বারা মানুষের জান্নাতভোগের মত সুখশান্তি লাভ করিবেন। এই ব্যাপারে আবুশ শায়খ যেন জিন্ন জাতিকে ফেরেশতাগণের দলভুক্ত করিয়া দিলেন।

ইবনুল মুনযির বলেন, আমি হামযা ইব্ন হাবীবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জিন্ন জাতি কি জান্নাতের সুখ-শান্তির অধিকারী হইবে? তিনি হাঁ-সূচক জবাব দেন এবং দলীলস্বরূপ তিলাওয়াত করেন ঃ

فِيهِنَّ قَاصِرٰتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَانٌّ. فَبِاَىِّ اٰلاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

"(বেহেশতের সুখ-সামগ্রীর) সেই সকলের মধ্যে রহিয়াছে বহু আনত-নয়না (হূর) যাহাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন্ন স্পর্শ করে নাই" (৫৫ ঃ ৫৬)।

অর্থাৎ মানুষের জন্য মানুষের উপযোগী হূর এবং জিন্নের জন্য জিন্নের উপযোগী হূর থাকিবে (করাচীর দারুল ইশা'আত মুদ্রিত তাফসীর মাযহারী, ১২খ, ১৩০-১৩১ সূরা জিন্নের তাফসীর প্রসঙ্গ)।

সূরা আর-রাহমানের নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারাও জিন্নদের জান্নাত প্রাপ্তির দলীল দেওয়া হইয়া থাকে, যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ. فَبِاَىِّ اٰلاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

"আর যে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি উদ্যান। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অ স্বীকার করিবে" (৫৫ ঃ ৪৫-৪৭)।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের কথা অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা যদি জান্নাত লাভের সুযোগ না পাইত, তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহস্বরূপ উহার উল্লেখ করিতেন না এবং উহা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ বলিয়া প্রকাশ করিতেন না। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন ঃ

অর্থাৎ এই একটি দলীল প্রমাণ হিসাবে এই বিষয়ে যথেষ্ট (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৫২)।

ইবলীস শয়তান প্রসঙ্গ

ইমাম তাবারী (র) বলেন, ইবলীস শব্দটি আরবী ابلاس। শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইহার শাব্দিক অর্থ কল্যাণ হইতে নিরাশ হওয়া, অনুতাপ, অনুশোচনা ও দুঃখ-দুশ্চিন্তা করা।

এই মর্মে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে, ইবলীসের এই নামকরণ করা হইয়াছে এই জন্য যে, আল্লাহ্ তাহাকে সর্বপ্রকার কল্যাণ হইতে নিরাশ করিয়াছেন এবং তাহাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করিয়াছেন। তাহার পাপাচারের শাস্তিস্বরূপ ইহা করা হইয়াছে।

সুদ্দী হইতে বর্ণিত, ইবলীসের প্রকৃত নাম ছিল হারিছ। সত্য হইতে নিরাশ হইয়া নিজেকে পরিবর্তিত করার জন্য তাহার নাম হয় ইবলীস। কুরআন শরীফেও এই অর্থে আয়াত আসিয়াছে ঃ

قُلْ اَرَاَيْتَمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ مَّنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِهِ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُوْنَ.

"তাহাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন তাহা বিস্মৃত হইল তখন আমি তাহাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। অবশেষে তাহাদেরকে যাহা দেওয়া হইল যখন তাহারা তাহাতে উল্লসিত হইল তখন অকস্মাৎ তাহাদেরকে ধরিলাম, ফলে তখনি তাহারা নিরাশ হইল" (৬ ঃ ৪৬)।

সূরা কাহ্ফের আয়াতে তাহার পরিচয় এইভাবে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا.

"এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফেরেশতাগণকে বলিয়াছিলাম আদমের প্রতি সিজদা কর, তখন তাহারা সকলেই সিজদা করিল ইসলীস ব্যতীত; সে জিন্নদের একজন ছিল। সে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করিল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারা তো তোমাদের শত্রু। যালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট" (১৮ ঃ ৫০)।

উক্ত আয়াত হইতে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানা গেল ঃ

(১) ইবলীস জিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত। (২) উহার বংশবিস্তারও হইয়া থাকে, তাই জিন্ন জাতির মধ্যেও যৌন চেতনা, বিবাহশাদী প্রভৃতির প্রচলন রহিয়াছে। (৩) কোন কোন মানুষ জিন্নদিগকে ও তাহাদের প্রধান ইবলীসকে আল্লাহ্র স্থলে নিজেদের অভিভাবক ও কর্মবিধায়করূপে মান্য করিয়া থাকে। (৪) ইবলীস ও তাহার বংশধরদের অনুসারীরা যালিম-অনাচারী, তাহাদের মন্দ পরিণতি রহিয়াছে। (৫) শয়তান জিন্নরাও ইবলীস; মানুষের শত্রু।

ইবলীসকে আল্লাহ্ পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত অবকাশ দিয়া রাখিয়াছেন যেন সে তাহার সাধ্যমত মানুষকে পথভ্রষ্টকারী শয়তান বাহিনীকে দিক-দিগন্তে ছাড়িয়া দেয়। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণিত হাদীছে আছে ঃ

ইবলীসের সিংহাসন সমুদ্র বক্ষে, সে তাহার বাহিনী প্রতিদিন মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য প্রেরণ করে। সুতরাং তাহার কাছে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ হইতেছে, যে মানুষকে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট করিতে পারে (মুসনাদ আহমাদ-এর বরাতে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ৫৩)।

'ইবলীস' শব্দটি কুরআন শরীফের ১১টি স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা ঃ

২ সূরা	বাকারা	৩৪
৭	আল-আ'রাফ	১১
১৫	আল-হিজর	৩১-৩২
১৭	আল-ইসরা	৬১
১৮	আল-কাহ্ফ	৫০
২০	তা-হা	১১৬
২৬	শু'আরা	৯৫
৩৪	সাবা	২০
৩৮	সাদ	৭৪-৭৫

বিভিন্ন হাদীছের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র নাম স্মরণ না করিয়া পানাহার করিলে বা ঘরে প্রবেশ করিলে, বাম হাতে দাঁড়ানো অবস্থায় পানাহার করিলে, ঘরে আল্লাহ্কে স্মরণ না করিলে এবং আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শয়তান তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অনুরূপ ধর্মের নামে নব-আবিষ্কৃত রীতিনীতি তথা বেদাতী কার্যকলাপে লিপ্ত করিয়া তওবা হইতে বিমুখ রাখিয়া শয়তান শ্রেণীর জিন্নরা মানুষকে ভ্রষ্টতায় ডুবাইয়া রাখে। উহাদের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার বিভিন্ন ব্যবস্থার কথাও হাদীছে বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে।

নবুওয়াত ও রিসালাত

কুরআন শরীফে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ

وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ.

"এমন কোন সম্প্রদায় নাই, যাহার নিকট সতর্ককারী প্রেরণ করা হয় নাই" (৩৫ ঃ ২৪)।

এই نذير (সতর্ককারী) শব্দের ব্যাখ্যা তাফসীরে জালালাইন শরীফে করা হইয়াছে এইভাবে ঃ نَبِىٌّ يُنْذِرُهَا.

"নবী, যিনি সেই সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন" (পৃ. ৫৭৭, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া চীন কর্তৃক প্রকাশিত, পিকিং মুদ্রণ ১৪০২/১৯৮২)।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

"আল্লাহর ইবাদত করিবার ও তাগূতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি" (১৬ ঃ ৩৬)।

মানবজাতিকে স্রষ্টার পক্ষ হইতে সতর্ককারী ও পথপ্রদর্শকরূপে আগমনকারী উক্ত মহামানবগণকে কুরআনুল কারীমে নবী ও রাসূলরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। আদম (আ) নবী বা রাসূল ছিলেন কিনা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বেই নবুওয়াত ও রিসালাতের অর্থ কী, নবী ও রাসূলের পার্থক্যই বা কী তাহা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণের পটভূমি ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এইভাবে ঃ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

'সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ্ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করিত তাহাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাহাদের সহিত সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাহাদিগকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাহাদের নিকট আসিবার পরে, তাহারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত সেই বিষয়ে বিরোধিতা করিত। যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা যে বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করিত, আল্লাহ্ তাহাদিগকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন" (২ ঃ ২১৩)।

উক্ত আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় যে,

(ক) প্রথমে মানবজাতি এক অভিন্ন উম্মত ও সত্য পথের অনুসারী ছিল;

(খ) কালক্রমে তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ শুরু হয়;

(গ) মানবজাতির মধ্যে সৃষ্ট কলহ ও হানাহানি বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইয়া দিয়া সঠিক পথে পরিচালনার জন্য নবী-রাসূলগণের আগমন ঘটে।

(ঘ) তাহাদের সাথে হিদায়াতের গ্রন্থাদিও নাযিল করা হয়;

(ঙ) কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার পরও একদল বিদ্বেষবশত কলহ-বিবাদ ও হানাহানিতে লিপ্ত থাকে;

(চ) ঈমানদার বান্দাগণ নবী-রাসূলগণের হিদায়াত গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

(ছ) নবী-রাসূলগণ পুণ্যবানদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং পাপী-তাপী অবাধ্যদের জন্য সতর্ককারীরূপেই বিশ্বে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই শেষোক্ত বক্তব্যটি অন্য আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে ঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ـ

"আমি সুসংবাদদাতা ও সাবধানকারী রাসূল প্রেরণ করিয়াছি, যাহাতে রাসূল আসার পর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৪ ঃ ১৬৫)।

এই নবুওয়াত ও রিসালাত আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দান। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ

"কিতাবীদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহারা এবং মুশরিকরা ইহা চাহেনা যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হউক। অথচ আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহণকারী" (২ ঃ ১০৫)।

তাফসীরবিদগণ বলেন, আয়াতে উক্ত خير (কল্যাণ) বলিতে ওহী এবং 'বিশেষ রহমত' বলিতে নবুওয়াত বুঝানো হইয়াছে (দ্র. তাফসীর জালালাইন, পৃ. ২২, চীনা মুদ্রণ, ১৪০২/১৯৮২)। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ـ

"আল্লাহ ফেরেশতাদের মধ্য হইতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হইতেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা" (২২ ঃ ৭৫)।

নবী ও রাসূলের পরিচয়

নবী শব্দটি আরবী نبأ ধাতু হইতে নির্গত, যাহার অর্থ সংবাদ। নবীগণ যেহেতু আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সংবাদ বাহকের দায়িত্ব পালন করেন, এইজন্য তাঁহাদিগকে নবী (বহুবচনে আম্বিয়া) বলা হইয়া থাকে।

আল্লামা রাগিব ইসফাহানী বলেন ঃ "নবুওয়াত হইতেছে আল্লাহ ও তদীয় বোধসম্পন্ন বান্দাদের মধ্যকার দৌত্যকর্ম, যাহাতে তাহাদের পরকাল ও ইহকালের জীবনের ব্যাধিসমূহ দূরীভূত হয়।"

কিন্তু নবী শব্দটি তিনি همزه বিহীনভাবে نبى -রূপে লিখিয়াছেন এবং ইহার আলোচনায় লিখিয়াছেন ঃ নবী শব্দটি همزة বিহীন, তবে ব্যাকরণবিদগণ বলিয়াছেন মূলে همزة ছিল, পরে তাহা পরিত্যক্ত হয়। কতক আলিম বলিয়াছেন, শব্দটি আরবী نبوة শব্দমূল হইতে উদ্ভূত, যাহার অর্থ সমগ্র মানব সমাজে উচ্চ মর্যাদার আসন। দলীল হইতেছে আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ·

"আমি তাহাকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী করিয়াছি" (১৯ ঃ ৫৭)।

সুতরাং همزة বিহীন نبى শব্দটি همزة যুক্ত نبى হইতে বলিষ্ঠতর। কেননা نبأ যাহার সংবাদ দেওয়া হয় তাহার সবটাই মর্যাদাপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। এইজন্যই নবী করমী (স) যখন লক্ষ্য করিলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষবশত তাঁহাকে همزه যোগ يا نبئ الله বলিয়া সম্বোধন করিল তখন সাথে সাথে তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ ওহে, আমি نبئ الله নহি, আমি হইতেছি نبى الله (আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৪৮২, বৈরূত সং)।

রাসূল শব্দটি আরবী رسالة, শব্দমূল হইতে নির্গত, যাহার অর্থ দৌত্যকর্ম বা সংবাদ বহন করা। রাসূলগণ যেহেতু সৃষ্টিজগতের নিকট আল্লাহ তা'আলার পয়গাম বহন করিয়া আনেন, তাই তাঁহাদিগকে রাসূল বলা হইয়া থাকে। মূলত নবী ও রাসূল শব্দ দুইটি প্রায় অভিন্ন অর্থ বহন কারিলেও উভয়ের মধ্যে পরিভাষাগত কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেন ঃ

"রাসূল হইতেছেন সেই সত্তা যাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্ট জগতের প্রতি তাঁহার বিধিবিধানের প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি কিতাব নাযিলের শর্ত আরোপ করা হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহার প্রতি কোন কিতাব অবতীর্ণ হইলেই কেবল তাঁহাকে রাসূল বলা যায়। পক্ষান্তরে নবীর কিতাব লাভ শর্ত নহে। কেননা নবী শব্দটি ব্যাপকতর অর্থবোধক (শরহু আকাইদিন নাসাফী, পৃ. ২৪, চট্টগ্রাম মুদ্রণ)।

কিন্তু উক্ত সংজ্ঞা সম্পূর্ণ যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। কেননা কুরআন শরীফে হযরত ইসমাঈল (আ) সম্পর্কেও উক্ত হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ· اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَبِيًّا ·

"স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা, সে তো ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল নবী"(১৯ ঃ ৫৪)।

লক্ষণীয়, নাযিলকৃত আসমানী কিতাবের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ১০৪। প্রধান চারিখানা তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ও আল-কুরআন যথাক্রমে হযরত মূসা (আ), হযরত দাঊদ (আ), হযরত ঈসা (আ) ও নবীকুল শিরোমনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি নাযিল হয় এবং বাকি এক শতখানা, যেগুলিকে সহীফা নামে অভিহিত করা হইয়াছে, যথাক্রমে নাযিল হয় ঃ

আদম (আ)–এর প্রতি ১০খানা;

শীছ (আ)-এর প্রতি ৫০খানা;

ইদরীস (আ)–এর প্রতি ৩০খানা এবং

ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি ১০খানা।

অথচ রাসূলের সংখ্যা হাদীছমতে ৩১৩। অন্য কথায় কিতাব ও সহীফাপ্রাপ্ত রাসূলের সংখ্যা মাত্র ৮, অবশিষ্ট ৩০৫ জন রাসূলের প্রতি কোন কিতাবই অবতীর্ণ হয় নাই। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্র রাসূল (স) তাঁহাদিগকে রাসূল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উল্লিখিত ৩১৩ জনের মধ্যে ২৫ জন রাসূলের নাম কুরআনুল কারীমে উল্লেখ হইয়াছে।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী (র) বলেন, 'নবী ও রাসূল-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া আমি যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা এই যে, উক্ত দুইটি শব্দের মধ্যে 'মানতিক' শাস্ত্রের পরিভাষায় نسبت عموم خصوص من وجه নামক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ কোন কোন দিক হইতে নবী শব্দটিই অধিকতর ব্যাপক—আবার কোন কোন দিক হইতে রাসূল শব্দই অধিকতর ব্যাপক।

"রাসূল হইতেছেন সেই প্রেরিত পুরুষ যিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে নূতন শরীআতের বার্তা পৌঁছাইয়া থাকেন। এই শরীআত তাঁহার নিজের জন্যও নূতন হইতে পারে, যেমন তাওরাত প্রভৃতি, আবার তাঁহার নিজের বেলায় নূতন না হইলেও কেবল তাঁহার উম্মতের বেলায়ও নূতন হইতে পারে। যেমন ইসমাঈল (আ)-এর শরীআত; উহা মূলত ইবরাহীম (আ)-এর পুরাতন শরীআতই ছিল, কিন্তু তিনি যে জুরহুম সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাদের জন্য উহা নূতন শরীআত ছিল। কেননা পূর্বে তাহাদের কাছে এই শরীআতের বার্তা পৌঁছে নাই। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমেই উহা তাহাদের কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছে। এই অর্থের দিক হইতে বিবেচনা করিলে রাসূলকে যে নবী হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যেমন ফেরেশতাগণ, তাহাদের ক্ষেত্রে রাসূল শব্দটি প্রযোজ্য হইলেও তাঁহারা নবী নহেন। ঈসা (আ)-এর প্রেরিত বার্তাবাহকগণের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۔

আয়াতে তাহাদিগকে রাসূল অভিধায় অভিহিত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা নবী ছিলেন না। পক্ষান্তরে নবী হইতেছেন সেই প্রেরিত পুরুষ যিনি ওহী লাভ করিয়া থাকেন—তিনি নূতন শরীআতের তাবলীগ করুন অথবা পুরাতন শরীআতের। যেমন বনী ইসরাঈলের অধিকাংশ নবীই মূসা (আ)-এর শরীআতের তাবলীগ করিতেন। এই হিসাবে 'রাসূল' শব্দের মধ্যে নবীর তুলনায় ব্যাপ্তি বেশি। আর অন্য হিসাবে নবী শব্দটিই 'রাসূল'-এর তুলনায় ব্যাপকতর। رَسُوْلًا نَبِيًّا শব্দ দুইটি যেখানে আয়াতে পাশাপাশি একত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে সেখানে তো কোন সমস্যা নাই। কিন্তু যেখানে শব্দ দুইটি একটি আরেকটির মুকাবিলায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধকরূপে আসিয়াছে, যেমন وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ (২২ : ৫২) আয়াতে?

এখানে পূর্বাপর বিবেচনায় নবী শব্দটি বলিতে ঐ সত্তাই বুঝিতে হইবে যিনি তাঁহার পূর্ববর্তী শরীআতের তাবলীগ করেন" (মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ, পৃ. ৪২; দারুল মা'আরিফ, করাচী ১৪১৬ হি.)।

ইসমাতে আম্বিয়া

নবীগণ যে নিষ্পাপ হইয়া থাকেন, ইহাও একটি সর্বসম্মত আকীদা। তারপরও আদম (আ) কী করিয়া আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করিতে পারিলেন, এই প্রশ্নটি কাহারও মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক।

এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে যাইয়া আল্লামা ইদরীস কান্দলবী (র) ইসমত (عصمت) ও মা'সিয়াত (معصيت) তথা নিষ্পাপত্ব ও অবাধ্যতা শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। চমৎকারভাবে তিনি লিখেন ঃ

"হকপন্থীগণের সর্ববাদীসম্মত আকীদা এই যে, নবী-রাসূলগণ (আ) আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা হইতে সর্বতোভাবে পবিত্র ও নিষ্পাপ। তাঁহারা সর্বপ্রকার গুনাহ হইতে মুক্ত। ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র অবাধ্যতা যদি তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবই হইত তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তদীয় মাখলুককে নিঃশর্তভাবে তাঁহাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দিতেন না, তাঁহাদের আনুগত্যকে তাঁহার নিজের আনুগত্য বলিয়া অভিহিত করিতেন না এবং আম্বিয়া কিরামের হাতে আনুগত্যের শপথকে তাঁহার নিজের হাতে আনুগত্যের শপথ বলিয়া অভিহিত করিতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ·

"যে রাসূলের আনুগত্য করিল সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করিল" (৪৮ ঃ ১০)।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ·

"যাহারা তোমার হাতে আনুগত্যের শপথ করিল তাহারা আল্লাহ্রই হাতে আনুগত্যের শপথ করিল। আল্লাহ্র হাত তাহাদের হাতের উপর থাকে" (৪৮ ঃ ১০)।

বলা বাহুল্য, কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত যে, এই নিঃশর্ত আনুগত্যের আদেশ কোন বিশেষ ব্যাপারের মধ্যে সীমাদ্ধ নহে, বরং 'আকাইদ হইতে আমলসমূহ' পর্যন্ত প্রতিটি আকীদা-আমলে ও আচরণে নবীর আনুগত্য অপরিহার্য। ইহার হেতু এই যে, আম্বিয়া কিরামের সত্তা ও তাঁহাদের স্বভাবচরিত্র অত্যন্ত পবিত্র হইয়া থাকে। আম্বিয়া কিরামের স্বভাব-চরিত্র ফেরেশতাকূলের অনুরূপ। ইসমত বা নিষ্পাপত্ব হইতেছে ফেরেশতাগণের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, আর আম্বিয়া কিরাম ফেরেশতাকুলের তুলনায় উত্তম ও অধিকতর বরণীয়। হযরত আদম (আ)-এর ঘটনাবলী ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আদম (আ) মা'সূম (নিষ্পাপ), ফেরেশতাগণের তুলনায় উত্তম ও অধিকতর মর্যাদাশীল।

ইসমত বা নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ

ইসমত হইতেছে বাহিরে ও অভ্যন্তরে নফস তথা রিপু ও শয়তানের হস্তক্ষেপ হইতে পবিত্র ও মুক্ত থাকা। নফস এবং শয়তানই হইতেছে মা'সিয়াত বা পাপাচারের উৎস বা মূল হেতু। আর

মা'সিয়াত বা পাপাচার হইতে মুক্ত থাকার নামই হইতেছে ইস্‌মত। মা'সূম ঐ সত্তা যাঁহার মন ও মনন, বিশ্বাস ও ই'তিকাদ, ইচ্ছা-আকাঙ্খা, আচার-আচরণ, অভ্যাস-ইবাদত লেনদেন, কথাবার্তা, ক্রিয়াকর্ম সবকিছু নফস ও শয়তানের হস্তক্ষেপ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত। গায়বী হিফাযত দ্বারা তিনি সংরক্ষিত থাকেন। তাঁহার দ্বারা এমন কিছু সংঘটিত হইতে পারে না যদ্দ্বারা তাঁহার ইসমত কোনভাবে বিঘ্নিত ও ক্লেদাক্ত হইতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সদয় দৃষ্টি এবং ফেরেশতাগণের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে যাহা তাঁহাকে পদে পদে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং হকের সামান্যতম পরিপন্থী প্রবণতা হইতেও তাঁহাকে ফিরাইয়া রাখে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে আম্বিয়ায়ে কিরামকে "মুসতাফায়নাল আখয়ার" (মনোনীত উত্তম বান্দা; দ্র. ৩৮ ঃ ৪৭) ও "ইবাদুল মুখলাসীন" (একনিষ্ঠ বান্দা; দ্র. ৩৮ ঃ ৮৩) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ্‌র সার্বিক সন্তুষ্টি এবং তাহাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রমাণবহ। মুখলাস বা মুখলিস শব্দ কেবল তাঁহার জন্যই প্রযোজ্য যাহার মধ্যে গায়রুল্লাহ্‌র বিন্দুমাত্র প্রভাব নাই, পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। অর্থাৎ তাহারা শয়তানী উপাদান হইতে সর্বোতোভাবে মুক্ত, পবিত্র। সুতরাং নবী অবশ্যই সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গুনাহ হইতে মুক্ত ও সর্বপ্রকার ক্লেদ হইতে পবিত্র বা মা'সূম হইবেন ইহাই স্বাভাবিক। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ الَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ (৭২ ঃ ২৭)-এর মধ্যে مَنْ বর্ণনামূলক (بيانيه) এবং رسول শব্দটি অনির্দিষ্ট বাচক (نكره) -রূপে আসিয়াছে। এই বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট যে, নবী মাত্রই আল্লাহ তা'আলার পসন্দনীয় এবং মনোনীত বান্দা । তাঁহার প্রত্যেকটি আমল-আখলাক, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, হাল-অবস্থা সর্বদিক হইতে আল্লাহ তা'আলার নিকট পসন্দনীয় এবং তিনি সর্বতোভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌রই বান্দা। উক্ত আয়াতে বর্ণিত সন্তুষ্টি কোনক্রমেই আংশিক সন্তুষ্টি নহে। কেননা কোন না কোন দিক দিয়া প্রত্যেক মুসলমানই আল্লাহ্‌র সার্বিক ও পূর্ণ মাত্রার সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়, আর পূর্ণ মাত্রায় এই সন্তুষ্টি কেবল ঐ বান্দাগণই লাভ করিতে পারেন যাহাদের যাহির-বাতিন নফস তথা রিপু এবং শয়তানের বন্দেগী ও আনুগত্য হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। মা'সিয়াত তথা পাপ-পঙ্কিলতা হইতে এই সার্বিক মুক্ত থাকার নামই হইতেছে ইস্‌মত, পাপ হইতে মুক্ত থাকা। আম্বিয়া কিরামের বিশেষণরূপে ইস্‌তিফা ও ইরতিদা শব্দ দুইটির প্রয়োগও প্রণিধান যোগ্য। শব্দ দুইটি باب افتعال -এর مصدر বা ক্রিয়ামূল। নিজের জন্য নির্দিষ্ট কোন ব্যাপার বুঝাইতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । যেমন اكتيال اتزان। শব্দ দুইটি নিজের জন্য ওজন করিয়া লওয়া ও মাপিয়া লওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে وزن ও كيل শব্দ দুইটি নিজের-পরের সকলের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۰ وَاِذَا كَالُوْا هُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۰

ইহাতে নিজেদের জন্য মাপিয়া নেওয়াকে اكْتَالُوْا। এবং অন্যদের জন্য মাপিয়া লওয়াকে كَالُوْهُم ও অন্যদের জন্য ওজন করিয়া লওয়াকে وَزَنُوْهُمْ বলা হইয়াছে (অর্থাৎ যাহারা নিজেদের জন্য মাপিয়া বা ওজন করিয়া লইতে পরিপূর্ণভাবে কড়ায়- গণ্ডায় আদায় করিয়া লয়, আর অন্যদের জন্য মাপিতে বা ওজন করিতে কম করিয়া দেয়, উক্ত আয়াতে তাহাদের নিন্দা করা হইয়াছে)। ব্যকরণের এই

নিয়ম অনুসারেই اصطفاء ও ارتضاء শব্দদ্বয়ের দ্বারা নিজের জন্য বাছিয়া লওয়া ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা বুঝান হইয়াছে। অন্যত্র ঐ একই অর্থে বলা হইয়াছে ঃ

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ·

"আমি তোমাকে নিজের জন্য পছন্দ করিয়া লইয়াছি (হে রাসূল)"

মোটকথা, আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) তাঁহাদের সকল আখলাক, আদাত, ইবাদাত, মুআমালাত, আচার-আচরণ ও কথায়-বার্তায় আপদমস্তক আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দনীয় এবং যাহিরে-বাতিনে শয়তানী হস্তক্ষেপ ও রিপুর তাড়না হইতে মুক্ত ও পবিত্র থাকেন। একটি মুহূর্তের জন্যও তাঁহারা আল্লাহ্র করুণা, সাহায্য ও তত্ত্বাবধান হইতে বিচ্ছিন্ন হন না। এইজন্যই বিনা প্রশ্নে শর্তহীনভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামের আনুগত্য করা ফরয, তাহাদের প্রতিটি কথা ও কাজ গ্রহণীয় এবং তাঁহাদের আনুগত্য বর্জন চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্যের এবং ইহলোকে-পরলোকে সমূহ ক্ষতির কারণ। মানবিক কারণে যদি নবী-রাসূলগণের দ্বারা কখনো কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াও যায়, তবে তাহা বাহির হইতে আসে, তাঁহাদের নিজেদের অভ্যন্তর হইতে নহে। যেমন পানির মধ্যে উষ্ণতা বাহির হইতে আসিয়া থাকে, স্বভাবগতভাবে উহাতে কেবল শীতলতাই থাকে, উষ্ণতার নামমাত্র থাকে না। এইজন্য পানি যতই গরম হউক না কেন, আগুনে উহা ঢালিয়া দেওয়া মাত্র তাহা নির্বাপিত হইয়া যায়। অনুরূপ আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তর্লোক পাপাচারের উৎস-উপাদান (নফস ও শয়তান) হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত ও পবিত্র। বাহিরের আছরের ফলে কখনও তাঁহাদের দ্বারা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া গেলেও কুদরতের অদৃশ্য হাত তাঁহাদের ইসমতের চেহারা হইতে সেই বহিরাগত ধুলাবালি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দেয়। ফলে নবুওয়াতের চেহারা পূর্বের তুলনায় পরিচ্ছন্নতর ও উজ্জ্বলতর হইয়া ঝলমলাইয়া উঠে। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ·

"এইভাবে আমি তাহাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (১২ ঃ ২৪)। উক্ত আয়াতে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তব্যের যথার্থতাই প্রতীয়মান হয়। কেননা উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন যে, তিনি গর্হিত কর্ম ও অশ্লীলতাকে ইউসুফ (আ) হইতে দূরে রাখিয়াছেন। তিনি বলেন নাই যে, তিনি ইউসুফকে গর্হিত কর্ম ও অশ্লীলতা হইতে দূরে রাখিয়াছেন। ফিরাইয়া রাখা, দূরে রাখা বা হটাইয়া দেওয়ার ব্যাপারটা তাহার জন্যই প্রযোজ্য হইতে পারে, যে নিজে সেদিকে অগ্রসর হইতে উদ্যত হয়। উক্ত আয়াতের বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল যে, গর্হিত কর্ম ও অশ্লীলতা ইউসুফ (আ)-এর দিকে ধাবিত হইতে চাহিতেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহা ফিরাইয়া রাখিলেন। ইউসুফ (আ) সেদিকে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পান নাই।

মোটকথা, বাহিরের প্রভাবে ভুলবশত আম্বিয়ায়ে কিরামের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া যায়, বাহ্যত তাহাকে 'ইস্ইয়ান বা মা'সিয়াত (পাপ বা অপরাধ) বলিয়া অভিহিত করা যায় অথবা বলা

যায়, তাহাদের উচ্চ মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ঐগুলিকেও পাপ বা অপরাধ বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে, যদিও বাস্তবিকপক্ষে উহা অপরাধ নহে।

মা'সিয়াত বা পাপ কি?

আল্লাহ্র হুকুম পালন না করা মাত্রই মা'সিয়ত বা গুনাহ নহে, বরং জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে যে বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়া থাকে, ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নহে, তাহাই পাপ বা গুনাহ। এইজন্যই ওযরখাহী করিতে গিয়া বলা হইয়া থাকে, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম অথবা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। যদি ভুলক্রমে বা ভুল বুঝাবুঝির কারণে সংঘটিত ত্রুটি-বিচ্যুতিও পাপ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা হইলে ওযরখাহির ক্ষেত্রে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম বা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বলার কোন অর্থই হয় না। যে ভুলত্রুটি ভুলক্রমে সংঘটিত হইয়া যায় তাহাকে মা'সিয়াত বা গুনাহ না বলিয়া উহাকে বলা হয় পদস্খলন (زلة)। হযরত আদম (আ)-এর নিষিদ্ধ ফল খাওয়াও ছিল ভুলবশত । কুরআনুল কারীমে বলা হইয়াছে ঃ

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

"তারপর সে (আদম) ভুলিয়া গেল, আর আমি তাহার মধ্যে দৃঢ়তা পাইলাম না" (২ ঃ ১১৫)।

হযরত আদম (আ) তখন আল্লাহ তা'আলা لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ · "এ গাছের কাছেও তোমরা দুইজন ঘেষিও না" বলিয়া যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন উহাও সেই সময় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শয়তান যে চিরশত্রু তাহাও তখন তাঁহার স্মরণ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা যে পূর্বাহ্নেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন ঃ

فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ·

"তোমাদেরকে সে যেন বেহেশত হইতে বাহির করিয়া না দেয়, দিলে তোমরা দুর্ভোগে নিপতিত হইবে" (২ ঃ ১১৭), তাহাও তখন তাঁহার স্মরণ ছিল না। সুতরাং যাহা ঘটিয়াছে ভুলক্রমেই ঘটিয়াছে। উহাকে পাপ বা অপরাধ বলিয়া অভিহিত করাই ভুল । হযরত আদম ও হাওয়া (আ) উভয়ে জান্নাতের জন্যই আত্মহারা ছিলেন। এইজন্য ইবলীসের শপথ শুনিয়া তাঁহারা তাহার প্রতারণার শিকার হইয়া গেলেন এবং ভাবিলেন, স্বয়ং আল্লাহ্র নাম লইয়া কেহ মিথ্যা বলিতে পারে না। উপরন্তু আদম (আ)-এর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ ছিল আল্লাহ্র প্রতি অনুরাগ-মহব্বতেরই কারণে, জান্নাতে আল্লাহ্র নৈকট্য চিরস্থায়ী হইবার আকাঙ্খায়। কুরআন মজীদের আয়াতাংশ যেমন শয়তানের উক্তি হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ ·

"তোমরা দুইজনে ফেরেশতা হইয়া যাও অথবা স্থায়ী হইয়া যাও এইজন্যই তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে এই বৃক্ষ হইতে নিষেধ করিয়াছেন" (৭ ঃ ২০)।

আল্লাহ্র নামে শপথ করার কারণে আদম (আ) এই ভুলে নিপতিত হইয়াছিলেন ঃ

وَقَاسَمَهُمَا اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ٠

"এবং সে (শয়তান) তাহাদের দুইজনের নিকট শপথ করিয়া বলিল, নিশ্চয় আমি তোমাদের দুইজনের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন" (৭ ঃ ২১)।

তখন হযরত আদম (আ)-এর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইল না যে, মহান আল্লাহ্র পবিত্র নাম লইয়াও কেহ মিথ্যা শপথ করিতে পারে, মিথ্যা কথা বলিতে পারে। তিনি মনে করিলেন, আল্লাহ্র কোন বান্দাই তাঁহার পবিত্র ও মহান নাম লইয়া মিথ্যা শপথ করিতে পারে না। সুতরাং বুঝা গেল যে, হযরত আদম (আ)-এর উক্ত কাজ বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্যে বা রিপুর তাড়নায় ছিল না। তাই উহাকে গুনাহ বা অপরাধ বলা যাইবে না বরং উহাকে তাঁহার পদস্খলনই বলিতে হইবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী فَدَلّٰهُمَا بِغُرُوْرٍ এবং فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ -এর উভয় ক্ষেত্রেই উহা যে তাঁহার পদস্খলন ও ভুলবশত ছিল, তাঁহার আল্লাহ্র নাফরমানীর ইচ্ছা ছিল না সেদিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

সুতরাং কুরআনুল কারীমের যে সমস্ত আয়াতে উহাকে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ বা অপরাধ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে উহা কেবল যাহেরী সুরত হিসাবেই বলা হইয়াছে, প্রকৃত অর্থে নহে অথবা তাঁহার উচ্চ মর্যাদার অনুপাতে উহাকে 'ইসয়ান বা অপরাধ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে উত্তম কাজ ছাড়িয়া অনুত্তম বা তাহার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের কাজ করাই এমন যেমনটি অন্যদের জন্য অপরাধমূলক কর্ম (দ্র. খিয়ালী -এর মোল্লা আবদুল হাকীমের লিখিত পাদটীকা)।

নবী-রাসূলগণের ত্রুটির অর্থ হইতেছে উত্তম ও শ্রেষ্ঠতরটির স্থলে ভুলবশত তাহাদের অপেক্ষাকৃত অনুত্তমটি করিয়া বসা। আর অন্যদের ত্রুটির অর্থ হক ও হিদায়াতের স্থলে বাতিল বা গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়া। উম্মতের আলিমগণের সর্ববাদীসম্মত মতে আম্বিয়ায়ে কিরাম এই জাতীয় ত্রুটি বা অপরাধ হইতে মুক্ত, মা'সূম। তাঁহাদের ইজতিহাদগত ত্রুটির অর্থ হইতেছে ভুলবশত উত্তম ও শ্রেষ্ঠতরটির স্থলে অপেক্ষাকৃত অনুত্তম তাঁহাদের দ্বারা সংঘটিত হইয়া যাওয়া।

হযরত আদম (আ)-এর পদস্খলন (زَلَّةٌ) ততটুকুই। তাহা না হইয়া (আল্লাহ্র আশ্রয় চাই) তাঁহারা যদি লোভের বশবর্তী ও রিপুর অনুবর্তী হইতেন, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর তাহাদের নিঃশর্ত ও অকুণ্ঠ আনুগত্য কখনও ফরয বা অপরিহার্য করিয়া দিতেন না আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁহাদের অনুকরণের নির্দেশ দিয়া বলিতেন না ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ٠

"ইহারাই হইতেছে সেই সব ব্যক্তি যাহাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ হিদায়াত দান করিয়াছেন, সুতরাং (তুমি ওহে রাসূল) তাহাদেরই অনুকরণ কর" (৬ ঃ ৯০) (দ্র. আল-মু'তামাদ ফি'ল-মু'তাকাদ-তাওরীশী প্রণীত)।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী (র) বলেন ঃ চিন্তা-গবেষণায় ইহাই যৌক্তিক গ্রহণযোগ্য হইতে বাধ্য যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মা'সূম হওয়ার বিশ্বাস ফেরেশতাদের মা'সূম হওয়ার বিশ্বাসের চাইতে অধিকতর তাকিদপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। এইজন্য যে, লোকজন আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুসরণ করার জন্য আদিষ্ট, ফিরিশতাগণের অনুসরণের জন্য আদিষ্ট নহে (দ্র. আল-মু'তামাদ ফি'ল-মু'তাকাদ, পৃ. ৭৩)।

মা'সূম বা নিষ্পাপ হওয়ার ক্ষেত্রেসমূহ

ইমাম রাযী (র) বলেন, ইসমতের সম্পর্ক চারটি ব্যাপারের সহিত ঃ

(১) আকাইদ (বিশ্বাস)

(২) আহকাম (আদেশ-নিষেধের তাবলীগ)

(৩) ফাতওয়া ও ইজতিহাদ;

(৪) কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্র।

(১) আকাইদ সম্পর্কে গোটা মুসলিম উম্মাহর সর্ববাদীসম্মত মত এই যে, নবী-রাসূলগণ একেবারে গোড়া হইতেই সহজাতভাবে তাওহীদ ও ঈমানের অধিকারী হইয়া থাকেন। ভূমিষ্ঠ কাল হইতেই তাঁহাদের অন্তর কুফর ও শিরকের ক্লেদমুক্ত এবং ইয়াকীন ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকে। তাঁহাদের মুবারক চেহারাসমূহ সর্বদা মারিফাত ও আল্লাহ্র নৈকট্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত থাকে। আজ পর্যন্ত ইতিহাসে ইহার কোন প্রামণ পাওয়া যায় নাই যে, আল্লাহ তা'আলা যে পবিত্র আত্মা মনীষিগণকে নবুওয়াত ও রিসালাত দানে ধন্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যকার কোন একজনও জীবনের কোন পর্যায়ে শিরক ও কুফরের কলুষতায় নিপতিত হইয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عَالِمِيْنَ.

"ইবরাহীমকে আমি পূর্ব হইতেই হিদায়াত দান করিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলাম" (২১ ঃ ৫১)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যদিও নবীগণ নবী পদবাচ্য হন না, তবুও তাঁহারা তখনও আল্লাহ্ কামিল ওলী এবং নৈকট্যধন্য অবশ্যই থাকেন। তাঁহাদের সেই বিলায়াত এত উচ্চ মানের হয় যে, অন্য ওলীগণ তাঁহাদের তুলনায় সমুদ্রের সম্মুখে বারি বিন্দুসমও গণ্য হন না। এইজন্য উম্মতে মুহাম্মাদীর আলিমগণ এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তরে কুফর ও গুমরাহির উপস্থিতি অসম্ভব।

(২) তাবলীগে আহকাম বা আদেশ-নিষেধের প্রচারে নবী-রাসূলগণ যে মা'সূম এ ব্যাপারে গোটা উম্মত একমত। এই ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহাদের কোন ভুলভ্রান্তির শিকার হওয়া বা মনের অজান্তে ভুলক্রমে তাবলীগের ক্ষেত্রে তাহাদের মিথ্যা বা বিকৃতির আশ্রয় লওয়া অসম্ভব। এই ব্যাপারে তাঁহারা সর্বতোভাবে মা'সূম ও পবিত্র। তাঁহাদের সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় অনুরাগ বা বিরাগের ক্ষেত্রে কোন অবস্থায়ই ওহী প্রচারের ব্যাপারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহাদের কোনরূপ মিথ্যা বা ছলচাতুরীর আশ্রয় লওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার। নচেৎ অকুণ্ঠচিত্তে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় ফেরেশতাগণের

কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা থাকিত, যাহাতে শয়তানের কোনরূপ হস্তক্ষেপ, ভেজাল বা মিথ্যার সংমিশ্রণ ওহীর সহিত না ঘটিতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهِ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا . لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْئٍ عَدَدًا .

"তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি তাঁহার অদৃশ্যের জ্ঞান কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না তাঁহার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ রাসূলের অগ্র ও পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন, রাসূলগণ তাহাদের প্রতিপালকের বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছেন কিনা জানিবার জন্য। রাসূলগণের নিকট যাহা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন" (৭২ ঃ ২৬-২৮)।

(৩) ফাতওয়া ও ইজতিহাদের ব্যাপারে উলামায়ে ইসলামের মত হইতেছে, আম্বিয়ায়ে কিরাম যে সমস্ত ব্যাপারে ওহী অবতীর্ণ হয় নাই এমন ব্যাপারসমূহে কখনও কখনও ইজতিহাদও করিতেন। কখনও সেই সব ইজতিহাদে ভুলত্রুটি হইয়া গেলে সাথে সাথে ওহীর মাধ্যমে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত। নবী-রাসূলের পক্ষ হইতে ইজতিহাদগত কোন ত্রুটি হইয়া যাইবে অথচ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাঁহাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করা হইবে না এমনটি হইতেই পারে না।

(৪) কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর অভিমত এই যে, নবী-রাসূলগণ কবীরা গুনাহ হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত ও পবিত্র, অবশ্য সগীরা বা অনুত্তম পর্যায়ের কাজ কখনো ভুলবশত বা অজ্ঞাতসারে হইয়া যাইতে পারে। বাহ্যিকভাবে তাহা অপরাধ বলিয়া মনে হইলেও ঐগুলির দ্বারাও শরীআতের কোন কোন হুকুম ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যুহর বা আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভুল (সাহু) হইয়া যাওয়া। বাহ্যত উহা ভুল বলিয়া দেখা গেলেও ইহার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সিজদায়ে সহো শিক্ষা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল। নবী করীম (স)-এর নামাযে সাহু না হইলে উম্মত সিজদায়ে সাহুর মাস্আলা কীভাবে শিক্ষা লাভ করিত? অনুরূপভাবে 'লায়লাতুত তা'রীছ' নামে মশহুর রাত্রিতে তাঁহার নামায কাযা না হইলে উম্মত কাযা নামায আদায়ের মাস্আলা কোথা হইতে লাভ করিত? এই হিসাবে ঐ সাহু বা ভুলিয়া যাওয়াটাও ছিল আল্লাহ্র দয়া ও সাক্ষাত রহমত। এইজন্য হযরত আবূ বক্র (রা) বলিতেন ঃ يا ليتنى كنت سهو محمد "হায়, যদি আমি মুহাম্মাদের ভুলত্রুটিই হইতাম"! অর্থাৎ মহানবী (স)-এর ভুল ও আমার হাজার নির্ভুল হইতে উত্তম। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ .

"নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাইব, ফলে তুমি বিস্মৃত হইবে না, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন তাহা ব্যতীত" (৮৭ ঃ ৬ -৭)।

এই আয়াত দ্বারাও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নবীর ভুলিয়া যাওয়ার মধ্যেও কোন না কোন তাৎপর্য নিহিত থাকে। মানুষ হিসাবে নবী-রাসূলগণেরও ভুলত্রুটি হইয়া থাকে। তাহা এইজন্য যে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত মানবরূপে থাকিবেন, মানবীয় বৈশিষ্ট্যাবলী হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্ত থাকা সম্ভব নহে ঃ ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে, আনন্দ-উৎফুল্লতাও আছে, হাসি-কান্না আছে, অনুরাগ-বিরাগও আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বাণী ঃ

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ٠

"বল আমি তোমাদেরই মত মানুষ" (১৮ ঃ ১১০)। ইহার মধ্যে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে অর্থাৎ নবী হওয়া সত্ত্বেও আমি মানুষই, ফেরেশতা নই। তোমাদেরই মত পানাহার করিয়া থাকি এবং মানবীয় প্রয়োজনাদি মিটাইবার উদ্দেশে হাট-বাজারেও গিয়া থাকি। এইসব কিছুই মানবীয় বৈশিষ্ট্য। এইগুলিও নবুওয়াত ও রিসালতের পরিপন্থী নহে। অবশ্য নবী-রাসূলগণের ভুল-ত্রুটি স্থায়ী হয় না, মানবীয় কারণে কখনও কোন ভুলচুক হইয়া গেলেও তাহা ঐ একবারই, জীবনে আর কোন দিন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয় না। যেমন হাদীসে আছে ঃ

لايلدغ المؤمن من جحر مرتين ٠

"মুমিন কখনও একই গর্তে দুইবার পা দেয় না।"

অনুরূপ হযরত আদম (আ)-এর উক্ত নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণও ছিল মানবীয় ভুলের ফসল। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ٠

আদম (আ) বিস্মৃত হইলেন এবং আল্লাহ্র নিষেধ ও শয়তানের শত্রুতার কথা তাঁহার স্মরণে রহিল না। অবাধ্যতার ইচ্ছা তাঁহার মোটেও ছিল না। কেবল শয়তানের কসমের দ্বারাই তিনি প্রতারিত হন। হাদীছে আছে ঃ المؤمن غـر كـريم। (মুমিন প্রতারিত হইয়া পড়ে)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ٠

"তোমরা কোন ভুল করিলে তোমাদের কোন অপরাধ নাই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সঙ্কল্প থাকিলে অপরাধ হইবে " (৩৩ ঃ ৫)।

উক্ত আয়াত অনুসারে অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটিতে যেখান গুনাহ নাই, সেখানে উহা 'ইসমতের' পরিপন্থী নহে। এই কারণেই রোযা অবস্থায় ভুলক্রমে পানাহার করিয়া ফেলিলে উহাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। হযরত আদম (আ)-এর অন্তর যেহেতু পবিত্র এবং আল্লাহ ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল তাই শয়তান যখন বলিল ঃ

اِنِّيْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ ٠

(নিশ্চিতভাবেই আমি তো তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন; ৭ ঃ ২১), তখন তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার নামে কেহ মিথ্যা কসম করিতে পারে। এই প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান আদম (আ)-এর পদস্খলন ঘটায়। কুরআন শরীফের ভাষায় ঃ

فَدَلَّٰهُمَا بِغُرُورٍ ۚ

"শয়তান তাহাদের দুইজনকে ধোঁকা দিয়া অধঃপতিত করিল" (৭ ঃ ২২)। غُرُورٌ শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই মা'সিয়াত বা অপরাধটির মূলে রহিয়াছে ধোঁকা বা প্রতারণা। নতুবা আদমের তাহাতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। তিনি বরং আল্লাহ তা'আলার আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষী ও তজ্জন্য প্রয়াসী ছিলেন। আনুগত্যের বাহানায় শয়তান তাঁহাকে বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে লিপ্ত করে। কিন্তু এই অপরাধটি কেবল বাহ্যিকভাবেই অপরাধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল মহা নি'মত ও অনন্ত রহমত। উহার উদ্দেশ্য ছিল গুনাহগারদেরকে তওবা ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। যেমন মহানবী (স)-এর নামাযে ভুলের দ্বারা সাহু সিজদা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, তেমনি আদম (আ)-এর ত্রুটির দ্বারা আদম সন্তানদেরকে তওবা-ইসতিগফার শিক্ষা দানই উদ্দেশ্য। যখন কোন আদম সন্তানের দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হইয়া পড়ে, অমনি সে তাহার আধিপিতা আদম (আ)-এর ন্যায় কান্নাকাটি ও আহাজারির সহিত আল্লাহ তা'আলার দরবারে লুটাইয়া পড়িবে। সে শয়তানের মত উল্টা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হইবে না। যদি আদম (আ)-এর দ্বারা কোন ভুলই সংঘটিত না হইত, তাহা হইলে আদম-সন্তানগণ তওবা-ইস্তিগফারের শিক্ষা কেমন করিয়া লাভ করিত?

শায়খ আবদুল ওয়াহআব শা'রানী (র) বলেন, "আল্লাহ তা'আলার ইল্ম-এর মধ্যে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুইটিই ছিল। তাঁহার হিকমত ছিল এই যে, দুইটিরই সূচনা হইয়া যাইবে। তাহা তিনি সৌভাগ্যের উদ্বোধন আদম (আ)-এর দ্বারাই করাইলেন এবং যুগপৎভাবে দুর্ভাগ্যের উদ্বোধন শয়তানের দ্বারা করাইলেন।"

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে, যে ব্যক্তি কোন সুন্নাতে হাসানা বা শুভ রীতির সূচনা করে, উহার উপর আমলকারী সকলের সওয়াবের সমপরিমাণ ছওয়াব সেই সূচনাকারীও লাভ করিয়া থাকে। যতদিন পর্যন্ত সেই শুভ কর্মটি চালু থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সে ঐ ছওয়াব পাইতে থাকিবে। অনুরূপ হযরত আদম (আ) এই পৃথিবীতে তওবা ও ইস্তিগফার তথা আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করার ও ক্ষমা প্রার্থনার বরকতময় সুন্নাত বা রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তওবা ও ইস্তিগফার করিয়া আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করিবে, তাহাদের সকলের সওয়াবের ভাগ তিনিও লাভ করিবেন এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

পক্ষান্তরে ইবলীস অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও অহমিকা প্রকাশের (সুন্নাতে সায়্যিআ) বা অশুভ রীতির প্রবর্তন করে। কিয়ামত পর্যন্ত যত ব্যক্তি আল্লাহর আদেশের প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন ও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবে, ততই ইবলীসের প্রতি লা'নত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এইজন্য যে, সে অস্বীকৃতি

জ্ঞাপনকারি কাফির ও দাম্ভিকদের পথপ্রদর্শক এবং আল্লাহ তা'আলার বিধান হইতে বিমুখতা প্রদর্শনকারীদের অগ্রপথিক। শায়খ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মুর্শিদ শায়খ আবুল আব্বাস আরীনী প্রায়ই বলিতেন, (আল্লাহ পানাহ্) হযরত আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করেন নাই, বরং তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সুপ্ত তাঁহার হতভাগা সন্তানরাই এই অবাধ্যতার কারণ। কেননা হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ সেই নৌযানের মত ছিল, যাহাতে তাঁহার সমস্ত পুণ্যবান ও পাপাচারী সন্তানরা সওয়ার ছিল।

হাফিয ইবন কায়্যিম (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কখনও কখনও তাঁহার কোন বান্দার মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তাহাকে কোন পাপাচার ও মা'সিয়াতে লিপ্ত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে উহা দ্বারা তিনি তাহার একটি বাতিনী রোগের চিকিৎসা করেন। সেই রোগটি হইতেছে আত্মশ্লাঘা বা অহমিকা। এমতাবস্থায় একটি ত্রুটি বা বিচ্যুতি হাজার ইবাদতের চাইতে অধিকতর উপকারী প্রমাণিত হয়।

ইহা সর্বজনবিদিত যে, কোন কোন সময় সুস্বাস্থ্য এতটা উপকারী প্রতিপন্ন হয় না, যতটা উপকারী প্রতিপন্ন হয় রোগ-ব্যাধি। এইজন্য যে, রোগের সূচনা হওয়ামাত্র তাহার চিকিৎসা ও প্রতিবিধানের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং দক্ষ চিকিৎসকের মাধ্যমেই শরীর পূর্বের তুলনায় অধিকতর নিরোগ হইয়া যায়। তারপর নানা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর বলবর্ধক ঔষধ, পথ্য সেবনে ও আহার্য-পানীয় গ্রহণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পূর্বের তুলনায় অধিকতর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া উঠে।

অনুরূপ হযরত আদম (আ)-এর উক্ত পদস্খলনের পর উপর্যুপরি তিন শত বৎসর পর্যন্ত তওবা-ইস্তিগফার ও আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটির মধ্যে কাটাইয়া দেওয়াটা তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হইয়া যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ٠ ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى ٠

"আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে দুর্ভোগে পতিত হইল। ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার তওবা কবুল করিলেন ও তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন" (২০ ঃ ১২১-১২২)।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে নবী-রাসূলগণের পদস্খলনের কথা এইজন্য বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে লোকে ধারণা করিতে পারে যে, তাঁহারা কত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কতই না নৈকট্য-প্রাপ্ত বান্দা ছিলেন যে সামান্য ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে। তাঁহারও সর্বদা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিতেন। নবী-রাসূলগণের এই ভুলভ্রান্তিগুলিই প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের মা'সূম হওয়ার প্রমাণবহ।

নবীগণের মা'সূম হওয়ার দলীলসমূহ

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ٠

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করিল, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্রই আনুগত করিল" (৪ ঃ ৮০)।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ·

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর, যাহাতে তোমরা কৃপা লাভ করিতে পার" (৩ঃ ১৩২)।

প্রথমোক্ত আয়াতে রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নিজের আনুগত্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, কোন গায়ের মা'সূম ব্যক্তির আনুগত্যকে স্বয়ং আল্লাহ্র আনুগত্য বলিয়া অভিহিত করা চলে না। আল্লাহ্র আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্যকে কেবল তখনই অভিন্ন বলা যাইতে পারে যখন রাসূল আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকিবেন। আয়াতে তাগিদসূচক قد শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে ,যাহাতে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের মধ্যে পার্থক্য না করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا · اُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ حَقًّا ·

"যাহারা আল্লাহকে অস্বীকার করে ও তাঁহার রাসূলগণকেও এবং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি এবং কতককে অবিশ্বাস করি, আর তাহারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করিতে চাহে, ইহারাই প্রকৃত কাফির" (৪ ঃ ১ ৫০-১৫১)।

দ্বিতীয়োক্ত আয়াতে নিঃশর্তভাবে রাসূলের আনুগত্যের হুকুম দেওয়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য রহমতের ওয়াদা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কোন গায়ের মা'সূম ব্যক্তির নিঃশর্ত আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, বরং তাহাদের আনুগত্যের নির্দেশ প্রদানকালে আনুগত্যের মাপকাঠি দেওয়া হইয়াছে এইভাবে ঃ

السمع والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (بخارى) ·

"আমীরের আনুগত্য ততক্ষণ পর্যন্ত জরুরী যতক্ষণ পর্যন্ত কোন পাপাচারের হুকুম আমীর না দেয়। কিন্তু আমীর যখন কোন পাপাচারের নির্দেশ দিবে তখন আর তাহার আনুগত্য করা চলিবে না" (বুখারী)।

পক্ষান্তরে যে সমস্ত আয়াতে নবীর আনুগত্যের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, কোথায়ও এরূপ বলা হয় নাই যে, যাবৎ না কোন পাপাচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, নবীর কোন কাজ পাপাচার বা মা'সিয়ত হইতেই পারে না, যাহাতে আমীর ও খলীফাগণের মত তাঁহাদের আনুগত্যের ব্যাপারেও শর্ত আরোপ করিতে হয়। অনুরূপভাবে বুঝা গেল যে, কোন গায়ের মা'সূম ব্যক্তির নিঃশর্ত আনুগত্য রহমতের কারণও হইতে পারে না।

(২) নবীগণ যদি পাপাচার হইতে মা'সূম না হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা সাক্ষী হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইতেন না। কেননা পাপাচারীরা ফাসিক হইয়া থাকে এবং ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا ۔

"যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ লইয়া আসে তবে তোমরা উহা যাচাই করিয়া লইবে" (৪৯ ঃ ৬)।

তাহা হইলে কিয়ামতের দিন অন্যান্য উম্মতের মুকাবিলায় নবীগণের সাক্ষ্য কিভাবে গ্রহণযোগ্য হইবে? অথচ কুরআন শরীফে আছে যে, প্রত্যেক নবী কিয়ামতের দিন নিজ নিজ উম্মতের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰؤُلَاءِ شَهِيْدًا ۔

"যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হইতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করিব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব তখন কী অবস্থা হইবে" (৪ ঃ ৪১)?

(৩) নবীর কাজ হইল মানুষকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের দিকে আহবান করা। এখন তাঁহারা নিজেরাই যদি আল্লাহ্‌র বাধ্য-অনুগত বান্দা না হন তাহা হইলে তো তাঁহারা আল্লাহ্‌র ভর্ৎসনার উপযুক্ত হইবেন। যেমন কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۔

"তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও, অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর! তবে কি তোমরা বুঝ না" (২ ঃ ৪৪)?

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ ۔ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ ۔

"তোমরা যাহা কর না তাহা তোমরা কেন বল এবং তোমরা যাহা কর না তোমাদের তাহা বলা আল্লাহ্‌র নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক" (৬১ ঃ ২-৩)।

অথচ এরূপ আচরণ একজন সাধারণ বক্তা ও নিম্নমানের আলিমের পক্ষেও সমীচীন নহে। নবী-রাসূলগণের পক্ষে তাহা কী করিয়া শোভন হইতে পারে?

(৪) পাপাচার সংঘটিত হইয়া থাকে শয়তানের আনুগত্যের কারণে। নবীগণ যদি মাসূম না হন তাহা হইলে তাহাদেরকে শয়তানের আনুগত্যকারী সাব্যস্ত করিতে হয়। যেমন আল্লাহ বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

"উহাদের সম্পর্কে ইবলীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণ করিল, ফলে উহাদের মধ্যে একটি মুমিন দল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিল" (৩৪ ঃ ২০)।

অথচ নবীগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই হইল শয়তানের অনুসরণ হইতে লোকজনকে রক্ষা করা।

(৫) নবীগণ মা'সূম না হইলে তাহাদের তুলনায় যাহারা নবী নন তাহাদের শ্রেষ্ঠতর হওয়া প্রমাণিত হয়। কেননা উক্ত আয়াতে মুমিনদের একটি দলকে উহার ব্যতিক্রম বলা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা নবীগণের চাইতেও উত্তম প্রতিপন্ন হইবেন। কেননা ঐ মতে নবীগণ যেখানে শয়তানের অনুসরণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না, সেখানে তাহারা কঠোর তাকওয়া ও ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন। আর আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ ۔

"তোমাদের মধ্যকার অধিকতর তাকওয়ার অধিকারীরাই আল্লাহ্র নিকট অধিকতর মর্যাদার অধিকারী" (৪৯ ঃ ১৩)

(৬) আল্লাহ তা'আলা বান্দাদিগকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেনঃ হিযবুল্লাহ বা আল্লাহ্র দল এবং হিযবুশ শয়তান বা শয়তানের দল। প্রথমোক্ত দল বলিয়া অভিহিত করিয়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

"ওহে! আল্লাহ্র দলই সফলকাম দল" (৫৮ ঃ ২২)।

فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ ۔

"ওহে! আল্লাহ্র দলই বিজয়ী" (৫ ঃ ৫৬)।

اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ۔

"ওহে! শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত" (৫৮ঃ ১৯)।

সুতরাং নবীগণের পাপাচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হইলে আল্লাহ্র দলের পরিবর্তে তাহাদেরকে শয়তানের দলবর্তী এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় (নাউযু বিল্লাহ)। ইহা তো কখনও হইতে পারে না।

(৭)। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে স্বয়ং ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন এইভাবে ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۔

"আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি উহাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করিব, তবে উহাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদিগকে নহে" (৩৮ ঃ ৮২-৮৩)।

আর সর্বদিক দিয়া একনিষ্ঠ বান্দা কেবল নবী-রাসূলগণই, যেমন হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়া'কূব (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۔

এবং হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّه مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۔

(দ্র. ৩৮ ঃ ৪৬ ও ১২ ঃ ২৪)।

উক্ত আয়াতসমূহে এবং কুরআনুল করীমের আরও অনেক স্থানে নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ বান্দা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

(৮)। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে নবী-রাসূলগণকে مصطفى ও مجتبى নির্বাচিত, মনোনীত,. বাছাইকৃত ও বিশেষ মর্যাদাবান পুণ্যবান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ۔

"নিঃসন্দেহে তাহারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৮ ঃ ৪৭)।

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ۔

"স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফলের কথা, ইহারা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন" (৩৮ ঃ ৪৮)। লক্ষণীয়, তাহাদের কোন বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহাদেরকে মনোনীত ও মর্যাদাশীল বান্দা বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই, বরং সামগ্রিকভাবে তাঁহাদেরকে মনোনীতরূপে ঘোষণা করা হইয়াছে। এহেন নির্বাচিত ও মনোনীত বান্দাগণ যে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত হইতে পারেন না, তাহা বলাই বাহুল্য।

(৯)। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ۔

"তাহারা কল্যাণকর কাজে ধাবিত হয়" (৩ ঃ ১১৪)।

লক্ষণীয় خَيْرٰت শব্দটিকে ال যোগে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই ال ব্যাকরণে ال استغراقى বা সম্পূর্ণবোধক অব্যয় বলা হয়, যাহরা অর্থ হইতেছে তাঁহারা সর্বপ্রকার কল্যাণেরই আধার, অকল্যাণকর কিছু তাঁহাদের দ্বারা হইতে পারে না।

(১০) প্রত্যেক পাপীতাপীর ব্যাপারেই 'যালিম' শব্দটি প্রযোজ্য। কুরআন শরীফের অনেক স্থানেই পাপীদিগকে 'যালিম' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং কোন নবী যদি কোন অবাধ্যতায় লিপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাপারেও উহা প্রযোজ্য হইত। কোন যালিম-এর পক্ষে নবী হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۔

"আমার প্রতিশ্রুতি যালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নহে" (২ ঃ ১২৪)।

উক্ত আয়াতে عَهْدٌ শব্দ দ্বারা যদি নবুওয়াত উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাপাচারী ও যালিম যে নবী হইতে পারে না তাহা তো স্পষ্ট কথা। আর যদি ইহার অর্থ 'ইমামত' বা নেতৃত্ব হইয়া থাকে, যেমনটি তাফসীর জালালায়নে উক্ত হইয়াছে, তবে ইহার দ্বারা যালিমের পক্ষে নবী হওয়া যে অসম্ভব তাহা আরও জোরদারভাবে প্রমাণিত হয়। কেননা ইমামতের তুলনায় নবুওয়াতের মর্যাদা এতই

অধিক যে, বিন্দুর সাথে সিন্ধুর তুলনাও এখানে অচল। এমতাবস্থায় যালিম যদি 'ইমাম' বা নেতাই হইতে না পারে, নবী হইবে কেমন করিয়া?

(১১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ .

"আল্লাহ তা'আলা সেই পবিত্র সত্তা যিনি নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদেরই মধ্য হইতে যিনি তাহাদেরকে তাঁহার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবেন এবং তাহাদেরকে পবিত্র করিবেন" (৬২ ঃ ২)।

নবী নিজেই যদি আত্মিকভাবে বিশুদ্ধ না হইয়া পাপাচারী হন তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা অন্যদের শুদ্ধি কেমন করিয়া সাধিত হইতে পারে?

(১২) নবী আল্লাহ্র পক্ষ হইতে উম্মতের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা (সুন্দরতম আদর্শ) এবং আল্লাহ্ তা'আলার পসন্দসই চারিত্রিক গুণাবলীর আধার হইয়া থাকেন, যাহাতে লোকজন বিনা আপত্তিতে চোখ বুজিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিতে এবং তাঁহার প্রতিটি কথা ও কাজকে নিজেদের জন্য আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا .

"তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করে তাহাদের জন্য অবশ্যই উত্তম আদর্শ রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে" (৩৩ ঃ ২১)।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলা পছন্দনীয় স্বভাব-চরিত্র, তাঁহার আনুগত্যের নমুনা এবং আল্লাহ্র ভয় অন্তরে পোষণকারীদের আদর্শ কেবল এমন ব্যক্তিই হইতে পারেন যিনি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র হইবেন।

(১৩) কোন ব্যক্তি যদি নবীর বর্তমানে কোন কাজ করে এবং নবী তাহা লক্ষ্য করিয়াও চুপ থাকেন বা মৌন সমর্থন দেন তবে তাঁহার ঐ মৌনতাই ঐ কাজটি বৈধ হওয়ার প্রমাণরূপে সকল দলমতের মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, নবীর মৌন সমর্থনই কোন কাজকে আল্লাহ্র বিরুদ্ধাচরণের সীমা হইতে বৈধতার গণ্ডীর মধ্যে নিয়া আসে। এমতাবস্থায় তাঁহার নিজের করা কাজ কেমন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে?

(১৪) কতক লোক যখন নিজেদের সম্পর্কে দাবি করিল যে, তাহারা আল্লাহ্র প্রিয়ভাজন, তখন আয়াত নাযিল হইল ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ .

"তুমি বলিয়া দাও (হে রাসূল), যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহা হইলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করিয়া দিবেন" (৩ ঃ ৩১)।

উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণকে আল্লাহ নিজের ভালবাসার মাপকাঠি সাব্যস্ত করিয়াছেন। তারপর তাঁহার অনুসরণের বিনিময়ে দুইটি অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহার একটি হইল, যদি তোমরা আমার নবীর অনুসরণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাদেরকে আমার প্রিয়পাত্ররূপে গ্রহণ করিব। দ্বিতীয়ত, তোমাদের গুনাহরাশিও মাফ করিয়া দিব।

বলা বাহুল্য, আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার মাপকাঠি এমন পুণ্যাত্মা ব্যক্তির অনুসরণই হইতে পারে যিনি মা'সূম হইবেন। একজন গায়র ম'সূমের আনুগত্য মহান আল্লাহ্র ভালবাসা লাভের এবং গুনাহসমূহের ক্ষমার কারণ হইতে পারে না (দ্র. ইস্মাতুল আম্বিয়া আরবী, পৃ. ৪-১০; ফখরুদ্দীন রাযী (৫৪৩-৬০৬হি); মা'আরিফুল কুরআন (উর্দু),১খ,পৃ. ৯৯-১১৩; ইদরীস কান্দেহলভী প্রণীত মাকতাবায়ে উছমানীয়া বায়তুল হাম্দ, লাহোর, ২য় মুদ্রণ, ১৯৮২ খৃ.)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধ গর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

২

হযরত শীছ (আ)

حضرت شيث عليه السلام

হযরত শীছ (আ)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিশ্বের প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর তৃতীয় পুত্র ও খলীফা। শীছ শব্দটি (شيث) মূলত হিব্রু। ইহার ইংরাজী রূপ Seth, Sheth এবং আরবী রূপ شيث। অর্থ "আল্লাহ্র দান"। হযরত আদম (আ)-এর দ্বিতীয় পুত্র হাবীল-এর মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পাঁচ বৎসর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য হযরত আদম (আ) ইহাকে আল্লাহ্র দানরূপে গণ্য করিয়া উক্ত নামকরণ করেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৯৮)। ঐতিহাসিক আল-মাসউদী তাঁহার মুরূজু'য-যাহার গ্রন্থে বিষয়টির আরও বিস্তারিত বিবরণ এইভাবে প্রদান করিয়াছেন যে, হাবীলের নিহত হইবার সংবাদ পাইয়া আদম (আ) যখন খুবই বিষণ্ন ও ম্রিয়মান হইয়া পড়েন তখন আল্লাহ তা'আলা ওয়াহয়ির মাধ্যমে তাঁহাকে সন্তান লাভের সুসংবাদ প্রদান করেন। সাথে সাথে তাঁহাকে তাসবীহ-তাহলীল করিতে এবং পবিত্রাবস্থায় স্ত্রী-গমন করিতে নির্দেশ দেন। এইভাবে হযরত হাওওয়া (আ) গর্ভবতী হন এবং তাঁহার মুখমণ্ডলে নূরের ঝলক দেখা যায়। অবশেষে তিনি অতিশয় সুশ্রী ও চরিত্রবান একটি সন্তানের জন্ম দেন। হাওওয়া (আ)-এর নূরের ঝলক তাঁহার মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। আদম (আ) তাঁহার এই পুত্রের নাম রাখেন শীছ (১খ, ৪৭)। হযরত আদম (আ)-এর ১৩০ বৎসর বয়সকালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন (বাইবেলের আদিপুস্তক, ৫ : ৩-৪)।

বাইবেলে হযরত শীছ

বাইবেলে শীছ (আ)-এর জন্ম, সন্তান লাভ ও মৃত্যু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, যাহা নিম্নরূপ ঃ "আর আদম পুনর্বার আপন স্ত্রীর পরিচয় লইলে তিনি পুত্র প্রসব করিলেন ও তাহার নাম শেথ রাখিলেন, কেননা [তিনি কহিলেন], কয়িন কর্তৃক হত হেবলের পরিবর্তে সদাপ্রভু আমাকে আর এক সন্তান দিলেন। পরে শেথেরও পুত্র জন্মিল, আর তিনি তাহার নাম ইনোশ রাখিলেন (বাইবেলের আদি পুস্তক, পৃ. ৬)।

পরে আদম এক শত ত্রিশ বৎসর বয়সে আপনার সাদৃশ্যে ও প্রতিমূর্তিতে পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম শেথ রাখিলেন (আদিপুস্তক, পৃ. ৬)।

শেথ এক শত পাঁচ বৎসর বয়সে ইনোশের জন্ম দিলেন। ইনোশের জন্ম দিলে পর শেথ আট শত সাত বৎসর জীবৎ থাকিয়া আরও পুত্র-কন্যার জন্ম দিলেন। সর্বশুদ্ধ শেথের নয়শত বার বৎসর

বয়স হইলে তাঁহার মৃত্যু হইল (আদিপুস্তক, পৃ. ৭)। ইব্ন কাছীর-এর বর্ণনামতে শীছের এক শত পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে ইনোশ (?)-এর জন্ম হয় (আল-বিদায়া, ১খ, ৯৫)।

খিলাফত ও নবুওয়াত লাভ

হযরত আদম (আ)-এর ইনতিকালের সময় তিনি স্বীয় পুত্র শীছকে নিজের খলীফা মনোনীত করিয়া যান এবং তাঁহাকে অবহিত করেন যে, তাঁহার ইনতিকালের পর তিনি আল্লাহ্র 'হুজ্জাত' ও পৃথিবীর খলীফা, আল্লাহ্র হক ওয়াসীদের নিকট প্রত্যর্পণকারী এবং তাঁহার সন্তানদের মধ্যে যাহাদের ইনতিকাল হয় তিনি তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় (অল-মাসউদী, মুরূজুয-যাহাব, ১খ, ৪৮)। আদম (আ) তাহাকে দিবারাত্রির হিসাব ও উহার প্রতিটি মুহূর্তের ইবাদত শিক্ষা দেন। পরবর্তী কালে সংঘটিতব্য মহাপ্লাবন [দ্র. নূহ (আ) নিবন্ধ] সম্পর্কেও তিনি তাহাকে অবহিত করেন (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৪৩; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৯৮)। ইমাম ছা'লাবীর বর্ণনামতে আদম (আ) স্বীয় পুত্র শীছ (আ)-কে যে ওসিয়ত করিয়া যান তাহা লিখিত আকারে তাহার নিকট প্রদান করেন এবং কাবীলের বংশধরদের নিকট হইতে উহা গোপন রাখিবার নির্দেশ দেন (আছ-ছা'লাবী, আরাইসুল-মাজালিস বা কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৯)। হযরত আদম (আ)-এর ওসিয়ত অনুযায়ী তাঁহার ইনতিকালের পর শাসন ক্ষমতা হযরত শীছ (আ)-এর উপর অর্পিত হয়। তিনি জনগণের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং পিতার ও নিজের প্রতি নাযিলকৃত সহীফা অনুযায়ী শরীআত চালু করেন (আল-মাসউদী, মুরূজুয-যাহাব, ১খ, ৪৮)।

কুরআন করীমে হযরত শীছ (আ)-এর নুবূওয়াত বা অন্য কোনও বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার নুবূওয়াতের কথা আবূ যার্র (রা) বর্ণিত একটি হাদীছ হইতে জানা যায়, যাহা ইব্ন হিব্বান তাঁহার 'সাহীহ' গ্রন্থে মারফূ'রূপে রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণিত ঃ আল্লাহ তা'আলা এক শত সাহীফা ও চারখানা কিতাব অবতীর্ণ করেন। তন্মধ্যে ৫০ খানা সাহীফা হযরত শীছ (আ)-এর উপর নাযিল করেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৯৯; কাযী যায়নু'ল-আবিদীন মীরাঠী, কাসাসুল-কুরআন, পৃ. ৪১)।

দাওয়াত ও তাবলীগ

নুবূওয়াত প্রাপ্তির পর হযরত শীছ (আ) নিজের ও কাবীলের বংশধরদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন। তিনি তাহাদেরকে সত্য পথ প্রদর্শন করেন এবং নেক কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এই সময় লোকজন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একদল তাহার অনুসরণ ও আনুগত্য করে এবং অপর দল কাবীলের বংশধরদের আনুগত্য করে। কাবীলের বংশধরদের কিছু অংশ শীছ (আ)-এর দাওয়াতে সৎপথ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অন্যরা অবাধ্যতার উপর অটল থাকে (দা. মা. ই., ১১খ, ৮৫১)। তাহারা আল্লাহ্কে ছাড়িয়া অগ্নিপূজা করিত যাহা শুরু হইয়াছিল কাবীলের জীবদ্দশাতেই। ইমাম ছা'লাবী বর্ণনা করেন যে, হাবীলকে হত্যার পর কাবীল ভয়ে য়ামান চলিয়া যায়। ইবলীস

সেখানে গমন করিয়া তাহাকে বলে যে, অগ্নি হাবীলের কুরবানী এইজন্য কবুল ও গ্রাস করিয়াছিল যে, সে অগ্নির সেবা ও উপাসনা করিত। তাই তুমি তোমার ও তোমার পরবর্তী বংশের জন্য একখানি গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় অগ্নি স্থাপন কর। ইহা শুনিয়া কাবীল ঐরূপ গৃহ নির্মাণ করিয়া তথায় অগ্নি স্থাপন করিল এবং উহার উপাসনা করিতে লাগিল। সেই হইতে অগ্নিপূজা শুরু হইয়াছিল (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৮)। শীছ (আ)-এর সময়েও কাবীলের কতক বংশধর অগ্নিপূজায় রত ছিল। আর যাহারা শীছ (আ)-এর আনুগত্য করিয়াছিল পরবর্তীতে শীছ (আ)-এর ইনতিকালের পর তাহারাও পথভ্রষ্ট হইয়া যায়। এই কওমকেই সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার জন্য শীছ (আ)-এর অধস্তন ৫ম পুরুষ আখনূখ তথা ইদরীস (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করা হয় (আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ১১)।

হযরত শীছ (আ)-এর বহু জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান উপদেশ বর্ণিত রহিয়াছে (দা.মা.ই., ১১খ, ৮৫১)। তিনি বলিতেন, "আল্লাহ্কে সর্বদা স্মরণ করিবে। ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া চলিবে। পিতা-মাতাকে সম্মান করিবে। তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিবে। ভ্রাতৃত্বভাব রক্ষা করিবে। রিপুর বশীভূত হইয়া ক্রোধকে প্রশ্রয় দিবে না। অভাবগ্রস্ত ও দীন-দুঃখীকে মুক্ত হস্তে দান করিবে। সদয় ব্যবহার করিবে। পাপকার্য হইতে বিরত থাকিবে। বিপদাপদ, বিপর্যয় ও দুর্যোগে ধৈর্য ধারণ করিবে। আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীল হইবে। আল্লাহ্র করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে" (কাজী এ. এফ. মফিজ উদ্দীন আহমদ, কাছাছুল কুরআন, পৃ. ৭৭-৭৮)।

বাসস্থান

Encyclopaedia of Islam-এর নিবন্ধকার CL. Huart-এর বর্ণনামতে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় সিরিয়ায় কাটান। সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া একই বর্ণনা রহিয়াছে (E. J. Brills, First Encyclopaedia of Islam, vol. vii, 358)। কিন্তু এই বর্ণনা একেবারেই অমূলক ও ভিত্তিহীন। কারণ শীছ (আ) পিতার প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। তাই তিনি সর্বদা আদম (আ)-এর সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার খিদমত করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন উক্ত কালের বর্ণনামতে, একদা হযরত আদম (আ)-এর অসুখের সময় জান্নাতের তৈল ও যায়তূন ফল খাওয়ার জন্য তাঁহার বাসনা জাগিল। তিনি স্বীয় পুত্র শীছকে সায়না পর্বতে আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহা চাহিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। সেখানে আল্লাহ তাঁহাকে বলিলেন, তোমার পাত্র আগাইয়া ধর। অতঃপর মুহূর্তের মধ্যে উহা আদম (আ)-এর কাঙ্খিত জিনিসে পূর্ণ হইয়া গেল। অতঃপর আদম (আ) নিজের শরীরে উক্ত তৈল মালিশ করিলেন এবং কয়েকটি যায়তূন ফল খাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুস্থ হইয়া গেলেন (পূ. গ্র.)। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে, শীছ (আ) স্বীয় পিতা আদম (আ)-এর সান্নিধ্যে থাকিতেন। আর আদম (আ) মক্কা শরীফে বসবাস করেন, সেখানেই ইনতিকাল করেন এবং আবূ কুবায়স পর্বতের পাদদেশে তাঁহাকে দাফন করা হয় (পূ. গ্র.; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৯৮)। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত শীছ (আ) মক্কাতেই বসবাস করেন, সিরিয়ায় নহে। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও সীরাত বিশারদ ইবনুল আছীর

সুস্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করিয়া বলেন, তিনি মক্কায় বসবাস করিতেন এবং প্রতি বৎসর হজ্জ ও উমরা পালন করেন (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৪৭)। এতদ্ব্যতীত তাঁহার কর্মকাণ্ড দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়। যেমন হযরত শীছ (আ)-ই প্রথম মাটি ও প্রস্তর দ্বারা কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। ইতোপূর্বে সেখানে আদম (আ)-এর জন্য একটি তাঁবু ছিল যাহা আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে জান্নাত হইতে আনাইয়া সেখানে স্থাপন করাইয়াছিলেন (ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ১২)।

বিবাহ

ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে স্বীয় ভগ্নী হাযূরার সহিত হযরত শীছ (আ)-এর বিবাহ হয় (দা.মা.ই., ১১খ, ৮৫০)। তখনকার নিয়ম ছিল হাওওয়া (আ) একসঙ্গে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিতেন। তাই এক গর্ভের পুত্রের সহিত অন্য গর্ভের কন্যার বিবাহ হইত (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৪৪-৪৫)।

ইনতিকাল

শেষ জীবনে হযরত শীছ (আ) রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে স্বীয় পুত্র আনূশকে ডাকিয়া ওসিয়ত করেন। অতঃপর মক্কায়ই ৯১২ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং আবূ কুবায়স পর্বতের গুহায় স্বীয় পিতা-মাতার পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয় (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, খ, ৪৭; দা. মা. ই., ১১খ, ৮৫০)।

আকৃতি-প্রকৃতি

দৈহিক অবয়ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া তিনি ছিলেন অবিকল স্বীয় পিতা আদম (আ)-এর ন্যায় (দা. মা. ই., ১১খ, ৮৫১)। তবে আদম (আ) ছিলেন শশ্রুবিহীন, আর তিনি ছিলেন শশ্রুমণ্ডিত (পূ. গ্র., পৃ. ৮৫০)।

সন্তান-সন্ততি

বাইবেলের বর্ণনামতে শীছ (আ)-এর বয়স ১০৫ (এক শত পাঁচ) বৎসর কালে তাঁহার পুত্র আনূশ জন্মগ্রহণ করে (Genesis, 5 : 6-8)। আনূশ ছাড়াও তাঁহার আরও বেশ কয়েকজন পুত্র-কন্যা ছিল (ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ১৩)। কিন্তু ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে তাহাদের নাম-পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তী কালের সকল মানুষ শীছ (আ)-এরই বংশধর। কারণ আদম (আ)-এর দ্বিতীয় পুত্র হাবীল-এর অকাল শাহাদাত লাভের কারণে তাহার কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। আর কাবীলের বংশধর সকলেই কাফির হওয়ার ফলে হযরত নূহ (আ)-এর মহাপ্লাবনে সকলেই ডুবিয়া মারা যায় (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান -নিহায়া, ১খ, ৯৮)।

ইনতিকালের সময় শীছ (আ) স্বীয় পুত্র আনূশকে ডাকিয়া হিদায়াতের সিলসিলা জারী রাখার জন্য ওসিয়ত করিয়া যান। ওসিয়ত অনুযায়ী তিনি আল্লাহ্র পয়গাম পৌছাইতে থাকেন। অতঃপর

তদীয় পুত্র কীনান, অতঃপর তদীয় পুত্র মাহলাঈল তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। কথিত আছে যে, পারস্যবাসীর ধারণামতে, মাহলাঈল সাত ইকলীমের বাদশাহ ছিলেন, সকল আদম সন্তানের বাদশাহ ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম বৃক্ষ কাটিয়া কাঠের ব্যবহার শুরু করেন। তিনিই বিভিন্ন শহর এবং শহরের বাহিরে বড় বড় কিল্লা নির্মাণ করেন। তিনিই ছিলেন বাবিল ও সূর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই শয়তানের অনুসারীদেরকে মারপিট করিয়া দূর-দূরান্তে তাড়াইয়া দেন। তাহারা পাহাড়-পর্বতে গিয়া বসবাস করিতে থাকে। তিনি একটি মুকুট বানাইয়াছিলেন, যাহা পরিধান করিয়া তিনি রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। চল্লিশ বৎসর তিনি রাজত্ব পরিচালনা করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ৯৯; যায়নুল আবিদীন মীরাঠী, কাসাসুল কুরআন, পৃ. ৪২)। মাহলাঈলের পর তাহার পুত্র য়ারুদ এবং তাহার পর তৎপুত্র আখনূখ তথা ইদরীস (আ) এই দায়িত্ব প্রাপ্ত হন (পৃ. গ্র.)।

আল-মুকান্না, যে ৭৮০ খৃ.-এর দিকে খুরাসানে নুবূওয়াতের দাবি করিয়াছিল, সে মনে করিত যে, আল্লাহ্‌র আত্মা হযরত আদম (আ) হইতে শীছ (আ)-এর মধ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছিল (মুতাহ্‌হার ইব্‌ন তাহির আল-মাকদিসী, কিতাবুল-খালক, Huart কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত, ৬খ, ৯৬-এর বরাতে স. ই. বি., ২খ, ৩৯৬)। এই ধারণাটি নসটিক (Gnostic= মর্মজ্ঞ) নামীয় একটি সম্প্রদায় হইতে বিস্তার লাভ করিয়াছে, যাহারা শীছীয় সম্প্রদায় এবং খৃস্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ইহাদের অনুসারীদেরকে মিসরে দেখা যায় (পৃ. গ্র.; দা. মা. ই., ১১খ, ৮৫১; বুতরুস আল-বুসতানী সম্পা., দাইরাতুল-মা'আরিফ, ১০খ, ৬৪৮)। ইহাদের নিকট "সাহীফায়ে শীছ-এর ভাষ্য" (Paraphrase of Seth) বিদ্যমান ছিল। সাতখানি সাহীফা ছিল শীছ (আ)-এর এবং অন্য সাতখানি তাহার পরবর্তীদের, যেগুলিকে তাহারা "আজনবী" (অপরিচিত) বলিত (Epiphanes, Hear, 5 : 39)। নসটিকদের নিকট Jaldabaoth-এর গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা শীছ (আ)-এর প্রতি আরোপ করা হয় (Epiphanes, পৃ. গ্র., ৮ : ২৬)। হাররান-এর সাবীদের নিকট কয়েকখানি সাহীফা ছিল যাহা শীছ (আ)-এর প্রতি আরোপ করা হইত (E. J. Brills, First Encyclopaedia of Islam, Vol. vii, 385; দা. মা. ই., ১১খ, ৮৫১)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া দারুল-ফিকর আল-আরাবী, আল-জীয়া (মিসর), তা. বি., ১খ, ৯৮-৯৯; (২) ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, আল-মারকাযুল-আরাবী আল-হাদীছ, মিসর তা. বি., পৃ. ৫৪-৫৬; (৩) আছ-ছা'লাবী, আরাইসুল-মাজালিস বা কাসাসুল আম্বিয়া, আল-মাকতাবা আল-কাসতুলিয়্যা ১২৮২ হি., পৃ. ৪৮-৫০; (৪) ইব্‌ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত ১ম সং, ১৪০৭/১৯৮৭, পৃ. ১২-১৩; (৫) ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল ফি'ত-তা'রীখ, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১ম সং, ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ, ৪৭; (৬) আল-মাসউদী, মুরূজুয-যাহাব, দারুল-আনদালুস, বৈরূত ৫ম সং, ১৯৮৩ খৃ., ১খ, ৪৭-৫০; (৭) কাযী যায়নুল আবিদীন সাজ্জাদ মীরাঠী, কাসাসুল কুরআন, মারকাযুল-মাআরিফ, দেওবানদ ১ম সং, ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ৪১-৪২; (৮) ইদারা তাসনীফ ওয়া তা'লীফ কর্তৃক সম্পা. আনওয়ারে আম্বিয়া, চক আনারকলী, লাহোর ৫ম সং, ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ১১-১২; (৯)

বুতরুস আল-বুসতানী সম্পা., দাইরাতুল মা'আরিফ, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত তা. বি., ১০খ, ৬৪৭-৬৪৮; (১০) দা. মা. ই., লাহোর ১ম সং., ১৩৯৫/১৯৭৫, ১১খ, ৮৫০-৮৫১; (১১) সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ সম্পা., ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, শাহকার বুক ফাউণ্ডেশন, করাচী তা. বি., পৃ. ৯৮৪; (১২) সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ২য় সং., ১৪০৮/১৯৮৭, ২খ, ৩৯৫-৩৯৬; (১৩) কাজী এ. এফ. মফিজ উদ্দীন আহমদ, কাসাসুল কুরআন (বাংলা), ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা ১৯৬৬ খৃ., পৃ. ৭৮-৭৯; (১৪) The Holy Bible, Cambridge University Press, Genesis, Chapter, 4 : 25-26, 5: 3-4, 6-8, Page. 5-6; (১৫) E. J. Brills Encyclopaedia of Islam, Leiden 1987, Vol. vii, p. 3851

আবদুল জলীল

৩

হযরত ইদ্‌রীস (আ)

حضرت ادریس علیه السلام

হযরত ইদ্‌রীস (আ)

হযরত ইদ্‌রীস (আ) মর্যাদাবান একজন মহান নবী। তাঁহার উপর আল্লাহ তাআলা ত্রিশটি সহীফা নাযিল করিয়াছেন। কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কুরআন মজীদে اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (১৯ : ৫৬) তাঁহাকে নবী ও সিদ্দীক বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে শামিল করা হইয়াছে ধৈর্যশীলদিগের মধ্যে كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ (২১ : ৮৫)। তিনিই সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লেখা আবিস্কার করিয়াছেন, আরও আবিষ্কার করিয়াছেন সেলাই এবং ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতি। অস্ত্রশস্ত্রের আবিস্কার তাঁহার আমল হইতেই শুরু হয়। তিনিই সর্বপ্রথম মানব যাঁহাকে আল্লাহ্ তাআলা মুজিযা হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অংক শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার নবুওয়ত ও রিসালাতের উপর ঈমান আনয়ন করা আমাদের উপর অপরিহার্য। কেননা কুরআনের অকাট্য আয়াত দ্বারা তাঁহার রিসালাত ও নবুওয়ত প্রমাণিত। (রূহুল মাআনী, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ১০৫; আন্-নুবুওয়াতু ওয়া'ল-আম্বিয়া, পৃ. ২৯৯)।

জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর নাম, বংশপরিচয় এবং তাঁহার সময়কাল সম্পর্কে ইতিহাস-বেত্তা ও জীবনীকারগণের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি হযরত নূহ (আ)-এর দাদা। কাহারো মতে ইদ্‌রীস শব্দটি মূল অক্ষর (درس) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ পাঠ করা। ইদ্‌রীস (আ) যেহেতু আল্লাহ্‌র কিতাব বেশী বেশী পাঠ করিতেন তাই তাঁহাকে ইদ্‌রীস নাম দেওয়া হইয়াছে। বস্তুত এই কথাটি সহীহ্ নয় (কাশশাফ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩)। হিব্রু ও সুরয়ানী ভাষায় তাঁহার নাম আখনূখ অর্থাৎ ইদ্‌রীস (درس) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হয় নাই। কেননা অনারব কোন শব্দ অন্য কোন শব্দ হইতে مشتق হওয়া সর্বজনবিদিত নহে। অধিকন্তু ইহাকে مشتق ধরা হইলে তাহা غير منصرف (রূপান্তরবিহীন বিশেষ্য) হইতে পারে না। অথচ এই শব্দটি غير منصرف (রূহুল মাআনী, ষষ্ঠদশ খণ্ড, পৃ. ১০৫)। আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন, درس শব্দটিকে افعيل-এর ওযনে ধরা হইলে ইহাতে এক সবব (سبب) পাওয়া যায়। কিন্তু এক سبب দ্বারা কোন ইসম (اسم) غير منصرف (সীমিত রূপান্তরযোগ্য বিশেষ্য) হইতে পারে না। এহেন অবস্থায়ও শব্দটি غير منصرف হওয়া তাঁহার عجمى (অনারব) হওয়ার দলীল। সম্ভবত আরবী ভাষার কাছাকাছি অন্য কোন ভাষায় শব্দটির অর্থ এই হইতে পারে। কিন্তু বিষয়টি যথাযথ উপলব্ধি না করিয়াই হয়তো বর্ণনাকারী এই কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহা درس ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। কাজেই এই ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ নয় (কাসাসুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯০; আল্-জামি' লিআহকামিল কুরআন, ১১ খ., পৃ., ৭৯; তাফসীরে রূহুল মাআনী, ১৬খ., পৃ. ১০৫)। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগেরও এই বিষয়ে মতপার্থক্য রহিয়াছে। এক দলের মতে তাঁহার নাম ছিল হারমাসুল হারামিসা (هرمس الهرامسة)। তিনি মিসরের 'আনাফ (عنف) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

গ্রীকরা হারামাসকে আরমীস (ارميس) বলে। অপর এক দলের মতে তাঁহার নাম গ্রীক ভাষায় তারমীস (طرميس)। তারমীসকে হিব্রু ভাষায় হানূখ বা খানূখ (خنوخ) ও আরবী ভাষায় আখনূখ (اخنوخ) বলা হয়। আর কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে ইদ্‌রীস বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। তৃতীয় আরেক দলের মতে হযরত ইদ্‌রীস (আ) বাবিল (ব্যবিলন) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই লালিত-পালিত হন (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ., ২৫; কাসাসুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৯৩-৯৪)।

তাঁহার বংশধারা নিম্নরূপ ঃ ইদ্‌রীস ইব্‌ন ইয়ারিদ ইব্‌ন মাহলাঈল ইব্‌ন কায়নান ইব্‌ন আনূশ (মতান্তরে ইয়ানিশ) ইব্‌ন শীছ ইব্‌ন আদম (আ) (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৪; কাসাসুল কুরআন, পৃ. ৯০; আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন, ১৬ খ., পৃ. ৭৯)।

কাহারো মতে হযরত ইদ্‌রীস (আ) হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বেকার নবী নহেন, বরং বনী ইসরাঈল বংশীয় নবীগণের একজন।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তাঁহারা বলেন, ইল্‌য়াস (আ)-এর নামই ইদ্‌রীস (আ)। তাঁহার এইরূপ উক্তির কারণ সেই রিওয়ায়াতটি যাহা ইমাম যুহ্‌রী (র) হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে মি'রাজ প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে উল্লেখ আছে যে, জিব্‌রাঈল (আ) যখন নবী করীম (স)-কে সঙ্গে লইয়া হযরত ইদরীস (আ)-এর পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে নেক নবী এবং নেক ভাই! আপনাকে মারহাবা। তিনি হযরত আদম এবং হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর মত "হে নেক নবী এবং নেক সন্তান! মারহাবা" কথাটি বলিলেন না। ইহাতে বুঝা যায় যে, হযরত ইদ্‌রীস (আ) যদি আখনূখ হইতেন তবে তিনিও তাহাদের ন্যায় "হে নেক সন্তান" বলিতেন।

এই রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করার পর হাফিয ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, এই প্রমাণটি দুর্বল। কেননা এই দীর্ঘ হাদীছটিতে রাবী হয়তো শব্দগুলো সম্পূর্ণরূপে স্মরণ রাখিতে পারেন নাই অথবা (২) হযরত ইদ্‌রীস (আ) হয়তো বিনয়বশত নবী করীম (স)-এর সম্মানার্থে এইভাবে বলিয়াছেন, নিজের পিতৃত্ব সম্পর্কটির কথা এখানে উল্লেখ করেন নাই (আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১খ., পৃ. ১১২-১১৩)।

হযরত আদম ও শীছ (আ)-এর পর হযরত ইদরীস (আ)-ই সর্বপ্রথম নবী। তাঁহার প্রতি আল্লাহ তাআলা ৩০টি সহীফা নাযিল করিয়াছেন। তিনিই সর্বপ্রথম মানব যাহাকে আল্লাহ্ তাআলা মুজিযা হিসাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং অংক শাস্ত্রের জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। হযরত ইদ্‌রীস (আ)-ই সর্বপ্রথম কলমের সাহায্যে লেখা আবিস্কার করেন এবং সর্বপ্রথম কাপড় সেলাই করেন। প্রতিবার সুই চালাইবার সময় তিনি একবার "সুবহানাল্লাহ" বলিতেন। তৎকালে তাঁহার তুলনায় উত্তম আমলকারী আর কেহই ছিল না (মুখতাসার তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৪৫৬) এবং সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করেন। তাঁহার পূর্ববর্তী লোকেরা জীব-জন্তুর চামড়া পরিধান করিত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতিও তিনিই সর্বপ্রথম আবিস্কার করেন এবং অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার তাঁহার আমল

হইতেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র তৈরি করিয়া কাবীল গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন (রূহুল মাআনী, ১৬ খ., পৃ. ১০৫)।

শারীরিক গঠন ঃ হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর শারীরিক গঠন ও আকৃতি কেমন ছিল, এই সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে যে, তিনি গোধূম বর্ণের, মধ্যমাকৃতির, পূর্ণ অবয়ববিশিষ্ট, পাতলা চুলবিশিষ্ট, সুদর্শন এবং ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার চেহারা অত্যন্ত সুন্দর, বাহুদ্বয় মযবুত, কাঁধ খুবই প্রশস্ত এবং শরীরের হাড় শক্ত ছিল। তিনি হালকা- পাতলা গড়নের ছিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় ছিল উজ্জ্বল, কাল। তিনি ছিলেন কথা-বার্তায় ধীরস্থির, নিরবতাপ্রিয় ও চাল-চলনে গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং চলার সময় তিনি দৃষ্টি অবনমিত রাখিতেন। তিনি চিন্তাশীল ও অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী ছিলেন এবং রাগের সময়ে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা বারবার ইশারা করিতেন। তাঁহার আংটির উপর এই বাক্যটি অংকিত ছিল ঃ

الصبر مع الايمان بالله يورث الظفر.

"আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের সহিত ধৈর্য অবলম্বন বিজয়ের পথ সুগম করিয়া দেয়।"

তাঁহার কোমরবন্দের উপর লিখিত ছিল ঃ

الاعيد فى حفظ الفروض والشريعة من تمام الدين وتمام الدين كمال المروة.

"প্রকৃত ঈদ ফরযসমূহ আদায় করার মধ্যে নিহিত, দীনের পূর্ণতা শরীআতের সহিত সংশ্লিষ্ট আর মানবতার পূর্ণতাই দীনের পূর্ণতা।"

তিনি জানাযার নামাযের সময় যে পাগড়ী ব্যবহার করিতেন তাহাতে নিম্নের বাক্যটি লিখিত ছিল ঃ

السعيد من نظر لنفسه وشفاعته عند ربه اعماله الصالحة.

"ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে নিজের নফসের প্রতি দৃষ্টি রাখে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মানুষের জন্য সুপারিশ হইল তাহার নেক আমলসমূহ" (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৭-২৮; কাসাসুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৯৮-৯৯)।

তাওরাতে হযরত ইদ্‌রীস (আ) সম্বন্ধে বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সেখানে শুধু এতটুকু উল্লেখ রহিয়াছে যে, হনোক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে মথূশেলহের জন্ম দিলেন। মথূশেলহের জন্ম দিলে পর হনোক তিন শত বৎসর ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিলেন এবং আরও পুত্র কন্যার জন্ম দিলেন। সর্বশুদ্ধ হনোক তিন শত পঁয়ষট্টি বৎসর রহিলেন। হনোক ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন। পরে তিনি আর রহিলেন না (আদি পুস্তক, পৃ. ৭)।

কুরআন মজীদে হযরত ইদ্‌রীস (আ)

কুরআন মজীদের শুধু দুই জায়গায় হযরত ইদ্‌রীস (আ) সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ . اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا * وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا *

"এবং স্মরণ কর এই কিতাবে ইদ্‌রীসের কথা, সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী এবং আমি তাহাকে উন্নীত

করিয়াছিলাম উচ্চ মর্যাদায়" (১৯ ঃ ৫৬)।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَاالْكِفْلِ ط كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ * وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ *

"এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদ্‌রীস ও যুলকিফ্‌ল-এর কথা; তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল এবং তাহাদিগকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম। তাহারা ছিল সৎকর্ম- পরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত" (২১ ঃ ৮৫-৮৬)।

নবুওয়াত প্রাপ্তি ও দীনের প্রচারে আত্মনিয়োগ

হযরত শীছ (আ)-এর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক ঈমান আনয়ন করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা নিজ গোত্রের অপরাপর মুশরিক ও মূর্তিপূজকদের দেখাদেখি হযরত শীছ (আ)-এর মূর্তি তৈরি করিয়া উহার পূজা করিতে থাকে। এইভাবে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া মুশরিকে পরিণত হইয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের হিদায়াতের জন্য তাহাদের মধ্য হইতে হযরত ইদ্‌রীস (আ)-কে নবুওয়ত দান করেন এবং তাহাদেরকে হিদায়াতের নির্দেশ দান করেন (আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ২১)।

নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দীন, একত্ববাদ এবং আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আহবান জানান। নেক আমলের মাধ্যমে তিনি লোকদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তির জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি তাহাদেরকে বিশেষ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে (আইয়ামে বীদ) সওম পালনের জন্য হুকুম করেন। পার্থিব দৌলতের প্রতি আসক্ত না হওয়া, সর্ব ব্যাপারে আদ্‌ল ও ইনসাফ কায়েম করা এবং আল্লাহ্‌র দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। দুর্বল ও অসহায় লোকদিগকে সাহায্য করার নিমিত্ত যাকাত প্রদানের জন্য নির্দেশ দেন। উপরন্তু তিনি তাহাদিগকে নাপাকী হইতে পবিত্রতা অর্জন করা, কুকুর ও শূকর ভক্ষণ না করা এবং মাদক দ্রব্য গ্রহণ না করার ব্যাপারে কঠোর বিধান প্রদান করেন। এমনিভাবে বিশেষ বিশেষ সময়ে ঈদ তথা আনন্দ উৎসব উদযাপন এবং বিশেষ ধরনের নেক আমল করার জন্য তিনি তাকীদ করিতেন। হযরত ইদ্‌রীস (আ) তিন ধরনের বস্তু আল্লাহ্‌র নামে মানত ও কুরবানী করার জন্য নির্দেশ দিতেন ঃ সুগন্ধি দ্রব্যের ধুয়া, জীব কুরবানী করা এবং মদ।

দার্শনিকদের বিপরীতমুখী বর্ণনায় বিস্মিত হইতে হয়। একদিকে তাহারা হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর শরীআতে মদ হারাম বলিয়া উক্তি করেন এবং অপর দিকে তিনি আল্লাহ্‌র নামে মদ উৎসর্গ করিবার জন্য উপদেশ দিতেন বলিয়াও বর্ণনা করেন। এতদ্ব্যতীত মৌসুমের প্রথম ফল ও ফুল আল্লাহ্‌র নামে উৎসর্গ করাকেও প্রয়োজনীয় মনে করা হইত। ফুলের মধ্যে গোলাপ, শস্য বীজের মধ্যে গম এবং ফলের মধ্যে আঙ্গুরের অগ্রাধিকার ছিল (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৬-২৭; আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ২১; কাসাসুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৭)।

হিজরত

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হযরত ইদ্‌রীস (আ) দীনের প্রচার ও প্রসারের আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যান। কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার কথা বিশ্বাস করে এবং তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তাঁহার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁহার বিরোধিতা শুরু করে। ফলে হযরত ইদ্‌রীস (আ) নিজ এলাকা হইতে হিজরত করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন এবং নিজের অনুগামীদেরকেও হিজরত করিতে বলিলেন। ইদ্‌রীস (আ)-এর অনুসারিগণ যখন এই কথা শুনিলেন তখন তাহারা জন্মভূমি ত্যাগ করা দুঃসাধ্য কাজ মনে করিয়া বলিল, বাবিল শহরের মত অনুরূপ শহর আমরা কোথায় পাইব?

অতঃপর হযরত ইদ্‌রীস (আ) তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আমরা যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হিজরত করি তবে আমাদিগকে সেইখানেও রিযিক দান করা হইবে। অতঃপর তিনি ও তাঁহার অনুসারিগণ মিসরের উদ্দেশে বাবিল শহর ত্যাগ করিলেন। এই ক্ষুদ্র দলটি যখন নীল নদ অববাহিকার সুজলা-সুফলা অঞ্চল দেখিতে পাইল তখন তাহারা আনন্দিত হইল এবং এই উৎকৃষ্ট স্থানটিকে নির্বাচন করিয়া তাহারা নীল নদের পার্শ্বেই বসবাস করিতেন লাগিল। এখানে পৌছিয়া হযরত ইদ্‌রীস (আ) আল্লাহ্‌র পয়গাম তথা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হইলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার যমানায় বাহাত্তরটি ভাষা প্রচলিত ছিল। তিনি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে উপরিউক্ত সব ভাষায়ই অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাহাদের ভাষায় দাওয়াত দিতেন এবং শিক্ষা দান করিতেন (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৫-২৬; কাসাসুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫)।

হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

নবুওয়াতের সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইদ্‌রীস (আ)-কে জাগতিক বহু জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারীও করিয়াছিলেন। হযরত ইদ্‌রীস (আ)-ই সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রবর্তন করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে সৌরজগত এবং নক্ষত্রসমূহের পারস্পরিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের গুরুত্ব ও রহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। তারীখুল হুকামা গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে যে, হযরত নূহ (আ)-এর সময়ের তুফানের পূর্বে জ্ঞানের যত প্রসার ও ব্যাপ্তি ঘটিয়াছিল তাহার প্রধান পুরোধা ছিলেন হযরত ইদ্‌রীস (আ)। একদল জ্ঞানী ব্যক্তি এমনও ধারণা করেন যে, দর্শন শাস্ত্রের পুস্তকসমূহে যে সমস্ত জ্ঞান-গভীর আলোচনা এবং নক্ষত্রসমূহের গতিবিধির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা সর্বপ্রথম হযরত ইদ্‌রীস (আ)-ই বলিয়াছেন। আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য ইবাদতখানা নির্মাণ, চিকিৎসা শাস্ত্রের আবিষ্কার, যমীন ও আসমানের যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে যথোপযোগী কবিতা রচনার মাধ্যমে স্বীয় মতামত প্রকাশও তাঁহারই অমর কার্যাবলীর অন্তর্গত। তিনি সর্বপ্রথম তুফান সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, আমাকে দেখান হইয়াছে একটি "আসমানী মুসীবত", যাহার পানি ও আগুন ভূমণ্ডলকে গ্রাস করিবে। ইহা দেখিয়া তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং শিল্প ও প্রযুক্তির বিলুপ্তি সম্বন্ধে শংকিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর তিনি মিসরে আহ্‌রাম (اهرام) এবং বারাবী (برابی)

অর্থাৎ মজবুত অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া উহাতে সমস্ত শিল্প ও তৎসম্পর্কিত নব আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতিসমূহের নকশা তৈয়ার করিলেন এবং যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী তাহাতে অংকিত করিলেন, যাহাতে এই শিল্প ও বিদ্যা চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া যায়। তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিল্প-প্রযুক্তি রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে হযরত ইদ্‌রীস (আ) সম্বন্ধে যেসব বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন থাকিতে পারে বলিয়া অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৮-২৯; কাসাসুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০-১০১; আনওয়ারে আম্বিয়া; পৃ. ২২; মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ, আম্বিয়া-ই কুরআন, ১খ., পৃ. ৭৮-৮৩)।

মিসরে অবস্থানকালে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ধর্মের প্রতি আহ্বান করা ছাড়াও তিনি দেশ শাসন, শহরের জীবন যাপন পদ্ধতি এবং একত্রে জীবন যাপনের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই শিক্ষা প্রদানের জন্য তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দেশ শাসন ও এতদসম্পর্কিত মূলনীতি শিক্ষা দিতেন। তাহারা এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জনপূর্বক নিজ নিজ সম্প্রদায়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া উক্ত নীতিমালার আলোকে শহর ও গ্রামগুলিকে আবাদ করিলেন। তাহাদের আবাদকৃত শহরের ন্যূনতম সংখ্যা হইল দুই শতের মত। ইহার মধ্যে ক্ষুদ্রতম শহরটির নাম ছিল রাহা (رها), যাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। তিনি তাঁহার শাসিত ভূখণ্ডকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশের জন্য একজন করিয়া শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে তিনি দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র বিধান অনুসরণের হুকুম দিয়াছিলেন। এইসব শাসকদের মধ্যে চারজনের নাম ঃ (১) ঈলাওয়াস (ايلاوس), (২) যূস (زوس), (৩) ইসকিলীবূস (اسقليبوس) ও (৪) যূস আমূন (زوس امون) অথবা ঈলাওয়াস আমূন (ايلاوس امون) অথবা বসীলূখাস (بسيلوخس)।

হযরত ইদরীস (আ) ইলম ও আমলের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র বান্দাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ঃ (১) জ্যোতিষী, (২) রাজা ও (৩) প্রজা। জ্যোতিষীদের মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে ছিল। কেননা তাহাকে আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের ব্যাপারসহ রাজা ও প্রজার ব্যাপারেও জবাবদিহি করিতে হইবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল রাজা। কেননা তাহাকে নিজের এবং রাজত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জবাবদিহি করিতে হইবে। আর তৃতীয় পর্যায়ে ছিল প্রজা। কেননা তাহাকে শুধু নিজের ব্যাপারে জবাবদিহি করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের এই পর্যায়ক্রমিক মর্যাদাভেদ কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল– বংশ ও খান্দানের পার্থক্যের প্রেক্ষিতে নহে (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৬-২৭; কাসাসুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫-৯৮)।

সন্তান-সন্তুতি ও মৃত্যু

তাওরাতে হযরত ইদ্‌রীস (আ) সম্পর্কে উল্লেখ আছে, আর হানুক বা ইদ্‌রীস (আ)- এর পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সে পুত্র মুতাওয়াশ্‌শালাহ জন্মগ্রহণ করেন। মুতাওয়াশ্‌শালাহ-এর জন্মের পর হানুক (ইদ্‌রীস) তিন শত বৎসর আল্লাহ্‌র সহিত ছিলেন। তাঁহার বহু সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল। এই

হিসাবে হানূকের পূর্ণ বয়স হইয়াছিল তিন শত পঁয়ষট্টি বৎসর। তিনি আল্লাহ্‌র সাথেই ছিলেন, পরে অদৃশ্য হইয়া যান অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া যান। আর মুতাওয়াশ্‌শালাহ্‌-এর বয়স যখন ১৮৭ তখন লমক (لمك) জন্মগ্রহণ করেন। লমকের জন্মের পর মুতাওয়াশ্‌শালাহ্‌ ৭৪২ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাহার ঔরসে বহু সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে। ৯৬৯ বৎসর বয়সে মুতাওয়াশশালাহ মারা যান। আর লমক ১৮২ বৎসর বয়সে এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। তিনি তাঁহার নাম রাখেন নূহ (আন্‌ওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ২৩)।

তাওরাতের এই আলোচনার দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত ইদ্‌রীস (আ)-কে জীবিত অবস্থায়ই আসমানে তুলিয়া নেন। কুরআন মজীদেও এ সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا *

"এবং আমি তাহাকে উন্নীত করিয়াছিলাম উচ্চ স্থানে" (১৯ ঃ ৫৬)।

ইব্‌ন জারীর তাবারী (র) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, একদা ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) কা'ব আল-আহবার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত ইদ্‌রীস (আ) সম্বন্ধে কুরআন মজীদে যে উল্লেখ রহিয়াছে, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ইহার অর্থ কি? জবাবে তিনি বলিলেন, একদা আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করিলেন, হে ইদ্‌রীস! সমস্ত দুনিয়াবাসী দৈনিক যেই পরিমাণ নেক আমল করিবে, সেই সমুদয় আমলের সমান আমি তোমাকে প্রত্যেক দিন সওয়াব দান করিব (ইহার দ্বারা তাঁহার যমানার লোকদিগের আমলের কথা বুঝানোই হয়তো আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল)। এই কথা শুনিয়া হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর মনের মধ্যে এই আকাঙক্ষার উদয় হইল যেন প্রত্যেক দিন তাঁহার আমল বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতঃপর তাঁহার এক ফেরেশ্‌তা বন্ধু তাঁহার নিকট আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, আল্লাহ্‌ তাআলা আমার প্রতি এইরূপ ওহী নাযিল করিয়াছেন। সুতরাং আপনি এই মর্মে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তার সহিত আলোচনা করুন, যাহাতে আমি আমার আমল বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাই। অতঃপর চার বন্ধু ফেরেশ্‌তা তাঁহাকে নিজের ডানার উপর বসাইয়া আসমানের দিকে আরোহণ করিলেন। ইহার পর তাহারা যখন চতুর্থ আসমানের উপর দিয়া যাইতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা যমীনের দিকে অবতরণ করিতেছিলেন। সেখানেই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাত হইয়া গেল। বন্ধু ফেরেশ্‌তা মালাকুল মওত ফেরেশ্‌তাকে হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর বাসনার কথা বলিলে তিনি বলিলেন, ইদরীস এখন কোথায়? বন্ধু ফেরেশ্‌তা বলিলেন, এই তো তিনি আমার পিঠের উপর আছেন। তখন মালাকুল মওত ফেরেশ্‌তা বলিলেন, চতুর্থ আসমানে তাঁহার রূহ কবয করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। এই কারণে আমি বিস্ময়ের মধ্যে ছিলাম যে, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে। কেননা তাঁহার তো যমীনে থাকার কথা। আর আমাকে চতুর্থ আসমানে তাঁহার জান কবয করার হুকুম করা হইয়াছে। অতঃপর এই স্থানেই মালাকুল মওত ফেরেশ্‌তা তাঁহার রূহ কবয করিয়া নিলেন। ইহার পর কা'ব আল-আহবার (র) বলিলেন, মহান আল্লাহ্‌র বাণী وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (এবং আমি তাহাকে উন্নীত করিয়াছিলাম উচ্চ স্থানে)-এর অর্থ ইহাই।

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর হাফিয ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, ইহা ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইহার কোন কোন তথ্যে সন্দেহের অবকাশ আছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ম খণ্ড ,পৃ. ১১২)।

এই কারণেই আল্লামা সায়্যিদ মাহমূদ আলুসী (র) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا-এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আমি তাহাকে নবুওয়ত, রিসালাত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছি (রূহুল মাআনী, পৃ. ১০৫)।

হযরত কাতাদা (র) বলেন, হযরত ইদ্‌রীস (আ) সপ্তম আকাশে ফেরেশ্‌তাগণের সহিত একত্রে ইবাদত-বন্দেগী করিতেন এবং জান্নাতের যে কোন স্থানে ইচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারের মতে তাঁহাকে সশরীরে আসমানে উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। মুকাতিল (র)-এর মতে তিনি আসমানে মৃত অবস্থায় আছেন। তবে এই মতটি বিরল। কা'ব আল-আহ্‌বার (র)-এর মতে হযরত ইদরীস (আ)-কে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ একদা হযরত ইদ্‌রীস (আ) নিজ প্রয়োজনে কোথাও যাইতেছিলেন। পথে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ তিনি অনুভব করিলেন এবং আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কেবল একদিন রৌদ্রের মধ্যে হাঁটিয়াছি। ইহাতেই আমার এত কষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলে যে একদিন পাঁচ শত বৎসরের পথ ইহাকে বহন করিয়া চলিবে তাহার কি অবস্থা হইবে! সুতরাং হে আমার রব! আপনি ইহার ওজন ও তাপ উভয়টিই কমাইয়া দিন। সকাল হইলে পর সূর্য বহনকারী ফেরেশ্‌তা উহাকে ওজন ও তাপের দিক হইতে পূর্বের তুলনায় কম পাইলেন। কিন্তু তিনি ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। তাই উক্ত ফেরেশ্‌তা বলিলেন, হে আমার রব! আপনি আমাকে সূর্য বহনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু কিছুই তো বুঝিতে পারিলাম না, সূর্য যে খুবই হালকা হইয়া গিয়াছে। আপনি এই ব্যাপারে কি ফয়সালা করিয়াছেন? আল্লাহ্‌ বলিলেন, আমার বান্দা ইদ্‌রীস আমার নিকট ইহার তাপ ও ওজন কমাইয়া দেওয়ার জন্য দুআ করিয়াছেন। আমি তাঁহার দুআ কবুল করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া সূর্য বহনকারী ফেরেশ্‌তা বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে তাঁহার সহিত একত্র করিয়া দিন এবং আমার ও তাঁহার মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করিয়া দিন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাহাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর নিকট আসিলেন। তৎপর হযরত ইদ্‌রীস (আ) তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন করিলেন এবং আল্লাহ তাআলাও এই বিষয়ে তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। অবশেষে তিনি তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

ইব্‌নুল মুনযির (র) আফরা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম উমার থেকে বর্ণনা করেন। নবী করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ হযরত ইদ্‌রীস (আ) একজন পূণ্যবান-পবিত্রাত্মা নবী ছিলেন। তিনি তাঁহার সময়টাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। সপ্তাহে তিন দিন তিনি লোকদিগকে কল্যাণ তথা ইল্‌ম শিক্ষা দিতেন, চার দিন দেশ-বিদেশে সফর করিতেন এবং অত্যন্ত মুজাহাদার সহিত আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করিতেন। সকল বনী আদমের যেই পরিমাণ আমল আসমানে উত্থিত হইত একাই তাঁহার প্রাত্যহিক আমল সেই পরিমাণ আসমানে সমুত্থিত হইত। মালাকুল মওত তাঁহাকে আল্লাহ্‌র

ওয়াস্তে ভালবাসিতেন। একদা তিনি যখন সফরের উদ্দেশে বাহির হইলেন তখন ঐ ফেরেশ্‌তা তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার সাহচর্যে থাকিতে চাই। হযরত ইদ্‌রীস (আ) তাঁহাকে চিনিতেন না। তাই তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আমার সাহচর্যে থাকিতে সক্ষম হইবেন না। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে শক্তি-সামর্থ দিবেন বলিয়া আমি আশাবাদী। অতঃপর এই দিনই ফেরেশ্‌তা তাঁহার সহিত সফরে বাহির হইলেন। দিনের শেষভাগে তাঁহারা বকরীর এক রাখালের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। এই অবস্থায় মালাকুল মওত বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদের সন্ধ্যা কোথায় হইবে তাহা আমাদের জানা নাই। যদি এই বকরীর পাল হইতে একটি বকরীর বাচ্চা নেই তাহা হইলে ইহার দ্বারা আমরা ইফতার করিতে পারিব। অর্থাৎ আমরা তাহা আহার করিতে পারিব। হযরত ইদ্‌রীস (আ) বলিলেন, এইরূপ কথা আর বলিবেন না। যে খাদ্য আমাদের নয় আপনি কি আমাকে সেইরূপ খাদ্য গ্রহণের জন্য বলিতেছেন? যেখানে আমাদের সন্ধ্যা হইবে সেইখানে আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সন্ধ্যা হওয়ার পর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে জীবিকার ব্যবস্থা হইয়া গেল, যেইভাবে অন্যান্য সময় তিনি হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর জন্য ব্যবস্থা করিতেন। খানা হাযির হওয়ার পর হযরত ইদ্‌রীস (আ) ফেরেশ্‌তা মালাকুল মওতকে বলিলেন, অগ্রসর হউন এবং আহার করুন। ফেরেশ্‌তা বলিলেন, যে আল্লাহ্‌ আপনাকে নবুওয়াতের মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন তাঁহার শপথ! আমার আহার করার ইচ্ছা নাই। আপনি একাই আহার করুন। তারপর তাঁহারা উভয়ে সালাত আদায়ের নিমিত্তে দাঁড়াইলেন। সালাত আদায় করিতে করিতে হযরত ইদ্‌রীস (আ) ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু ফেরেশ্‌তা ক্লান্তও হইলেন না এবং কোনরূপ নিদ্রাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ইহাতে হযরত ইদ্‌রীস (আ) আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং নিজের ইবাদতকে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। অতঃপর ভোরে আবার তাঁহারা উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিলেন। চলিতে চলিতে দিনের শেষে তাঁহারা একটি আঙ্গুরের বাগানের নিকট গেলেন। তখন ফেরেশ্‌তা বিগত দিনের ন্যায় তাঁহাকে পুনরায় সেই কথা বলিলেন। সন্ধ্যা হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তাআলা তাহাদের খাবার পাঠাইয়া দিলেন। হযরত ইদ্‌রীস (আ) সাথী ফেরেশ্‌তাকে আহার করার জন্য ডাকিলেন, কিন্তু তিনি আহার করিলেন না। ইহার পর তাঁহারা সালাত আদায়ের উদ্দেশে দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাদের অবস্থা বিগত রাত্রের অনুরূপই হইল। এই অবস্থা দেখিয়া হযরত ইদরীস (আ) বলিলেন, যে সত্তার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ! আপনি তো আদম বংশজাত কোন মানুষ নহেন। জবাবে ফেরেশ্‌তা বলিলেন, হাঁ, আমি মানব বংশজাত নই, বরং আমি মালাকুল মওত (মৃত্যুদূত)। এই কথা শুনিয়া হযরত ইদ্‌রীস (আ) বলিলেন, আপনি কি আমার কোন বিষয়ে আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছেন। উত্তরে মালাকুল মওত বলিলেন, আমি আপনার কোন ব্যাপারে আদিষ্ট হইয়া আসিলে আপনাকে আমি লক্ষ্য করিতাম না। আমি তো আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনাকে মহব্বত করি এবং এইজন্যই আমি আপনার সাহচর্য অবলম্বন করিয়াছি। ইহার পর হযরত ইদ্‌রীস (আ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যত সময় আপনি আমার সহিত ছিলেন এই সময়ের মধ্যে আপনি

কাহ রো জান কব্য করিয়াছেন কী? জবাবে তিনি বলিলেন, হাঁ, আপনার সাহচর্যে থাকা অবস্থায় মাশরিক হইতে মাগরিব পর্যন্ত যত মানুষের জান কব্য করার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি তাহাদের সকলের প্রাণই আমি এই অবস্থায় সংহার করিয়াছি। বস্তুত গোটা পৃথিবী আমার সামনে মানুষের সম্মুখস্ত দস্তরখানের মত যা থেকে মানুষ ইচ্ছামত খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে। হযরত ইদ্‌রীস (আ) তাঁহাকে বলিলেন, হে মালাকুল মওত্! যেই সত্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আপনি আমাকে মহব্বত করেন তাঁহার উসীলায় আমি আপনার নিকট এমন কিছু যাঞ্চা করিব যাহা অবশ্যই আপনি দিবেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, আপনি যাঞ্চা করুন হে আল্লাহ্‌র নবী! হযরত ইদ্‌রীস (আ) বলিলেন, আমি মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিয়া পুনরায় আমার জান ফিরিয়া পাইতে চাই। জবাবে মালাকুল মওত বলিলেন, অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে আমি এই কাজ করিতে সক্ষম নই। অতঃপর তিনি স্বীয় রবের নিকট এই ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং মহান আল্লাহ তাআলা এই বিষয়ে তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার জান কবয করিলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহার জান পুনরায় তাঁহাকে ফেরত দিলেন। প্রাণ ফিরিয়া পাওয়ার পর মালাকুল মওত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! মৃত্যুর স্বাদ আপনার কেমন অনুভূত হইল? তিনি বলিলেন, আমাকে যেমন বলা হইয়াছে এবং আমি যাহা শুনিয়াছি ইহার চাইতেও কঠিন পাইয়াছি। ইহার পর জাহান্নাম দেখার জন্য তিনি তাঁহার নিকট আবেদন করিলেন। ফেরেশ্‌তা তাঁহাকে জাহান্নামের এক দরজার কাছে লইয়া গেলেন এবং জাহান্নামের একজন প্রহরীকে ডাক দিলেন। জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশ্‌তাগণ মালাকুল মওতের আগমন টের পাইতেই তাহাদের শরীর শিহরিয়া উঠিল এবং তাহারা বলিলেন, আপনি আমাদের ব্যাপারে আদিষ্ট হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন কি? তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের ব্যাপারে আদিষ্ট হইয়া এখানে আসিলে তোমাদের প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করিতাম না। আমার আগমনের কারণ এই যে, আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইদ্‌রীস (আ) জাহান্নামের কিছু নমুনা দেখার জন্য আমার নিকট আবেদন করিয়াছেন। তাই আমি এখানে আসিয়াছি। অতঃপর তাহারা সূঁচের ছিদ্র পরিমাণ জায়গা উম্মুক্ত করিয়া দিলে জাহান্নামের সামান্য পরিমাণ বাতাস তাঁহার গায়ে লাগিতেই তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যান। মালাকুল মওত বলিলেন, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করিয়া দিন। তৎক্ষণাৎ তাহারা জাহান্নামের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। অতঃপর মালাকুল মওত হযরত ইদ্‌রীস (আ)-এর মুখমণ্ডলে হাত বুলাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমার সাহচর্যে থাকা অবস্থায় আপনার গাঁয়ে এতটুকু স্পর্শ লাগুক আমি তাহা চাই নাই। তাঁহার হুঁশ ফিরিয়া আসিলে ফেরেশ্‌তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জাহান্নামকে কেমন দেখিলেন? তিনি বলিলেন, আমাকে যেমন বলা হইয়াছে এবং যেমন আমি শুনিয়াছি তাহার চাইতেও ভয়াবহ এবং কঠিন পাইয়াছি। ইহার পর হযরত ইদ্‌রীস (আ) জান্নাতের সামান্য কিছু দর্শন করার জন্য সাথী ফেরেশ্‌তার নিকট আবেদন করিলেন এবং এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে পূর্ববৎ কথাবার্তা হইল। অবশেষে জান্নাতের দ্বার খুলিয়া দেওয়ার পর জান্নাতের স্নিগ্ধ বাতাস, সুগন্ধি ও ফুলের সৌরভ তাঁহার তনু ও মনকে বিমোহিত ও আমোদিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল ও মন খুশীতে ভরিয়া উঠিল। হযরত

ইদ্‌রীস (আ) সাথী ফেরেশতাকে বলিলেন, হে মালাকুল মওত! আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া জান্নাতের ফলমূল ভক্ষণ করিতে চাই এবং উহার শরাবান তহুরা পান করিতে চাই। তবে হয়ত আমার এই চাওয়া-পাওয়া অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার হইবে বলিয়া আমি মনে করি। অতঃপর তিনি জান্নাতে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে কিছু আহার করিলেন এবং পান করিলেন। তারপর ফেরেশ্‌তা মালাকুল মওত বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনার উদ্দেশ্য তো হাসিল হইয়াছে। এখন আপনি বাহির হইয়া আসুন। আল্লাহ তা'আলা পুনরায় আপনাকে আম্বিয়ায়ে কিরামের সঙ্গে এখানে প্রবেশ করান, ইহাই আমার কামনা। এই কথা শুনিয়া হযরত ইদরীস (আ) জান্নাতের বৃক্ষরাজির মধ্যকার একটি বৃক্ষ জড়াইয়া ধরিলেন এবং বলিলেন, আমি এখান হইতে বাহির হইব না। এই বিষয়ে আপনি যদি আমার সহিত বিতর্ক করিতে চাহেন তবে আমি আপনার সহিত বিতর্ক করিতেও প্রস্তুত আছি। তখন আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মওতের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন, ঝগড়া শেষ করিয়া দাও। এই কথা শুনিয়া তিনি হযরত ইদ্‌রীস (আ)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্‌র নবী! কোন যুক্তির ভিত্তিতে আপনি আমার সঙ্গে এই বিষয়ে বিতর্ক করিতেছেন? জবাবে হযরত ইদ্‌রীস (আ) বলিলেন, কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে)। আর আমি তাহা আস্বাদন করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا (এবং তোমাদের প্রত্যেকেই উহা অতিক্রম করিবে), আমি তাহাও অতিক্রম করিয়াছি। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশকারী লোকদিগের ব্যাপারে বলিয়াছেন, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ (এবং তাহারা সেথা হইতে বহিষ্কৃতও হইবে না)। কাজেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাতে দাখিল করার পর আমি কি এখান হইতে বাহির হইয়া যাইব? তখন আল্লাহ তা'আলা মালাকুল মওতের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলেন, তোমার সহিত যে ব্যক্তি বিতর্ক করিতেছে সে আমার বান্দা ইদ্‌রীস। আমি আমার ইজ্জত ও মহাপরাক্রমের কসম করিয়া বলিতেছি, বিষয়টি অনুরূপ ঘটিবে বলিয়াই আমার জ্ঞানের মধ্যে ছিল। সুতরাং তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দাও। সে তোমার বিপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করিয়াছে।

এই ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লামা আলূসী (র) বলেন, ইহার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত। এই পর্যায়ে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, এখানে وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا-এর অর্থ "আমি তাহাকে উন্নীত করিয়াছি উচ্চ মর্যাদায়" অর্থাৎ رفع معنوى তথা মর্যাদার দিক হইতে উন্নীত করা উদ্দেশ্য। আর رفع حسى তথা জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলিয়া নেওয়ার বিষয়টিকে যদি বিশুদ্ধ বলিয়া মানিয়া নেওয়া হয় তথাপি এই তথ্যটির উপর কুরআনের মর্ম বুঝা নির্ভরশীল নহে। উল্লেখ্য যে, رفعت-এর معنوى হওয়ার বিষয়টি তো বহুল ব্যবহৃত। এমনিভাবে مكان-এর معنوى হওয়ার বিষয়টিও আরবী ভাষায় কম ব্যবহৃত নহে। যেমন নিম্নোক্ত কবিতায় ইহার সমর্থন রহিয়াছে ঃ

ولك فى مكان اذا ما سقطت + تقوم ورجلك فى عافية

(বায়ানুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১)।

আল্লামা মাহমূদ আলূসী (র) উপরিউক্ত রিওয়ায়াতসমূহ উল্লেখ করার পর বলিয়াছেন যে, কাব আল-আহবারের বর্ণনাটিতে সন্দেহ আছে। আল্লাহ তা'আলাই ইহার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত (রূহুল মাআনী, ১৬খ., পৃ. ১০৭)।

ইদরীস (আ)-এর উপদেশাবলী

হযরত ইদ্রীস (আ)-এর বহু উপদেশ, প্রজ্ঞাজনিত উক্তি ও শিষ্টাচারমূলক বক্তব্য সাধারণ্যে প্রবাদের ন্যায় ছড়াইয়া আছে। নিম্নে ইহার কয়েকটি উল্লেখ করা হইল ঃ

(١) لن يستطيع احد ان يشكر الله علىٰ نعمه بمثل الانعام على خلقه.

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টিকে যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করিয়াছেন এইগুলির শোকর আদায় করিতে কেহই সক্ষম নহে।

(٢) من اراد بلوغ العلم وصالح العمل فليترك من يده اداة الجهل وسيئ العمل كما ترك الصانع الذى يعرف الصنائع كلها اذا اراد الخياطة اخذ التها وترك آلة النجارة فحب الدنيا وحب الاخرة لا يجتمعان فى قلب ابداً .

যেই ব্যক্তি জ্ঞানে পূর্ণতা লাভের ও নেক আমলের ইচ্ছা করে সে যেন তাহার হাত হইতে মূর্খতার উপকরণ এবং বদ আমলকে বর্জন করে। যেমন কারিগর যে সকল প্রকার কারিগরীতে দক্ষ, সে যখন সেলাই কাজ করার ইচ্ছা করে তখন সুঁই হাতে নেয় কিন্তু মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি হাত হইতে রাখিয়া দেয়। দুনিয়ার এবং আখিরাতের মহব্বত একই দিলে কখনও একত্র হয় না।

(٣) خير الدنيا حسرة وشرها ندم.

দুনিয়ার ধন-সম্পদের পরিণাম হইল আক্ষেপ এবং মন্দ কাজের পরিণাম হইল অনুতাপ।

(٤) اذا دعوتم الله سبحانه فاخلصوا النية وكذا الصيام والصلوات فافعلوا.

যখন তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ডাকিবে তখন তোমাদের নিয়াতকে একনিষ্ঠ করিয়া নিবে। সাওম ও সালাতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ করিবে।

(٥) لا تحلفوا كاذبين ولا تهجموا على الله سبحانه باليمين ولا تحلفوا الكاذبين فتشاركوهم فى الاثم.

মিথ্যা শপথ করিও না, আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামে শপথের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিও না এবং মিথ্যাবাদী লোকদিগকে শপথ করিবার জন্য উৎসাহিত করিও না। কেননা এইরূপ করিলে তোমরাও তাহাদের পাপের অংশীদার হইয়া যাইবে।

(٦) تجنبوا المكاسب الدنيئة.

নিকৃষ্ট উপার্জন পরিহার কর।

(٧) اطيعوا لملوككم واخضعوا لا كابركم واملاوا افواهكم بحمد الله .

তোমরা তোমাদের শাসকগণের আনুগত্য করিবে, বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সামনে অবনত থাকিবে এবং সর্বদা মুখে আল্লাহ্র প্রশংসা করিবে।

(৮) حياة النفس الحكمة.

জ্ঞান-বিজ্ঞানই আত্মার জীবন।

(৯) لا تحسدوا الناس على مؤاتاة الحظ فان استمتاعهم به قليل.

অপরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন দেখিয়া হিংসা পোষণ করিও না। কেননা তাহাদের এই উপভোগ ক্ষণস্থায়ী।

(১০) من تجاوز الكفاف لم يغنه شئ.

যে ব্যক্তি তাহার চাহিদার চাইতেও বেশী পাইতে চায় সে কখনোও তৃপ্ত হইবে না (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৮; কাসাসুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০০)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুরআন মজীদ, ১৯ ঃ ৫৬; ২১ ঃ ৮৫-৮৬; (২) মাওলানা মুহাম্মাদ হিফযুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ১ম খণ্ড; (৩) মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী, আন্-নুবুওয়াতু ওয়াল আম্বিয়া, পৃ. ২৯৯, দারুল কলম, দামেশ্ক; (৪) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আনসারী আল-কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, ১১খ., পৃ. ৭৯, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (৫) যামাখ্শারী, কাশ্শাফ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩-২৪, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি.; (৬) পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, পৃ. ৭, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা; (৭) আলূসী, রূহুল মাআনী, ১৬ খ., পৃ. ১০৫-১০৭, মুলতান, পাকিস্তান; (৮) 'আবদুল ওয়াহ্হাব আন্-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৪, ২৯, বৈরূত ১৯৮৬ খৃ.; (৯) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, পৃ. ১১১-১১২-১১৩, বৈরূত ১৯৯৩ খৃ.; (১০) জামীল আহমাদ, আম্বিয়া-ই কুরআন, ১খ., পৃ. ৭৮-৮৫; (১১) ইব্ন কাছীর, মুখতাসার তাফসীর, ২খ., পৃ. ৪৫৬, বৈরূত; (১২) এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম অনূদিত, আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ২০-২৩, ইফা প্রকাশিত, ১৯৮৭ খৃ.; (১৩) মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, বায়ানুল কুরআন, ২খ., পৃ. ১১, দিল্লী।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী

৪

হযরত নূহ (আ)

حضرت نوح عليه السلام

হযরত নূহ (আ)

নামকরণ

একজন বিশিষ্ট নবী ও রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে "পরম কৃতজ্ঞ বান্দা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে, اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا "সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা" (১৭ ঃ ৩)। হাদীছে তাঁহাকে প্রথম রাসূল বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে (দ্র. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., ৪৭০; মুসলিম, আস-সাহীহ, ১খ., ১০৮; তিরমিযী, সুনান, ২খ., ৬৬; ইব্ন মাজা, ৩২৯-৩০)।

আল-কুরআনুল করীমে نُوْحٌ -রূপে এবং বাইবেলে Noah -রূপে লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত Noe-রূপেও ইহা লিখিত হইয়া থাকে [দ্র. Encyclopaedia Britannica (Index), vol. vii, 366]। শব্দটি হিব্রু, যাহার অর্থ হইল বিশ্রাম, আরাম। এই নামকরণের কারণ এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, পিতা লেমক (লামিক) তাঁহার নাম রাখেন নোহ। কেননা তিনি (নূহ-এর পিতা লামিক) কহিলেন, সদাপ্রভু কর্তৃক অভিশপ্ত ভূমি হইতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের ক্লেশ হয় তদ্বিষয়ে এ আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে (Genesis, 5 : 29; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৭)।

নূহ নামকরণ সম্পর্কে আল্লামা আলূসী ইকরিমা ও মুকাতিল প্রমুখ মুফাসসিরের কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করেন। তাঁহারা ইহাকে আরবী نِيَاحَة (ক্রন্দন করা) ধাতু হইতে উদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় نوح -এর অর্থ হইল অধিক ক্রন্দনকারী। তাঁহারা নূহ (আ)-এর অধিক ক্রন্দনের কয়েকটি কারণ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ (১) উম্মতের ধ্বংসের জন্য দু'আ করায় পরবর্তী জীবনে তিনি অধিক ক্রন্দন করিতেন; (২) স্বীয় পুত্রের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করার অপরাধ স্মরণ করিয়া (যাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে); (৩) একবার কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত একটি কুকুরের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় কুকুরটিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, إخسا يا قبيح "দূর হ হে কুশ্রী"! ইহাতে আল্লাহ্ তাহাকে বলেন, "তুমি কি আমাকে মন্দ বলিলে, না কুকুরটিকে?" এই অনুশোচনায় তিনি অধিক ক্রন্দন করিতেন; (৪) কওমের কুফরীতে বাড়াবাড়ি করায়। যখনই তিনি তাহাদিগকে দাওয়াত দিতেন আর তাহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিত তখনই তিনি ক্রন্দন করিতেন। এক বর্ণনামতে ইহার পূর্বে তাঁহার নাম ছিল "আস-সাকান", মতান্তরে আবদুল জব্বার। এই সকল রিওয়ায়াত বর্ণনা করার পর আল্লামা আলূসী (র) নিজেই মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই সকল রিওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নহে; বরং নূহ তাঁহার জন্মের সময়কারই নাম। আর ইহা نِيَاحَة ধাতু হইতে উদ্ভূত নহে (রূহুল-মাআলী, ৮খ., ১৪৯)। কারণ শব্দটি আদৌ আরবী নহে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ঐতিহাসিক ও সীরাতবিদগণের মতে তাঁহার বংশ-৫৪লতিকা হইল ঃ নূহ ইব্ন লামিক ইব্ন মাতূশালিহ ইব্ন খানূখ বা আখনূখ (ইদরীস আ) ইব্ন য়ারুদ ইব্ন মাহলাঈল ইব্ন কীনান ইব্ন আনূশ ইব্ন শীছ (আ) ইব্ন আদম (আ) (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৯; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া; আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩০)। তিনি হযরত আদম (আ)-এর দশম পুরুষে স্বীয় পিতা লামিক-এর ১৮২ বৎসর বয়সকালে জন্মগ্রহণ করেন (Bible, Genesis 5 : 29; Encyclopaedia of Religion, Vol. 10, P. 460; Encyclopaedia Americana, Vol. 20, P. 392)। তবে আদম (আ) হইতে ঠিক কত বৎসর পর তাঁহার জন্ম হয় এই ব্যাপারে বহু মতামত পাওয়া যায়। ইব্ন জারীর তাবারীর বর্ণনামতে হযরত আদম (আ)-এর ইনতিকালের ১২৬ বৎসর পর হযরত নূহ (আ) জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের ইতিহাসের বর্ণনামতে ১৪৬ বৎসর (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১০০-১০১; ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৯)। হাফিজ ইব্ন হিব্বান তাঁহার আস-সাহীহ গ্রন্থে আবূ উমামা (রা) হইতে যে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন তদনুযায়ী উভয়ের ব্যবধান হইল দশ শতাব্দী। কারণ তিনি বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আদম কি নবী ছিলেন? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দিলেন, হাঁ। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার মধ্যে এবং নূহ (আ)-এর মধ্যে ব্যবধান কত? দশ শতাব্দী (عشرة قرون) (প্রাগুক্ত)। সাহীহ আল-বুখারীতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আদম ও নূহ (আ)-এর মধ্যে দশ কারন (عشرة قرون) ব্যবধান। ইহার মধ্যবর্তী সকলেই ইসলামের উপর ছিল (প্রাগুক্তঃ আল-বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১০১)। এখন কা'রন শব্দ দ্বারা যদি ১০০ বৎসর বুঝানো হইয়া থাকে, যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান দাঁড়ায় এক হাজার বৎসর; আর উহা দ্বারা যদি জাতি তথা মানব সম্প্রদায় বুঝানো হইয়া থাকে, যেমন কুরআন করীমের বহু স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা [১৭ ঃ ১৭] وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ "নূহের পর আমি কত মানব গোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি" [২৩ ঃ ৩১] ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ "অতঃপর তাহাদের পরে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলাম" (১৯ ঃ ৯৮); وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ "তাহাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে বিনাশ করিয়াছি" (২৫ ঃ ৩৮); وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا "এবং উহাদের অন্তর্বর্তীকালীন বহু সম্প্রদায়কেও"। অনুরূপভাবে হাদীছেও ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .

"সর্বোত্তম জাতি হইল আমার সহিত যাহারা আছে; অতঃপর তাহাদের পরপরই যাহারা আসিবে; অতঃপর তাহাদের পরপরই যাহারা আসিবে"।

তবে উভয়ের মধ্যে কয়েক হাজারের ব্যবধান হইবে। কারণ তখন অর্থ দাঁড়াইবে নূহ (আ)-এর পূর্বে দীর্ঘকাল যাবৎ কয়েক পুরুষ পৃথিবী আবাদ করিয়াছে (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ১খ., ১০১;

ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৯-৬০)। হাফিজ ইব্ন কাছীরের এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটি গ্রহণ না করিয়া قرن শব্দ দ্বারা যদি জাতি তথা পুরুষ বা বংশপরম্পরা বুঝানো হইয়াছে বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে عشرة قرون -এর অর্থ দাঁড়াইবে দশ পুরুষ যাহা ইতিহাস ও কুলজি শাস্ত্রের সহিতও খাপ খায়। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বাইবেলের হিব্রু, সামী ও গ্রীক ভাষার কপিসমূহে বহু মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, যাহার সবই অনুমান নির্ভর বলিয়া মনে হয়। বাইবেলে বর্ণিত নূহ (আ)-এর পূর্বপুরুষদের সময়কালের একটি ছক নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

পুত্র শীছ (আ)-এর জন্মের সময় আদম (আ)-এর বয়স ১৩০ বৎসর

”	আনূশ (আ)	”	”	”	শীছ (আ)	”	”	১০৫	”
”	কীনান (আ)	”	”	”	আনূশ (আ)	”	”	৯০	”
”	মাহলাঈল (আ)	”	”	”	কীনান (আ)	”	”	৭০	”
”	য়ারুদ (আ)	”	”	”	মাহলাঈল (আ)	”	”	৬৫	”
”	আখনূখ (আ)	”	”	”	য়ারুদ (আ)	”	”	১৬২	”
”	মাতুশালিহ (আ)	”	”	”	আখনূখ (আ)	”	”	৬৫	”
”	লামিক (আ)	”	”	”	মাতুশালিহ (আ)	”	”	১৮৭	”
”	নূহ (আ)	”	”	”	লামিক (আ)	”	”	১৮২	”

হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি হইতে নূহ (আ)-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল ১০৫৬ বৎসর, হযরত আদম (আ)-এর ইনতিকালের সময় তাঁহার বয়স ৯৩০ বৎসর। হযরত আদম (আ)-এর ইনতিকাল হইতে নূহ (আ)-এর জন্ম পর্যন্ত সময়কাল ১০২৬ বৎসর (Bible, Genesis, 5 : 1-32; আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজজার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩০; হিফজর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল-কুরআন, ১খ., ৬৪)।

কুরআন করীমে হযরত নূহ (আ)

আল-কুরআনুল করীমের বিরাট একটি অংশ হযরত নূহ (আ)-এর আলোচনায় পূর্ণ। তাঁহার দাওয়াত ও তাবলীগ, কওমের নাফরমানী, নৌযান তৈরী, মহাপ্লাবন, কাফিরদের ধ্বংস এবং নূহ (আ) ও তাঁহার অনুসারীদের রক্ষা পাওয়া প্রভৃতি বিষয়ে বহু স্থানে আলোচনা করা হইয়াছে। একটি পূর্ণ সূরাতেই তাঁহার আলোচনা করা হইয়াছে যাহার নামকরণ করা হইয়াছে নূহ (আ)-এর নামে (দ্র. ২৯ পারা ৭১ নং সূরা)। কুরআন করীমের ৪৩ স্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সূরা আ'রাফ, সূরা হূদ, সূরা আল-মু'মিনূন, সূরা আশ-শু'আরা, সূরা আল-কামার ও সূরা নূহ-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। কুরআন করীমের যেসকল সূরা ও আয়াতে তাঁহার বর্ণনা আসিয়াছে উহার একটি ছক নিম্নরূপ ঃ

সূরা নং	সূরার নাম	আয়াত নং
৩	আল-ইমরান	৩৩-৩৪

৪	আন-নিসা	১৬৩
৬	আল-আন'আম	৮৪
৭	আল-আ'রাফ	৫৯-৬৪, ৬৯
৯	আত-তাওবা	৭০
১০	ইউনুস	৭১
১১	হূদ	২৫-৩৪, ৩৬-৪৮, ৮৯
১৪	ইবরাহীম	৯
১৭	বনী ইসরাঈল	৩, ১৭
১৯	মারয়াম	৫৮
২১	আল-আম্বিয়া	৭৬-৭৭
২২	আল-হাজ্জ	৪২
২৩	আল-মু'মিনূন	২৩-২৪
২৫	আল-ফুরকান	৩৭
২৬	আশ-শু'আরা	১০৫, ১০৬, ১১৬
২৯	আল-'আনকাবূত	১৪-১৫
৩৩	আল-আহযাব	৭
৩৭	আস-সাফ্ফাত	৭৫-৮৩
৩৮	সাদ	১২
৪০	আল-মু'মিন	৫, ৩১
৪২	আশ-শূরা	১৩
৫০	কাফ	১২-১৪
৫১	আয-যারিয়াত	৪৬
৫২	আন-নাজম	৫২
৫৪	আল-কামার	৯-১৬
৫৭	আল-হাদীদ	২৬
৬৬	আত-তাহরীম	১০
৭১	নূহ	১-২৮

(সংশোধনীসহ হিফজুর রহমান সিউহারবী, করাচী, ১৯৬৫, ১খ., ৩১)। তবে সূরা আ'রাফ, হূদ, মু'মিনূন, শু'আরা, কামার ও নূহ এই ৬টি সূরাতে নূহ (আ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সূরার ধারাবাহিকতানুযায়ী তাঁহার আলোচনা নিম্নরূপ ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ . ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ . (٣:٣٣-٣٤)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন। ইহারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ" (৩ ঃ ৩৩-৩৪)।

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ.

"আমি তো তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম" (৪ ঃ ১৬৩)।

وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

"পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আয়্যুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। আর এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি" (৬ ঃ ৮৪)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ . قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِىْ ضَلٰلَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَاَنْصَحُ لَكُمْ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاۤءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوْا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ . فَكَذَّبُوْهُ فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ (٧:٩٥-٦٤)

আমি তো নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশংকা করিতেছি। তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলিয়াছিল, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নাই, বরং আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাইতেছি ও তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিতেছি এবং তোমরা যাহা জান না আমি তাহা আল্লাহ্র নিকট হইতে জানি। তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট উপদেশ আসিয়াছে যাহাতে সে তোমাদিগকে সতর্ক করে? তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে। তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা তরণীতে ছিল আমি তাহাদিগকে উদ্ধার করি এবং যাহারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। তাহারা তো ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়" (৭ ঃ ৫৯-৬৪)।

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً. (٧:٦٩)

"এবং স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদের দৈহিক গঠনে অধিকতর হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করিয়াছেন" (৭ ঃ ৬৯)।

اَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَقَوْمِ اِبْرَاهِيْمَ وَاَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۰ (۹:۷۰)

"উহাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহাদের নিকট আসে নাই? উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূলগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ এমন নহেন যে, তাহাদের উপর জুলুম করেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে" (৯ : ৭০)।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يَا قَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا اِلَىَّ وَلاَ تُنْظِرُوْنِ۰ (۱۰:۷۱)

"উহাদিগকে নূহ-এর বৃত্তান্ত শোনাও। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহ্‌র নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করি। তোমরা যাহাদিগকে শরীক করিয়াছ তৎসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করিয়া লও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্ম নিষ্পন্ন করিয়া ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না"(১০ : ৭১)।

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۰ فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ۰ (۱۰:۷۲-۷۳)

"অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলে লইতে পার, তোমাদের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাহি নাই, আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহ্‌র নিকট। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইতে আদিষ্ট হইয়াছি। আর উহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে; অতঃপর তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করি আর যাহারা আর নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল তাহাদিগকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ, যাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছিল" (১০ : ৭২-৭৩)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ۰ اَنْ لاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۰ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰكَ اِلاَّ بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰكَ اتَّبَعَكَ اِلاَّ الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِيْنَ۰ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ۰ وَيَا قَوْمِ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ۰ وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ۰ وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلاَ اَقُوْلُ

لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ اِنِّيْ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ . قَالُوْا يَا نُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ . قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ . وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ . اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ . وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ . وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ . وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ . فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ . حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلَّا قَلِيْلٌ . وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . وَهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوْحُ ٌۨابْنَهٗ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ . قَالَ سَاٰوِيْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ . وَقِيْلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ . وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ . قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّيْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ . قَالَ رَبِّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ . قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ . (١١:٢٥-٤٨)

"আমি তো নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী, যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত না কর; আমি তো তোমাদের জন্য মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির আশংকা করি। তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা, যাহারা ছিল কাফির, তাহারা বলিল, আমরা তোমাকে তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু দেখিতেছি না; আমরা তো দেখিতেছি তোমার অনুসরণ করিতেছে তাহারাই, যাহারা আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ হইতে দান করিয়া থাকেন, আর ইহা তোমাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছে, আমি কি এই বিষয়ে

তোমাদিগকে বাধ্য করিতে পারি, যখন তোমরা ইহা অপসন্দ কর? হে আমার সম্প্রদায়! ইহার পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ যাচ্ঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহ্‌র নিকট এবং মুমিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নয়। তাহারা নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করিবে। কিন্তু আমি তো দেখিতেছি তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেই, তবে আল্লাহ হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না? আমি তোমাদিগকে বলি না, আমার নিকট আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে আর না অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত এবং আমি ইহাও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। তোমাদের দৃষ্টিতে যাহারা হেয় তাহাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাহাদিগকে কখনই মঙ্গল দান করিবেন না; তাহাদের অন্তরে যাহা আছে তাহা আল্লাহ সম্যক অবগত। তাহা হইলে আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হইব। তাহারা বলিল, হে নূহ! তুমি তো আমাদের সহিত বিতণ্ডা করিয়াছ, তুমি বিতণ্ডা করিয়াছ আমাদের সহিত অতিমাত্রায়; সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর। সে বলিল, ইচ্ছা করিলে আল্লাহই উহা তোমাদের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে চাহিলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসিবে না, যদি আল্লাহ তোমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তাহারা কি বলে যে, সে ইহা রচনা করিয়াছে? বল, আমি যদি ইহা রচনা করিয়া থাকি, তবে আমি আমার অপরাধের জন্য দায়ী হইব। তোমরা যে অপরাধ করিতেছ তাহা হইতে আমি দায়মুক্ত। নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছিল, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনও ঈমান আনিবে না, সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না। তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যাহারা সীমালংঘন করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না; তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে। সে নৌকা নির্মাণ করিতে লাগিল এবং যখনই তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানেরা তাহার নিকট দিয়া যাইত, তাহাকে উপহাস করিত। সে বলিত, তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব। যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ এবং তোমরা অচিরে জানিতে পারিবে, কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কাহার উপর আপতিত হইবে স্থায়ী শাস্তি। অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনান উথলিয়া উঠিল; আমি বলিলাম, ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুইটি, যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে। তাহার সংগে ঈমান আনিয়াছিল অল্প কয়েকজন। সে বলিল, ইহাতে আরোহণ কর, "আল্লাহ্‌র নামে ইহার গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। পর্বত প্রমাণ তরঙ্গের মধ্যে ইহা তাহাদিগকে লইয়া বহিয়া চলিল। নূহ তাহার পুত্রকে, যে পৃথক ছিল, আহবান করিয়া বলিল, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গী হইও না। সে বলিল, আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় লইব যাহা আমাকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবে। সে বলিল, আজ আল্লাহ্‌র হুকুম হইতে রক্ষা করিবার কেহ নাই, তবে যাহাকে

আল্লাহ দয়া করিবেন সে ব্যতীত। ইহার পর তরঙ্গ উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার পর বলা হইল, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া লও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত হইল, নৌকা জূদী পর্বতের উপর স্থির হইল এবং বলা হইল, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হউক। নূহ্ তাহার প্রতিপালককে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য, আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি বলিলেন, হে নূহ! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এইজন্য আমি আপনার শরণ লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব। বলা হইল, হে নূহ! অবতরণ কর আমার পক্ষ হইতে শান্তি ও কল্যাণসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাহাদের প্রতি; অপর সম্প্রদায়সমূহকে আমি জীবন উপভোগ করিতে দিব, পরে আমা হইতে মর্মন্তুদ শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে" (১১ ঃ ২৫-৪৮)।

وَيَاقَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ .

"হে আমার সম্প্রদায়! আমার সহিত বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদিগকে এমন অপরাধ না করায় যাহাতে তোমাদের উপর তাহার অনুরূপ বিপদ আপতিত হইবে, যাহা আপতিত হইয়াছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর" (১১ ঃ ৮৯)।

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لاَ يَعْلَمُهُمْ اِلاَّ اللّٰهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَاِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ. (١٤:٩)

"তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসে নাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, আদের ও ছামূদের এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের? উহাদের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না, উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূল আসিয়াছিল, উহারা উহাদের হাত উহাদের মুখে স্থাপন করিত এবং বলিত, যাহাসহ তোমরা প্রেরিত হইয়াছ তাহা আমরা অবশ্যই অস্বীকার করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছি সে বিষয়ে, যাহার প্রতি তোমরা আমাদিগকে আহবান করিতেছ" (১৪ ঃ ৯)।

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا .

"হে তাহাদের বংশধর! যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত আরোহণ করাইয়াছিলাম; সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা" (১৭ ঃ ৩)।

وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ۔ (١٧:١٧)

"নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করিয়াছি! তোমার প্রতিপালকই তাঁহার বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট" (১৭ ঃ ১৭)।

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْرَائِيْلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّبُكِيًّا ۔ (١٩:٥٨)

"ইহারাই তাহারা, নবীদের মধ্যে যাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন, আদমের বংশ হইতে ও যাহাদিগকে আমি নূহের সহিত নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলাম এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাহাদিগকে আমি পথনির্দেশ করিয়াছিলাম ও মনোনীত করিয়াছিলাম; তাহাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হইলে তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়িত ক্রন্দন করিতে করিতে" (১৯ ঃ ৫৮)।

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۔ وَنَصَرْنٰهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔ (٢١:٧٦-٧٧)

"স্মরণ কর নূহকে; পূর্বে সে যখন আহ্বান করিয়াছিল তখন আমি সাড়া দিয়াছিলাম তাহার আহ্বানে এবং তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে মহাসংকট হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিয়াছিল; নিশ্চয়ই উহারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এইজন্য উহাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম" (২১ ঃ ৭৬-৭৭)।

وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّثَمُوْدُ ۔ (٢٢:٤٢)

"এবং লোকেরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে উহাদের পূর্বে অস্বীকার করিয়াছিল তো নূহ, 'আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়" (২২ ঃ ৪২)!

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۔ فَقَالَ الْمَلَؤُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَاَنْزَلَ مَلٰئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ ۔ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوْا بِهٖ حَتّٰى حِيْنٍ ۔ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ ۔ فَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ۔ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۔

"আমি নূহকে পাঠাইয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের নিকট। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে না? তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিল, এতো তোমাদের মত একজন মানুষই, তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে চাহিতেছে, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে ফেরেশতাই পাঠাইতেন। আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষগণের কালে এইরূপ ঘটিয়াছে, একথা শুনি নাই। এতো এমন লোক যাহাকে উন্মত্ততা পাইয়া বসিয়াছে; সুতরাং তোমরা ইহার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর। নূহ্ বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। অতঃপর আমি তাহার নিকট ওহী পাঠাইলাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিবে ও উনুন উথলিয়া উঠিবে তখন উঠাইয়া লইও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাহাদিগকে ছাড়া যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আর তাহাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলিও না যাহারা জুলুম করিয়াছে। তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে। যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করিবে তখন বলিও, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন জালিম সম্প্রদায় হইতে। আরও বলিও, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যাহা হইবে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী" (২৩ঃ২৩-২৯)।

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً وَّاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۔

"এবং নূহের সম্প্রদায়কেও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিলাম, যখন তাহারা রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিল তখন আমি উহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং উহাদিগকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করিয়া রাখিলাম। জালিমদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি" (২৫ঃ৩৭)।

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِالْمُرْسَلِيْنَ ۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ ۔ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۔ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۔ قَالُوْا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۔ قَالَ وَمَا عِلْمِىْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۔ اِنْ اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۔ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ۔ قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِىْ كَذَّبُوْنِ ۔ فَافْتَحْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔ فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۔ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ۔

"নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করিয়াছিল। যখন উহাদের ভ্রাতা নূহ উহাদিগকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। উহারা বলিল, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করিব অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করিতেছে? নূহ বলিল, উহারা কী করিত তাহা আমার জানা নাই। উহাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝিতে! মুমিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। উহারা বলিল, হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের শামিল হইবে। নূহ বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করিতেছে। সুতরাং তুমি আমার ও উহাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দাও এবং আমাকে ও আমার সহিত যে সব মুমিন আছে, তাহাদিগকে রক্ষা কর। অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গে যাহারা ছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম বোঝাই নৌযানে; তৎপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করিলাম" (২৬ ঃ ১০৫-১২০)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ۔ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔ (٢٩:١٤-١٥)

"আমি নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে উহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর। অতঃপর প্লাবন উহাদিগকে গ্রাস করে, কারণ উহারা ছিল সীমালংঘনকারী। অতঃপর আমি তাহাকে এবং যাহারা নৌযানে আরোহণ করিয়াছিল তাহাদিগকে রক্ষা করিলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য ইহাকে করিলাম একটি নিদর্শন" (২৯ ঃ ১৪-১৫)।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۔

"স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারয়াম-তনয় ঈসার নিকট হইতেও-তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার" (৩৩ ঃ ৭)।

وَلَقَدْ نَادٰنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۔ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۔ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۔ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۔ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۔

"নূহ আমাকে আহ্বান করিয়াছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী। তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহাসংকট হইতে। তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশপরম্পরায়, আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি, সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম। অন্য সকলকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম" (৩৭ ঃ ৭৫-৮২)।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ ۔

"ইহাদের পূর্বেও রাসূলদিগকে অস্বীকার করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়" (৩৮ ঃ ১২)।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ.

"ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাহাদের পরে অন্যান্য দলও অস্বীকার করিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়াছিল এবং উহারা অসার তর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, উহা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য। ফলে আমি উহাদিগকে পাকড়াও করিলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি" (৪০ ঃ ৫)।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا. (٤٢:١٣)

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন নূহকে" (৪২ ঃ ১৩)।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ . وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ.

"উহাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্স ও ছামূদ সম্প্রদায়, আদ, ফিরআওন ও লূত সম্প্রদায় এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা' সম্প্রদায়; উহারা সকলেই রাসূলদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল, ফলে উহাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হইয়াছে" (৫০ ঃ ১২-১৪)।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ.

"আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, উহারা তো ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়" (৫১ ঃ ৪৬)।

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى .

"আর ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও (তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন), উহারা ছিল অতিশয় জালিম ও অবাধ্য" (৫৩ ঃ ৫২)।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ. فَدَعَا رَبَّهٗ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ. تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ. وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ.

"ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও অস্বীকার করিয়াছিল- অস্বীকার করিয়াছিল আমার বান্দাকে আর বলিয়াছিল, এতো এক পাগল। আর তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল। তখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর। ফলে আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে। তখন নূহকে আরোহণ

করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে, যাহা চলিত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; ইহা পুরস্কার তাহার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল। আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী" (৫৪ ঃ ৯-১৬)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ۔

"আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নুবূওয়াত ও কিতাব, কিন্তু উহাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী" (৫৭ ঃ ২৬)।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ۔ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ۔

"আল্লাহ্ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ ও লূত উহাদিগকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সহিত জাহান্নামে প্রবেশ কর" (৬৬ ঃ ১০)।

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ۔ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ۔ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ۔ يَغْفِرْلَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِىْ اِلاَّ فِرَارًا۔ وَاِنِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا۔ ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا۔ يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهَارًا۔ مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا۔ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔ وَاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا۔ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا۔ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا۔ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا۔ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِىْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗ اِلاَّ خَسَارًا۔ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا۔ وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاَ سُوَاعًا وَّلاَ يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا۔ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّلاَ تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ ضَلٰلاً۔ مِّمَّا خَطِيْئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا۔ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا۔ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا۔ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِىَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلاَ تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلاَّ تَبَارًا۔

"আমি নূহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাহাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসিবার পূর্বে। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী, এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাহাকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর; তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হইলে উহা বিলম্বিত হয় না; যদি তোমরা ইহা জানিতে। সে বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু আমার আহ্বান উহাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করিয়াছে। আমি যখনই উহাদিগকে আহ্বান করি যাহাতে তুমি উহাদিগকে ক্ষমা কর, উহারা কানে আঙ্গুলী দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজদিগকে ও জিদ করিতে থাকে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অতঃপর আমি উহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি প্রকাশ্যে। পরে আমি উচ্চস্বরে প্রচার করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি গোপনে। বলিয়াছি, তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন, তিনি তোমাদিগকে সমৃদ্ধ করিবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করিবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করিবেন নদী-নালা। তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছ না! অথচ তিনিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে। তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে আর সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে; তিনি তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে। অতপর উহাতে তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন এবং পরে পুনরুত্থিত করিবেন। আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত, যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে। নূহ বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করিয়াছে এবং অনুসরণ করিয়াছে এমন লোকের যাহার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তাহার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই। আর উহারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, তোমরা কখনও পরিত্যাগ করিও না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নাসরকে। উহারা অনেককে বিভ্রান্ত করিয়াছে। সুতরাং তুমি জালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না। উহাদের অপরাধের জন্য উহাদিগকে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল এবং পরে উহাদিগকে দাখিল করা হইয়াছিল অগ্নিতে, অতঃপর উহারা কাহাকেও আল্লাহ্র মুকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী। নূহ আরও বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। তুমি উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে; আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর" (৭১ ঃ ১-২৮)।

হাদীছে হযরত নূহ (আ)

হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছে খুব বেশি বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাঁহার সম্পর্কে হাদীছে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায় ঃ

عن ابى هريرة (رض) قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم .... يقول ادم إذهبوا الى نوح فيأتون نوحا فيقولون يانوح انت اول الرسل الى اهل الارض وسماك الله عبدا شكورا الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى الى ما بلغنا الا تشفع لنا الى ربك فيقول ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسى نفسى ايتوا النبى (البخارى = الصحيح جلد ١ صفحه ٤٧٠) وفى رواية مسلم ولكن ائتوتوا ابراهيم عليه السلام الذى اتخذه الله خليلا (مسلم : الصحيح ج ا صفحه ١٠٨)

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমরা নবী (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। [তিনি কিয়ামতের দিনের বর্ণনা দেন যে, সেই দিনের ভয়াবহতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকজন আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করিবার জন্য বিভিন্ন নবীর দ্বারস্থ হইবে। এই পর্যায়ে তাহারা আদম (আ)-এর নিকট গিয়া আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করার অনুরোধ করিলে] আদম (আ) বলিবেন তোমরা নূহ (আ)-এর নিকট যাও। তখন তাহারা নূহের নিকট গিয়া বলিবে, 'হে নূহ! বিশ্ববাসীর নিকট আপনি প্রথম রাসূল। আর আল্লাহ আপনার নাম রাখিয়াছেন "কৃতজ্ঞ বান্দা" আপনি দেখিতেছেন না, আমরা কি অবস্থায় নিপতিত! আপনি দেখিতেছেন না আমাদের কি কষ্ট হইতেছে! আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের নিকট সুপারিশ করুন। তিনি বলিলেন, আমার প্রতিপালক আজ এমন ক্রোধান্বিত হইয়াছেন যে, এইরূপ ক্রোধান্বিত তিনি ইতোপূর্বে কোন দিন হন নাই, পরেও কোন দিন হইবেন না। নাফসী! নাফসী! তোমরা আমার বংশধরের কাছে যাও। মুসলিম ও ইব্ন মাজা গ্রন্থে এই স্থলে ইবরাহীম (আ)-এর নাম উল্লেখ রহিয়াছে যে, তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও, আল্লাহ্ যাহাকে খলীল (বন্ধু)-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., ৪৭০; মুসলিম, আস-সাহীহ, ১খ., ১০৮; ইব্ন মাজা, আস-সুনান, পৃ. ৩২৯-৩৩০; তিরমিযী, আল-জামি, ২খ, ৬৬)।

عن ابى سعيد (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيئ نوح وأمته فيقول الله هل بلغت فيقول نعم اى رب فيقول لامته هل بلغكم فيقولون لا ماجاءنا من نبى فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد وامته فتشهد انه قد بلغ وهو قوله وكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا .

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, (কিয়ামতের দিন) নূহ (আ)-ও তাঁহার উম্মত (ময়দানে) আসিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, তুমি কি (হিদায়াতের বাণী ও আমার দীনের দাওয়াত) পৌঁছাইয়াছ? তিনি বলিবেন, হাঁ, হে আমার প্রতিপালক! অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁহার উম্মতকে বলিবেন, সে কি তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছে? তাহারা

বলিবে, না, আমাদের কাছে কোন নবী আসে নাই। তখন তিনি নূহকে বলিবেন, তোমার সাক্ষী কে? তিনি বলিবেন, মুহাম্মাদ (স)-ও তাঁহার উম্মত। তখন আমরা সাক্ষী দিব যে, তিনি (হিদায়াতের বাণী) পৌঁছাইয়াছেন। ইহাই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ "এইভাবে আমি তোমাদিগকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হইবে" (আয়াত দ্র. ২ ঃ ১৪৩; হাদীছ দ্র. আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., ৪৭০)।

قال ابن عمر (رض) قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال انى لانذركموه وما من نبى الا أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ·

ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার লোক সমাবেশে দাঁড়াইলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌র যথাযথ প্রশংসা করিলেন। অতঃপর দাজ্জালের প্রসংগ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে তাহার সম্পর্কে সতর্ক করিব। প্রত্যেক নবীই (তাহার সম্পর্কে) আপন সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছেন। নূহ (আ)-ও তাঁহার সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিলেন" (আল-বুখারী আস-সাহীহ, ১খ., ৪৭০)।

عن عبد الله ابن عمرو قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول صام نوح الدهر الا يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى (ابن ماجه : السنن ١٢٤/١)

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি, নূহ (আ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিবস ব্যতীত সারা বৎসর সাওম পালন করিতেন (ইব্‌ন মাজা, আস-সুনান, ১খ., ১২৪)।

একটি হাদীছে হযরত নূহ (আ)-এর নাম উল্লেখ না থাকিলেও হাদীস বিশারদ ও ভাষ্যকারগণের মতে উক্ত হাদীছে নূহ (আ)-এর কথাই বর্ণনা করা হইয়াছে। হাদীসটি হইল ঃ

قال عبد الله كأنى انظر الى النبى صلى الله عليه وسلم يحكى نبيا من الأنبياء ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون (البخارى : الصحيح ٤٩٥/١)

আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি যেন নবী (স)-কে দেখিতেছি যে, তিনি বর্ণনা করিতেছেন ঃ নবীদিগের মধ্য হইতে একজন নবীকে তাঁহার সম্প্রদায় প্রহারে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে আর তিনি স্বীয় মুখমণ্ডল হইতে রক্ত মুছিয়া বলিতেছিলেন, 'হে আল্লাহ্! আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা কর। কেননা তাহারা অজ্ঞ' (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., ৪৯৫)।

বাইবেলে হযরত নূহ (আ)

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (Old Testament)-এর ৬-১০ অনুচ্ছেদ ব্যাপী হযরত নূহ (আ) সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। সেখানে বেশির ভাগ বর্ণনাই প্লাবন সম্পর্কিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পরবর্তী বংশের তালিকা ও বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। বাইবেলের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

লেমক এক শত বিরাশী বৎসর বয়সে উপনীত হইলে তাহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে যাহার নাম তিনি নোহ [বিশ্রাম] রাখিলেন। কেননা তিনি কহিলেন, সদাপ্রভু কর্তৃক অভিশপ্ত ভূমি হইতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের ক্লেশ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে; নোহের জন্ম দিলে পর লেমক পাঁচ শত পঁচানব্বই বৎসর জীবিত থাকিয়া আরও পুত্র-কন্যার জন্ম দিলেন; সর্বশুদ্ধ লেমকের সাত শত সাতাত্তর বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল। পরে নোহ পাঁচ শত বৎসর বয়সে শেম, হাম ও যেফতের জন্ম দিলেন (Genesis, 5 : 28-32; বাংলা অনুপবিত্র বাইবেলে, আদিপুস্তক, পৃ. ৭)।

নোহ ও জল প্লাবনের বৃত্তান্ত

এইরূপে যখন ভূমণ্ডলে মনুষ্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব; মনুষ্যের সহিত পশু, সরীসৃপ, জীব ও আকাশের পক্ষীদিগকেও উচ্ছিন্ন করিব। কেননা তাহাদের নির্মাণ প্রযুক্ত আমার অনুশোচনা হইতেছে। (কিন্তু) নোহ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইলেন। নোহের বংশ-বৃত্তান্ত এই ঃ নোহ তাৎকালীন লোকদের মধ্যে ধার্মিক ও সিদ্ধলোক ছিলেন, নোহ, শেম, হাম ও যেফৎ নামে তিন পুত্রের জন্ম দেন। তৎকালে পৃথিবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট, পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ ছিল। আর ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ ইহা ভ্রষ্ট হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল। তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমি সকল প্রাণীকে ধ্বংস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি, কেননা তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আর দেখ আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তুমি গোদর কাষ্ঠ দ্বারা এক জাহাজ নির্মাণ করিবে ও তাহার ভিতরে ও বাহিরে ধুনা দিয়া লেপন করিবে। এই প্রকারে তাহা নির্মাণ করিবে। জাহাজ দৈর্ঘ্যে তিন শত হাত, প্রস্থে পাঁচ শত হাত ও উচ্চতায় ত্রিশ হাত হইবে। আর তাহার ছাদের এক হাত নীচে বাতায়ন প্রস্তুত করিয়া রাখিবে ও জাহাজের পার্শ্বে দ্বার রাখিবে; তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা নির্মাণ করিবে। আর দেখ আকাশের নীচে প্রাণবায়ু বিশিষ্ট যত জীব-জন্তু আছে সকলকে বিনষ্ট করণার্থে আমি পৃথিবীর উপরে জল প্লাবন আনিব, পৃথিবীস্থ সকলে প্রাণ ত্যাগ করিবে। কিন্তু তোমার সহিত আমি নিজস্ব নিয়ম স্থির করিব; তুমি আপন পুত্রগণ, স্ত্রী ও পুত্রবধূদিগকে সংগে লইয়া সেই জাহাজে প্রবেশ করিবে। আর বংশবিশিষ্ট সমস্ত জীব-জন্তুর স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া লইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থে নিজের সহিত সেই জাহাজে প্রবেশ করাইবে। সর্ব জাতীয় পক্ষী ও সর্বজাতীয় পশু ও সর্ব জাতীয় ভূচর সরীসৃপ জোড়া জোড়া প্রাণ রক্ষার্থে তোমার নিকটে প্রবেশ করিবে। আর তোমার ও তাহাদের আহারার্থে তুমি সর্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিয়া আপনার নিকটে সঞ্চয় করিবে। তাহাতে নোহ সেইরূপ করিলেন, ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম করিলেন (Genesis 6 : 1-22; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, পৃ. ৭-৮; ঈষৎ পরিবর্তনসহ)।

আর সদাপ্রভু নোহকে কহিলেন, তুমি সপরিবারে জাহাজে প্রবেশ কর, কেননা এই কালের লোকদের মধ্যে আমার সাক্ষাতে তোমাকেই ধার্মিক দেখিয়াছি। তুমি শুচি পশুর স্ত্রী-পুরুষ লইয়া

প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া এবং অশুচি পশুর স্ত্রী-পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির এক এক জোড়া এবং আকাশের পক্ষীদিগেরও স্ত্রী-পুরুষ লইয়া প্রত্যেক জাতির সাত সাত জোড়া সমস্ত ভূমণ্ডলে তাহাদের বংশ রক্ষার্থে নিজের সঙ্গে রাখ। কেননা সাত দিনের পর আমি পৃথিবীতে চল্লিশ দিবা-রাত্র বৃষ্টি বর্ষাইয়া আমার সৃষ্টি যাবতীয় প্রাণীকে ভূমণ্ডল হইতে উচ্ছিন্ন করিব। তখন নোহ সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারেই সকল কর্ম করিলেন। নোহের ছয় শত বৎসর বয়সে পৃথিবীতে জল প্লাবন হইল, জল প্লাবন হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নোহ ও তাহার পুত্রগণ এবং তাহার স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ জাহাজে প্রবেশ করিলেন। নোহের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে শুচি অশুচি পশুর এবং পক্ষীর ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবের স্ত্রী-পুরুষ জোড়া জোড়া জাহাজে নোহের নিকট প্রবেশ করিল। পরে সেই সাত দিন গত হইলে পৃথিবীতে জল প্লাবন হইল। নোহের বয়সের ছয় শত বৎসরের দ্বিতীয় মাসের সপ্তদশ দিনে মহা জলধির সমস্ত স্রোতধারা উথলিয়া উঠিল এবং আকাশের বাতায়ন সকল মুক্ত; তাহাতে পৃথিবীতে চল্লিশ দিবারাত্র মহাবৃষ্টি হইল। সেই দিন নোহ এবং শেম, হাম ও যেফৎ নামে নোহের পুত্রগণ এবং তাহাদের সহিত নোহের স্ত্রী ও তিন পুত্রবধূ জাহাজে প্রবেশ করিলেন। আর তাহাদের সহিত সর্ব জাতীয় বন্য পশু, সর্ব জাতীয় গ্রাম্য পশু, সর্ব জাতীয় ভূচর সরীসৃপ জীব ও সর্ব জাতীয় পক্ষী, সর্ব জাতীয় খেচর, প্রাণবায়ুবিশিষ্ট সর্ব প্রকার জীব-জন্তু জোড়া জোড়া জাহাজে নোহের নিকট প্রবেশ করিল। ফলত তাহার প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রাণীর স্ত্রী-পুরুষ প্রবেশ করিল। পরে সদাপ্রভু তাহার পশ্চাৎদ্বার বন্ধ করিলেন। আর চল্লিশ দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে জল প্লাবন হইল, তাহাতে পানি বৃদ্ধি পাইয়া জাহাজ ভাসাইলে তাহা মৃত্তিকা ছাড়িয়া উঠিল। পরে পানি প্রবল হইয়া পৃথিবীতে অতিশয় বৃদ্ধি পাইল এবং জাহাজ পানির উপর ভাসিতে থাকিল। আর পৃথিবীতে পানি অত্যন্ত প্রবল হইল, আকাশ মণ্ডলের অধঃস্থিত সকল মহাপর্বত নিমগ্ন হইল। তাহার উপরে পনের হাত পানি উঠিয়া প্রবল হইল, পর্বত সকল নিমগ্ন হইল। তাহাতে ভূচর যাবতীয় প্রাণী-পক্ষী, গ্রাম্য ও বন্য পশু, ভূচর সরীসৃপ সকল এবং মনুষ্য সকল মরিল। এইরূপে ভূমণ্ডল নিবাসী সমস্ত প্রাণী-মনুষ্য, পশু সরীসৃপ জীব ও আকাশীয় পক্ষী সকল উচ্ছিন্ন হইল, কেবল নোহ ও তাহার সঙ্গী জাহাজস্থ প্রাণীরা বাঁচিলেন। আর পানি পৃথিবীর উপরে এক শত পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত প্রবল থাকিল (Genesis, 7 : 1-24; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক পৃ. ৯)।

আর ঈশ্বর নোহকে ও জাহাজে স্থিত তাহার সঙ্গী পশ্বাদি যাবতীয় প্রাণীকে স্মরণ করিলেন, ঈশ্বর পৃথিবীতে বায়ু বহাইলেন, তাহাতে পানি থামিল। আর জলধির স্রোতধারা ও আকাশের বাতায়ন সকল বন্ধ এবং আকাশের মহাবৃষ্টি নিবৃত্ত হইল। আর পানি ক্রমশ ভূমির উপর হইতে সরিয়া গিয়া এক শত পঞ্চাশ দিনের শেষে হ্রাস পাইল। তাহাতে সপ্তম মাসে, সপ্তদশ দিনে অরারর্যের পর্বতের উপরে জাহাজ লাগিয়া রহিল। পরে দশম মাস পর্যন্ত পানি ক্রমশ সরিয়া হ্রাস পাইল। ঐ দশম মাসের প্রথম দিনে পর্বতগুলোর শৃঙ্গ দেখা গেল।

আর চল্লিশ দিন গত হইলে নোহ আপনার নির্মিত জাহাজের বাতায়ন খুলিয়া একটি দাঁড় কাক ছাড়িয়া দিলেন; তাহাতে সে উড়িয়া ভূমির উপরস্থ পানি শুষ্ক না হওয়া পর্যন্ত ইতস্তত গতায়াত

করিল। আর ভূমির উপরে পানি হ্রাস পাইয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য তিনি নিজের নিকট হইতে এক কপোত ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে সমস্ত পৃথিবী পানিতে আচ্ছাদিত থাকায় কপোত পদার্পণের স্থান পাইল না, তাই জাহাজে তাহার নিকটে ফিরিয়া আসিল। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া উহাকে ধরিলেন এবং জাহাজের ভিতরে আপনার নিকট রাখিলেন। পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব করিয়া জাহাজ হইতে সেই কপোত পুনর্বার ছাড়িয়া দিলেন এবং কপোতটি সন্ধ্যাকালে তাহার নিকট ফিরিয়া আসিল; তাহার চঞ্চুতে জিত বৃক্ষের একটি নবীন পত্র ছিল; উহাতে নোহ বুঝিলেন, ভূমির উপরে পানি হ্রাস পাইয়াছে। পরে তিনি আর সাত দিন বিলম্ব করিয়া সেই কপোত ছাড়িয়া দিলেন। তখন সে তাঁহার নিকটে আর ফিরিয়া আসিল না। [নোহের বয়সের] ছয় শত এক বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিনে পৃথিবীর উপরে পানি শুষ্ক হইল; তাহাতে জাহাজের ছাদ খুলিয়া দৃষ্টিপাত করিলেন, ভূতল নির্জল। পরে দ্বিতীয় মাসের সাতাইশতম দিনে ভূমি শুষ্ক হইল (প্রাগুক্ত, ৪ ঃ ১-১৪, বাংলা আদিপুস্তক, পৃ. ৯-১০)।

নোহের সহিত কৃত ঈশ্বরের নিয়ম

পরে ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি নিজ স্ত্রী, পুত্রগণ ও পুত্র-বধূগণকে সঙ্গে লইয়া জাহাজ হইতে বাহিরে যাও। আর তোমার সঙ্গী পশু, পক্ষী ও ভূচর সরীসৃপ প্রভৃতি মাংসময় যত জীব-জন্তু আছে, সেই সকলকে তোমার সঙ্গে বাহিরে আন, তাহারা পৃথিবীকে প্রাণীময় করুক এবং পৃথিবী প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হউক। তখন নোহ নিজ পুত্রগণ এবং নিজ স্ত্রী ও পুত্র বধূগণকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। আর স্ব-স্ব জাতি অনুসারে প্রত্যেক পশু, সরীসৃপ জীব ও পক্ষী, সমস্ত ভূচর প্রাণী জাহাজ হইতে বাহির হইল। পরে নোহ সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিলেন এবং সর্ব প্রকার শুচি পশুর ও সর্বপ্রকার শুচি পক্ষীর মধ্যে কতকগুলো লইয়া বেদির উপরে হোম করিলেন (Genesis, 8 : 15-22; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, পৃ. ১০-১১)।

পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার পুত্রগণকে এই আশীর্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও, পৃথিবী পরিপূর্ণ কর। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী তোমাদের হইতে ভীত ও ত্রাসযুক্ত হইবে; সমস্ত ভূচর জীব ও সমুদ্রের সমস্ত মৎস্য শুদ্ধ, সে সকল তোমাদেরই হস্তে সমর্পিত। প্রত্যেক গমনশীল প্রাণী তোমাদের খাদ্য হইবে; আমি হরিৎ, ঔষধির ন্যায় সে সকল তোমাদিগকে দিলাম কিন্তু স্বপ্রাণ অর্থাৎ সরক্তমাংস ভোজন করিও না। আর তোমাদের রক্তপাত হইলে আমি তোমাদের প্রাণের পক্ষে তাহার পরিশোধ অবশ্যই লইব; সকল পশুর নিকটে তাহার পরিশোধ লইব এবং মনুষ্যের ভ্রাতা মনুষ্যের নিকটে আমি মনুষ্যের প্রাণের পরিশোধ লইব; যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্য কর্তৃক তাহার রক্তপাত করা যাইবে; কেননা ঈশ্বর নিজ প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে নির্মাণ করিয়াছেন। তোমরা প্রজাবন্ত হও ও বহু বংশ হও, পৃথিবীকে প্রাণীময় কর ও তন্মধ্যে বর্ধিষ্ণু হও।

পরে ঈশ্বর নোহকে ও তাহার সঙ্গী পুত্রগণকে কহিলেন, দেখ তোমাদের সহিত তোমাদের ভাবী বংশের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত, পক্ষী এবং গ্রাম্য ও বন্য পশু, পৃথিবীস্থ যত প্রাণী জাহাজ হইতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের সহিত আমি আমার নিয়ম স্থির করি। আমি তোমাদের সহিত আমার নিয়ম স্থির করি; জল প্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণী আর উচ্ছিন্ন হইবে না এবং পৃথিবীর বিনাশার্থে জল প্লাবন আর হইবে না। ঈশ্বর আরও কহিলেন, আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত চিরস্থায়ী পুরুষ-পরম্পরার জন্য যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহার চিহ্ন এই। আমি মেঘে আপন ধনু স্থাপন করি তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। যখন আমি পৃথিবীর উর্দ্ধে মেঘের সঞ্চার করিব, তখন সেই ধনু মেঘে দৃষ্ট হইবে। তাহাতে তোমাদের সহিত ও মাংসময় সমস্ত প্রাণীর সহিত আমার যে নিয়ম আছে তাহারা আমার স্মরণ হইবে এবং সকল প্রাণীর বিনাশার্থ জল প্লাবন আর হইবে না। আর মেঘ ধনুক হইলে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব; তাহাতে মাংসময় যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সহিত ঈশ্বরের যে চিরস্থায়ী নিয়ম তাহা আমি স্মরণ করিব। ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণীর সহিত আমার স্থাপিত নিয়মের এই চিহ্ন হইবে।

নোহের তিন পুত্রের বিবরণ

নোহের যে পুত্রেরা জাহাজ হইতে বাহির হইলেন, তাহাদের নাম শেম, হাম ও যেফৎ; সেই হাম কনানের পিতা। এই তিনজন নোহের পুত্র; ইহাদেরই বংশ সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইল।

জল প্লাবনের পরে নোহ তিন শত পঞ্চাশ বৎসর জীবিত থাকিলেন। সবশুদ্ধ নোহের নয় শত পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইলে তাহার মৃত্যু হইল (Genesis, 9 : 1-29; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, পৃ. ১১-১২)।

হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়

ইব্‌ন জুবায়র (মৃ. ১২১৭ খৃ.) প্রমুখের বর্ণনামতে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কে বানূ রাসিব বলা হইত (ইব্‌ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১০১)। প্রবীণ ঐতিহাসিক ইমাম আছ-ছা'আলাবী (মৃ. ৪২৭/১০৩৫ সন) তাঁহার আরাইসুল-মাজালিস গ্রন্থে ইহাদের পূর্বপুরুষের বিস্তারিত পরিচয় তুলিয়া ধরিয়াছেন। তবে উহা গারীব (বিরল বর্ণনা)-এর পর্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহে উক্ত বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় ছিল কাবীল-এর বংশধর এবং শীছ (আ)-এর বংশধরের মধ্যে যাহারা উহাদের আনুগত্য করিয়াছিল তাহারা। প্রকৃতপক্ষে শীছ (আ)-এর বংশের লোকের সহিত কাবীলের বংশের রক্ত মিলিত হইয়া যে সম্প্রদায়ের জন্ম হয় তাহারাই ছিল নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এই ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, হযরত আদম (আ)-এর বংশের দুইটি ধারা ছিল, যাহার একটি সমতল ভূমিতে বসবাস করিত এবং অপরটি পর্বতে। পর্বতের পুরুষগণ ছিল সুশ্রী ও সুদর্শন আর মহিলাগণ কুৎসিত। অপরপক্ষে সমতল ভূমির মহিলাগণ ছিল সুন্দরী ও রূপসী আর পুরুষগণ কুশ্রী। ইবলীস একদিন এক গোলামের আকৃতি ধারণ করিয়া সমতল ভূমির

এক ব্যক্তির নিকট আসিল, অতঃপর তাহার নিকট মজুরী খাটিবার বন্দোবস্ত করিল। সে তাহার সেবা করিত। ইবলীস একদিন রাখালদের বাঁশির ন্যায় একটি বাঁশি বানাইল। উহা হইতে এমন এক আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল যাহা লোকে ইতোপূর্বে আর কখনও শোনে নাই। উক্ত আওয়াজ পার্শ্ববর্তী লোকজনের কানে পৌঁছিলে তাহারা উহা শুনিবার জন্য তাহার নিকট আসিল, অতঃপর তাহারা উহাকে উৎসবরূপে গ্রহণ করিল। সেখানে বৎসরে একবার তাহারা জড়ো হইত এবং নারী-পুরুষ খোলামেলাভাবে মিলিত হইত। পর্বতে বসবাসকারী এক ব্যক্তি অকস্মাৎ তাহাদের উৎসবের দিনে তাহাদের নিকট আসিয়া পড়িল এবং মহিলা ও তাহাদের সৌন্দর্য দর্শন করিল, অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া সাথি-সঙ্গীদিগকে অবহিত করিল। অতঃপর তাহারা ইহাদের নিকট চলিয়া আসিল এবং ইহাদের সহিত একত্রে অবস্থান করিতে লাগিল। এইভাবে তাহাদের মধ্যে অশ্লীলতা ও অপকর্ম ছড়াইয়া পড়িল। ইহাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى (৩৩ ঃ ৩৩) "এবং প্রাচীন যুগের মত নিজদিগকে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইবে না।"

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আদম (আ) ওসীয়ত করিয়াছিলেন যে, শীছ-এর বংশধর কাবীল-এর বংশধরকে যেন বিবাহ না করে। শীছ (আ)-এর বংশধর ইহা খুবই গুরুত্বের সহিত পালন করিত, এমনকি তাহারা নিজদের বাসস্থানে পাহারাদার নিযুক্ত করিয়াছিল যাহাতে কাবীলের বংশধরদের কেহ তাহাদের নিকটেও না আসিতে পারে। একদা শীছ (আ)-এর বংশধরের এক শত লোক বলিল, দেখি না আমাদের চাচার বংশধরেরা কি করিতেছে। এই বলিয়া সেই এক শত পুরুষ সমতল ভূমির সুন্দরী মহিলাদের নিকট নামিয়া আসিল। অতঃপর সেখানকার মহিলারা তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইল। বেশ কিছু দিন এইভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল। অতঃপর আর এক শতজন বলিল, দেখি না আমাদের ভ্রাতাগণ সেখানে কী করিতেছে। এই বলিয়া তাহারা পর্বত হইতে তাহাদের নিকট নামিয়া আসিল। তাহাদিগকেও মহিলারা বরণ করিয়া লইল। অতঃপর শীছ-এর বংশধর সকলেই নামিয়া আসিল। এইভাবে তাহারা পাপাচারে লিপ্ত হইল এবং পরস্পরে বিবাহ-শাদী করিল। পরস্পরে মিলিয়া-মিশিয়া তাহারা একাকার হইয়া গেল। এইরূপে কাবীলের বংশধর বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবী ভরিয়া তুলিল এবং তাহারা নানারূপ পাপাচার শুরু করিয়া পৃথিবী ভরিয়া দিল (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৫৬)। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের বর্ণনামতে কাবীলের বংশধর এতদূর পাপাচারী হইয়াছিল যে, তাহারা অগ্নিপূজা করিত। কিন্তু ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত বুখারীর হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আদম (আ) হইতে নূহ (আ) পর্যন্ত সময়কালের সকলেই ইসলাম ও হক-এর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই কাবীলের বংশধর মুশরিক হওয়ার বর্ণনা সঠিক বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১০১)। হইতে পারে তাহারা শিরক ব্যতীত অন্যান্য পাপাচার করিত এবং নূহ (আ)-এর সময়ে আসিয়া তাহারা ওয়াদ্দ, সুওয়া, য়াগুছ, য়াউক ও নাসর নামীয় মূর্তিসমূহের পূজা করিত। তাহার সম্প্রদায় শিরক তথা মূর্তিপূজা শুরু করিয়া দেয়। পৃথিবীর বুকে ইহাই ছিল সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা। ইহার সূচনা

সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন যে, ওয়াদ্‌দ, সুওয়া, য়াগুছ, য়াউক ও নাসর ছিল নূহ সম্প্রদায়ের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিবর্গের নাম। তাহারা ইনতিকাল করিলে শয়তান তাহাদের পরামর্শ দিল যে, তাহারা যে সকল স্থানে উপবেশন করিত সেখানে তাহাদের প্রতিকৃতি স্থাপন কর এবং সেগুলোকে উহাদের নামেই নামকরণ কর। তাহারা এইরূপ করিল। কিন্তু তখন উহাদের উপাসনা করা হইত না। অতঃপর এই সকল লোক যখন ইনতিকাল করিল এবং এই প্রতিকৃতি স্থাপনের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত লোক পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া গেল তখন তাহাদের উপাসনা করা শুরু হইয়া গেল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নূহ সম্প্রদায়ের এই মূর্তিপূজা পরবর্তীতে সমগ্র আরব জাহানে বিস্তার লাভ করে (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ২৩ খ., ৭৩২)। ইকরিমা, দাহহাক, কাতাদা, ইব্ন ইসহাক প্রমুখও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ., ১০৫)। এই বিষয়টিই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ আরও বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে ওয়াদ্‌দ ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং বেশি নেককার ও জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন বাবিল নিবাসী। তাহার ইনতিকালে লোকজন খুবই মর্মাহত ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িল। তাহারা তাহার কবরের পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিল। ইবলীস তাহাদের এই মাতম ও হা-হুতাশ দেখিয়া একজন মানুষের আকৃতিতে আসিয়া বলিল, এই ব্যক্তির প্রতি আমি তোমাদের আক্ষেপ ও হা-হুতাশ দেখিতেছি। আমি কি তোমাদিগকে এই ব্যক্তির একটি প্রতিকৃতি বানাইয়া দিব, যাহা তোমরা তোমাদের মজলিসে রাখিয়া উহার মাধ্যমে তাহাকে স্মরণ করিবে? তাহারা বলিল, হাঁ। অতঃপর ইবলীস তাহাদের জন্য তাহার অনুরূপ একটি প্রতিকৃতি বানাইয়া দিল। তাহারা উহা তাহাদের মজলিসে রাখিয়া দিল এবং উহার মাধ্যমে তাহাকে স্মরণ করিতে লাগিল। উহার প্রতি তাহাদের স্মরণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইবলীস বলিল, আরও ভালমত স্মরণ করিবার সুবিধার্থে তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে রাখিবার জন্য আমি কি ইহার অনুরূপ একটি করিয়া মূর্তি তৈয়ার করিয়া দিব? তাহারা বলিল, হাঁ। অতঃপর সে প্রত্যেকের ঘরে অনুরূপ একটি করিয়া মূর্তি বানাইয়া দিল এবং তাহারাও যথারীতি উহার মাধ্যমে তাহাকে স্মরণ করিতে লাগিল। তাহাদের সন্তানগণ তাহাদের এইরূপ কর্ম দেখিতে লাগিল। এমনিভাবে তাহাদের নূতন নূতন বংশধর আসিতে লাগিল এবং উহাকে স্মরণের উক্ত পদ্ধতিও পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এক সময় ইবলীস তাহাদিগকে বুঝাইল যে, পূর্ববর্তিগণ তো ইহারই উপাসনা করিত এবং ইহারই নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিত। ইহা শুনিয়া তাহারা ইহাকেই উপাস্য বানাইয়া ফেলিল এবং আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া ইহারই ইবাদত করিতে লাগিল। তাই আল্লাহ্ ব্যতীত সর্বপ্রথম যাহার ইবাদত করা হয় তাহা হইল এই ওয়াদ্‌দ-এর মূর্তি, যাহাকে তাহারা ওয়াদ্‌দ নামেই আখ্যায়িত করিয়াছিল (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১০৫-১০৬; আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, ২৯ খ., ৭৭)। উল্লিখিত অন্যান্য মূর্তিগুলোরও তাহারা একই পন্থায় ইবাদত করিতে শুরু করে। এই কথাই একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রা) যখন তাঁহাদের হাবশায় দেখা মারিয়া নামক গির্জার সৌন্দর্য ও উহার অভ্যন্তরে রক্ষিত মূর্তিসমূহের কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উল্লেখ করিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ঐ

সকল জাতির মধ্যকার কোনও নেককার লোক ইনতিকাল করিলে তাহারা তাহার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করিত, অতঃপর উহাতে এই সকল মূর্তি স্থাপন করিত। আল্লাহ্র নিকট উহারাই হইল সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টি (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১০৬; আল-বুখারী, ১খ., ১৭৯; মুসলিম, আস-সাহীহ, ১খ., ২০১)।

মোটকথা, নূহ (আ)-এর সময়ে আসিয়া তাঁহার সম্প্রদায় সর্বপ্রকারের পাপাচার শুরু করিয়া দেয়। তাই কেহ কেহ বলিয়াছেন, নূহ সম্প্রদায় আল্লাহ্র অপছন্দনীয় ও অসন্তুষ্টিমূলক কাজ, যথা অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া, মদ্য পান করা, আল্লাহ্র ইবাদত পরিত্যাগ করিয়া খেল-তামাশায় মত্ত হওয়া প্রভৃতিতে সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল (ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ., ৫৪)।

নবুওয়াত প্রাপ্তি

উক্ত সম্প্রদায় যখন এইরূপে বিভিন্ন ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হইল, বিভিন্ন মূর্তির পূজা করিতে শুরু করিল এবং তাহাদের মধ্যে গোমরাহী ও কুফরী ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের হিদায়াতের জন্য হযরত নূহ (আ)-কে নবী ও রাসূলরূপে প্রেরণ করেন। তিনি হযরত ইদরীস (আ)-এর পরবর্তী নবী এবং পৃথিবীর প্রথম রাসূল। যেমন বুখারী ও মুসলিম-এর হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত শাফায়াতের হাদীছে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. মুসলিম, আস-সাহীহ, ১খ., ১০৮; আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ১খ., ৪৭০)।

নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় নূহ (আ)-এর বয়স কত ছিল এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। আল্লামা আলূসী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থ রূহুল মা'আনীতে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর একটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তখন নূহ (আ)-এর বয়স ছিল ৪০ বৎসর (দ্র. রূহুল মা'আনী, ১২খ., ৩৫)। ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে ৪৮০ বৎসর বয়সে নূহ (আ) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯০)। মুকাতিল-এর বর্ণনামতে ১০০ বৎসর, এতদ্ব্যতীত ৫০, ২৫০, ৩৫০ বৎসর বলিয়াও মতামত পাওয়া যায় (দ্র. আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৫৬; ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১০১; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., ৪০; আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৮খ., ১৪৯, ১২খ., ৩৫-৩৬)।

দাওয়াত ও তাবলীগ

নবূওয়াত প্রাপ্ত হইয়া হযরত নূহ (আ) তাঁহার কওমকে জানাইলেন যে, তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী (৭১ ঃ ২), তাহাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল (৬ ঃ ১০৭)। বিভিন্নভাবে তিনি তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাহাদিগকে অন্য সব উপাস্য পরিত্যাগ করিয়া এক আল্লাহ্র ইবাদত করিতে বলিলেন। ইহা অমান্য করিলে তাহাদের উপর আযাব অবতীর্ণ হইবে, সেই ব্যাপারে সতর্কও করিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনও ইলাহ নাই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিনের শাস্তির আশঙ্কা করিতেছি" (৭ ঃ ৫৯)। তিনি শুধু তাহাদিগকে শাস্তির ভয়ই দেখাইলেন না, বরং আল্লাহ্র ইবাদত করিলে এবং তাঁহার (নূহ-এর) আনুগত্য করিলে তাহাদের কৃত অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দেওয়ার এবং নির্দিষ্ট

সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়ার ঘোষণাও দিলেন (৭১ ঃ ৩-৪)। তিনি তাহাদিগকে পার্থিব পুরস্কার ও সুখ-শান্তি প্রাপ্তির আশ্বাস দিলেন এবং তাহাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন। তিনি বলিলেন, "তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করিবেন, তোমাদিগকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতিতে সমৃদ্ধ করিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করিবেন এবং নদী-নালা প্রবাহিত করিবেন" (৭১ ঃ ১০-১২)। অতঃপর তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ দান ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলেন, "তো তোমাদের কি হইয়াছে যে, তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে চাহিতেছ না। অথচ তিনিই তো তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন পর্যায়ক্রমে। তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন সপ্ত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করিয়াছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করিয়াছেন প্রদীপরূপে? তিনি তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে, অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করিবেন ও পরে পুনরুত্থিত করিবেন এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করিয়াছেন বিস্তৃত যাহাতে তোমরা চলাফেরা করিতে পার প্রশস্ত পথে" (৭১ ঃ ১৩-২০)।

তাহারা তাহাদের নিজেদের মধ্যে হইতেই একজন লোক এই দায়িত্ব পাইয়াছে জানিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল (৭ ঃ ৬৩) এবং বলিল, আমরা তোমাকে তো আমাদের মত মানুষ ব্যতীত কিছু দেখিতেছি না; আমরা তো দেখিতেছি তোমার অনুসরণ করিতেছে তাহারাই যাহারা আমাদের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতেই অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতেছি না; বরং আমরা তোমাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করি (১১ ঃ ২৭)। অতঃপর সকলে মিলিয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল (২ ঃ ৬৪)।

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে হযরত নূহ (আ) নিরলস পরিশ্রম করেন। তাঁহার সাধ্যমত সমস্ত উপায়-উপকরণ তিনি অবলম্বন করেন। তিনি দিবা-রাত্র, প্রকাশ্যে ও গোপনে উচ্চস্বরে (৭১ ঃ ৫-৯) সর্ববিধ পন্থায় কওমকে দাওয়াত দেন, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণীর লোক ছাড়া কেহই তাহার দাওয়াতে কর্ণপাত করিল না; বরং তাহাদের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং ধনী শ্রেণীর লোকেরা তাহাকে স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত (৭ ঃ ৫৯) বলিয়া আখ্যায়িত করিল, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিল। তাঁহাকে একজন সামান্য মানুষ এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে নিম্ন শ্রেণীর লোক বলিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিল। তাহারা তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া অপবাদ দিল, আবার কখনও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আকাঙ্খী বলিয়া দোষারোপ করিল এবং তাঁহার ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা করার জন্য নিজেরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বলিল, আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তো একজন ফেরেশতাই পাঠাইতেন (২৩ ঃ ২৪-২৫; ৫৪ ঃ ৯)।

অবশেষে তাহারা নূহ (আ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে দূরে সরাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিল। কিন্তু নূহ (আ) দৃঢ়তার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, মুমিনদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া আমার কাজ নহে (২৬ ঃ ১১৪)। তাহারা নিশ্চিতভাবে তাহাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভ করিবে (১১ ঃ ২৯)। তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলে আল্লাহ তা'আলা

অসন্তুষ্ট হইবেন। পরোক্ষভাবে ইহাও বলিলেন, আমি যদি তাহাদেরকে তাড়াইয়া দেই তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করিবে না (১১ ঃ ৩০)। তিনি আরো বলিলেন, "উহারা কি করিত তাহা আমার জানা নাই। উহাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝিতে" (২৬ ঃ ১১২-১১৩)! তিনি বলিলেন, এই সকল দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর লোক যাহারা মনে-প্রাণে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের (সম্প্রদায়ের) নিকট এইজন্য তুচ্ছ ও হেয় যে, উহারা তাহাদের ন্যায় সম্পদ ও বিত্তশালী নহে। আর এজন্যই তাহাদের (কাফিরদের) ধারণায় তাহারা (দরিদ্র মুমিনগণ) কল্যাণ বা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে না। কারণ তাহাদের ধারণামতে সৌভাগ্য ও কল্যাণ সম্পদের মধ্যে নিহিত; দরিদ্রতার মধ্যে নহে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত, যিনি তাহাদের অন্তর সম্পর্কে জ্ঞাত। কারণ আল্লাহ প্রদত্ত সৌভাগ্য ও হিদায়াত বাহ্যিক ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নহে; বরং অন্তরের নির্মলতা, নিয়তের ইখলাস ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল।

নূহ (আ) বিভিন্নভাবে তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, তিনি পার্থিব কোন স্বার্থে (দাওয়াত ও তাবলীগের) কাজ করিতেছেন না। তিনি তাহাদের নিকট কোন সম্পদ বা কোন পদ ও পদবী চাহিতেছেন না। এই মহতী কাজের বিনিময় তো আল্লাহ্‌ই তাহাকে প্রদান করিবেন (১১ ঃ ২৯)। তিনি তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, তাহার কাছে না আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার আছে, আর না তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবগত; আর না তিনি কোন ফেরেশতা (১১ ঃ ৩১)। তিনি একজন মানুষ মাত্র, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আল্লাহ্‌র বিধান ও নির্দেশের প্রতি তাহাদিগকে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যই মনোনীত করিয়াছেন।

কিন্তু কোন যুক্তিই তাহারা গ্রহণ করিল না, কোনভাবেই তাহারা দাওয়াত কবূল করিল না; বরং উক্ত দাওয়াতকে ঝগড়া ও বিতণ্ডারূপে আখ্যায়িত করিয়া বলিল, হে নূহ! তুমি আমাদের সহিত অতিরিক্ত বিতণ্ডা করিয়াছ। তাই নিতান্ত তাচ্ছিল্য ও অবিশ্বাসভরে তাহারা বলিল, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর (১১ ঃ ৩২)। নূহ (আ) ইহার উত্তরে বলিলেন, "ইচ্ছা করিলে আল্লাহ্‌ই তোমাদের নিকট উপস্থিত করিবেন এবং তোমরা উহা ব্যর্থ করিতে পারিবে না" (১১ ঃ ৩৩)। অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিল যে, নূহ (আ) যখনই তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দিতেন তখনই তাহারা তাঁহার কোন কথাই যাহাতে কর্ণকুহরে না পৌঁছে সেইজন্য কানে আঙ্গুলি প্রবেশ করাইত। আর তাঁহাকে যাহাতে দেখিতে না হয় সেইজন্য নিজদিগকে কাপড়ে আবৃত করিয়া ফেলিত এবং জিদ ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতে লাগিল (৭১ ঃ ৭)। এক পর্যায়ে তাঁহাকে পাগল বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিল (৫৪ ঃ ৯) এবং এই কাজ হইতে বিরত না থাকিলে তাঁহাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিবার হুমকিও দিল (২৬ ঃ ১১৬)।

নূহ (আ)-এর নৈরাশ্য এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সান্ত্বনা দান

এইভাবে সাড়ে নয় শত বৎসর তিনি অসীম ধৈর্যের সহিত তাহাদিগকে দাওয়াত দিলেন (২৯ ঃ ১৪)। কিন্তু তাহাদের স্বভাব-চরিত্রের কোনই পরিবর্তন হইল না। নূহ (আ)-এর যুক্তিপূর্ণ ও আন্তরিক

দাওয়াত তাহাদের হৃদয়ে একটুও দাগ কাটিল না। তাহারা নিজেরা তো গ্রহণ করিলই না, সন্তানদিগকেও তাহারা ওসিয়াত করিয়া যাইত যেন তাহারা নূহ (আ)-এর দাওয়াত গ্রহণ না করে (আল-বিদায়া, ১খ., ১০৯)। ইব্ন ইসহাক প্রমুখ নূহ (আ)-এর প্রতি তাঁহার সম্প্রদায়ের রূঢ় আচরণের কথা বিস্তারিতভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। দাহ্হাক সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় তাঁহাকে আটক করিয়া প্রহার করিত, গলায় ফাঁস দিত। ফলে তিনি বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া যাইতেন। অতঃপর হুঁশ ফিরিয়া আসিলে বলিতেন, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার কওমকেও। কারণ তাহারা অজ্ঞ। অতঃপর তিনি গোসল করিতেন এবং কওমের নিকট গিয়া আবার তাহাদিগকে দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে তাহারা স্বীয় পাপে প্রতিনিয়ত ডুবিয়া রহিল। তাহাদের অপরাধ গুরুতর হইতে লাগিল। নূহ (আ) ও তাহাদের মধ্যকার এই আচরণ দীর্ঘায়িত হইতে লাগিল। এই মুসীবত তাঁহার জন্য কঠিন আকার ধারণ করিল । প্রজন্মের পর প্রজন্ম পর্যন্ত তিনি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম পূর্বের তুলনায় আরও বেশী অপরাধী ও দুষ্কৃতকারী হইতে লাগিল, এমনকি পরবর্তী প্রজন্ম বলিতে লাগিল, এই লোকটি আমাদের বাপ-দাদাদের সময়ে এইরূপ পাগল ছিল। তাহারা ইহার কোন কথাই গ্রহণ করিত না।

তাঁহার কওম যে উত্তরোত্তর কেবল খারাপই হইতেছিল ইহার স্বপক্ষে ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ একটি ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন। একবার এক লোক তাহার পুত্রকে কোলে লইয়া লাঠিতে ভর করিয়া নূহ (আ) -এর নিকট আগমন করিল এবং লোকটি তাহার পুত্রকে বলিল, বৎস! এই বৃদ্ধকে ভালমত দেখিয়া নাও। সে যেন তোমাকে কখনও ধোঁকা দিতে না পারে। ছেলেটি বলিল, পিতা ! লাঠিখানি আমাকে দাও। লোকটি লাঠিখানি তাহার হাতে দিল। ছেলেটি আবার বলিল, আমাকে মাটিতে নামাইয়া দাও। লোকটি তাহাকে মাটিতে নামাইয়া দিল। সে হাঁটিয়া নূহ (আ)-এর কাছে গেল এবং লাঠি দিয়া তাঁহাকে প্রহার করিল। মনের দুঃখে নূহ (আ) তখন বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তোমার বান্দারা আমার সহিত কীরূপ আচরণ করিতেছে তাহা তুমি দেখিতেছ। তাহাদিগকে যদি তুমি রাখিতে চাও তবে তাহাদিগকে হেদায়াত দান কর। আর যদি তাহা না হয় তবে তাহাদের ব্যাপারে তোমার ফয়সালা করা পর্যন্ত আমাকে ধৈর্য ধারণের তাওফীক দাও। তুমি তো উত্তম ফয়সালাকারী। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া এবং কওমের শেষ অবস্থা জানাইয়া দিয়া তাঁহার নিকট ওহী পাঠাইলেন, যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেহ কখনো ঈমান আনিবে না। সুতরাং তাহারা যাহা করে তজ্জন্য তুমি দুঃখিত হইও না (১১ ঃ ৩৭; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৬-৫৭; আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১২ খ, ২২; ঐ লেখক, তারীখুল-উমাম ওয়াল মুলূক, ১খ, ৯২; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৫; আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, ১২খ, ৪৮)। তিনি আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর। কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে" (২৩ ঃ ২৬)।" আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর" (৫৪ ঃ ১০)।

কওমের বিরুদ্ধে নূহ (আ)-এর বদদোআ

নূহ (আ) তাহাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হইয়া গেলেন এবং আল্লাহ্র নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, তাহাদের দাওয়াত কবুল না করা তাঁহার দাওয়াত পৌছানোর কোন ত্রুটির কারণে নহে, বরং অমান্যকারীদের অহংকার ও অবাধ্যতার ফল এবং তাহারা কেহই আর কখনও ঈমান আনিবে না। তাহারা পৃথিবীতে থাকিলে কোন ফলোদয় হইবে না, বরং ধনেজনে বর্ধিত হইয়া পাপাচার আরও বৃদ্ধি করিবে। তাই তাহাদিগকে আর অবকাশ না দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরগণের মধ্য হইতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। তুমি উহাদিগকে অব্যাহতি দিলে উহারা তোমার বান্দাদিগকে বিভ্রান্ত করিবে এবং জন্ম দিতে থাকিবে কেবল দুষ্কৃতকারী ও কাফির (৭১ ঃ ২৬-২৭)। কিন্তু সাথে সাথে স্বীয় পিতামাতা এবং তাহার অনুসারী মু'মিনদের ক্ষমার জন্য দো'আ করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা মু'মিন হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদিগকে এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদিগকে (৭১ ঃ ২৮)। উল্লেখ্য যে, তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। কাহারও মতে নারী-পুরুষ মিলিয়া ৪০ জন, কাহারও মতে ৬০ জন, আবার কাহারও মতে ৮০ জন (আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৫; আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, ১২ খ, ৫৫)।

আল্লাহর নির্দেশে জাহাজ নির্মাণ

স্বীয় কাওম সম্পর্কিত নূহ (আ)-এর এই দো'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করিলেন (৩৭ঃ৭৫) এবং তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি কাফির মুশরিকদিগকে এক মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করিবেন। আর তাঁহাকে ও তাঁহার অনুসারী মু'মিনদিগকে জাহাজে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সরাসরি নিজের তত্ত্বাবধানে জাহাজ তৈরীর নির্দেশ দিলেন (১১ ঃ ৩৭)।

ইমাম ছা'লাবী জাহাজ তৈরীর বিবরণ এইভাবে দিয়াছেনঃ তখনও পর্যন্ত যেহেতু নৌযান ব্যবহার শুরু হয় নাই, তাই নূহ (আ) কৌতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমার প্রতিপালক! নৌযান কি? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, একটি কাষ্ঠ নির্মিত গৃহ যাহা পানির উপর চলে। নূহ (আ) বলিলেন, হে প্রতিপালক! কাষ্ঠ কোথায় পাইব? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, হে নূহ! আমি যাহা চাই তাহা করিতে সক্ষম। নূহ (আ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! বৃক্ষ কোথায় পাইব? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, একটি বৃক্ষ তুমি রোপণ কর। অতঃপর তিনি একটি সেগুন, মতান্তরে দেবদারু (আল-বিদায়া, ১খ, ১১০) আর বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে গোফর বৃক্ষ (Genesis; 6:14) রোপণ করিলেন, অতঃপর চল্লিশ বৎসর মতান্তরে এক শত বৎসর (আল-বিদায়া, প্রাগুক্ত) কাটিয়া গেল। এই সময়কালে তিনি কওমের উপর বদদো'আ করা হইতে বিরত রহিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরের বর্ণনামতে এই সময়কাল পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাহাদের মহিলাদিগকে বন্ধ্যা করিয়া রাখিলেন। ফলে তাহাদের আর কোন সন্তান পয়দা হইল না (ইবনুল আছীর, আল-কামিল,

১খ, ৫৬; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৭)। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। কোনও বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সূত্রে ইহার উল্লেখ নাই। ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ সম্ভবত এই ধারণার বশবর্তী হইয়া উহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, জন্মের ধারা চালু থাকিলে অনেক নিষ্পাপ শিশুই পিতামাতার সহিত প্লাবনে মৃত্যুবরণ করিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষ্পাপ শিশুকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই জাতীয় বর্ণনার প্রয়োজন নাই। কারণ আল্লাহ্‌র নিয়ম হইল, কোনও অঞ্চলে আযাব আসিলে সেখানকার ছোট-বড়, ধনী-গরীব, যুবা-বৃদ্ধ, পাপী-নিষ্পাপ নির্বিশেষে সকলে উহাতে ধ্বংস হয়। অতঃপর পাপিষ্ঠদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতই বরবাদ হইয়া যায়। আর নিষ্পাপদের জন্য ইহা হয় সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ তাহারা দুঃখ-কষ্টের জগত হইতে চিরস্থায়ী শান্তির জগতে উপনীত হয়। তাই নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের যুবা-বৃদ্ধ-শিশু সকলেই প্লাবনে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় (হিফজুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ১খ, ৮৪-৮৫)।

অতঃপর বৃক্ষটি যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, সালমান (রা)-এর বর্ণনামতে ৪ বৎসর হইল (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৯১), তখন আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে উহা কাটিবার নির্দেশ দিলেন। তিনি উহা কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইলেন এবং বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! ইহা দ্বারা কিভাবে আমি উক্ত গৃহ নির্মাণ করিব? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, উহাকে তিনটি আকৃতিতে বিন্যস্ত কর, উহার মাথা মোরগের ন্যায়, পেট পাখির পেটের ন্যায় এবং লেজ অনেকটা মোরগের লেজের মত বানাও। উহা বদ্ধ আকৃতির বানাও। দরজাগুলি বানাও উহার দুই পার্শ্বে। উহাকে ত্রিতলবিশিষ্ট বানাও। ৮০ হাত দৈর্ঘ্য, ৫০ হাত প্রস্থ এবং উচ্চতায় ৩০ হাত বানাও। ইহা আহলে কিতাবদের বর্ণনা বলিয়া ইমাম ছা'লাবী উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ৫৭)। কিন্তু বাইবেলে ৩০০ হাত দৈর্ঘ্য, ৫০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চতার কথা উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. Genesis, 6:15)। এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসিতেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে জাহাজ তৈয়ার করা শিক্ষাদান করিতে জিবরীল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন। নূহ (আ) কাঠ কাটিয়া উহাতে পেরেক ঢুকাইয়া জাহাজের আকৃতি বানাইতে লাগিলেন (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৭; ছানাউল্লাহ পানীপতি, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৪)। আর তাঁহার কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যখনই তাঁহার নিকট দিয়া গমন করিত তখনই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত (১১ঃ ৩৮)। তাহারা বলিত, নূহ! তুমি নবুওয়াতের দাবি করিয়া এখন কাঠমিস্ত্রি হইয়া গিয়াছ! তাহারা আরও বলিত, এই পাগলের কাণ্ড দেখ, কাষ্ঠ দিয়া ঘর বানাইতেছে যাহা নাকি পানির উপর দিয়া চলিবে! এই মরুভূমিতে পানি কোথা হইতে আসিবে! এই বলিয়া তাহারা পরস্পর হাসাহাসি করিত (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, প্রাগুক্ত; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৬১)। নূহ (আ) ও তাহাদের পরিণতি সম্পর্কে উদাসীনতা এবং আল্লাহর নাফরমানীতে অটল থাকার ধৃষ্টতা দেখিয়া তাহাদের পন্থায় উত্তর দিতেন, তোমরা যদি আমাদিগকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদিগকে উপহাস করিব, যেমন তোমরা উপহাস করিতেছ এবং তোমরা অচিরে জানিতে পারিবে কাহার উপর আসিবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি (১১ ঃ ৩৮-৩৯)। অতঃপর তিনি নিজ কাজে মনোনিবেশ করিতেন। আল্লাহ তা'আলা পূর্বেই তাঁহাকে ইহাদের বিষয় জানাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও

আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর। আর যাহারা সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলিও না; তাহারা তো নিমজ্জিত হইবে" (১১ ঃ ৩৭)। তাহাদের ব্যাপারে নূহ (আ)-এর দো'আ কবুল হইয়াছিল এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে নৌকা নির্মাণ কর্ম তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করিবার জন্য প্রত্যাদেশ পাঠাইলেন এবং বলিলেন, পাপিষ্ঠদের প্রতি আমার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং নৌকা নির্মাণ কর্ম তাড়াতাড়ি সম্পাদন কর। তখন নূহ (আ) দুইজন কাঠমিস্ত্রি ভাড়া করিলেন এবং তাঁহার পুত্র সাম, হাম ও য়াফিছও নৌকা বানাইতে লাগিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি উহার নির্মাণ কর্ম সমাপ্ত করেন। কত বৎসরে উহা সমাপ্ত হয় সে ব্যাপারে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। যায়দ ইবন আসলাম (রা)-এর বর্ণনামতে রোপণ ও কর্তনে ১০০ (এক শত) বৎসর অতিবাহিত হয় এবং নৌকা নির্মাণে আরও এক শত বৎসর ব্যয় হয়। অন্য এক বর্ণনামতে বৃক্ষ লাগানোর পর ৪০ বৎসর ব্যয় হয়। কা'ব আল-আহবারের এক বর্ণনাতে নূহ (আ) ৩০ বৎসরে নৌকা নির্মাণ করেন (ছানাউল্লাহ পানীপতি, তাফসীরুল-মাজহারী, ৫খ, ৮৫)। কিন্তু কা'ব হইতে অপর একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ৪০ বৎসরের (আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, ১২খ, ৫০)। মুজাহিদের বর্ণনামতে ৩ বৎসরে নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত ৬০ ও ৪০০ বৎসরের বর্ণনাও পাওয়া যায় (প্রাগুক্ত)। আর ইবন আব্বাস (রা) হইতে একটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায় যে, দুই বৎসরে তিনি নির্মাণ কর্ম সমাপ্ত করেন (আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৪)। এই মতটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। উক্ত নৌকার পার্শ্বে আল্লাহ তা'আলা আলকাতরার একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া ছিলেন যাহা টগবগ করিতেছিল। অতঃপর নৌকার ভিতর ও বাহিরের দিকে উক্ত আলকাতরা দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হইল এবং লৌহ কীলক দ্বারা মজবূত করা হইল (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৫৮)। ইহাই কুরআন করীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, "আর আমি তাহাকে আরোহণ করাইলাম কাষ্ঠ ও কীলক নির্মিত এক নৌযানে" (৫৪ ঃ ১৩)।

নৌযানের আকৃতি

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত নৌকার অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ ছিল মোরগের মাথা ও লেজের আকৃতিসম্পন্ন এবং মধ্যভাগ ছিল পাখির পেটের ন্যায়। ইমাম ছাওরীর বর্ণনামতে উহার বুক ছিল সরু, যাহাতে পানি ভেদ করিয়া চলিতে পারে (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৩)। উক্ত নৌকার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কতটুকু ছিল সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে ঃ বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী উহার দৈর্ঘ ছিল ৩০০ হাত, প্রস্থ ৫০ হাত এবং উচ্চতা ৩০ হাত (Genesis, 6:15)। অধিকাংশ মুফাসসির ও মুহাদ্দিছ এই মতটিই গ্রহণ করিয়াছেন। ইবন্ মারদূয়া সামুরা ইবন জুনদূব (রা) সূত্রে এবং 'আবদ ইব্ন হুমায়দ, ইবনুল-মুনযির ও আবুশ-শায়খ কাতাদা হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বাগাবী ইবন আব্বাস (রা) সূত্র হইতেও অনুরূপ একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি তাঁহার আত-তাফসীরুল মাজহারী গ্রন্থে ইহাকেই প্রসিদ্ধ মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. ছানাউল্লাহ পানিপতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৪-৮৫)। দাহ্হাক সূত্রে বর্ণিত ইবন আব্বাস (রা)-এর অপর এক মতে দৈর্ঘ্য ৬০০ হাত, প্রস্থ ৩৩০ হাত এবং উচ্চতা

৩৩ হাত (ছা'লাবী, কাসাস, পৃ. ৫৮)। ইবন আব্বাস (রা)-এর আরও একটি রিওয়ায়াত রহিয়াছে, সেই মতে দৈর্ঘ্য ১২০০ হাত, প্রস্থ ৬০০ হাত (ইবন কাছীর, কাসাস, পৃ. ৭৩)। ইমাম বাগাবী ও ইবন জারীর তাবারী প্রমুখ হাসান বাসরী (র) হইতে অনুরূপ মত বর্ণনা করিয়াছেন (আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, ১২খ, ৫০; পানিপতী, আত-তাফসীরু'ল-মাজহারী, ৫খ, ৮৫; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৬)। শামীর বর্ণনামতে নৌকার দৈর্ঘ্য ৮০ হাত, প্রস্থ ৫০ হাত এবং উচ্চতা ছিল ৩০ হাত (প্রাগুক্ত)। ইবন আব্বাস (রা)-এর একটিমাত্র রিওয়ায়াত ছাড়া আর সকলেই এই ব্যাপারে একমত যে, উক্ত নৌকার উচ্চতা ছিল ৩০ হাত। ইহার তিনটি তলা ছিল। প্রত্যেক তলার উচ্চতা ছিল ১০ হাত। ইহার দরজা ছিল প্রস্থের দিকে যাহার উপর পর্দা ছিল (ইবন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৩; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ খ., ১১০)। ছাদের এক হাত নিচে ছিল বাতায়ন (বাইবেল, আদিপুস্তক ৬ ঃ ১৬; বাংলা অনু. বংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, পৃ. ৮)। এখানে উল্লেখ্য যে, হাত বলিতে ইবন সা'দের মতে নূহ (আ)-এর পিতার দাদার হাত বুঝানো হইয়াছে (দ্র. তাবাকাত, ১খ, ৪১)। ছানাউল্লাহ পানিপতী বলেন, হাতের সীমানা হইল কাঁধের সীমানা জোড়া পর্যন্ত (তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৫)। হাফিজ ইবন কাছীর উল্লেখ করিয়াছেন যে, এমন বিশাল এক নৌকা তৈরী হইল, যাহার দৃষ্টান্ত পূর্বেও কখনও ছিল না, পরবর্তীতেও হইবে না (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১০৯)।

নৌকায় আরোহণ

নৌযান তৈরীর কাজ সমাপ্ত হইলে আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠাইলেন যে, উহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুইটি, যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে (১১ ঃ ৪০)। প্রাণীকুলের প্রত্যেক জাতের একজোড়া করিয়া তোলার নির্দেশ এজন্য দিয়াছিলেন যাহাতে উহাদের বংশ বিলুপ্ত হইয়া না যায়। বাইবেলে বলা হইয়াছে যে, শুচি পশুর সাত জোড়া এবং অশুচি পশুর এক জোড়া নৌকায় উঠাও (Genesis, 7: 2-3); ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ বংশ সংরক্ষণের জন্য এক জোড়াই যথেষ্ট। অতঃপর স্থলভাগ ও জলভাগ এবং পর্বত ও সমভূমির সকল জীব-জন্তুকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার নিকট একত্র করিয়া দিলেন। এক বর্ণনামতে ৪০ দিবা-রাত্র অবিরল ধারায় বৃষ্টি হয়। ফলে হিংস্র প্রাণী, জীবজন্তু ও পক্ষীকুল নূহ (আ)-এর নিকট আসিয়া জড়ো হয়। অতঃপর তিনি উহাদের জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় তোলেন এবং আদম (আ)-এর লাশও তোলেন। অতঃপর নারী-পুরুষের মধ্যখানে পর্দা হিসাবে উহা রাখিয়া দেন (ইবন সা'দ, তাবাকাত, ১খ, ৪১)। ইবন জারীর আত-তাবারী ও ইবনুল আছীর প্রমুখ ইবন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৯৪; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৭-৫৮)। কোন তলায় কোন জীব আরোহণ করে সেই ব্যাপারেও মতভেদ রহিয়াছে। এক বর্ণনামতে নীচ তলায় জীবজন্তু, দ্বিতীয় তলায় মানুষ ও রসদপত্র এবং তৃতীয় তলায় পক্ষীকুলকে আরোহণ করান হয় (ইব্‌ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১১০; পানিপতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৫)। অপর এক বর্ণনামতে জীবজন্তু দ্বিতীয় তলায় এবং মানুষ

উপরের তলায় আরোহণ করে। তাহাদের সহিত স্নেহভরে তোতা পাখীকেও লওয়া হয় যাহাতে অন্য কোন প্রাণী তাহাকে হত্যা না করে (আছ-ছা'লাবী, কাসাস, পৃ. ৫৯)। অন্য এক বর্ণনামতে নূহ (আ) পক্ষীকুলকে নীচের তলায় এবং হিংস্র প্রাণী ও অন্যান্য জীবজন্তুকে মধ্যের তলায় আরোহণ করান। আর নিজে ও তাঁহার সঙ্গীরা উপরের তলায় আরোহণ করেন (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ., ৫৭)। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে শারহু খুলাসাতিল মাসীর গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, নীচ তলায় আরোহণ করে পক্ষীকুল, হিংস্র প্রাণী ও অন্যান্য সকল জীবজন্তু, মধ্যের তলায় ছিল খাদ্য, পানীয় ও কাপড়-চোপড়। আর উপরের তলায় আরোহণ করে মানবমণ্ডলী (আত-তাফসীরুল-মাজহারী, ৫খ, ৮৫)। তবে সর্বপ্রথম বর্ণিত মতটি যুক্তিযুক্ত ও সঠিক বলিয়া মনে হয়। কারণ চতুষ্পদ জন্তুর জন্য নিচের তলায় আরোহণ সুবিধাজনক, আর পক্ষীকুলের জন্য উপরের তলাই সুবিধাজনক আর মানুষ তো যে কোন তলাতেই আরোহণ করিতে পারে।

ইবন আব্বাস (রা)-এর একটি রিওয়ায়াত অনুসারে সর্বপ্রথম নৌযানে আরোহণ করে পক্ষীকুলের মধ্যে তোতা পাখি এবং সর্বশেষ আরোহণ করে প্রাণীকুলের মধ্যে গাধা। ইবলীস উহার লেজ ধরিয়া আরোহণ করে। গাধা যখন নৌকায় প্রবেশ করিতেছিল তখন ইবলীস উহার লেজ ধরিলে গাধা তাহার পা তুলিতে পারিতেছিল না। তখন নূহ (আ) ধমক দিয়া বলিলেন, ধিক তোমার! প্রবেশ কর যদিও শয়তান তোমার সঙ্গে থাকে। নূহ (আ)-এর মুখ দিয়া অকস্মাৎ ইহা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। শয়তান এই সুযোগে গাধার সহিত নৌকায় প্রবেশ করিল। নূহ (আ) তাহাকে নৌকায় দেখিয়া বলিলেন, তুই কেন আসিলি, হে আল্লাহর দুশমন! শয়তান বলিল, কেন! আপনি বলেন নাই, প্রবেশ কর, যদিও শয়তান তোমার সঙ্গে থাকে? অনেকের ধারণামতে শয়তান নৌকার উপরিভাগে ছিল (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৫৯; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৯৩; ঐ লেখক, তাফসীর, ১২খ, ২৩; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৬-৫৭; পানিপতী, আত-তাফসীরুল-মাজহারী, ৫খ, ৮৭)।

মালিক ইব্ন সুলায়মান আন-নাহবারী বলেন, নৌকায় যখন সকল জীবজন্তু আরোহণ করিতেছিল তখন সর্প ও বিচ্ছু নূহ (আ)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমাদিগকেও আরোহণ করান। তিনি বলিলেন, তোমরা তো ক্ষতি, কষ্ট ও বিপদের কারণ। তাই আমি তোমাদিগকে আরোহণ করাইব না। তাহারা বলিল, আমাদিগকে আরোহণ করিতে দিন, আমরা আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, যাহারা আপনার স্মরণ করিবে তাহাদের কাহাকেও আমরা কোনরূপ ক্ষতি করিব না। এইজন্যই যে উহাদের ক্ষতির ভয় পায় সে যদি এই আয়াত তেলাওয়াত করে (৩৭:৭৯)

سَلَامٌ عَلٰى نُوحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ ٠ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٠ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ٠

তবে উহারা তাহার কোন ক্ষতি করে না (আছ-ছা'লাবী, প্রাগুক্ত; পানিপতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৭-৮৮)।

ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আল্লাহ যখন নূহ (আ)-কে প্রত্যেক প্রাণীর একজোড়া করিয়া নৌকায় আরোহণ করার নির্দেশ দিলেন তখন নূহ (আ) বলিলেন, সিংহ ও গাভী কিভাবে একত্র করিব? আল্লাহ তা'আলা তাহাকে বলিলেন, কে তাহাদের মধ্যে শক্রতা পয়দা করিয়া দিয়াছে? নূহ (আ) বলিলেন, ওগো আমার প্রতিপালক! তুমিই। আল্লাহ বলিলেন, আমি তাহাদের মধ্যে ভালবাসা ও সমঝোতা পয়দা করিয়া দিব, ফলে একে অন্যের ক্ষতি করিবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিংহকে জ্বরগ্রস্ত করিয়া দিলেন। তখন সে নিজকে লইয়াই ব্যস্ত রহিল (প্রাগুক্ত, আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, ১২খ, ৫৪)।

ইবন আবী হাতিম সূত্রে যায়দ ইবন আসলাম (রা) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, নূহ (আ) যখন নৌকায় প্রত্যেক প্রাণীর একজোড়া করিয়া তুলিলেন, তখন তাহার সঙ্গীগণ বলিল, আমরা কিভাবে নিশ্চিত ও প্রশান্তিতে থাকিব অথচ আমাদের সহিত সিংহ রহিয়াছে! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিংহকে জ্বরে আক্রান্ত করিয়া দিলেন। পৃথিবীর বুকে ইহাই ছিল প্রথম জ্বর। অতঃপর তাহারা ইঁদুর সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া বলিল যে, উহা তো আমাদের খাদ্য দ্রব্য ও মালপত্র বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। তখন আল্লাহ তা'আলা সিংহের প্রতি প্রত্যাদেশ করিলে উহা হাঁচি দিল। ইহা হইতে বিড়াল বাহির হইল। বিড়ালের ভয়ে ইঁদুর আত্মগোপন করিয়া রহিল। এই বর্ণনার সনদটি মুরসাল (ইবন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৪; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ, ১১১; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৭; আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, ১২খ, ৫৩)।

হযরত নূহ (আ)-এর সহিত কতজন মুমিন নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল সেই ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। (১) ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে তাহারা ছিল স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ৮০ জন, যাহাদের একজনের নাম ছিল জুরহুম এবং তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মহিলারাও ছিল। তাহার অপর এক বর্ণনায় সর্বমোট ৮০ জনের কথা বলা হইয়াছে যাহার ব্যাখ্যা হইল ঃ শাম, হাম, য়াফিছ ও তাহাদের স্ত্রীগণ, নূহ (আ)-এর পত্নী এবং শীছ (আ) বংশের অন্য ৭৩ জন। (২) মুকাতিল-এর বর্ণনামতে ৭২ জন পুরুষ ও নারী। নূহ (আ)-এর তিন পুত্র ও তাহাদের স্ত্রীগণ এই মোট ৭৮ জন, যাহাদের অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক ছিল নারী। (৩) কা'ব আল-আহবার-এর বর্ণনামতে ৭২ জন। (৪) ইবন ইসহাকের বর্ণনামতে মহিলা ছাড়া ছিল দশজন ঃ নূহ (আ), তাঁহার তিন পুত্র সাম, হাম, য়াফিছ এবং তাঁহার উপর ঈমান আনয়নকারী ছয়জন এবং ইহাদের স্ত্রীগণ অর্থাৎ দশজন পুরুষ ও দশজন মহিলা মোট ২০ জন। (৫) কাতাদা, ইবন জুরায়জ ও মুহাম্মাদ ইবন কা'ব আল-কুরাজীর বর্ণনামতে নৌকায় নূহ (আ), তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার তিন পুত্র সাম, হাম, য়াফিছ এবং তাহাদের তিন পত্নী এই মোট ৮ জন ছাড়া আর কেহ ছিল না। (৬) আ'মাশ-এর বর্ণনামতে ৭ জন। নূহ (আ), তাঁহার তিন পুত্র ও তাহাদের তিন পত্নী। তিনি তাহাদের মধ্যে নূহ (আ)-এর স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেন নাই (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৯৫; ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৫; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১১১; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৫৯; ইবনুল

আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৬; ছানাউল্লাহ পানিপতী, আত-তাফসীরুল-মাজহারী, ৫খ, ৮৭)। তবে শেষোক্ত মত দুইটি সঠিক নহে এবং তাহা গ্রহণযোগ্যও হইতে পারে না। কারণ ইহা স্পষ্টতই কুরআন করীমের পরিপন্থী। আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে যে, তাঁহার পরিবার-পরিজন ছাড়াও তাঁহার উপর ঈমান আনয়নকারীদের একটি দলও ছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ. (١١ : ٤٠)

"আমি বলিলাম, ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুইটি, যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে" (১১ ঃ ৪০)।

অপর বর্ণর্ণাগুলির মধ্যে ৮০ জনের বর্ণনাটিই সঠিক বলিয়া মনে হয়। কারণ নৌযান হইতে অবতরণ করিয়া তিনি যে লোকালয়ের পত্তন করেন উহার নাম রাখেন 'ছামানীন' যাহা 'সূক ছামানীন (৮০ জনের বাজার) নামে খ্যাত। ইহাতে বুঝা যায়, নূহ (আ)-এর সাথী-সঙ্গিগণ সংখ্যায় ৮০ জন ছিল। ইহাই অধিকাংশ আলিমের মত।

প্লাবনের সূচনা ও তাননূর (উনান) উথলিয়া উঠার মর্ম

প্লাবনের সূচনার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ. (١١ : ٤٠)

"অবশেষে যখন আমার আদেশ আসিল এবং উনান উথলিয়া উঠিল আমি বলিলাম, ইহাতে উঠাইয়া লও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগলের দুইটি, যাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদিগকে" (১১ ঃ ৪০)।

এখানে উনান উথলিয়া উঠার মর্ম কি সে ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। (১) হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল ভোর হওয়া এবং চতুর্দিক আলোকিত হইয়া যাওয়া। অর্থাৎ ভোরের আলো ছড়াইয়া পড়িলে সকলকে লইয়া নৌকায় আরোহন করিতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন। তবে এই মতটি বিরল। অন্য কেহ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। (২) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ইহার অর্থ হইল যমীনের উপরিভাগ তথা যমীনের উপর দিয়া পানি প্রবাহিত হওয়া। আরবগণ যমীনের উপরিভাগকে তাননূর বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হইল, যমীনের সকল স্থান হইতে পানি উথলিয়া উঠিল, এমনকি অগ্নি প্রজ্জলিত হইবার স্থান উনান হইতেও। ইহাই অধিকাংশ আলিমের অভিমত (ইবন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১১১; পানিপতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৫-৮৬)। (৩) কাতাদা (র) বলেন, তাননূর হইল যমীনের সবচেয়ে উন্নত ও মর্যাদাসম্পন্ন স্থান; (৪) হাসান, মুজাহিদ ও শা'বী (র) বলেন, তাননূর অর্থ হইল যেখানে রুটি তৈরী করা হয়। ইহাই অধিকাংশ মুফাস্সিরের মত। আর উহা ছিল একটি পাথরের উনান পূর্বে যাহা হাওয়া

(আ)-এর ছিল (আল-কামিল, ১খ, ৫৬), পরে হাত বদল হইতে হইতে নূহ (আ)-এর নিকট আসিয়া পৌঁছে (আত-তাবারী, তারীখ, ১৯, ৯৪; পানিপতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ, ৮৬)। তাই ইহার অর্থ হইল, নূহ (আ)-কে বলা হইল যখন দেখিবে উক্ত উনান হইতে পানি উথলিয়া উঠিতেছে তখন তুমি ও তোমার সাথী-সঙ্গীবৃন্দ নৌকায় আরোহণ করিবে। অতঃপর তাঁহার স্ত্রী একদিন উনানে কাজ করিতেছিলেন। হঠাৎ উনান হইতে পানি উথলিয়া উঠিতে দেখিয়া তিনি নূহ (আ)-কে এই সংবাদ দিলেন (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৫৮)।

এই উনানটি কোথায় অবস্থিত ছিল সেই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে ঃ (১) মুজাহিদ (র) বলেন, উহা ছিল কূফার প্রান্ত সীমায়। এই ব্যাপারে সুদ্দী (র) শা'বী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহ্র কসম করিয়া বলিতেন যে, উনান কূফার প্রান্তেই উথলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি আরও বলেন, নূহ (আ) কূফার মসজিদের অভ্যন্তরেই নৌকা তৈরী করেন। আর উনান ছিল মসজিদের প্রবেশ পথের ডাইন দিকে যাহা কিনদা গোত্রের দরজার সহিত মিলিত ছিল। উনান উথলিয়া উঠা ছিল নূহ (আ)-এর জন্য তাঁহার কওম ধ্বংস হওয়ার একটি আলামত ও দলীল। (২) আলী ইবন আবী তালিব (রা) বলেন, কূফার মসজিদের কিনদা গোত্রের দরজার দিক হইতেই উনান উথলিয়া উঠিয়াছিল। (৩) মুকাতিল (র) বলেন, ইহা ছিল আদম (আ)-এর উনান। ইহা শাম (বর্তমান সিরিয়া)-এর আয়ন বিরদ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। (৪) ইবন আব্বাস (রা) বলেন, উনানটি ছিল ভারতবর্ষে। ইব্ন জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবন আবী হাতিম, আবুশ-শায়খ ও আল-হাকিম ইহা বর্ণনা করত ইহাকে সহীহ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাতাদার বর্ণনামতে ইহা জাযীরাতুল আরবে ছিল (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৫৮; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৯৪-৯৫; পানিপতী, আত-তাফসীরুল-মাজহারী, ৫খ, ৮৬; ইবন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৪; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১১১; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৬)।

প্লাবনের মুহূর্তে নূহ (আ)-এর দু'আ

অতঃপর সকলকে লইয়া নূহ (আ) যখন নৌযানে আরোহণ করিলেন তখন আল্লাহ্র নির্দেশে এই দু'আ পাঠ করিলেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ·

"আল্লাহর নামে ইহার গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (১১ ঃ ৪১)।

আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি আরও বলিলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ·

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন জালিম সম্প্রদায় হইতে" (২৩ ঃ ২৮)। তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁহার নিকট দু'আ করিলেন ঃ

رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلاً مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যাহা হইবে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী" (২৩ ঃ ২৯)।

মহাপ্লাবন

অতঃপর সকলের নৌযানে আরোহণ সমাপ্ত হইলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্লাবন শুরু হইল। ইবন জারীর প্রমুখের বর্ণনামতে, গ্রীক হিসাব অনুযায়ী 'আব' মাসের ১৩ তারিখে উক্ত প্লাবন শুরু হয়। আরবী রজব মাসের দশ তারিখে (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬০; ইবন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ১১২)। তখন পৃথিবীর সকল প্রস্রবণ, কূপ ও জলাশয় এবং বড় বড় নদী-নালা ফুঁসিয়া উঠিল। আকাশ হইতে ৪০ দিন ৪০ রাত্র অবিরল ধারায় বৃষ্টিপাত হইতে থাকিল। অতঃপর প্রবল বেগে পানি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহাই আল্লাহ তা'আলা কুরআন করীমে ইরশাদ করিয়াছেনঃ "আমি উন্মুক্ত করিয়া দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে এবং মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত করিলাম প্রস্রবণ; অতঃপর সকল পানি মিলিত হইল এক পরিকল্পনা অনুসারে" (৫৪ ঃ ১১-১২)। এইভাবে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় নৌকা ভাসিল (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬০; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ., ৫৬-৫৭; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ৯৪)। এইভাবে পানি কেবল বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল, এমনকি সকল পাহাড়-পর্বত ডুবিয়া গেল। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে, এই প্লাবনে পৃথিবীর পানি সর্বোচ্চ পাহাড় হইতে ১৫ হাত উপরে উঠিয়া যায়। বাইবেলে এই কথাই বলা হইয়াছে। মতান্তরে পাহাড় হইতে ৮০ হাত উপরে পানি উঠিয়া যায় (Genesis, 6:20)। পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। উহার মধ্য দিয়া নূহ (আ)-এর নৌযান উক্ত পানিতে ভাসিতে লাগিল (১১ ঃ ৪২)। নৌযানখানি পানির উপর ৬ হাত ভাসিয়া ছিল (ইব্‌ন সাদ, ১খ, ৪১), অবশিষ্ট ২৪ হাত পানির নীচে নিমজ্জিত ছিল। এইভাবে ভাসমান অবস্থায় নৌকা চলিতে লাগিল। কোথায়ও উহা স্থির থাকিল না। ৬ মাস এইভাবে নৌকা ভাসিতে থাকিল। অতঃপর উহা হারামের নিকট আসিল, কিন্তু উহাতে প্রবেশ করিল না, বরং এক সপ্তাহ যাবৎ উহার চতুর্পার্শ্বে ঘুরিতে লাগিল। ইহা ছিল সেই ঘর যাহার কেন্দ্র রক্ষা করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা উহাকে ৪র্থ আসমানে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। ইহা ছিল জান্নাতের ইয়াকূত দ্বারা তৈরী। জিবরীল (আ) হাজরে আসওয়াদকে আবূ কুবায়স পর্বতে উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইবরাহীম (আ)-এর বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ পর্যন্ত উহা সেখানেই ছিল। অতঃপর তিনি উহা স্বস্থানে স্থাপন করেন (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬০; ইব্‌ন সাদ, তাবাকাত, ১খ, ৪১; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৬)। এইভাবে ভাসিতে ভাসিতে উহা জূদী পর্বতে গিয়া স্থির হইল (জূদী পর্বতের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে)। অবশেষে আল্লাহর সিদ্ধান্ত কার্যকর হইবার পর পৃথিবীকে পানি গ্রাস করিয়া লইতে এবং আকাশকে বারি বর্ষণ হইতে ক্ষান্ত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্লাবন শুরু হইতে পানি গ্রাস করা পর্যন্ত সময় ছিল ছয় মাস (ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৫৭)। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নূহ (আ)-এর নৌকা জূদী পর্বতে স্থির হয়,

আর পৃথিবীতে যাহা কিছু ছিল, কাফির-মুশরিক, প্রাণীকুল ও গাছপালা সবই ধ্বংস হইয়া যায়। তাই নূহ (আ) ও তাঁহার সঙ্গে নৌকায় যাহারা ছিল তাহারা ব্যতীত পৃথিবীতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না (আছ-ছা'লাবী, কাসাস, পৃ. ৬০)। ইহাই কুরআন করীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ وَيسَمَاءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ واسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. (٤٤ - ١١)

"ইহার পর বলা হইল, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করিয়া লও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। ইহার পর বন্যা প্রশমিত হইল এবং কার্য সমাপ্ত হইল। নৌকা জূদী পর্বতের উপর স্থির হইল এবং বলা হইল, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হউক" (১১ ঃ ৪৪)।

উল্লেখ্য যে, কাতাদা প্রমুখের বর্ণনামতে নৌকা জূদী পর্বতে স্থির ছিল এক মাস (ইবন কাছীর, কাসাস, পৃ. ৮৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১১৬)।

ইব্ন জারীর তাবারী, ছা'লাবী ও ইবন কাছীর প্রমুখ নৌযান ও প্লাবন সম্পর্কে নূহ (আ)-এর তনয় হাম-এর যবানীতে একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইল, আলী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুদআন সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, হাওয়ারীগণ একবার ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-কে বলিল, আপনি যদি এমন এক ব্যক্তিকে আমাদের সম্মুখে জীবিত করিতেন যিনি নূহ (আ)-এর নৌকা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, অতঃপর সেই সম্পর্কে আমাদিগকে অবহিত করিতেন। ঈসা (আ) তাহাদিগকে লইয়া চলিতে চলিতে একটি মাটির স্তূপের নিকট আসিলেন। অতঃপর উহা হইতে একমুষ্টি মাটি লইয়া বলিলেন, قُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র হুকুমে দাঁড়াইয়া যাও)। ইহা বলিতেই তিনি মস্তক হইতে মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে দাঁড়াইয়া গেলেন। তিনি তখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন, তুমি কি এই অবস্থায়ই ইনতিকাল করিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, না, আমি যুবা অবস্থায়ই মারা যাই। কিন্তু আমি মনে করিলাম বুঝি কিয়ামত হইয়া গিয়াছে। সেই আতঙ্কেই আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি। ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন, "নূহ (আ)-এর নৌকার বিবরণ দাও।" তিনি বলিলেন, 'উহার দৈর্ঘ্য ছিল ১২০০ হাত এবং প্রস্থ ছিল ৬০০ হাত। উহা ছিল তিন তলাবিশিষ্ট। এক তলায় ছিল চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী, আর এক তলায় ছিল মানুষ, অপর এক তলায় ছিল পক্ষীকুল। চতুষ্পদ জন্তুর বিষ্টা যখন বাড়িয়া গেল তখন আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-কে ওহী পাঠাইলেন যে, হাতীর লেজে আঘাত কর। তিনি আঘাত করিলেন, তখন উহা হইতে একটি নর শূকর ও একটি মাদি শূকর বাহির হইল। ইহারা সকল বিষ্টা খাইয়া ফেলিল। অতঃপর যখন ইঁদুরের উপদ্রব বৃদ্ধি পাইল এবং উহারা নৌকার রশিসমূহ কাটিয়া ফেলিতে লাগিল তখন আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, সিংহের চক্ষুদয়ের মধ্যখানে আঘাত কর। অতঃপর তিনি সেখানে আঘাত করিলে উহার নাক দিয়া একটি নর ও একটি মাদি বিড়াল বাহির হইল এবং ইঁদুরের

উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উহাদিগকে খাইয়া ফেলিল। ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন যে, নূহ (আ) কিভাবে জানিলেন যে, জনপদ ও শহর শুকাইয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, "তিনি খবর আনিবার জন্য প্রথমে কাক প্রেরণ করেন। অতঃপর উহা মরা লাশ পাইয়া উহাতে বসিয়া পড়ে এবং ফিরিয়া আসার পরিবর্তে সেখানেই মশগুল হইয়া পড়ে। তখন নূহ (আ) উহার প্রতি বদদোআ করেন যেন তাহার অন্তরে ভীতির সৃষ্টি হয়। এইজন্য উহা মানুষের পোষ মানে না এবং ঘরে আসিতে পারে না। অতপর তিনি কবুতর প্রেরণ করিলেন। উহা ঠোঁটে করিয়া যয়তুনের পাতা এবং পায়ে করিয়া কাদা মাটি লইয়া আসিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শহর ও জনপদ শুকাইয়া গিয়াছে। তখন তিনি কবুতরের গলায় সবুজের মালা পরাইয়া দিলেন যাহা এখনও পরিদৃষ্ট হয় এবং উহার জন্য দোআ করিলেন যেন সে ভালবাসা ও নিরাপত্তা লাভ করে। এইজন্য উহা মানুষের পোষ মানে এবং ঘরের সহিত সম্পৃক্ত থাকে।" তাহারা বলিল, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা ইহাকে আমাদের পরিবারের নিকট লইয়া যাই না কেন? সে আমাদের সহিত উঠা বসা করিবে এবং আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিবে।" তিনি বলিলেন, যাহার রিযিক নাই সে কিভাবে তোমাদের সঙ্গে যাইবে? অতঃপর তাহাকে বলিলেন, عد باذن الله "আল্লাহ্র নির্দেশে পূর্বের রূপে ফিরিয়া যাও।" তখন সে আবার মাটি হইয়া গেল (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৮২-৮৩; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৬; আত-তাবারী, ১খ., ৯১-৯২; ঐ লেখক, তাফসীর, ১২খ., ২২; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬১; পানিপতী, আত-তাফসীরুল-মাজহারী, ৫খ., ৯০)। হাফিজ ইব্ন কাছীর এই রিওয়ায়াত বর্ণনার পর এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহা চূড়ান্ত পর্যায়ের বিরল (غريب جدا) (দ্র. তাহার রচিত কাসাসুল-আম্বিয়া ও আল-বিদায়া ও নিহায়া, প্রাগুক্ত)।

নূহ (আ)-তনয় কিনআনের অবস্থা

আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পরিবার-পরিজন ও মুমিনদিগকে রক্ষা করিবেন। নূহ (আ)-এর এক পুত্রের নাম ছিল য়াম, যাহাকে কিনআন বলা হইয়াছে। সে ছিল কাফির, ঈমান আনে নাই। ফলে সে নৌকায়ও আরোহণ করে নাই। প্লাবনে ডুবিয়া তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া নূহ (আ)-এর পিতৃ-হৃদয় স্নেহ বিগলিত হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত স্নেহভরে পুত্রকে ডাকিলেন এবং আরোহণ করিতে বলিলেন। কাফিরদের সঙ্গী হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল যে, সে পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় লইবে। নূহ (আ) বলিলেন, আল্লাহ্র আযাব হইতে আজ কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। তিনি যাহার প্রতি রহম করিবেন কেবল সেই রক্ষা পাইবে। অতঃপর বিশাল এক তরঙ্গ আসিয়া দুইজনের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করিল। অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হইল (১১ ঃ ৪২-৪৩)। তখন নূহ (আ) তাহার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট অনুযোগ [কোন কোন মুফাসসিরের মতে কিনআন নিমজ্জিত হইবার পূর্বে নূহ (আ) আল্লাহ্কে সম্বোধন করিয়া ইহা বলেন। সেক্ষেত্রে ইহা অনুযোগ না হইয়া বরং স্বীয় পুত্রের জন্য সুপারিশ হইবে] করিলেন এবং তাহাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, 'হে

আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য। আর আপনি তো বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক' (১১ ঃ ৪৫)। উল্লেখ্য যে, "পরিবারভুক্ত" লোকের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মপরায়ণ ও তাঁহার অনুসারীবৃন্দকে বুঝাইয়াছিলেন ঃ কিন্তু নূহ (আ) আপন বৈবাহিক সূত্রে সৃষ্ট পরিবার বুঝিয়াছিলেন, সেইজন্য ঐরূপ অনুযোগ বা সুপারিশ করিয়াছিলেন, তাই আল্লাহ তা'আলা ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাহাকে বলিলেন, 'হে নূহ! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে তো অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করিও না। আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও' (১১ ঃ ৪৬)। অতঃপর নূহ (আ) নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই সে বিষয়ে যাহাতে আপনাকে অনুরোধ না করি, এইজন্য আপনার শরণ লইতেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইব' (১১ ঃ ৪৭)।

উক্ত সর্বগ্রাসী প্লাবন হইতে কোন কাফিরই প্রাণে রক্ষা পায় নাই, সকলেই পানিতে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল। কোন কাফির মুশরিকের প্রতি সেই সময় আল্লাহ্ তা'আলা দয়া প্রদর্শন করেন নাই। ইব্ন জারীর তাবারী ও ইব্ন আবী হাতিম প্রমুখ ইয়া'কূব ইব্ন মুহাম্মাদ আয-যুহরী সূত্রে আইশা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যদি নূহ (আ) সম্প্রদায়ের কাহারও প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেন তবে অবশ্যই সেই শিশুটির মায়ের প্রতি দয়া করিতেন। তাহার ঘটনা এই ছিল যে, প্লাবনের পানি যখন রাস্তাঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া গেল তখন এক শিশুর মাতা ভয় পাইয়া গেল। সে শিশুটিকে ভীষণ ভালবাসিত। অতঃপর সে শিশুটিকে লইয়া পাহাড়ে আশ্রয় নিতে গেল এবং পাহাড়ের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আরোহণ করিল। সে পর্যন্ত পানি পৌঁছিলে সে শিশুটিকে লইয়া পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিল। পানি যখন তাহার পা পর্যন্ত পৌঁছিল তখন সে শিশুটিকে দুই হাত উঁচু করিয়া ধরিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না, মা ও শিশু উভয়েই নিমজ্জিত হইল (ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯১; ঐ লেখক, তাফসীর, ১২খ., ২১-২২; ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৮-৭৯; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৩-১১৪; আছ-ছালাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬০)।

কোন কোন ইতিহাসবেত্তা ও মুফাসসির এই বিষয়ে এক অলীক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, উজ ইব্ন ইনাক নামক এক অসম্ভব দীর্ঘাকৃতির লোক উক্ত প্লাবন হইতে নৌকায় আরোহণ না করিয়াও রক্ষা পাইয়াছিল। তাহাদের বর্ণনামতে, উজ ইব্ন 'ইনাক' নূহ (আ)-এর পূর্বকাল হইতে মূসা (আ)-এর সময়কাল পর্যন্ত জীবিত ছিল। সে ছিল কাফির, অহঙ্কারী ও উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। সে ৩,৩৩৩ হাত লম্বা ছিল। এত দীর্ঘ হওয়ার কারণে সে সমুদ্রের তলদেশ হইতে মাছ ধরিয়া তাহা সরাসরি সূর্যের কাছে ধরিয়া উহার তাপে ভুনা করিয়া খাইত। সে নূহ (আ)-কে নৌকায় তুলিবার অনুরোধ করে, কিন্তু সে কাফির থাকায় নূহ (আ) তাহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর প্লাবন শুরু হইলে প্লাবনের পানি তাহার হাঁটুর উপর উঠিতে পারে নাই। ফলে সে নিমজ্জিত হওয়া হইতে

রক্ষা পায় (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬০-৬১; ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৯; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৪; আল-আলূসী, রূহুল-মাআনী, ১২খ., ৬২; আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ., ৯০)। এক বর্ণনামতে তাহার রক্ষা পাওয়ার কারণ ছিল, নূহ (আ) নৌকা তৈরীর জন্য সেগুন কাঠের প্রয়োজন অনুভব করেন। কিন্তু তিনি কোথাও উহা পাইতেছিলেন না। উজ তাহাকে শাম হইতে উহা বহন করিয়া আনিয়া দেয়। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা তাহাকে নিমজ্জিত হওয়া হইতে রক্ষা করেন (আত-তাফসীরুল মাজহারী, প্রাগুক্ত)। কিন্তু এই ঘটনা একদিকে যেমন যুক্তিগ্রাহ্য নহে, অপরদিকে তেমনি সুস্পষ্ট কুরআন-হাদীছের পরিপন্থী। যুক্তিগ্রাহ্য এইজন্য নহে যে, স্বয়ং নূহ (আ)-এর ঔরসজাত পুত্র কিনআন তাহার কুফরীর কারণে রক্ষা পায় নাই, নূহ (আ)-এর সুপারিশ সত্ত্বেও। অথচ তাহার পিতা একজন সম্মানিত নবী ও আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা, আর উজ তো এক অহংকারী কাফির। অপরদিকে একজন অসহায় নারী ও নিষ্পাপ শিশুর প্রতি আল্লাহ তা'আলা দয়া প্রদর্শন করেন নাই, আর এহেন একজন কাফির, মুশরিককে আল্লাহ্ দয়া প্রদর্শন করিয়া রক্ষা করিবেন, ইহা কোনও সুস্থ বিবেক গ্রহণ করিতে পারে না। আর কাষ্ঠ বহন করিয়া আনার বিষয়টিও স্বীকৃত নহে। কারণ অধিকাংশ বর্ণনামতে নূহ (আ) নিজেই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন এবং উক্ত বৃক্ষের কাঠ দ্বারাই নৌকা তৈরী করা হয়। আর উহা কুরআন হাদীছের-পরিপন্থী এইজন্য যে, নূহ (আ)-এর প্রার্থনা ছিল ঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا ·

পৃথিবীতে বসবাসকারী কোন কাফির যেন নিস্তার না পায় (৭১ ঃ ২৬)। আর এই দু'আই কবূল হইয়াছিল আল্লাহ্র দরবারে। তাই উজ ইব্ন ইনাক কাফির হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে নিস্তার পাইতে পারে? অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন যে, মুমিন বান্দা ছাড়া অন্য সকলকে আমি নিমজ্জিত করিয়াছিলাম (৩৭ ঃ ৮১-৮২)। সুতরাং উজ ইব্ন ইনাক-এর প্লাবন হইতে রক্ষা পাইয়া মূসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকার বিষয়টি কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নহে।

অপরদিকে তাহার যে অসম্ভব রকমের দীর্ঘাকৃতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা সহীহ হাদীছের পরিপন্থী। কারণ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

ان الله خلق ادم وطوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الان ·

"আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে ষাট হাত লম্বা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতঃপর বর্তমান পর্যন্ত মানুষের দৈর্ঘ্য কেবল হ্রাস পাইতেছে" (আস-সাহীহ, ১খ., ৪৬৮)।

ইহাতে মিথ্যার লেশমাত্র নাই। সুতরাং ইহার ব্যত্যয় হইবার নহে (ইব্ন কাছীর; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৯-৮০; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৪; পানিপতী, আত-তাফসীরুল মাজহারী, ৫খ., ৯০-৯১)। তাই বলা যায় যে, এই ঘটনা ইয়াহূদ-নাসারাদের মনগড়া কল্প-কাহিনী বৈ আর কিছুই নহে।

প্লাবনের সমাপ্তি এবং নূহ (আ)-এর ভূমিতে অবতরণ

অবশেষে আল্লাহ্র নির্দেশে প্লাবন থামিয়া গেল, ভূপৃষ্ঠ হইতে পানি সরিয়া গেল ও পৃথিবী চলা-ফেরার যোগ্য হইয়া গেল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে আল্লাহ যখন প্লাবন বন্ধ করিতে চাহিলেন তখন পৃথিবীতে বাতাস প্রেরণ করিলেন। ফলে পানি স্থির হইয়া গেল এবং ঝর্ণাগুলির পানির প্রবাহ বন্ধ হইয়া গেল। অতঃপর ধীরে ধীরে পানিও শুকাইয়া গেল (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৭; ঐ লেখক, কাসাসুল-আম্বিয়া পৃ. ৮৪)। বাইবেলেও ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. Genesis : 8 : 1-3)। বাইবেলের বর্ণনামতে পানি ক্রমশ সরিয়া গিয়া এক শত পঞ্চাশ দিবসের শেষে হ্রাস পাইল। তাহাতে সপ্তম মাসের সপ্তদশ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর নৌকা আশরাত (জূদী) পর্বতে আসিয়া স্থির হয়। আর দশম মাসের প্রথম দিন হইতে পাহাড়ের চূড়া দেখা যায়। অতঃপর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইবার পর নূহ (আ) তাঁহার নৌকার বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি পানির অবস্থা জানিবার জন্য একটি দাঁড়কাক ছাড়িয়া দিলেন। সে আর ফিরিয়া আসিল না, বরং সে ইতস্তত গতায়াত করিল। অতঃপর তিনি কবুতর প্রেরণ করিলেন। সে ফিরিয়া আসিল, তাহার পা রাখার মত জায়গা পাইল না। অতঃপর তিনি হাত বাড়াইয়া উহাকে নৌকার মধ্যে প্রবেশ করাইলেন, ইহার পর সাত দিন অতিক্রান্ত হইল। অতঃপর তিনি পানির অবস্থা জানিবার জন্য আবার সেই কবুতর ছাড়িয়া দিলেন। উহা সন্ধ্যা বেলায় চঞ্চুতে করিয়া একটি যয়তুনের নবীন পাতা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তখন নূহ (আ) বুঝিলেন যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে পানি কমিয়া গিয়াছে। ইহার পর আর সাত দিন অপেক্ষা করিয়া আবার সেই কবুতর প্রেরণ করিলেন। অতঃপর সে আর ফিরিয়া আসিল না। তখন নূহ বুঝিলেন যে, মাটি জাগিয়া গিয়াছে। অতঃপর প্লাবন শুরুর দিন হইতে নূহের কবুতর প্রেরণ পর্যন্ত যখন এক বৎসর পূর্ণ হইল এবং দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম মাসের প্রথম দিন আসিল তখন ভূপৃষ্ঠ দেখা গেল এবং মাটি পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিল। নূহ (আ)-ও নৌকার ছাদ খুলিয়া দিলেন (Genesis 8 : 3-14)।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণও সামান্য পরিবর্তনসহ অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনা হইল ঃ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, নূহ (আ)-এর সহিত নৌকায় ৮০ জন পুরুষ ছিল। তাহাদের সহিত তাহাদের স্ত্রীগণও ছিল। তাহারা ১৫০ দিন নৌকায় ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এক পর্যায়ে নৌকা মক্কার দিকে ফিরাইয়া দেন। অতঃপর ৪০ দিন যাবত উহা বায়তুল্লাহকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উহাকে জূদী পর্বতের দিকে ফিরাইয়া দেন। সেখানে আসিয়া নৌকা স্থির হইয়া যায়। অতঃপর নূহ (আ) ভূপৃষ্ঠের খবর আনিবার জন্য কাক প্রেরণ করেন। সে গিয়া মরা লাশের উপর পতিত হয়, তাই আসিতে বিলম্ব করে। তখন তিনি কবুতর প্রেরণ করেন। সে তাঁহার নিকট যয়তুন বৃক্ষের পাতা লইয়া আসে এবং তাহার পায়ে কাদা মাটি লাগিয়াছিল। তখন নূহ (আ) বুঝিতে পারেন যে, পানি নামিয়া গিয়াছে। তখন আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে তাঁহার সঙ্গীগণসহ অবতরণের নির্দেশ দিয়া বলিলেন ঃ

يَانُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"হে নূহ! অবতরণ কর আমার পক্ষ হইতে শান্তি ও কল্যাণসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাহাদের প্রতি; অপর সম্প্রদায়সমূহকে আমি জীবন উপভোগ করিতে দিব, পরে আমা হইত মর্মন্তুদ শাস্তি উহাদিগকে স্পর্শ করিবে।"

ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে প্লাবনের ২য় বৎসরের ২য় মাসের ২৬তম রজনীতে এই নির্দেশ দেওয়া হয় (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৮৪)। অতঃপর নূহ (আ) ১০ মুহাররাম তারিখে পুনরায় নূতন করিয়া আল্লাহ্র পৃথিবীতে জূদী পর্বতের পাদদেশে নামিয়া আসিলেন। বিশ্বের বুকে এইবার হইলেন তিনিই প্রথম মানব। এই হিসাবে তাঁহার উপাধি "আবুল বাশার ছানী" বা "আদম ছানী" (মানুষের দ্বিতীয় আদিপিতা)-রূপে প্রসিদ্ধ হয় এবং সম্ভবত এইজন্যই হাদীছে তাঁহাকে প্রথম রাসূল (দ্র. আল-বুখারী, ১খ., ৪৭০; মুসলিম, ১খ., ১০৮) বলা হইয়াছে (হিফজুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৭৬)।

কাতাদা প্রমুখের বর্ণনামতে তাহারা রজব মাসের দশম দিনে নৌকায় আরোহণ করেন। অতঃপর ১৫০ দিন তাহারা নৌকায় অতিবাহিত করেন। জূদী পর্বতে তাহাদিগকে লইয়া নৌকা স্থির ছিল এক মাস। আর তাহারা নৌকা হইতে অবতরণ করেন মুহাররামের দশ তারিখ। এইজন্য উক্ত দিবসের নামকরণ করা হয় 'আশূরা'। পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াই তিনি তাঁহার সঙ্গী সকল মানুষ এমনকি জীব-জন্তুকেও ঐদিন আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়স্বরূপ সাওম পালন করিবার নির্দেশ দেন (আছ-ছালাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৬১-৬২; ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৮৩; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৬; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯৬)। [উল্লেখ্য যে, নূহ (আ) ও তাঁহার সঙ্গীগণ নৌকায় আরোহণ করিয়াও সাওম পালন করিয়াছিলেন (তাবারী, প্রাগুক্ত)]। এইখান হইতেই আশূরার সাওম চালু হয়। ইমাম ইব্ন জারীর তাবারী ইহার সমর্থনে একটি মারফূ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াহূদীদের কিছু লোকের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তাহারা সেই দিন সাওম পালন করিতেছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কোন্ সাওম"? তাহারা বলিল, ইহা সেইদিন যেদিন আল্লাহ মূসা (আ) ও বানূ ইসরাঈলকে নিমজ্জিত হওয়া হইতে রক্ষা করেন এবং ফিরআওন নিমজ্জিত হয়, এই দিনে নৌকা জূদী পর্বতে স্থির হয়। অতঃপর নূহ ও মূসা (আ) এইদিনে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করিবার জন্য সাওম পালন করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি মূসার প্রতি বেশী হকদার এবং এই দিনের সাওম পালন করার বেশী হকদার। অতঃপর তাঁহার সাহাবীদিগকে ঐদিনে সাওম পালন করিবার নির্দেশ দেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৭; ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৩)।

অতঃপর নূহ (আ) সেখানে অবতরণ করিয়া জাযীরার 'কারদায়' অঞ্চলের পার্শ্বে একটি জায়গা মনোনীত করিলেন এবং সেখানে একটি জনপদের পত্তন করিলেন, যাহার নাম রাখিলেন 'ছামানীন' (অর্থাৎ ৮০)। কারণ সেখানে তিনি যাহারা তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের জন্য একখানি করিয়া গৃহ নির্মাণ করিলেন। আর তাহারা সংখ্যায় ছিল ৮০ জন। উক্ত জনপদ বর্তমানে 'সূক ছামানীন' নামে খ্যাত (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯৬; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ., ৫৮; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬২)। ভূমিতে অবতরণ করিবার পর নূহ (আ) হযরত আদম (আ)-এর লাশ বায়তুল মাকদিসে দাফন করেন (ইব্ন সাদ, তাবাকাত, ১খ., ৪২)। অতঃপর তিনি তাহাদের মধ্যে আবার দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন। নূহ (আ) ইহার পর ৩৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন (আছ-ছা'লাবী, প্রাগুক্ত)। বাইবেলেও বলা হইয়াছে যে, 'জল প্লাবনের পর নোহ তিন শত পঞ্চাশ বৎসর জীবৎ থাকিলেন (Genesis, 9 : 28; বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, পৃ. ১২)। কালক্রমে এক দিন তাহাদের ভাষা ৮০টি ভাষায় রূপান্তরিত হইল, যাহার একটি হইল আরবী। তাহারা একে অন্যের কথা বুঝিত না। নূহ (আ) তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৬; ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৩)। এই প্লাবন-এর সময়কাল ৩২৩২ খৃ. পূ. বলিয়া অনুমান করা হয় (আবদুল মাজিদ দারয়াবাদী, মাসাইল ওয়া কিসাস, পৃ. ১০৭)।

প্লাবন বিশ্বের সর্বত্র না বিশেষ স্থানে হইয়াছিল

হযরত নূহ (আ)-এর সময়কার প্লাবন সমগ্র বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল, না শুধু তাঁহার কওম যে অঞ্চলে বাস করিত সেই অঞ্চলে, এই ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায় ঃ (১) ইসলামী চিন্তাবিদগণের একটি দল, ইয়াহূদ ও খৃস্টানদের ধর্মযাজকগণ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী, ভূতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের একটি অংশ এই মত পোষণ করিয়াছেন যে, এই প্লাবন সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছিল না; বরং নূহ (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় যে অঞ্চলে বসবাস করিত সেখানেই সীমাবদ্ধ ছিল। উক্ত অঞ্চলের আয়তন ছিল ১,৪০,০০০ (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) বর্গ-কিলোমিটার। তাহাদের মতে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে হওয়ার কারণ হইল, তখনকার সময়ে জনবসতি ছিল একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। আর তাহা ছিল শুধুমাত্র নূহ (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায় যে অঞ্চলে বাস করিত সেই অঞ্চলেই। কারণ তখনও হযরত আদম (আ)-এর বংশধর উক্ত অঞ্চল ব্যতীত অন্য কোথাও বিস্তার লাভ করে নাই। তাই তাহারাই শাস্তির উপযুক্ত ছিল এবং তাহাদের উপরই প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে যেহেতু কোনও বাসিন্দা ছিল না, তাই সেই সকল এলাকার সহিত প্লাবনের কোন সম্পর্ক নাই।

(২) আর কিছু সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও নৃতত্ত্ববিদের মতে এই প্লাবন ছিল বিশ্বব্যাপী। আর শুধু এই একটি প্লাবনই নহে, বরং তাহাদের মতে বিশ্বে আরও কয়েকটি বড় ধরনের প্লাবন হইয়াছে। তন্মধ্যে নূহ (আ)-এর প্লাবন অন্যতম। কারণ 'জাযীরা' ও ইরাকের ভূখণ্ড ছাড়াও বিশ্বের অন্যান্য উঁচু পর্বতের চূড়ায় এমন সব প্রাণীর কঙ্কাল ও হাড় পাওয়া গিয়াছে যাহার সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ ও ভূবিজ্ঞানীদের অভিমত হইল, ইহারা জলজ প্রাণী। পানিতেই কেবল

বসবাস করিতে পারে। পানি ছাড়া এক মুহূর্তও বাঁচিয়া থাকা তাহাদের জন্য দুষ্কর। তাই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের উঁচু পর্বত শিখরে উক্ত নিদর্শন পাওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, কোনও কালে এমন এক সর্বগ্রাসী প্লাবন হইয়াছিল যাহার আওতা হইতে পর্বত শৃঙ্গও রেহাই পায় নাই (আবদুল-ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৩৬; হিফজুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল-কুরআন, ১খ., ৭৬-৭৭)। আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার স্বীয় গ্রন্থে প্রথম অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

অগ্নি উপাসকগণ এই প্লাবন স্বীকার করে না। তাহারা বলে, 'জিউমিরত' (جيومرت) অর্থাৎ আদম-এর সময়কাল হইতে আমাদের রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে। পুরুষানুক্রমে একের পর এক উহা লাভ করিয়া আসিতেছে ফীরূয ইব্ন য়াযদাজিরদ ইব্ন শাহরিয়ার পর্যন্ত। প্লাবন সংঘটিত হইলে কওমের বংশ-লতিকা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। আর কওমের রাজত্বও বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাহাদের কিছু সংখ্যক লোক প্লাবন স্বীকার করে এবং বলে, উহা শুধু বাবিল ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সংঘটিত হইয়াছিল। আর জিউমিরত-এর বংশধরদের নিবাস ছিল পূর্বাঞ্চলে। তাই তাহাদের পর্যন্ত উহা পৌঁছে নাই। আবূ জা'ফর তাবারী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা প্লাবনের যেই বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এই ধারণা উহার পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ . وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبٰقِيْنَ .

"তাহাকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করিয়াছিলাম মহা সংকট হইতে। তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশ-পরম্পরায়"।

এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নূহ (আ)-এর বংশধরই কেবল অবশিষ্ট রহিয়াছে; অন্য কেহ নহে। সবাই নিমজ্জিত হইয়া মারা গিয়াছে (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯৭)।

ইবাদাত ও আখলাক

হযরত নূহ (আ) ছিলেন অতিশয় ইবাদতগুযার বান্দা। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে "পরম কৃতজ্ঞ বান্দা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا .

"সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা" (১৭ ঃ ৩)।

তিনি পানাহার, উঠা-বসা, পোশাক-পরিচ্ছদ তথা তাঁহার সকল কাজ-কর্মে আল্লাহ্র হামদ ও শোকর আদায় করিতেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৮; ঐ লেখক, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৮৬)। ইমাম আহমাদ (র) আবূ উসামা সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, আল্লাহ সেই বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন যে আহার করিয়া উহার জন্য তাঁহার প্রশংসা করে; পানি পান করিয়া উহার জন্য তাঁহার প্রশংসা করে (মুসলিম, আস-সাহীহ, ২খ., ৩৫২)। আর শোকরগুযার ও প্রশংসাকারী সেই হইতে পারে যে অন্তর দ্বারা, কথা-বার্তা এবং কাজকর্মে আল্লাহ্র আনুগত্য করিয়া থাকে (প্রাগুক্ত)।

হযরত নূহ (আ) সালাত কিভাবে আদায় করিতেন তাহা জানা যায় না। তবে তাঁহার সাওম পালন করা সম্পর্কিত হাদীছের দ্বারা পরোক্ষভাবে অনুমান করা যায় যে, তিনি দুই ঈদের সালাত আদায় করিতেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সাওম ও হজ্জ পালন করিতেন, হাদীছের দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। সাহল ইব্ন আবী সাহল সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, নূহ (আ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দিবস ছাড়া সারা বৎসরই সাওম পালন করিতেন (ইব্ন মাজা, ১খ., ১২৪)। তাবারানী রাওহ ইব্ন ফারাজ সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ., ১১৮)। ইহাতে অনুমিত হয় যে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার বিধান তাহার সময়েই ছিল এবং তাঁহার হজ্জ পালন সম্পর্কেও হাদীছে সুস্পষ্ট বিবরণ রহিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন হজ্জ করিতেছিলেন তখন উসফান উপত্যকায় আসিয়া আবূ বাকর (রা)-কে বলিলেন, আবূ বাকর! ইহা কোন উপত্যকা? আবূ বাকর (রা) বলিলেন, ইহা উসফান উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, নূহ, হূদ ও ইবরাহীম মধ্য বয়স্ক শক্তিশালী উষ্ট্রের উপর আরোহণ করিয়া এই উপত্যকা অতিক্রম করিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে ছিল কিছু গাধা, যেগুলোর নাকের রশি (নাকীল) ছিল খেজুর বৃক্ষের আঁশ দ্বারা তৈরী। আর তাহাদের পরনে ছিল আবা (জুব্বা) এবং তাহাদের চাঁদর ছিল পশমের সাদা-কালো ডোরাকাটা। তাহারা বায়তুল আতীক-এ হজ্জ করেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ., ১১৯; ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৮)। হাফিজ ইব্ন কাছীর এই হাদীছ উল্লেখ করিয়া ইহাকে গরীব বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (প্রাগুক্ত)। ইবনুল জাওযী উরওয়া ইবনুয যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নূহ (আ)-এর এই হজ্জ ছিল প্লাবনের পূর্বে (দ্র. হাফিজ ইব্ন কাছীর কৃত কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থের টীকা)।

হযরত নূহ (আ)-এর ধর্মের ইবাদত-বন্দেগী এবং বিধি-নিষেধসমূহ প্রায় সবই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত শরীআতের অনুরূপ ছিল। কুরআন করীমের ৪২ ঃ ১৩ নং আয়াতের দ্বারাও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার সাওম, হজ্জ ও দুই ঈদের সালাতের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (স) আনীত শরীআতেও রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার শরীআতের সাতটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও বিধি-নিষেধের কথা জানা যায়, যাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরীআতেও রহিয়াছে। সেইগুলো হইল ঃ (১) হুকুম দেওয়ার অধিকারী কর্তৃপক্ষকে মান্য করা; (২) আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত মহামানব তথা নবী-রাসূলদের নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা; (৩) শিরক তথা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করা; (৪) ব্যভিচার না করা; (৫) মানুষ হত্যা না করা; (৬) দস্যুবৃত্তি না করা এবং (৭) জীবন্ত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ না করা। এই ধরনের বিধি-নিষেধের সংখ্যা আরও ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতেও কেহ কেহ এই সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিত, লোকসমাজে তাহারা ধার্মিক হিসাবে পরিগণিত হইত (Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. 9, P. 379-380)।

নূহ (আ) অন্তিমকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সামকে যে ওসিয়াত করিয়াছিলেন তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দীনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় [উহার বিস্তারিত বিবরণ দ্র. "ইনতিকালের পূর্বে নূহ (আ)-এর

ওসিয়াত" শিরো.]। স্বীয় পুত্রকে তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর যিকির করিতে নির্দেশ দেন। মূলত ইহাকেই রাসূলুল্লাহ (স) ঈমানের কলেমা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন এবং এই কলেমা পাঠ করিয়া কেহ ইনতিকাল করিলে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس ان النبى صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يارسول الله وسعديك قال يامعاذ قال لبيك يا رسول الله وسعاديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشروا قال اذا يتكلوا فاخبر بها معاذ عند موته تأثما (ولى الدين الخطيب ، مشكوة المصابيح -١/١٢٤) .

"আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) একটি বাহনে আরোহী ছিলেন, আর মুআয (রা) তাঁহার পেছনে ছিলেন। তিনি ডাকিলেন ঃ মু'আয! তিনি উত্তর দিলেন, লাব্বায়ক ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি প্রস্তুত। রাসূলুল্লাহ (স) এইভাবে তিনবার ডাকিলেন এবং মু'আয (রা) তিনবার এরূপ উত্তর দিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তিই সত্যভাবে অন্তর হইতে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর সাক্ষ্য দিবে এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-এর সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ তাহার জন্য জাহান্নাম হারাম করিয়া দিবেন। মুআয (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি কি ইহার সংবাদ লোকজনকে জানাইয়া দিব না যাহাতে তাহারা সুসংবাদ লাভ করে? রাসূলাল্লাহ্ (স) বলিলেন, তাহা হইলে তাহারা ইহার উপর আস্থা করিয়া বসিয়া থাকিবে। অতঃপর মুআয (রা) ইহার সংবাদ তাহার মৃত্যুর সময় (হাদীছ না পৌঁছানোর) গুনাহের ভয়ে জানাইয়া যান।"

অন্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى ذر قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم ثم اتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق على رغم انف ابى ذر (مشكوة ١/١٤) .

"আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আগমন করিলাম। তাঁহার শরীরে ছিল সাদা কাপড়, তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। আবার আসিলাম তখন তিনি জাগ্রত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি لا اله الا الله বলিবে, অতঃপর ইহার উপরই ইনতিকাল করিবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আমি বলিলাম, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? তিনি বলেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। আমি বলিলাম, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে? তিনি বলিলেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে। আমি আবারও বলিলাম, যদিও সে

ব্যভিচার করে ও চুরি করে? তিনি বলিলেন, যদিও সে ব্যভিচার করে ও চুরি করে, আবূ যার-এর নাক ধূলায় ধূসরিত হওয়া সত্ত্বেও" (মিশকাতুল-মাসাবীহ, ১খ., ১৪; বুখারী ও মুসলিম-এর বরাতে)।

তিনি سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ-এর যিকির করিবার জন্য স্বীয় পুত্রকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও এই কলেমার বড়ই ফযীলত বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عن ابى هريرة (رض) قال قال النبى صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ (البخارى (٢/١١٢٩) .

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ দুইটি কলেমা রাহমান (আল্লাহ্)-এর নিকট প্রিয়, মুখে উচ্চারণ করা সহজ, আর মীযানে (দাড়িপাল্লায়) তাহা হইবে ভারী। কলেমা দুইটি হইল ঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ·

(আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., ১১২৯)।

নূহ (আ) তাঁহার ওসিয়াতে আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রেরিত মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল করীমে বহু স্থানে, বহুভাবে শিরক করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, শিরক মস্তবড় জুলুম (৩১ ঃ ১৩) ان الشرك لظلم عظيم "নিশ্চয়ই শিরক চরম জুলুম"। আল্লাহ্ তা'আলা শিরক ব্যতীত সকল গুনাহ্ ক্ষমা করিবেন, কিন্তু শিরক-এর অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ·

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার সহিত শরীক করা ক্ষমা করেন না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহ্র শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"

শিরক করিলে অন্যান্য ভাল আমলও নষ্ট হইয়া যায়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ·

"তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্মই তো নিষ্ফল হইবে এবং অবশ্যই তুমি হইবে ক্ষতিগ্রস্ত।"

শিরককারীর পরিণতি হইবে জাহান্নাম, জান্নাত তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে। ইরশাদ্ হইয়াছে (৫ ঃ ৭২) ঃ

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ ·

"কেহ্ আল্লাহ্র শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম।"

নূহ (আ) স্বীয় পুত্রকে অহঙ্কার করিতে নিষেধ করেন। আর রাসূলুল্লাহ (স) অহঙ্কারকে জান্নাত পাওয়ার অন্তরায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি ইরাশদ করিয়াছেন ঃ

عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من ايمان قال فقال رجل انه يعجبنى ان يكون ثوبى حسنا ونعلى حسنا قال ان الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطرالحق وغمص الناس (الترمذى : الجامع الصحيح (٢ صفحة ٢١).

"আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার রহিয়াছে। আর জাহান্নামে প্রবেশ করিবে না সে ব্যক্তি যাহার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান রহিয়াছে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলিল, আমার তো ইহা ভালো লাগে যে, আমার পোশাক সুন্দর হউক, আমার জুতা সুন্দর হউক (ইহা কি অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত)! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, (না, ইহা তো ভাল কারণ) আল্লাহ্ সৌন্দর্য পছন্দ করেন; বরং অহঙ্কারী সেই ব্যক্তি যে সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করে।"

হযরত নূহ (আ) ছিলেন ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। তাই আপন কওমকে দিবারাত্র সারাক্ষণই দাওয়াত দিয়াছেন। তাঁহার কওম কাপড় মুড়ি দিয়া, কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া তাঁহার সে দাওয়াতের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াছে। এতদসত্ত্বেও তিনি ধৈর্যহারা হন নাই। সাড়ে নয় শত বৎসর তিনি এইভাবে সর্বদাই রোদন করিতেন, কখনও বা কওমের করুণ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়া, কখনও নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া। তিনি ছিলেন অতিশয় দয়ালু ও স্নেহবৎসল। তাই স্বীয় পুত্র কিন'আন কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাহার নিশ্চিত মৃত্যু দেখিয়া তাঁহার স্নেহবাৎসল্য উথলিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে নৌকায় আরোহণ করিয়া প্রাণ রক্ষার আহ্বান জানাইয়াছেন। কওম তাঁহাকে প্রহারে প্রহারে রক্তাক্ত করিয়া ফেলিয়াছে, বেহুঁশ হইয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন, কিন্তু হুঁশ ফিরিতেই শরীরের ধূলি ঝাড়িয়া আবার তাহাদের নিকট গমন করিয়াছেন এবং দাওয়াত দিয়াছেন। কারণ তাহাদের মর্মন্তুদ শাস্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে, তিনি স্থির থাকিতে পারেন নাই।

নূহ (আ)-এর বৈশিষ্ট্যাবলী

নবী হিসাবে নূহ (আ) বহু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যাহা অন্য কোনও নবীর মধ্যে ছিল না। তাঁহার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ (১) তিনিই প্রথম শরীআতের অধিকারী নবী ছিলেন; (২) তিনিই আল্লাহ্র দিকে প্রথম আহ্বানকারী; (৩) শিরক হইতে প্রথম সতর্ককারী; (৪) প্রথম দাঈ, যাঁহার উম্মাতকে তাঁহার আনীত হিদায়াত প্রত্যাখ্যানের কারণে শাস্তি দেওয়া হয়; (৫) তাঁহার দু'আর ফলে বিশ্বের সকলকে ধ্বংস করা হয়; (৬) তিনি নবী-রাসূলদের মধ্যে সর্বাধিক দীর্ঘ জীবন লাভ

করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাকে شيخ المرسلين ও اكبر الأنبياء বলা হয়; (৭) তাঁহার নিজের মধ্যেই ছিল তাঁহার মুজিযা। কারণ তিনি হাজার বৎসরাধিক বয়স পাইয়াছিলেন, কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুজ হইয়া পড়েন নাই। আর তাঁহার শারীরিক শক্তি কিছুমাত্র কম হয় নাই; (৮) দাওয়াতের কাজে তিনি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাইয়াছিলেন এবং তিনি দিবা-রাত্রে, প্রকাশ্যে ও গোপনে দাওয়াত দিয়াছেন; (৯) তিনি তাঁহার উম্মতের পক্ষ হইতে দীর্ঘদিন যাবত প্রহার, গালিগালাজ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, ঠাট্টা ও উপহাস প্রভৃতি কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন। এইজন্য আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ·

"আমি ধ্বংস করিয়াছিলাম ইহাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে; উহারা তো ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়" (৫১ ঃ ৪৬);

(১০) আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে অঙ্গীকার ও ওহীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুসতফা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ (٧ : ٣٣) ·

"স্মরণ কর যখন আমি নবীদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারয়াম-তনয় ঈসার নিকট হইতেও" (৩৩ ঃ ৭)। অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ ·

"আমি তো তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি, যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম" (৪ ঃ ১৬৩)।

(১১) যেদিন কিয়ামত কায়েম হইবে সেইদিন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পরে তিনি কবর হইতে উঠিবেন; (১২) তাঁহাকে আল্লাহ "কৃতজ্ঞ বান্দা"-রূপে আখ্যায়িত করেন। যথা ইরশাদ হইয়াছে ঃ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا · "সেতো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা" (১৭ ঃ ৩); (১৩) তাঁহাকে নৌকা প্রদান করা হইয়াছিল এবং উহার নির্মাণ জ্ঞানও শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল; তাঁহাকে উহাতে করিয়া হেফাজত করা হয় এবং পানির উপর দিয়া উহা চালনা করা হয়; (১৪) তাঁহাকে শান্তি ও কল্যাণ দ্বারা সম্মানিত করা হয়। যথা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ (٤٨ : ١١) ·

"হে নূহ! অবতরণ কর আমার পক্ষ হইতে শান্তি ও কল্যাণসহ তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাহাদের প্রতি" (১১ ঃ ৪৮)। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাজী বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিন-মুমিনা এই শান্তি ও কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত; (১৫) তাঁহার বংশধরদিগকেই আল্লাহ তা'আলা বংশ-পরম্পরায় পৃথিবীতে বিদ্যমান রাখিয়াছেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ .

"তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশ-পরম্পরায়" (৩৭ ঃ ৭৭)। এইজন্য তাহাকে আদম ছানী বলা হয় এবং বর্তমান মানবগোষ্ঠীর মূল ও আদি। কারণ তাঁহার তিন পুত্র, সাম, হাম ও য়াফিছ হইতেই বর্তমান মানবগোষ্ঠী বিস্তার লাভ করিয়াছে (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৬৩)।

দৈহিক অবয়ব

হযরত নূহ (আ) ছিলেন গৌর বর্ণের, পাতলা চেহারা, লম্বা মস্তক, বড় চোখ, শক্ত ও মোটা বাহু, হাল্কা পায়ের গোছা, ভারী ও অধিক গোশতধারী উরু, মোটা নাভি, লম্বা দাড়ি ও লম্বা চওড়া ভারী শরীরবিশিষ্ট (ইব্ন কুতায়বা, আল-মাআরিফ, পৃ. ১৩; আল-আলূসী, রূহুল মাআনী, ২৯খ., ৬৮)।

ইনতিকালের পূর্বে নূহ (আ)-এর ওসিয়াত

ইমাম আহমাদ (র) সুলায়মান ইব্ন হারব সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী নূহ (আ)-এর মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে তিনি স্বীয় পুত্র সামকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে দুই কাজ করিবার জন্য উপদেশ দিতেছি এবং দুই কাজ করিতে নিষেধ করিতেছি। যে দুইটি করিবার জন্য উপদেশ দিতেছি উহার একটি হইল ঃ (১) لا اله الا الله -এর যিকির করিবে। কারণ সাত আসমান, সাত যমীন ও উহার মধ্যবর্তী সকল কিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর لا اله الا الله অপর পাল্লায়, তবে لا اله الا الله -এর পাল্লা ভারী হইবে; যদি সাত আসমান ও সাত যমীন একত্র করা হয় তবুও لا اله الا الله উহা ভেদ করিয়া আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিয়া যাইবে। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে যে, সাত আসমান ও সাত যমীন যদি আলাদা আলাদা গোলাকার বৃত্ত হয়, তবে لا اله الا الله উহাদিগকে মিলাইয়া দিবে; আর অপরটি হইল (২) سبحان الله وبحمده -এর যিকির করিবে। কারণ ইহা সকল সৃষ্টির দো'আ (صلوة) এবং ইহার দ্বারাই তাহাদিগকে রিযিক প্রদান করা হয়। আর যে দুইটি বিষয়ে নিষেধ করিতেছি উহা হইল ঃ (১) শিরক ও (২) কিবর অর্থাৎ আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করা এবং অহঙ্কার করা। যাহার অন্তরে বিন্দুমাত্র শিরক বা কিবর আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করিবে না (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৯; ঐ লেখক, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৮৯; আছ-ছা৭লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬২)।

নূহ (আ)-এর বয়স

হযরত নূহ (আ) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবি রাসূল ও সর্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী মানব ছিলেন। এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে তিনি সর্বমোট কত বৎসর জীবিত ছিলেন এই ব্যাপারে বেশ কিছু মতামত পাওয়া যায় ঃ আহলে কিতাব ও কিছু সংখ্যক আলিমের মতে নৌকায় আরোহণের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৬০০ বৎসর, প্লাবনের পর তিনি আরও ৩৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাই

তাঁহার মোট বয়স হইয়াছিল ৯৫০ বৎসর (Bible, Genesis, 7 : 6; 9 : 28-29; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯৬)।

ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও এই ধরনের একটি মত বর্ণিত আছে (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৯০; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ১২)। কিন্তু ইহা সঠিক নহে। আওন ইব্ন আবী শাদ্দাদের এক বর্ণনামতে নূহ (আ) প্লাবনের পর ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন এবং প্লাবনের পূর্বে তাঁহার বয়স ছিল ৩৫০ বৎসর। তদনুসারে নূহ (আ)-এর মোট বয়স ১৩০০ বৎসর (আছ-ছা'লাবী, প্রাগুক্ত)। এই মতটিও সঠিক নহে। উপরিউক্ত মতদ্বয় সঠিক না হওয়ার কারণ হইল ইহা কুরআন করীমের সুস্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। কুরআন করীমের বর্ণনায় ইহা জানা যায় যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হইতে প্লাবন পর্যন্ত ৯৫০ বৎসর তিনি কওমের মধ্যে অবস্থান করত দাওয়াতী কাজ করেন। ইহার পর প্লাবন শুরু হয়। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلاَّ خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ‌.

"আমি তো নূহকে তাহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে উহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিল পঞ্চাশ কম হাজার বৎসর। অতঃপর প্লাবন উহাদিগকে গ্রাস করে; কারণ উহারা ছিল সীমালংঘনকারী" (২৯ ঃ ১৪)। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অপর এক রিওয়ায়াতমতে নূহ (আ) ৪০ বৎসরে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন; ৯৫০ বৎসর তিনি দাওয়াতী কাজ করেন এবং প্লাবনের পর আর ৬০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ফলে তাঁহার মোট বয়স ৪০+৯৫০+৬০=১০৫০ বৎসর (আল-আলূসী; রূহুল-মাআনী, ১২খ., ৩৫)। মুকাতিল বলেন, নূহ (আ) ২৫০ বৎসরে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন (মতান্তরে ১০০ ও ৫০ বৎসরে); ৯৫০ বৎসর তিনি দাওয়াতী কাজ করেন এবং প্লাবনের পর জীবিত ছিলেন ২৫০ বৎসর। সুতরাং তাঁহার মোট বয়স ছিল ১৪৫০ বৎসর (প্রাগুক্ত, ১২খ., ৩৫-৩৬; ৮খ., ১৪৯)। তবে দুই-একটি রিওয়ায়াত ব্যতীত অধিকাংশ বর্ণনামতে প্লাবনের পর তিনি ৩৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইতোপূর্বে নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় তাঁহার বয়স সম্পর্কিত তিনটি মত উল্লেখ করা হইয়াছে। কুরআন করীমের উপরিউক্ত আয়াত-এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং প্লাবনের পর তিনি ৩৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন, ইহা মানিয়া লইলে (যেমন অধিকাংশ মত) বর্ণিত তিনটি মতানুযায়ী তাঁহার বয়স দাঁড়ায় নিম্নরূপ ঃ (১) নবুওয়াত প্রাপ্তি ৫০ বৎসর+ দাওয়াতী কাজ ৯৫০+প্লাবনের পর ৩৫০ বৎসর মোট বয়স = ১৩৫০ বৎসর; (২) নবুওয়াত প্রাপ্তি ৩৫০ বৎসর + দাওয়াতী কাজ ৯৫০+ প্লাবনের পর ৩৫০ বৎসর = মোট ১৬৫০ বৎসর। এক বর্ণনামতে ইহা আওন ইব্ন আবী শাদ্দাদের মত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ., ৫৫; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯০)। (৩) নবুওয়াত প্রাপ্তি ৪৮০ বৎসর+ দাওয়াতী কাজ ৯৫০ বৎসর+প্লাবনের পর ৩৫০ বৎসর; মোট বয়স=১৭৮০ বৎসর। ইহাই ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৯০)। ইমাম আবূ জাফর তাবারী অবশ্য এই মতটির মধ্যে দাওয়াতী সময়কাল ১২০ বৎসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহার বয়স হয় সর্বপ্রথম

উল্লিখিত মতটির অনুরূপ (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯০)। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই মত সঠিক নহে।

এত দীর্ঘ বয়স পাওয়া সত্ত্বেও মৃত্যু উপস্থিত হইলে হযরত নূহ (আ)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, দুনিয়াকে আপনি কিরূপ পাইয়াছেন? তখন ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, উহা এমন একটি গৃহের ন্যায় যাহার দুইটি দরজা রহিয়াছে। উহার একটি দিয়া আমি প্রবেশ করিলাম এবং অপরটি দিয়া বাহির হইলাম। এই সামান্য সময়মাত্র (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ., ৫৮; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮২)।

নূহ (আ)-এর কবর

হযরত নূহ (আ)-এর কবর কোথায় অবস্থিত এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। এক বর্ণনামতে তাঁহার কবর কূফার মসজিদে অবস্থিত, অপর এক বর্ণনামতে জাবাল-ই আহমারে। আধুনিক কালের কোন কোন আলিমের মতে নূহ (আ)-এর কবর বর্তমানে লেবাননের একটি পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত "কারাক" শহরে, যাহা বর্তমানে "কারাক নূহ" নামে পরিচিত। এই কারণে সেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। ইব্ন জারীর ও আল-আযরাকী আবদুর রহমান ইব্ন ছাবিত প্রমুখ তাবিঈ হইতে মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, নূহ (আ)-এর কবর আল-মাসজিদুল-হারাম-এ অবস্থিত। হাফিজ ইব্ন কাছীর এই মতটিকে অধিকতর সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১২০; কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৯০)।

পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি

হযরত নূহ (আ)-এর কয়জন স্ত্রী ছিলেন সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনও বিবরণ পাওয়া না গেলেও আল-কুরআন ও ইতিহাসের বিবরণ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, প্লাবনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার দুইজন স্ত্রী ছিলেন। একজন ছিলেন তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়নকারিনী যিনি তাঁহার সহিত নৌকায় আরোহণ করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৯)। আর অপরজন ছিল কাফির; সে প্লাবনে নিমজ্জিত হইয়াছিল এবং পরিণামে তাহার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা হইয়াছে। আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এই স্ত্রীর কথাই উক্ত হইয়াছে ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ (١٠ : ٦٦).

"আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন, উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ ও লূত উহাদিগকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদিগকে বলা হইল, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সহিত জাহান্নামে প্রবেশ কর" (৬৬ ঃ ১০)।

তবে বাইবেলে এই স্ত্রীর উল্লেখ নাই। শুধুমাত্র যে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, প্লাবনের পর নূহ (আ) কাবীলের বংশের এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে যূনাতান (يوناطن) নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে (ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ১খ., ৪২)।

হাদীছ ও অন্যান্য বর্ণনায় হযরত নূহ (আ)-এর চারজন পুত্রের কথা জানা যায়। তন্মধ্যে তিন পুত্র, সাম, হাম ও য়াফিছ মুমিন ছিলেন বলিয়া নূহ (আ)-এর সহিত নৌকায় আরোহণ করিয়া রক্ষা পান। নৌকায় আরোহণের সময় সাম-এর বয়স ছিল ৭৮ বৎসর (আছ-ছা'লাবী, কাসাস, পৃ. ৬২), মতান্তরে ৯৮ বৎসর (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯৭)। পরবর্তীতে ইহাদের দ্বারাই সমগ্র বিশ্বে নূহ (আ)-এর বংশ বিস্তৃত হয়। বর্তমান কালে বিশ্বে যত লোক আছে সবাই নূহ (আ)-এর উক্ত তিন পুত্রের বংশধর। এই কথাই আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করিয়াছেন ঃ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ .

"তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশ-পরম্পরায়" (৩৭ ঃ ৭৭)।

নূহ (আ)-এর অপর পুত্র য়াম, যাহাকে আহলে কিতাবগণ কিন'আন বলিয়া থাকে এবং সাধারণত এই নামেই সে পরিচিত, কাফির হওয়ার কারণে প্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া মারা যায়। আবির নামে তাঁহার আর এক পুত্রের কথা জানা যায় যে প্লাবনের পূর্বেই মারা গিয়াছিল (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯৭; ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮২)। এক বর্ণনামতে তাঁহার উপরিউক্ত তিন পুত্র (সাম, হাম ও য়াফিছ) প্লাবনের পর জন্মগ্রহণ করেন। প্লাবনের পূর্বে শুধু কিন'আন জন্মগ্রহণ করে। সে প্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারায়। কিন্তু এই বর্ণনা সঠিক নহে; বরং সঠিক হইল, উক্ত তিন পুত্রও প্লাবনের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং মুমিন হওয়ার কারণে প্লাবনের সময় নৌকায় আরোহণ করে তাহাদের স্ত্রীগণসহ (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৫-১১৬)। যূনাতান নামে তাঁহার আরও এক পুত্রের কথা জানা যায় যাহার বিবরণ উপরে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইমাম আহমাদ (র) আবদুল ওয়াহহাব সূত্রে সামুরা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সাম হইলেন আরবের পিতা; হাম হইলেন হাবশের পিতা; আর য়াফিছ হইলেন রূম-এর পিতা (ইব্ন কাছীর, কাসাস, পৃ. ৮১; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১১৫)। ইমাম তিরমিযীও বিশর ইব্ন মুআয আল-আকাদী সূত্রে সামুরা (রা) হইতে অনুরূপ মারফূ' একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮১)। ইসমাঈল ইব্ন আয়্যাশ সূত্রে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব হইতে মুরসাল হাদীছ বর্ণিত যে, নূহ (আ)-এর তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ঃ সাম, য়াফিছ ও হাম। এই তিনজনের প্রত্যেকেরই আবার তিন পুত্র ঃ সাম-এর পুত্র হইল আরব, ফারিস ও রূম; য়াফিছ-এর পুত্র তুরক্, সাকালিবা ওইয়াজূজ-মাজূজ; আর হাম-এর পুত্র হইল কিবত, সুদান ও বারবার (ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ., ৬১; ইব্ন কাছীর, কাসাস, পৃ. ৮১; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ., ১১৫; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., ৪০-৪১)।

হাফিজ আবূ বাক্র আল-বায্যার তাঁহার মুসনাদ গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে একটি মারফূ' হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ নূহ-এর সন্তানগণ হইলেন সাম, হাম ও য়াফিছ। সামের বংশধর হইল আরব, ফারিস ও রূম। কল্যাণ ইহাদের মধ্যেই রহিয়াছে। য়াফিছের বংশধর হইল, য়াজূজ-মাজূজ, তুরক্ ও সাকালিবা; ইহাদের মধ্যে কল্যাণ নাই। আর হাম-এর বংশধর হইল কিব্‌ত, বারবার ও সুদান। ইহা রিওয়ায়াত করিয়া তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই একটিমাত্র সূত্রই কেবল মারফূ'রূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যরা ইহাকে মুরসালরূপে বর্ণনা করিয়াছেন (ইবন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৮১)।

এক বর্ণনামতে নূহ (আ) নিষেধ করিয়াছিলেন যে, নৌকায় থাকাকালে কেহ যেন নিজ স্ত্রীর সহিত সঙ্গত না হয়। কিন্তু হাম উহা অমান্য করত স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে নূহ (আ) বদদুআ করিলেন যে, তাহার এই বীর্যের সৃষ্টি যেন কালো বর্ণের হয় এবং তাহার সন্তানগণ যেন স্বীয় ভ্রাতৃদ্বয়ের সন্তানগণের গুলাম হয়। অতঃপর তাহার কালো বর্ণের এক পুত্র সন্তান হয়, যাহার নাম কিনআন ইবন হাম। তিনি ছিলেন সুদানের দাদা (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৫৯ ; ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১১৬; ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮২)।

সন্তানদের মধ্যে ভূমি বণ্টন

নৌযান হইতে অবতরণের পর নূহ (আ) পৃথিবীকে তাঁহার সন্তানদের মধ্যে তিন ভাগে ভাগ করেন ঃ সাম-এর জন্য তিনি পৃথিবীর মধ্য ভাগ বরাদ্দ করেন। উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বায়তুল মাকদিস, নীল, ফুরাত ও দিজলা, সায়হূন (সির দরিয়া) জায়হূন (আমূ দরিয়া) ও ফায়শূন। আর উহা ফায়শূন হইতে নীল নদের পূর্ব দুই প্রান্ত পর্যন্ত এবং উত্তরের বায়ু চলাচলের স্থান হইতে দক্ষিণের চলাচলের স্থান পর্যন্ত। আর হামের জন্য বরাদ্দ করা হয় নীল নদের পশ্চিম দুই তীর এবং পশ্চিম -এর বায়ু যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত ও ইহার অপর প্রান্ত হইতে সায়হূন পর্যন্ত, পশ্চাতের বায়ু চলাচলের স্থান পর্যন্ত; আর য়াফিছ-এর জন্য বরাদ্দ করা হয় কায়শূন ও ইহার পরবর্তী স্থান হইতে পূর্বের বায়ু যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৯৮; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬৩)। কুরআন কারীমে ইহার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ۔ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ ۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

"তাহার বংশধরদিগকেই আমি বিদ্যমান রাখিয়াছি বংশ-পরম্পরায়; আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহ-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম" (৩৭ ঃ ৭৭-৮১)।

(ক) নূহ (আ)-এর এলাকা

কুরআন কারীমের ইঙ্গিত ও বাইবেলের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নূহ (আ)-এর কওম বর্তমান ইরাকের বাবিল নগরীতে বসবাস করিত। বাবিল -এর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে বাইবেল হইতে এবং প্রাচীন যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে উহা হইতেও ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। উহাতে কুরআন ও বাইবেলে উল্লিখিত ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। ইহার ঘটনার স্থল মাওসিল-এর পার্শ্ববর্তী কোন স্থান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (মাওলানা মাওদূদী-তাফহীমুল কুরআন, ২খ., ৪০-৪১)। আবুল হাসান-এর বর্ণনামতে নূহ (আ)-এর এলাকা ছিল ইরাকের কূফা নগরী। বলা হয় যে, নূহ (আ)-ই সর্বপ্রথম এখানে বসবাস করেন। এক বর্ণনামতে প্লাবনের পর তিনি ও তাঁহার সাথী-সঙ্গীবর্গ খাদ্য-পানীয়ের সন্ধানে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এখানেই তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়। এখানেই তাহারা নগর পত্তন করেন। তাহাদের বসতি ছিল দিজলা ও ফুরাত সংলগ্ন এলাকায় (ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল-বুলদান, ১খ., ৩০৯)। ইবন সা'দ-এর একটি বর্ণনা হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, [নূহ (আ) প্লাবন শেষে জূদী পর্বতের পাদদেশে অবতরণ করেন এবং সেখানে "সূক ছামানীন" নামে একটি নগরীর পত্তন করেন], অতঃপর 'সূক ছামানীন-এ যখন স্থান সংকুলান হইতেছিল না তখন তাহারা বাবিল গমন করত বসতি স্থাপন করেন। ইহা ফুরাত ও সুরাত (صراة)-এর মধ্যবর্তী স্থান যাহার আয়তন ১৪৪ বর্গ ফারসাখ, সেইখানে তাহার বংশ বৃদ্ধি হয়, এবং সংখ্যায় তাহারা এক লাখে পৌছায়, এবং তাহারা সকলেই মুসলিম ছিলেন (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., ৪২)।

যে সকল রিওয়ায়াত (জনশ্রুতি) কুরদিস্তান ও আর্মেনিয়ায় প্রাচীন কাল হইতে বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে উহা হইতেও জানা যায় যে, প্লাবনের পর হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা উক্ত অঞ্চলের কোনও এক স্থানে স্থির হইয়াছিল। মাওসিল-এর উত্তরে জাযীরা ইব্ন উমার-এর আশেপাশে আর্মেনিয়া সীমান্তে আরারাত পর্বতের পার্শ্ববর্তী এলাকায় এখনও নূহ (আ)-এর বিভিন্ন নিদর্শন চিহ্নিত করা হয়। নাখচিওয়ান শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে এখনও প্রসিদ্ধ আছে যে, উক্ত শহর নূহ (আ) পত্তন করেন (মাওলানা মাওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ২খ, ৪০-৪১)। সুতরাং অনুমিত হয় যে, প্লাবনের পর নূহ (আ) উক্ত অঞ্চলে অবতরণ করেন এবং খাদ্য-পানীয়ের সন্ধানে দিজলা ও ফুরাত মধ্যবর্তী কূফায় গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

(খ) জূদী পর্বতের অবস্থান

বাইবেলে উক্ত পবর্তকে "আরারাত" পর্বত বলা হইয়াছে। দিজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলই ছিল নূহ (আ)-এর দাওয়াত ও তাবলীগের কেন্দ্রস্থল এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রবাহিত হইয়া ইরাকে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। অতঃপর ইহা পারস্য উপসাগরে গিয়া পতিত হইয়াছে। আর্মেনিয়ার পর্বতশ্রেণী "আরারাত" অঞ্চলে অবস্থিত। এইজন্য বাইবেলে উহাকে আরারাত পর্বত বলা হইয়াছে। কিন্তু কুরআন কারীমে শুধুমাত্র নৌকা যে স্থানে গিয়া স্থির হইয়াছিল অর্থাৎ 'জূদী', উহার উল্লেখ করা হইয়াছে। উহা দিজলা নদীর পূর্ব দিকে মাওসিল-এর অন্তর্গত দিয়ার বাকর-এর

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত (ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ২খ., ১৭৯)। উহা আর্মেনিয়া পর্বতমালার সহিত মিলিত হইয়াছে। কামূসুল মুহীতে বলা হইয়াছে, জূদী জাযীরার একটি পর্বতের নাম যেখানে নূহ (আ)-এর নৌকা স্থির হইয়াছিল। তাওরাতে উহাকে আরারাত বলা হইয়াছে (আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৩৭)। তাওরাতের ভাষ্য-কারগণের ধারণা হইল ঃ জূদী সেই পর্বতশ্রেণীর নাম যাহা আরারাত ও জর্জিয়ার পর্বতশ্রেণীকে পরস্পরের সহিত একত্র করিয়া দিয়াছে। তাহারা আরও বলেন, আলেকজাণ্ডার-এর সময়কালে গ্রীক লেখনীও ইহার সমর্থন করে। তদুপরি খৃস্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত এখানে একটি মসজিদ ছিল যাহাকে মা'বাদু'স-সাফীনা (معبد السفينة) বলা হইত (হিফজুর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ১খ., ৮৫)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, বহু, স্থা.; (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কুতুবখানা-ই রাহীমিয়া, দিল্লী তা. বি., ১খ., ১৭৯, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৯৫, ৫১৫; (৩) মুসলিম, আস-সাহীহ, কুতুবখানা, রাহীমিয়া, দিল্লী, তা. বি., ১খ., ১০৮, ২০১; ২খ., ৩৫২; (৪) আত-তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, কুতুবখানা-ই রাশীদিয়া, দিল্লী, তা. বি., ২খ., ২১, ৬৬; (৫) ইব্ন মাজা, আস-সুনান, এম বাশীর হাসান এন্ড সন্স, কলিকাতা তা বি., ১খ., ১২৪; ২খ., ৩২৯-৩৩০; (৬) হাফিজ ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকর আল-আরাবী, মিসর তা. বি., বি., ১খ., ১০০-১২০; (৭)ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, আল-মারকাযুল-আরাবী আল-হাদীছ, কায়রো তা. বি., পৃ. ৫৯-৯০; (৮) ঐ লেখক, তাফসীরুল-কুরআনিল-আজীম, মাকতাবা দারুত-তুরাছ, কায়রো তা. বি., ২খ., ৪৪২-৪৪৯; ৪খ., ৪২৪-৪২৮; (৯) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, দারুল-কালাম, বৈরূত তা. বি., ১খ., ৮৯-৯৮; (১০) ঐ লেখক, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, দারুল মারিফা, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, ১২খ., ১৭-৩৫; ২৯খ., ৫৭-৬৪; (১১) আছ-ছা'লাবী, আরাইসুল মাজালিস বা কাসাসুল আম্বিয়া, আল-মাতবা আল-কাসতুল্লিয়্যা ঃ ১২৮২ হি., পৃ. ৫৬-৬৩; (১২) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত, ১ম সং ১৪০৭/১৯৮৭ সন, ১খ., ৫৪-৬৩; (১৩) য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল-বুলদান, দারুল-কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা, বি, ১খ., ৩০৯-৩১০ ;২খ., ১৩৪; (১৪) ইবন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যা, বৈরূত ১ম সং ১৪০৭/ ১৯৮৭ সন, পৃ. ১৩-১৭; (১৫) আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, দারুল-ফিকর, বৈরূত তা. বি. পৃ. ৩০-৪৮; (১৬) ইবন সা'দ, আত-তাবাকাতুল-কুবরা, দার সাদির, বৈরূত তা. বি. ১খ, ৪০-৪৫; (১৭) আল-আলূসী,রূহুল মাআনী, দার ইহয়া'ইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা. বি. ৮খ, ১৪৯; ১২খ., ৩৫-৭৫; ২৯খ., ৬৮-৮১ ; (১৮) আল-কুরতুবী,আল-জামি লিআহকামিল-কুরআন, দারু ইহয়াইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা. বি., ৯খ., ২২-৪৯ ; ১৮খ., ২৯৮-৩১৪; (১৯) ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরুল-কাবীর, দারু ইহয়া'ইত-তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত তা. বি., ১৭খ., ২১০-২৩৫; ১৮খ., ২-৭ ; ৩০খ., ১৩৪-১৪৭; (২০) আস-সুয়ূতী,আদ-দুররুল-

মানছূর; তেহরান তা. বি., ৩খ., ৩২৬-৩৩৭; (২১) আশ-শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, মিসর ২য় সং ১৩৮৩/১৯৬৪ সন ২খ., ৪৯২-৫০৩; ৫খ., ২৯৬-৩০২; (২২) ইমাম রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত তা. বি., পৃ. ১০২-১০৩, শিরো 'জূদ'; (২৩) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতী, আত-তাফসীরুল-মাজহারী, মাকতাবা রাশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান, তা. বি., ৫খ., ৮০-৯৩; ১০খ., ৭১-৭৮; (২৪) হিফজুর-রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, মুশতাক বুক কর্ণার, লাহোর তা. বি., ১খ., ৬৩-১০১; (২৫) দাইরা-ই মা'আরিফ-ই ইসলামিয়া, দানিশ গাহ-ই পাঞ্জাব, লাহোর ১ম সং ১৪০৯/১৯৮৯ সন, ২২খ., ৪৭৪-৪৮০, নূহ শিরো; (২৬) ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, সম্পা. সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ, শাহকার বুক ফাউন্ডেশন, করাচী, তা. বি., পৃ. ১৪১৬; (২৭) কাযী যয়নুল আবিদীন সাজ্জাদ মীরাঠী, কাসাসুল-কুরআন, মারকাযুল-মা'আরিফ, হোজাঈ, আসাম, দেওবান্দ শাখা, ১ম সং ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ৫৩-৭৪; (২৮) The Holy Bible, Cambridge University Press, Genesis, Chapter 6-11, Page 6-13; (২৯) Encyclopaedia Britannica (Index). Helen Heminway Benton; Publisher 1973-1974, vol. vii, P. 366-7; (৩০) Encyclopaedia Americana, Canada 1979, Vol. 20, P, 392; (৩১) Encyclopaedia of Religion and Ethics, New York, vol. ix, P. 379-80, Noachian Precepts; (৩২) The Encyclopaedia of Religion, New York 1986, vol. 10, P. 460-61; (৩৩) Encyclopaedia of Islam, New edition, Leiden 1995, vol. viii., 108-109, (৩৪) শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দিহলাবী, তারীখুল-আহাদীছ ফী রুমূযি কাসাসিল-আম্বিয়া, দিল্লী তা. বি., পৃ. ১৪-১৬।

আবদুল জলীল

৫

হযরত হূদ (আ)

حضرت هود عليه السلام

হযরত হূদ (আ)

ভূমিকা

মহান আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। সেই ধারাবাহিকতায় তিনি হযরত হূদ (আ)-কে তাঁহার নিজের কাওম আদ-এর প্রতি নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। পবিত্র কুরআনে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْدًا "আদ সম্প্রদায়ের নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম" (১১ ঃ ৫০)। হযরত হূদ (আ) হযরত নূহ (আ)-এর পর নবী হিসাবে আসিয়াছিলেন। হযরত আদম (আ) হইতে হযরত নূহ (আ)-এর পূর্ব পর্যন্ত প্রেরিত নবীগণের সময় শরীআতের বিস্তারিত নির্দেশাবলী নাযিল হয় নাই। ঐ পর্যায়ের নবীগণ মুখ্যত মানুষকে তাওহীদের শিক্ষা দিতেন। হযরত নূহ (আ) হইতে নবুওয়াত ও রিসালাতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। হযরত নূহ (আ)-এর সময়ে শরীআতের নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হইলেও জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হয় নাই। জিহাদের বিধান হযরত মূসা (আ)-এর সময় হইতে কার্যকর হয়। জিহাদের নির্দেশের পূর্বে কোন কাওমের নিকট প্রেরিত নবী-রাসূলের বিরোধিতাকারী ঐ কাওমের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট নবী অথবা তাঁহার অনুসারীগণের পক্ষে জিহাদের কোন অবকাশ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ঐসব নাফরমান কাওমকে দুনিয়াবী আযাব ও গযব দিয়া ধ্বংস করিয়া দিতেন। আল্লাহ হযরত হূদ (আ)-এর কাওমকেও তাহাদের নাফরমানীর কারণে আযাব প্রেরণ করিয়া ধ্বংস করিয়া দেন।

হযরত হূদ (আ)-এর জন্ম

তাওরাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এবর (হূদ) যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতা শেলহ-এর বয়স ছিল ৩০ বৎসর। হযরত হূদ (আ)-এর মোট বয়স ছিল ৪৬৪ বৎসর (বাইবেল, আদিপুস্তক ১১ ঃ ১৫; আম্বিয়ায়ে কুরআন, খ. ১, পৃ. ১২৩)।

বাইবেলের বর্ণনায় যাঁহাকে এবর বলা হইয়াছে তিনিই হযরত হূদ (আ)। উক্ত বর্ণনার আলোকে তাঁহার বয়সও নির্ধারণ করা যায়। যেমন এবর (হূদ) ৩৪ বৎসর বয়সে পেলগের জন্ম দেওয়ার পর আরও ৪৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাই তাঁহার মোট বয়স ছিল ৪৬৪ বৎসর।

হযরত হূদ (আ)-এর বংশ ও জন্ম সম্পর্কিত কিছু তথ্য ছাড়া বাইবেলের আদিপুস্তক হইতে আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এই সম্পর্কে মুহাম্মাদ জামীল আহ্মাদ বলেন, "হযরত হূদ (আ)-এর নবুওয়াতের তথ্য ও তাঁহার ওয়াজ-নসীহত, দাওয়াত ও তাবলীগ, তাঁহার কাওমের নাফরমানী ও বিদ্রোহ এবং সর্বশেষ তাহাদের ধ্বংস সম্পর্কিত ঘটনা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে। তাওরাত এই সম্পর্কে নীরব" (আম্বিয়ায়ে কুরআন, খ.১, পৃ. ১২৪)।

হযরত হূদ (আ)-এর বংশপরিচয়

হূদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন রিবাহ ইব্‌ন খালূদ ইব্‌ন 'আদ ইবন আওস ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ)। ৪র্থ পুরুষে তাঁহার পরদাদা 'আদ ইব্‌ন আওস-এর নামযুক্ত যে গোত্র ছিল, সেই গোত্রের সঙ্গে তিনি সম্পর্কিত ছিলেন। তাঁহার বংশলতিকা সাম ইব্‌ন নূহ (আ) পর্যন্ত যাইয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশের সহিত মিলিয়া যায়। হযরত হূদ (আ) ও সাম-এর মধ্যে ৬ পুরুষের ব্যবধান বিদ্যমান (গুলাম নবী, মুকাম্মাল কাসাসুল কুরআন, ১খ, পৃ. ৭৫)। মুহাম্মাদ জামীল আহ্‌মাদ রচিত আম্বিয়ায়ে কুরআন নামক গ্রন্থে হযরত হূদ (আ)-এর বংশলতিকা নিম্নোক্তরূপে দেখানো হইয়াছে ঃ

Noah حضرت نوح عليه السلام

Shem سام

Arpachshad ارفخشد

Arphaxad

Salah سلح

Eber عبر (حضرت هود)

উপরিউক্ত বংশলতিকায় হযরত হূদ (আ)-কে ইবার (عبر) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী হূদ (আ) হযরত আদম (আ)-এর ১৪তম অধস্তন এবং হযরত নূহ (আ)-এর ৫ম অধস্তন পুরুষ (আম্বিয়ায়ে কুরআন, খ. ১, পৃ. ১২৩; বাইবেল, আদিপুস্তক, পৃ. ১৩)।

ইব্‌ন কাছীর রচিত কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে হযরত হূদ (আ)-এর বংশলতিকা নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ হূদ ইব্‌ন শালিখ ইব্‌ন আরফাখশায ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ)। কেহ্ বলেন, হযরত হূদ (আ) হইলেন আবির ইব্‌ন শালিক ইব্‌ন আরফাখ্‌শায ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ) অথবা কেহ বলেন, হূদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন বিরাহ ইব্‌ন আল-জারূদ ইব্‌ন 'আদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ) (এই বংশলতিকাটি ইব্‌ন জারীর উল্লেখ করেন; ইব্‌ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ., পৃ. ৯৫, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ.)। হযরত হূদ (আ) 'আদ জাতির সর্বাধিক অভিজাত শাখা খালূদ বংশে জন্মগ্রহণ করেন (আয়নী, ৭ খ., কিতাবুল আম্বিয়া, উদ্ধৃতিসহ কাসাসুল কুরআন, ১খ., পৃ. ৮৯, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ.)। হযরত হূদ (আ) আরব বংশীয় ছিলেন। এই মর্মে এক হাদীছে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সহীহ্ ইব্‌ন হিব্বান-এ হযরত আবূ যার (রা) কর্তৃক বর্ণিত আম্বিয়া-ই কিরামের বর্ণনা সম্বলিত দীর্ঘ হাদীছের এক স্থানে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ

منهم اربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر.

"আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত নবী-রাসূলগণের মধ্যে ৪জন আরব ছিলেন ঃ হযরত হূদ (আ), হযরত সালিহ্ (আ), হযরত শু'আয়ব (আ) এবং তোমার নবী হে আবূ যার অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (স)" (ইব্‌ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ., পৃ. ৯৫)।

হযরত হূদ (আ)-এর বংশলতিকার একটি তুলনামূলক চিত্র বিখ্যাত মিসরীয় ঐতিহাসিক আবদুল ওয়াহ্‌হাব আন্‌-নাজ্জার তাঁহার রচিত কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে তুলিয়া ধরেন ঃ
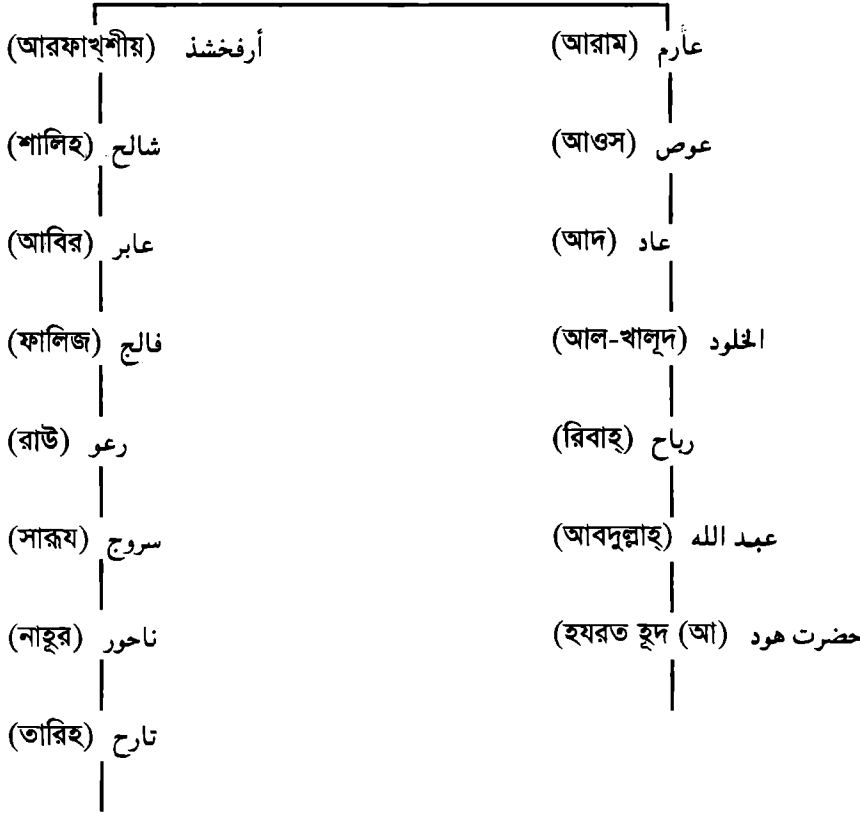
এই বংশলতিকার স্তম্ভে দৃষ্ট হয় যে, হযরত হূদ (আ) সাম-এর ৬ষ্ঠ অধস্তন পুরুষ, পক্ষান্তরে হযরত ইবরাহীম (আ) সাম-এর ৮ম অধস্তন পুরুষ (আবদুল ওয়াহ্‌হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫০)।

আরব বংশ বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জাওফী লিখেন, হূদ (আ)-এর পুত্র ইয়ারুব ইব্‌ন কাহতান পরবর্তী কালে য়ামানে পৌঁছিয়া বসতি স্থাপন করেন। য়ামানের সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার বংশধর। আরবী ভাষার সূচনা তাঁহার নিকট হইতেই হইয়াছে এবং তাঁহার নাম অনুসারে ভাষার নাম আরবী ও এই ভাষাভাষীর নাম হইয়াছে আরব (বাহরে মুহীত; মুফতী মহাম্মাদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৪৫৪)। কিন্তু আরেকটি তথ্য এই যে, আরবী ভাষা হযরত নূহ

(আ)-এর আমল হইতে প্রচলিত ছিল। নূহ (আ)-এর কিশ্তীর একজন আরোহী জুরহুম নামক ব্যক্তি আরবী ভাষায় কথা বলিতেন। এই জুরহুম হইতেই মক্কা শহর আবাদ হইয়াছে। তবে ইহা সম্ভব যে, য়ামানে আরবী ভাষার সূচনা ইয়াকূব ইব্ন কাহ্তান হইতেই হইয়াছিল (মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৪৫৪)।

ইব্ন 'আসাকির তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে এই মর্মে আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে একটি মওকূফ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন আল্লাহ মানবজাতিকে বাবিল-এ একত্র করিলেন, তখন তাহাদের উপর দিয়া আল্লাহ্র হুকুমে জোরে হাওয়া প্রবাহিত হইল। তাহারা তাহাদের একত্র করার কারণ জানার জন্য এক স্থানে জড় হইল। তখন এক (অদৃশ্য) ঘোষণাকারী ঘোষণা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা পশ্চিমকে ডাইনে, পূর্বকে বামে রাখিবে এবং পবিত্র ঘরের দিকে মুখ করিবে তাহাদের ভাষা হইবে আকাশের বাসিন্দাদের ভাষা"। তখন কাহতানের পুত্র য়া'রুব দাঁড়ান। তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়, "হে হূদের পুত্র য়া'রুব ইব্ন কাহতান! তুমি কি সেই ব্যক্তি?" অতঃপর তিনি হইলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি "প্রাঞ্জল আরবীতে" কথা বলেন। অতঃপর একের পর এক ঘোষণা হইতে লাগিল আর লোকেরা দাঁড়াইয়া নিজেদের সম্মতি জানাইতে থাকিল। এইভাবে মানবজাতির ভাষা বাহাত্তরটি ভাষায় বিভক্ত হইল, তখন ঘোষণা বন্ধ হইল। আর পরিণতিতে কাহারও ভাষা কেহই বুঝিতে সক্ষম না হওয়ায় তাহারা যাহার যাহার নির্ধারিত এলাকায় প্রস্থান করিল। সেই কারণেই এই দেশের নাম হয় বাবিল (আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ২৩২, ঢাকা ১৯৮২ খৃ.; নতুন সংস্করণ ১৯৯৫ খৃ.)।

হযরত হূদ (আ)-এর নবুওয়াত লাভ

হযরত হূদ (আ) তাঁহার নিজ কওম 'আদ-এর প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হন। 'আদ হযরত নূহ (আ)-এর ৫ম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁহার পুত্র সাম-এর বংশধরের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম। পরবর্তী পর্যায়ে আদ নামক ব্যক্তির বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় আদ নামে খ্যাত হয়। বংশবৃদ্ধির ফলে আদ একটি জাতিতে পরিণত হয়। আদ জাতির লোকেরা ছিল সুঠামদেহী ও দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট। তাহারা প্রচণ্ড কায়িক শক্তির অধিকারী ছিল। তাহা ছাড়া আর্থিক দিক হইতেও তাহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। 'আদ জাতি তাহাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও শক্তিমত্তায় গর্বিত হইয়া আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। ফলে তাহাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ হযরত হূদ (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا "আদ সম্প্রদায়ের নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম"।

আল-কুরআনে হযরত হূদ (আ)

পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় হযরত হূদ (আ) ও তাঁহার রিসালাত সংক্রান্ত আলোচনা এবং তাঁহার কওম অর্থাৎ কওমে আদ-এর কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। নিম্নে সূরাসমূহের নাম ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হইল ঃ

সূরা আল-আ'রাফ ঃ আয়াত নম্বর ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২।

সূরা হূদ ঃ আয়াত নম্বর ৫০, ৫১,৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০।

সূরা আল-মুমিনূন ঃ ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২।

সূরা আস-শু'আরা ঃ আয়াত নম্বর ঃ ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০।

সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ আয়াত নম্বর ১৫, ১৬।

সূরা আয-যারিয়াত ঃ ৪১-৪২।

সূরা আল-আহকাফ ঃ আয়াত নম্বর ২১-২৬।

সূরা আল-কামার ঃ আয়াত নম্বর ১৮, ১৯, ২০, ২১।

সূরা আল-হাক্কা ঃ আয়াত নম্বর ৬, ৭, ৮।

সূরা আল-ফাজ্র ঃ আয়াত নম্বর ৬, ৭, ৮ (আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৩-৫৬)। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْداً قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ اِنَّا لَنَرٰكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّاِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ. قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اُبَلِّغُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّيْ وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ. اَوَعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوْا اٰلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْ اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ. فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

"আদ জাতির নিকট আমি উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা কি সাবধান হইবে না? তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল, তাহারা বলিয়াছিল, আমরা তো দেখিতেছি তুমি নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নহি, বরং আমি জগৎসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইতেছি এবং আমি তোমাদিগের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্খী। তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদিগের নিকট তোমাদিগের একজনের মাধ্যমে তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য উপদেশ আসিয়াছে? এবং স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে। তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদিগের নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ যে, আমরা যেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি এবং আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ যাহার ইবাদত করিত তাহা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর। সে বলিল, তোমাদিগের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদিগের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহ এমন কতগুলি নাম সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন সনদ পাঠান নাই? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদিগের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি। অতঃপর তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যাহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল এবং যাহারা মুমিন ছিল না তাহাদিগকে নির্মূল করিয়াছিলাম" (৭ ঃ ৬৫-৭২)।

وَاِلٰى عَادٍ اَخَاهُمْ هُوْداً قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ. يٰقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْراً اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ. قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ. اِنْ نَقُوْلُ اِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ قَالَ اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ. مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ. اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّىْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ. وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْداً وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنٰهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوْا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ. وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَلَا اِنَّ عَاداً كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْداً لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ.

"আমি আদ জাতির নিকট উহাদিগের ভ্রাতা হূদকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। হে আমার সম্প্রদায়! আমি ইহার পরিবর্তে তোমাদিগের নিকট পরিশ্রমিক যাচ্ঞা করি না। আমার পারিশ্রমিক আছে তাঁহারই নিকট যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করিবে না? হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদিগের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁহার দিকেই ফিরিয়া আস। তিনি তোমাদিগের জন্য প্রচুর বারি বর্ষাইবেন। তিনি তোমাদিগকে আরও শক্তি দিয়া তোমাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিবেন এবং তোমরা অপরাধী হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইও না। উহারা বলিল, হে হূদ! তুমি আমাদিগের নিকট কোন স্পষ্ট

প্রমাণ আনয়ন কর নাই, তোমার কথায় আমরা আমাদিগের ইলাহ্দিগকে পরিত্যাগ করিবার নহি এবং আমরা তোমাতে বিশ্বাসী নহি। আমরা তো ইহাই বলি, আমাদিগের ইলাহ্দিগের মধ্যে কেহ তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করিয়াছে। সে বলিল, আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তাহা হইতে নির্লিপ্ত যাহাকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক কর, আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্র উপর; এমন কোন জীব-জন্তু নাই, যে তাঁহার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নহে; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে। অতঃপর তোমরা মুখ ফিরাইয়া লইলেও আমি যাহাসহ তোমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি, আমি তো তাহা তোমাদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং আমার প্রতিপালক তোমাদিগ হইতে ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিবেন এবং তোমরা তাঁহার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সমস্ত কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি হূদ ও তাহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে। এই আদ জাতি তাহাদিগের প্রতিপালকের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করিয়াছিল এবং অমান্য করিয়াছিল তাঁহার রাসূলগণকে এবং উহারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করিত। এই দুনিয়ায় উহাদিগকে করা হইয়াছিল লা'নতগ্রস্ত এবং লা'নতগ্রস্ত হইবে উহারা কিয়ামতের দিনেও। জানিয়া রাখ! আদ সম্প্রদায় তাহাদিগের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল হূদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম" (১১ ঃ ৫০-৬০)।

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ۔ فَاَرْسَلْنَا فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ۔ وَقَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ۔ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ۔ اَيَعِدُكُمْ اَنَّكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا اَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ۔ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوْعَدُوْنَ۔ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ۔ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلُ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهٗ بِمُؤْمِنِيْنَ۔ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ۔ قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نٰدِمِيْنَ۔ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنٰهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ۔ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا اٰخَرِيْنَ۔

"অতঃপর আমি তাহাদিগের পর অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলাম এবং উহাদিগেরই একজনকে উহাদিগের নিকট রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তবুও কি তোমরা সাবধান হইবে

না? তাহার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যাহারা কুফরী করিয়াছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগসম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল. সে তো তোমাদিগের মত একজন মানুষই; তোমরা যাহা আহার কর সে তো তাহাই আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর সেও তাহাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদিগের মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সে কি তোমাদিগকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদিগের মৃত্যু হইলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইলেও তোমাদিগকে পুনরুত্থিত করা হইবে? অসম্ভব, তোমাদিগকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্ভব। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদিগের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এইখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না। সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করিয়াছে এবং আমরা তাহাকে বিশ্বাস করিবার নহি। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর; কারণ উহারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। আল্লাহ বলিলেন, অচিরে উহারা অনুতপ্ত হইবেই। অতঃপর সত্যসত্যই এক বিকট আওয়াজ উহাদিগকে আঘাত করিল এবং আমি উহাদিগকে তরঙ্গ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করিয়া দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হইয়া গেল জালিম সম্প্রদায়। অতঃপর তাহাদিগের পরে আমি বহু জাতি সৃষ্টি করিয়াছি" (২৩ ঃ ৩১-৪২)।

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِيْنَ . اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ . اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ . فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ . وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ . وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ . وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ . فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ . وَاتَّقُوا الَّذِىْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ . اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ . وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ . اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ . قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ . اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ . وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ . فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

"আদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। যখন উহাদিগের ভ্রাতা হূদ উহাদিগকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? আমি তোমাদিগের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদিগের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ নিরর্থক? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করিতেছ এই মনে করিয়া যে, তোমরা চিরস্থায়ী হইবে। এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হানিয়া থাক কঠোরভাবে। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সেই সমুদয় যাহা তোমরা জান। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন আন'আম ও সন্তান-সন্তুতি,

উদ্যান ও প্রস্রবণ। আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তির। উহারা বলিল, তুমি উপদেশ দাও অথবা না-ই দাও, উভয়ই আমাদিগের জন্য সমান। ইহা তো পূর্ববর্তীদিগেরই স্বভাব। আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদিগের শামিল নহি। অতঃপর উহারা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল এবং আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিলাম। ইহাতে অবশ্যই আছে নিদর্শন; কিন্তু উহাদিগের অধিকাংশই মুমিন নহে। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু" (২৬ ঃ ১২৩-১৪০)।

فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ
أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُونَ · فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ
الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ·

"আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, আমাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? উহারা কি তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ উহারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করিত। অতঃপর আমি উহাদিগকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইবার জন্য উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না" (৪১ ঃ ১৫-১৬)।

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ · قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ·
قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ · فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ
أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ · تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
فَأَصْبَحُوا لَا يُرٰى إِلَّا مَسٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ · وَلَقَدْ مَكَّنّٰهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنّٰكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ
سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنٰى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ·

"স্মরণ কর আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যাহার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল। সে তাহার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। আমি তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তি আশংকা করিতেছি। উহারা বলিয়াছিল, তুমি আমাদিগকে আমাদিগের দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর। সে বলিল, ইহার জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই নিকট আছে। আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি কেবল তাহাই তোমাদিগের

নিকট প্রচার করি। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়। অতঃপর যখন তাহারা উহাদিগের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন বলিতে লাগিল, উহা তো মেঘ, আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে। হূদ বলিল, ইহাই তো তাহা, যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, এক ঝড়, মর্মন্তুদ শাস্তি বহনকারী। আল্লাহ্র নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করিয়া দিবে। অতঃপর উহাদিগের পরিণাম এই হইল যে, উহাদিগের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি। আমি উহাদিগকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম তোমাদিগকে তাহা দেই নাই। আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু এইগুলি উহাদিগের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল" (৪৬ ঃ ২১-২৬)।

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ.

"এবং নিদর্শন রহিয়াছে আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণকর বায়ু। ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছিল তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল" (৫১ ঃ ৪১-২)।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ. تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ.

"আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, ফলে কী কঠোর হইয়াছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! উহাদিগের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে, মানুষকে উহা উৎখাত করিয়াছিল উম্মূলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী" (৫৪ ঃ ১৮-২১)।

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ. حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.

"আর আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা, যাহা তিনি উহাদিগের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সপ্ত রাত্রি ও অষ্ট দিবস বিরামহীনভাবে। তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিত- উহারা সেথায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। অতঃপর উহাদিগের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি" (৬৯ঃ ৬-৮)?

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ. الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ.

"তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি, যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই" (৮৯ ঃ ৬-৮)?

হাদীছ শরীফে হযরত হূদ (আ)

হাদীছে হযরত হূদ (আ)-এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে কতক হাদীছে হযরত হূদ (আ)-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) এক দিন হযরত রাসূলুল্লাহ (স)-এর কিছু দাড়ি পাকা দেখিলেন এবং বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন! রাসূলে পাক (স) বলেন, "হাঁ" সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে" (মাআরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা অনু., পৃ. ৬১৯)। এই হাদীছ হইতে বুঝা যায় যে, বিশেষত এই সূরায় হযরত নূহ (আ), হযরত হূদ (আ) ও হযরত সালিহ (আ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রমের বর্ণনা এবং তাঁহাদের কওমের নাফরমানির কথা অবগত হইয়া মহানবী (স) বিচলিত হইয়াছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত হূদ (আ) সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কথা বলেন। ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ মনে করেন, হযরত হূদ (আ)-এর পিতা সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় কথা বলেন (আবদুল ওয়াহ্হাব আন্-নাজ্জার, কাসাসুল কুরআন, পৃ. ৪৯; ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৯৫)।

সহীহ্ ইব্ন হিব্বানে হযরত আবূ যার (রা) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছে নবী ও রাসূলগণের বর্ণনার এক স্থানে নবী করীম (স) বলেন ঃ

مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ هُوْدٌ وَّصَالِحٌ وَّشُعَيْبٌ وَّنَبِيُّكَ يَا اَبَا ذَرٍّ.

"(আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত) নবী-রাসূলগণের মধ্যে ৪জন আরব ছিলেন ঃ হযরত হূদ, হযরত সালিহ, হযরত শু'আয়ব এবং তোমার নবী, হে আবূ যার" (ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৯৫)। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছে আদ জাতি ও হযরত হূদ (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُمُ اتَّخَذُوْا صَنَمًا يُقَالُ لَهُ صَمُوْدًا وَصَنَمًا يُقَالُ لَهُ الْهَتَارُ فَبَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ هُوْدًا وكَانَ هُوْدٌ مِنْ قَبِيْلَةٍ يُقَالُ لَهَا الْخُلُوْدُ وكَانَ مِنْ اَوْسَطِهِمْ نَسَبًا وَاَصْبَحَهُمْ وَجْهًا وكَانَ فِيْ مِثْلِ اَجْسَادِهِمْ اَبْيَضُ بَادِيُّ الْعَنْفَقَةِ طَوِيْلَ اللِّحْيَةِ فَدَعَاهُمْ اِلٰى عِبَادَةِ اللّٰهِ وَاَمَرَهُمْ اَنْ يُّوَحِّدُوْهُ وَاَنْ يَكُفُّوْا عَنْ ظَلْمِ النَّاسِ فَاَبَوْا ذٰلِكَ وكَذَّبُوْهُ وَقَالُوْا (مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً).

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদ জাতি 'সামূদ' ও 'আল-হাতার' নামক দুইটি মূর্তির পূজা করিতে শুরু করে। অতঃপর আল্লাহ তাহাদের নিকট হযরত হূদ (আ)-কে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি খালূদ গোত্রের সন্তান ছিলেন। তিনি বংশের দিক হইতে অভিজাত এবং সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার শরীরের রং সাদা, চিবুক চুলপূর্ণ, দাড়ি লম্বা ছিল। তিনি তাহাদেরকে আল্লাহ্র ইবাদত করার ও তাঁহাকে একমাত্র স্রষ্টা হিসাবে মানার জন্য বলেন এবং মানুষের উপর অত্যাচার করা হইতে বিরত থাকিতে বলেন। কিন্তু তাহারা হযরত হূদ

(আ)-কে মিথ্যুক বলে এবং গর্ব করিয়া বলে, আমাদের চাইতে শক্তিশালী আর কে আছে" (তাফসীরুল মানার, খ. ৭, পৃ. ৪৯৮)!

কওমে হূদ বা আদ জাতির পরিচয়

হযরত হূদ (আ)-কে তাঁহার নিজস্ব কওম আদ-এর হিদায়াতের জন্য আল্লাহ প্রেরণ করেন। হযরত হূদ (আ)-এর জীবন ও কর্মতৎপরতা আদ জাতিকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়াছিল। ফলে হযরত হূদ (আ)-এর জীবনী আলোচনা করিতে হইলে আদ জাতি সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা আবশ্যক। হযরত আদম (আ)-এর পর অনেক অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আরবে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী এক জাতির আবাদ ছিল, যাহাদেরকে পবিত্র কুরআনে 'আদ জাতি' বলা হইয়াছে। হযরত নূহ (আ)-এর প্লাবনের পর তাঁহার পুত্রদের মধ্যে অন্যতম সাম-এর বংশ আরব ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। আদ জাতি ঐ বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, যাহাদের বিভিন্ন গোত্রকে امم سامية বা 'সামী জাতিগোষ্ঠী' বলা হইত। এই আদ জাতি ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আ) -এর বংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় এই জাতিকে আদ-ই ইরাম বলা হইত। কুরআনে উল্লিখিত আদ ও ছামূদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরাম-এ গিয়া মিলিত হয়। ফলে ইরাম শব্দটি আদ ও ছামূদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য।

সায়্যিদ সুলায়মান নদবী আসমানী কিতাব তাওরাত অনুযায়ী বর্ণিত اقوام বংশ পরিবর্তন ছক তাঁহার গ্রন্থে উপস্থাপন করিয়াছেন এবং ঐ ছকে তিনি عاد জাতিকে (هود) امم سامية اولى বলিয়া উল্লেখ করেন। অর্থাৎ সেই আদ হযরত হূদ (আ)-এর যমানায় কওমে হূদ নামে অভিহিত ছিল এবং হযরত হূদ (আ)-এর পরবর্তী امم مسامية -কে عاد ثانية অর্থাৎ ثمود (ছামূদ), جرهم (জুরহুম), معين (মুঈন), طسم (তাসাম), جديس (জাদীস) ইত্যাদি নামে উল্লেখ করেন। شجره اقوام
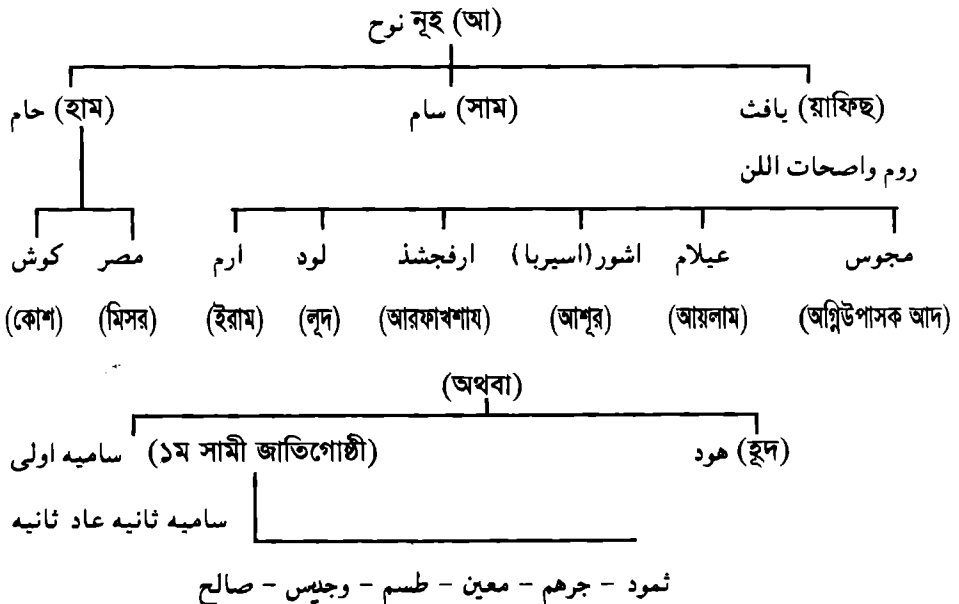
দ্বিতীয় সামী জাতিগোষ্ঠী দ্বিতীয় আদ ঃ ছামূদ, জুরহুম, মঈন, তাসাম ও জাদীস, সালিহ
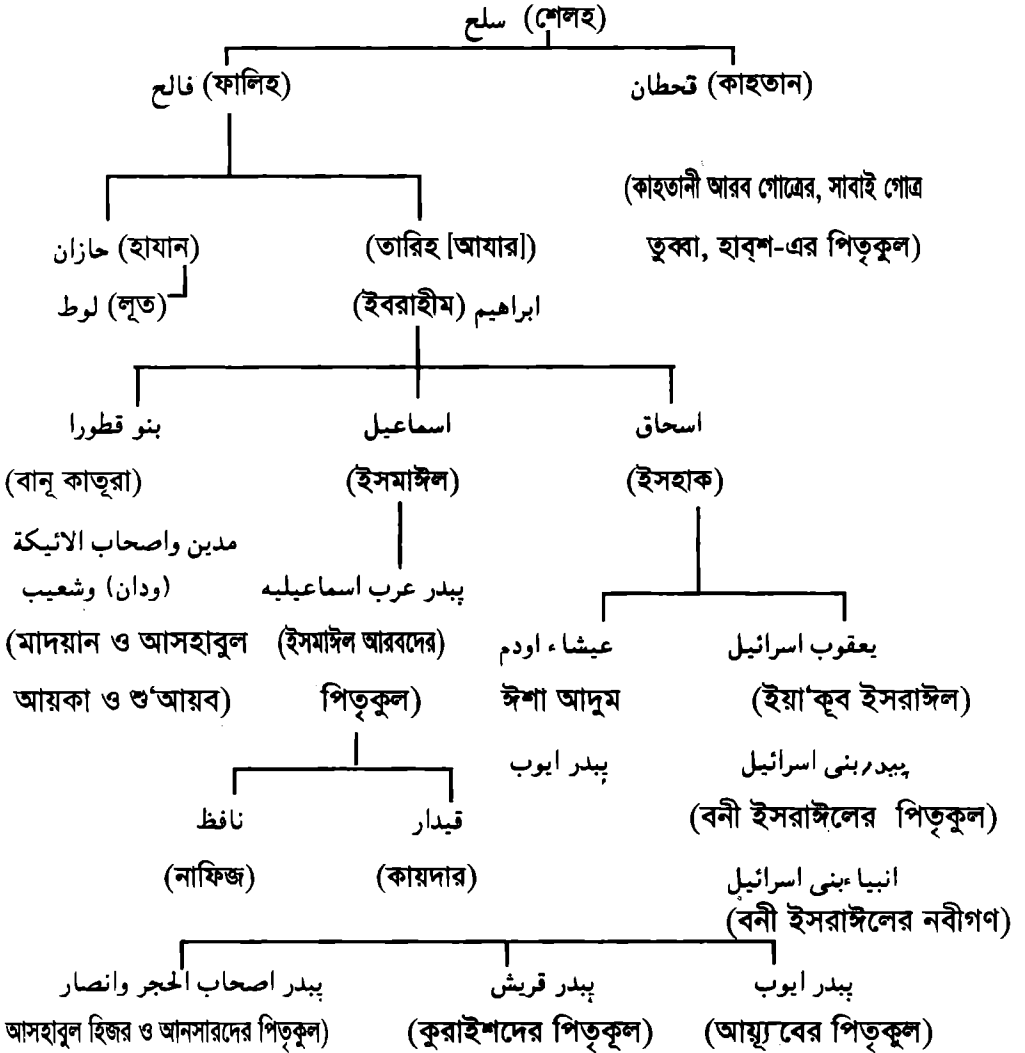
(সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, তারীখু আরদিল কুরআন, ১খ, পৃ. ৯৪, করাচী ১৯১৫ খৃ.)।

সায়্যিদ সুলায়মান নদবীর মতে امم سامية আরবের সর্বপ্রথম ও প্রাথমিক বাসিন্দা ছিল এবং বিভিন্ন কারণে তাহারা আরবভূমি হইতে বাহির হইয়া বাবিল, মিসর, শাম (সিরিয়া) ইত্যাদি এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে। আরব ঐতিহাসিকগণ তাহাদেরকে امم بائدة বা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি হিসাবে অভিহিত করেন। কেননা তাহারা তাহাদের দেশ আরব হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র গিয়া আসমানী গযবে ধ্বংস হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক তাহাদেরকে عرب عاربة অর্থাৎ খাঁটি ও অবিমিশ্র আরব বলিয়া চিহ্নিত করেন। ইউরোপীয় বংশবিশারদ পণ্ডিতগণ আরবের বিভিন্ন প্রাচীন জাতি-গোষ্ঠীকে

কেবল সামী বলিতেন, কিন্তু 'আরবগণ তাহাদের প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীকে পৃথক পৃথক নামে অভিহিত করেন। যেমন عاد (আদ), ثمود (ছামূদ), جرهم (জুরহুম), لحيان (লিহ্য়ান), طسم (তাস্ম), جديس (জাদীস) ইত্যাদি। ঐসব গোত্রের মধ্যে আদ সবচাইতে বৃহৎ গোত্র ছিল এবং عرب بائده অর্থাৎ প্রাচীন আরবের ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল গোত্রের মধ্যে কেবল আদ গোত্রই রাজত্বের অধিকারী ছিল। আরবদের বর্ণনা অনুযায়ী আরব ও আরবের বাহিরে বাবিল ও মিসরে তাহারা বিশাল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ছিল। আরব ঐতিহাসিকগণ উপরিউক্ত গোত্রসমূহের মূল ধারা ارم ابن سام-এর দিকে নির্দেশ করেন। তাহাদের তথ্যসূত্র অনুযায়ী প্রাচীনতম উৎস ইব্ন কুতায়বার কিতাবুল মাআরিফ-এ ইব্ন কুতায়বা এবং পরবর্তী কালের লেখক কালকাশান্দী سبائك الذهب-এর মধ্যে নিম্নোক্তরূপে উপস্থাপন করেন ঃ

ইব্ন কুতায়বা (কিতাবুল মাআরিফ)	কালকাশান্দী
আমালিক ইব্ন লাবিয ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম	আমালীক ইব্ন লাবিয ইব্ন সাম
জাদীস ইব্ন লাবিয ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম	জাদীস ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম
'আদ ইব্ন 'আওদ ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম	'আদ ইব্ন আওদ ইব্ন 'আবীল ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম
ছামূদ ইব্ন জাছার ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম	ছামূদ ইব্ন জাছির ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম
	তাসম ইব্ন লাবিয ইব্ন সাম

(ইব্ন কুতায়বা, কিতাবুল মা'আরিফ, পৃ. ১০, মিসর; আল্-কালকাশান্দী, সাবায়িকুল মাযহাব, পৃ. ১৩১৪, বোম্বাই)।

উপরে বর্ণিত বংশতালিকায় সকল গোত্রই সাম-এর বংশধর ছিল। তবে সাম-এর পরে সকলেই 'ইরাম'-এর অধস্তন ছিল। ফলে আরবের সকল গোত্রের মধ্যে আরামী উপাদানের প্রাধান্য ছিল। যেমন আরবী ভাষায় আরামী শব্দ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় (প্রফেসর আরনল্ড, سواء السبيل লাহোর)। এমনকি আরবের প্রাচীন শহর 'মক্কা' নামটিও আরামী (জুরজী যায়দান, পৃ. ২৪০)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইব্ন খালদূন বলেন,

كَانَ يُقَالُ عَادُ اِرَمَ فَلَمَّا هَلَكُوْا قِيْلَ ثَمُوْدُ اِرَمَ فَلَمَّا هَلَكُوْا قِيْلَ نَمْرُوْدُ اِرَمَ ٠

"প্রথমে 'আদকে ইরাম বলা হইত। যখন তাহারা ধ্বংস হইয়া যায় তখন ছামূদ-ই ইরাম বলা হইত। যখন তাহারাও ধ্বংস হইয়া যায়, তখন নমরূদ-ই ইরাম বলা হইত" (ইব্ন খালদূন, ২ খ, পৃ. ৭)। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٠ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٠ الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ ٠

"তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করিয়াছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি, যাহারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের, যাহার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই" (৮৯ঃ ৬-৮)!

উপরিউক্ত আয়াতে ইরাম শব্দ ব্যবহার করিয়া 'আদ গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম 'আদকে নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহারা দ্বিতীয় 'আদ-এর তুলনায় 'আদ-এর পূর্বপুরুষ ইরাম-এর নিকটতম বিধায় তাহাদেরকে 'আদ-ই ইরাম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অনুরূপভাবে সূরা আন্-নাজ্‌ম-এ তাহাদিগকে 'আদ-ই উলা বলা হইয়াছে ঃ

وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادًا الْاُوْلٰى وَثَمُوْدَ فَمَا اَبْقٰى وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ۔

"আরও এই যে, তিনিই প্রাচীন 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও, কাহাকেও তিনি বাকী রাখেন নাই, আর ইহাদিগের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও, উহারা ছিল অতিশয় জালিম ও অবাধ্য" (৫৩ ঃ ৫০-৫২)।

আদ শব্দটির অর্থ

সেমিটিক (সামী) ভাষাসমূহের মধ্যে সাহিত্যে অস্তিত্বের দিক হইতে হিব্রু প্রাচীনতম ভাষা। ইহার ফলে প্রাচীন শব্দসমূহের উৎপত্তি 'আরবী ভাষার তুলনায় 'হিব্রু ভাষায় অধিক সংরক্ষিত। হিব্রু ভাষায় 'আদ' শব্দের অর্থ 'উচ্চ ও বিখ্যাত' এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইরাম এবং ইসাম (সাম) শব্দদ্বয়ের অর্থও অনুরূপ। এই অর্থের প্রভাব আরবীতেও বিদ্যমান। ইরাম-এর অর্থ পার্বত্য / পাহাড়ী ও দিকনির্দেশক পাথর। তাওরাতে 'আদ' পুংলিঙ্গের নামের জন্য এবং عادة স্ত্রীবাচক নামের জন্য একাধিক স্থানে আসিয়াছে, যাহার ফলে ইহা স্পষ্ট যে, প্রাচীন কালে এই নাম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইত (সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, তারীখু আরদিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৯৭-৯৮, করাচী ১৯১৫ খৃ.)।

আদ জাতির আবির্ভাবকাল

আদ জাতির আবির্ভাবের সময়কাল আনুমানিক ৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। কেননা 'আদকে عوض بن ارم بن سام -এর সন্তান বলা হইয়াছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের যে স্থানে 'আদ-এর উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই স্থানে তাহাদেরকে কওমে নূহ-এর প্রতিনিধি বলা হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

"এবং স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে" (৭ ঃ ৬৯)।

'আদ-ই ইরাম অথবা 'আদ-ই উলা তথা আমাদের আলোচ্য 'আদ জাতির আবির্ভাবকাল ২২০০ খৃ. পূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ হয় বলিয়া অনুমিত। 'আদ জাতির অন্তিমকাল নির্ধারণের পদ্ধতি এই যে, ১৫০০ খৃ. পূর্বাব্দে য়ামান-এ অপর একটি শক্তির উদ্ভব ঘটে এবং ঐ সময়ের কিছু পূর্বের যুগ ছিল হযরত মূসা (আ)-এর যুগ। হযরত মূসা (আ)-এর একজন অনুসারী মুমিন ব্যক্তি ফিরআওনের দরবারে বলিয়াছিলেন ঃ

يَا قَوْمِ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ.

"হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদিগের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি, যেমন ঘটিয়াছিল নূহ, 'আদ, ছামূদ এবং তাহাদিগের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে" (৪০ ঃ ৩০-৩১)।

সুতরাং উপরিউক্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে 'আদ জাতির আবির্ভাবকাল ৩০০০ খৃ. পূর্বাব্দ হইলেও তাহাদের গৌরবময় যুগ খৃ. পূর্ব ২২০০ সাল হইতে খৃ. পৃ. ১৭০০ সাল পর্যন্ত ছিল। অবশ্য 'আদ জাতির নেককার লোকজন হযরত ঈসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত ছিলেন। গ্রীকগণ 'আদ জাতিকে عاد رمثيا (عادام) এবং عادأيت (عاد) ইত্যাদি নামে উল্লেখ করে, যাহারা হাদ্‌রামাওত ও য়ামানের বাসিন্দা ছিল। পার্থক্য নির্ধারণের জন্য ১ম যুগকে 'আদ-ই উলা এবং ২য় যুগকে 'আদ-ই ছানিয়া বলা হয় (তারীখু আরদিল কুরআন, ১খ., পৃ. ৯৮-৯৯)।

যে সকল ঐতিহাসিক আদ জাতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা লিখেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন মক্কায় বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ করেন এবং হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁহার মাতা হযরত হাজেরা (রা)-কে ঐ স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করেন, তখন 'আদ জাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

আদ জাতির বাসস্থান

'আদ জাতির কেন্দ্রীয় আবাসভূমি 'আরবের উৎকৃষ্ট বিস্তৃত অংশ অর্থাৎ য়ামান ও হাদ্‌রামাওত তথা পারস্য উপসাগরের উপকূল হইতে ইরাক সীমান্ত পর্যন্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের রাজত্বের মূল কেন্দ্র ছিল য়ামান (তারীখু আরদিল কুরআন, ১খ., পৃ. ৯৯)।

কাসাসুল কুরআন গ্রন্থের গ্রন্থকারের মতে 'আদ জাতি হযরত নূহ (আ)-এর পর পৃথিবীতে আবাদ হয়। "আহ্কাফ" নামক বালুকাময় মরুভূমিতে তাহাদের বসতি ছিল। ঐ এলাকা হাদ্‌রামাওত ও য়ামানের উত্তরে য়ামান উপসাগরের (ভারত মহাসাগর সংলগ্ন) তীর ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চল প্রাচীন কাল হইতেই বালুকাময় ছিল, না 'আদ জাতির ধ্বংসের পর বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয়, তাহা জানা যায় না। তাওরাত ইত্যাদি আসমানী গ্রন্থ 'আদ জাতি সম্পর্কে নীরব। ইতিহাসও এই প্রাচীনতম জাতি সম্পর্কে কিছু বলে না। তবে কুরআনুল কারীমই এই 'আদ জাতির অবস্থা ও বাসস্থান সম্পর্কে জানার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

ইব্‌ন কাছীর রচিত কাসাসুল আম্বিয়ার মতে এই 'আদ জাতি অর্থাৎ 'আদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ ছিল একটি 'আরবী জাতিগোষ্ঠী। তাহারা আল-আহকাফে বসবাস করিত এবং আহকাফ হইল বালির পাহাড়। ইহা উমান ও হাদ্‌রামাওতের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ছিল। এই স্থান সমুদ্র উপকূলে বিস্তৃত ছিল। উপকূল সংলগ্ন স্থানকে الشحر (আশ্-শিহ্‌র) বলা হইত এবং ঐ স্থানের উপত্যকার নাম مغيث (মুগীছ) (বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া, ১খ., পৃ. ৯৫)। পবিত্র কুরআনে 'আদ জাতির বাসস্থান কোথায় তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা না হইলেও সূরা আহকাফে বলা হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"স্মরণ কর আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা, যাহার পূর্বে ও পরেও সতর্ককারীরা আসিয়াছিল। সে তাহার আহকাফবাসী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়াছিল এই বলিয়া, আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত করিও না। আমি তো তোমাদিগের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করিতেছি" (৪৬ ঃ ২১)।

জানা যায় যে, 'আদ জাতির নির্দিষ্ট বাসস্থান য়ামান হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত দক্ষিণ 'আরব এবং পারস্য উপসাগরের তীর ঘেঁষিয়া ইরাক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মনে হয় বর্তমান য়ামান, হাদ্রামাওত, উমান, কাতার, আল-আহ্সা ইত্যাদি স্থানে 'আদ জাতির বসতি বিস্তৃত ছিল। ইহাদের কেন্দ্রস্থল ছিল আহকাফ, যাহা হাদ্রামাওতের উত্তরে, উমানের পশ্চিমে এবং রাবউল খালী'র দক্ষিণে অবস্থিত। বর্তমানে আহকাফে বালির টিলা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু ঐ যুগে হয়ত আহকাফ অঞ্চল সবুজ-শ্যামল প্রান্তর ছিল। শায়খ আবদুল ওয়াহ্হাব আন্-নাজ্জার তাঁহার 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থে হাদ্রামাওতের সায়্যিদ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদের বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, একবার তিনি একদল লোকের সঙ্গে প্রাচীন কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের খোঁজ করার জন্য হাদ্রামাওতের উত্তর দিকের প্রান্তরে কর্মরত ছিলেন। তাঁহারা অনেক চেষ্টার পর বালির টিলা খোদাই করিয়া মর্মর পাথরের কতিপয় পাত্র উদ্ধার করেন। ঐ সকল পাত্রে কিলক পদ্ধতির লেখা ছিল। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁহারা খননকার্য সমাপ্ত করিতে পারেন নাই (হিফ্জুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, খণ্ড ১, পৃ. ৮৯; আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫১)। এই খননকার্য দ্বারা অনুমান করা যায় যে, 'আদ জাতি বসবাস করার সময় ঐ স্থান হয়ত বর্তমান সময়ের মত মরুময় ছিল না, বরং সবুজ, সজীব ও শ্যামল অঞ্চল ছিল। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় তাহা বুঝা যায় ঃ

وَاتَّقُوا الَّذِىْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ. وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

"ভয় কর তাঁহাকে যিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন সেই সমুদয় যাহা তোমরা জ্ঞাত। তিনি তোমাদিগকে দিয়াছেন আন'আম তথা উট, গরু, মেষ, ছাগল ও সন্তান-সন্ততি, উদ্যান ও প্রস্রবণ। আমি তোমাদিগের জন্য আশংকা করি মহাদিবসের শাস্তি" (২৬ ঃ ১৩২-১৩৫)।

'আদ জাতির লোকেরা মাঠে তাঁবুর মধ্যে বসবাস করিত। ঐসব তাঁবু বিশাল উঁচু স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল। অথবা তাহারা এমন উঁচু গৃহে বাস করিত, যেসব গৃহের ছাদ অত্যন্ত উঁচু স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল।

সায়্যিদ সুলায়মান নদবী তাঁহার 'তারীখু আরদিল কুরআন' গ্রন্থে بلاد احقاف শিরোনামে লিখেন, য়ামামা, উমান, বাহ্রাইন, হাদরামাওত এবং পশ্চিম য়ামানের মধ্যবর্তী যে বিশাল প্রান্তর 'আদ্-দুবনা" অথবা "রাবউ'ল-খালী" নামে পরিচিত, যদিও তাহা আবাদীর উপযুক্ত নহে, কিন্তু ইহার আশেপাশে কোথায়ও কোথায়ও আবাদীযোগ্য কিছু ভূমি বিদ্যমান, বিশেষ করিয়া ঐ অংশে, যে অংশ হাদ্রামাওত হইতে নাজরান পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমানে অবশ্য এই অংশটিও আবাদ নহে। তাহা সত্ত্বেও

প্রাচীন কালে হাদ্‌রামাওত ও নাজরানের মধ্যবর্তী অংশে "আদ-ই ইরাম"-এর বিখ্যাত জাতির বসবাস ছিল। এই জাতিকে আল্লাহ নাফরমানীর কারণে ধ্বংস করিয়া দেন (তারীখু আরদিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৭৩)।

মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ তাঁহার রচিত 'আম্বিয়ায়ে কুরআন' নামক গ্রন্থে 'আদ জাতির আবাসভূমির পরিচয় দিতে গিয়া বলেন, "দক্ষিণ-পূর্ব আরবে পারস্য উপসাগরীয় উপকূল হইতে 'ইরাক সীমান্ত এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে (আরবে) হাদ্‌রামাওত পর্যন্ত 'আদ জাতির আবাসভূমি বিস্তৃত ছিল (অম্বিয়ায়ে কুরআন, ১খ., পৃ. ১২৪, লাহোর)। অত্র নিবন্ধের পরবর্তী পৃষ্ঠায় 'আদ জাতির আবাসভূমির (বিলাদু আহকাফ) একটি মানচিত্র দেয়া হইল (পরের পৃষ্ঠায়)।

আদ জাতির পার্থিব সমৃদ্ধির বর্ণনা

পবিত্র কুরআনে 'আদ জাতিকে হযরত নূহ (আ)-এর পরে পৃথিবীতে আগমনকারী এবং শারীরিক শক্তি, ধনসম্পদ ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। সর্বোপরি তাহাদেরকে কাওমে নূহের পরে দুনিয়ার খিলাফত দান করা হয় ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْا اٰلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদিগকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তোমাদিগের অবয়ব অন্য লোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়ত তোমরা সফলকাম হইবে" (৭ ঃ ৬৯)।

বলা বাহুল্য, 'আদ জাতির লোকেরা বিশালদেহী এবং প্রচণ্ড শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিল। ইসরাঈলী রিওয়ায়াতসমূহে তাহাদের দেহের গঠন ও শক্তি সম্পর্কে আতিরঞ্জিত কথাবার্তা বর্ণিত আছে। তবে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) ও হযরত মুকাতিল (র) হইতে তাহাদের উচ্চতা ১২ হাত তথা ১৮ ফুট বলিয়া বর্ণনা পাওয়া যায় (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা অনুবাদ, পৃ. ১৪৫৪)। তাহাদের মত শক্তিশালী আর কোন জাতি তৎকালে পৃথিবীতে ছিল না। হাফেজ ইব্‌ন কাছীর লিখিয়াছেন যে, 'আদ জাতির একেকজন লোক বিরাট পাথরের চাড় হাতে উঠাইয়া শত্রু গোত্রের উপর নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করিয়া দিতে পারিত। তাহারা তাহাদের সচ্ছলতা, ধন-সম্পদ ও শিল্প বিজ্ঞানের বিচারে সমসাময়িক সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। তাহাদের শান-শওকত ও সার্বিক শক্তিমত্তা তাহাদেরকে অংহকারী, অত্যাচারী ও সীমালংঘনকারী বানাইয়া দেয়। তাহাদের অধিকৃত এলাকায় তাহারা সদম্ভে বিচরণ করিত। তাহারা ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিসমূহের উপর অন্যায়ভাবে কঠোর আচরণ ও জুলম করিত। তাহাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ছিল না। নিজেদের শক্তিমত্তার ক্ষেত্রে তাহারা কাহাকেও পরওয়া করিত না।

তাহারা অহংকারের সহিত বলিত, এই পৃথিবীতে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে? তাহাদের এই অন্যায় দাবি পবিত্র কুরআনে বিবৃত হইয়াছে ঃ "আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, উহারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করিত এবং বলিত, আমাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? উহারা কি

কাস্পিয়ান সাগর
সিরিয়া
দিজলা নদী
ফোরাত নদী
রোম সাগর
মিসর
সিনাই উপদ্বীপ
বায়তুল মাকদিস
পারস্য
বসরা
পারস্য উপসাগর
বাহরাইন
মদীনা
মক্কা
আরব ভূমি
উমান
ইয়ামন
আদ জাতির বাসভূমি
আহকাফ-এর বসতভূমি
এডেন
হাদরামাওত
আরব সাগর
আবিসিনিয়া
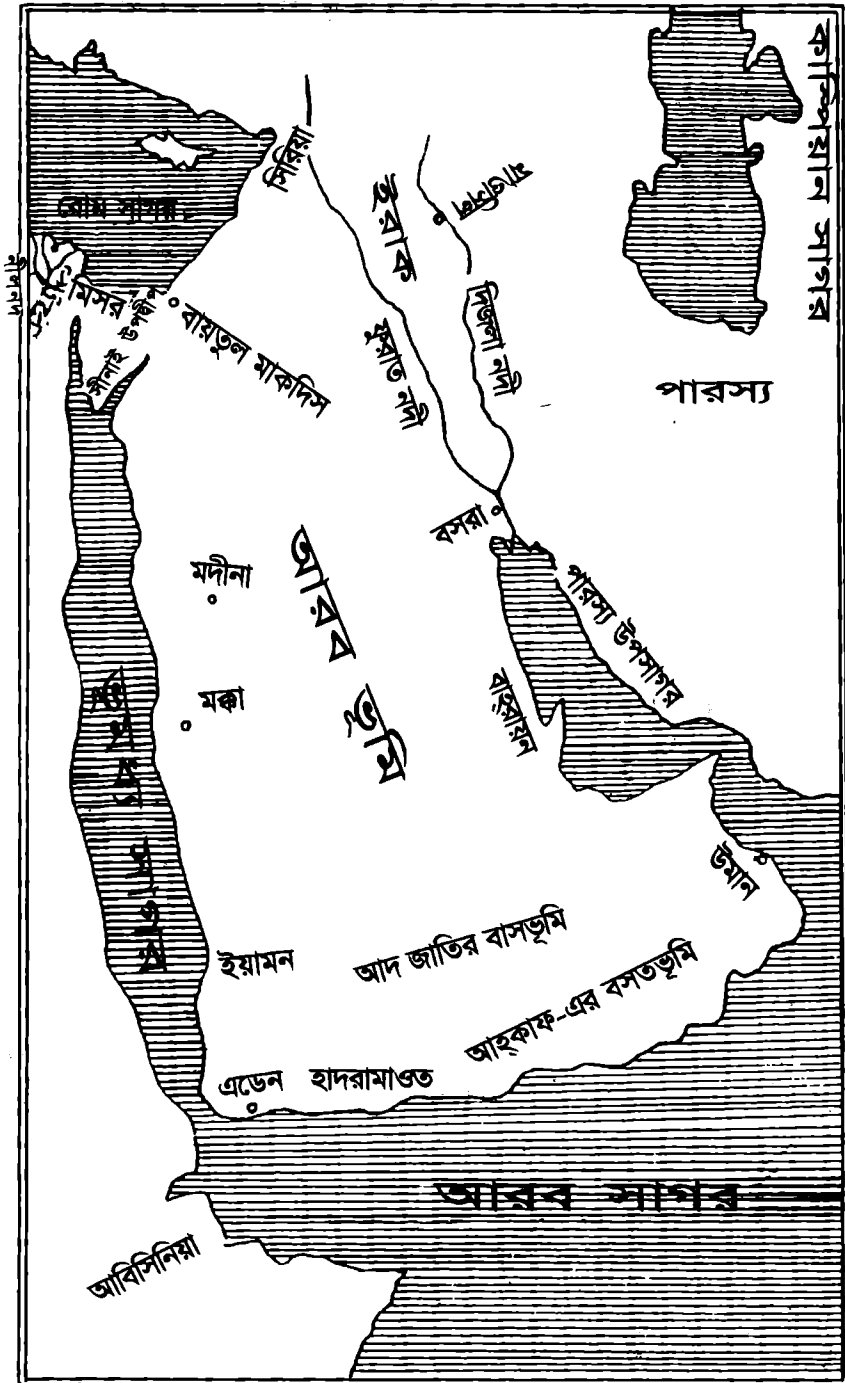
তবে লক্ষ্য করে নাই যে, আল্লাহ যিনি উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি উহাদিগের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ উহারা আমার নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করিত" (৪১ ঃ ১৫)।

'আদ জাতির ঔদ্ধত্য ও অবিমৃষ্যকারিতা এমন পর্যায়ে ছিল যে, তাহারা তাহাদের উপর আপতিত আযাবের কথা বা আখিরাতের আযাবের কথা হযরত হূদ (আ)-এর মুখ হইতে শ্রবণ করার পরও দম্ভভরে কথা বলে। পবিত্র কুরআনের সূরা আহকাফে বলা হইয়াছে ঃ

"উহারা বলিয়াছিল, 'তুমি আমাদিগকে আমাদিগের দেব-দেবীগুলির পূজা হইতে নিবৃত্ত করিতে আসিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর" (৪৬ ঃ ২২)।

আদ জাতির ধর্মমত

আদ জাতি মূর্তি নির্মাণে পটু ছিল। তাহাদের পূর্ববর্তী মূর্তিপূজকদের মত তাহারাও বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি নির্মাণ করিয়া ইহাদের পূজা করিত। তাহাদের মূর্তিসমূহের নাম ছিল ঃ ওয়াদ্দ, সুআ, য়াগূছ, য়াঊক ও নাস্র। হযরত নূহ (আ)-এর কওমের পরে প্রথম মূর্তিপূজা আরম্ভকারী ছিল এই আদ জাতি বা আদ-ই ইরাম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, খ. ১, পৃ. ১২১; নাজ্জারের কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫১)।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(আদ জাতি) এক মূর্তির পূজা করিত, উহাকে সামূদ বলা হইত এবং আর একটি মূর্তির পূজা করিত ঐ মূর্তিকে আল্-হাতার বলা হইত" (আবদুল ওয়াহ্হাব আন্-নাজজার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫১)।

ইব্ন কাছীর তাঁহার কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে বলেন ঃ নিশ্চয় আদ জাতি এবং তাহারা হইল আদ-ই ঊলা বা ১ম আদ জাতি। হযরত নূহ (আ)-এর তুফানের পর তাহারা ছিল প্রথম মূর্তিপূজক। তাহাদের মূর্তি ছিল তিনটি, যথা সামাদ, সামূদ ও হারা।

মোটকথা আদ জাতি মূর্তি বা দেব-দেবীর পূজায় এতই বিমূঢ় ছিল যে, তাহারা কোনক্রমেই হযরত হূদ (আ)-এর দাওয়াত গ্রহণ করিয়া এক আল্লাহ্য় বিশ্বাস করে নাই এবং তাঁহার ইবাদত করে নাই। তবে তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাহাদের মধ্য হইতে মুষ্টিমেয় লোক ঈমানদার ছিলেন এবং গযব হইতে নবীর সঙ্গে রক্ষা পান।

হযরত হূদ (আ)-এর কর্মজীবন বা দাওয়াতী জীবন

আল্লাহ তা'আলা হযরত হূদ (আ)-কে পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী, অহংকারী, জালেম, আল্লাহর নাফরমান মূর্তিপূজক আদ জাতির মধ্যে প্রেরণ করেন। আদ জাতি যখন তাহাদের শক্তিমত্তায় উন্মত্ত হইয়া আরব ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় লুটপাট, অসৎ কার্যকলাপ, ঝগড়া-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হইয়া পড়ে, তখন হূদ (আ) তাহাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহসমূহের বর্ণনা দানপূর্বক বলেন, হে আদ জাতি! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁহার নিয়ামতের দ্বারা ভরপুর

করিয়া দিয়াছেন। তোমরা সবুজ ও সতেজ অঞ্চলের মালিক। ধন-সম্পদ, বাগান, ঝর্ণা, গবাদি পশু, মোটকথা সকল জীবনোপকরণ তোমাদের জন্য সহজলভ্য। কওমে নূহের পর আল্লাহ তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। তাই বলিয়া ইহার অর্থ এই নহে যে, তোমরা আল্লাহ্র যমীনে অহংকার করিবে, দুর্বলের উপর জুলুম করিবে, মানুষের অধিকার ছিনাইয়া নিবে, নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিবে, ভাল ও মন্দের মধ্যে কোন পার্থক্য করিবে না এবং তোমরা এইসব অন্যায় কেবল এই মনে করিয়া করিতেছ যে, আল্লাহ্র যমীনের উপর তোমাদের জওয়াবদিহি নেওয়ার মত আর কেহ নাই। তোমরা যদি উপরিউক্ত সকল কার্যকলাপ এবং পাপাচার পরিত্যাগপূর্বক তোমাদের চরিত্র সংশোধন কর, আল্লাহ্র নিকট পাপ মার্জনা চাহিয়া নিজেদেরকে তাঁহার মুখাপেক্ষী কর, তাহা হইলে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের শক্তিমত্তা ও সচ্ছলতায় আরও উন্নতি দান করিবেন এবং তোমরা পরিত্রাণ লাভ করিবে। কিন্তু তোমরা যদি নিজেদেরকে সংশোধন না কর, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও যে, আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এইসব অনুগ্রহরাজি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন, তিনি তোমাদের বাদ দিয়া অন্য আর এক জাতিকে রাজত্ব দান করিবেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত হূদ (আ)-এর দাওয়াত ও তা'লীমের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ.

"এবং হে আমার কওম! তোমাদের পালনকর্তার নিকট তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁহার দিকেই ফিরিয়া আস। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করিবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করিবেন, তোমরা অপরাধীর মত বিমুখ হইও না" (১১ ঃ ৫২)।

আদ জাতি তাহাদের বসবাসের জন্য বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করিত এবং তাহারা মনে করিত যে, তাহারা চিরকাল দুনিয়াতে থাকিতে পারিবে। তাহারা মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিত এবং দুর্বলের উপর জুলুম করিত। তাহাদের এহেন কার্যকলাপের উল্লেখ করিয়া আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوْا اٰلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"তোমরা প্রতিটি উচ্চ স্থানে নিরর্থক স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করিতেছ? এবং বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছ, যেন তোমরা চিরকাল এই অট্টালিকায় থাকিবে। যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জালেম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাঁহাকে, যিনি তোমাদেরকে সেইসব বস্তু দিয়াছেন, যাহা তোমরা জ্ঞান। তিনি তোমাদেরকে দিয়াছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি এবং উদ্যান ও ঝর্ণা" (২৬ ঃ ১২৮-১৩৪)।

আদ জাতির মধ্যে অন্যায়-অপকর্ম এমনভাবে প্রোথিত ছিল এবং মূর্তিপূজা তাহাদের চিন্তা-চেতনায় ও অস্থি-মজ্জায় এমনভাবে বাসা বাঁধিয়াছিল যে, তাহাদের উপর হযরত হূদ (আ)-এর

ওয়াজ-নসীহত কোন প্রভাব ফেলিতে পারে নাই। তাহারা হযরত হূদ (আ)-এর পয়গাম শ্রবণে আগ্রহী হয় নাই, বরং গর্ব ও অহংকার বশত মিথ্যার অপবাদ দিয়া তাঁহার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। পবিত্র কুরআনে তাহাদের বক্তব্য নিম্নোক্তভাবে উক্ত হইয়াছে ঃ "আর আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তাহারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করিত এবং বলিত, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে আছে? তাহারা কি লক্ষ্য করে নাই যে, যে আল্লাহ তাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাদের অপেক্ষা শক্তিধর? বস্তুত তাহারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করিত" (৪১ ঃ ১৫)।

হযরত হূদ (আ) তাঁহার কওমকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, হে আমার সম্প্রদায়! ফেরেশতাদেরকে রাসূল হিসাবে পাঠানো উচিত ছিল, এই মর্মে তোমাদের বক্তব্য তোমাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। তোমাদের কওমের কাহারও উপর আল্লাহ্‌র পয়গাম অবতীর্ণ হওয়ায় আশ্চর্য হওয়া উচিত নহে। কেননা প্রথম হইতেই আল্লাহ্‌র এই বিধান চলিয়া আসিতেছে। তিনি (আল্লাহ) মানবজাতির হিদায়াত ও সংশোধনের জন্য তাহাদের মধ্য হইতেই কোন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়া তাঁহার রাসূল বানাইয়া প্রেরণ করেন এবং ঐ রাসূলের মাধ্যমে সকল বান্দার নিকট তাঁহার আহকাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম এই যে, কোন কওমের হিদায়াতের জন্য এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করা উচিত, যিনি সেই কওমেরই একজন হইবেন, তাহাদের ভাষায় কথা বলিবেন, তাহাদের চরিত্র-অভ্যাস এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ভালভাবে জানেন, তাহাদের মতই জীবনযাপন করেন এবং কওমের সকলেই তাঁহাকে চিনে।

হযরত হূদ (আ)-এর উপদেশ সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের বাপ-দাদার ধর্মে অটল থাকে। তাহরা এই কথা বলিয়া তাঁহাকে হাসি-ঠাট্টা করে যে, যেহেতু হযরত হূদ (আ) আমাদের দেবতাদের মন্দ বলেন, সেই হেতু দেবতারা তাঁহাকে কিছু করিয়াছে অর্থাৎ তাঁহার ক্ষতি করিয়াছে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ "তাহারা (কওমে আদ) বলিল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়া আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করিতে পারি না, আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নহি। আমরা তো ইহাই বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপর শোচনীয় ভূত চাপাইয়া দিয়াছে। সে বলিল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাহাদের সঙ্গে, যাহাদেরকে তোমরা শরীক করিতেছ" (১১ ঃ ৫৩-৫৪)।

সূরা আল-আ'রাফ-এ কওমে হূদ ও হযরত হূদ (আ)-এর কথোপকথনের বিষয় পরিষ্কারভাবে উক্ত হইয়াছে ঃ "তাহার সম্প্রদায়ের (আদ) সর্দাররা যাহারা কুফরী করিয়াছিল, বলিল ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখিতে পাইতেছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বলিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি মোটেই নির্বোধ নহি, বরং আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রাসূল। আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং আমি তোমাদের বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্খী। তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ যে, তোমাদের মধ্য হইতেই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে উপদেশ আসিয়াছে, যাহাতে তিনি তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করেন। তোমরা স্মরণ

কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কাওমে নূহের পর সর্দার করিয়াছেন এবং তোমাদের দেহের বিস্তৃতি বেশী করিয়াছেন। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ কর যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদের কাছে এইজন্য আসিয়াছ যে, আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাহাদের পূজা করিত, তাহাদেরকে ছাড়িয়া দেই? অতএব নিয়া আস আমাদের কাছে যাহার দ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাইতেছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও" (৭ ঃ ৬৬-৭০)।

হযরত হূদ (আ) তাঁহার কাওমের লোকদের সন্দেহ দূর করার জন্য পরিষ্কার ভাষায় বলেন, তোমরা এমন মনে করিও না যে, আমি কোন পদ-পদবী অথবা সম্পদ ও প্রাচুর্যের লোভ-লালসায় এইসব কথা শিক্ষা দিতেছি। এমন নহে, বরং আমি তো আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত, কেবল আল্লাহ্র পয়গাম তোমাদেরকে শুনাই এবং কোন লোভ-লালসা ছাড়াই আমার উপর অর্পিত এই অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেছি। তোমাদের নিকট হইতে কোন জিনিস প্রতিদান হিসাবে চাহি না। আমি তো কেবল আমার আল্লাহ্র নিকটই প্রতিদানের প্রত্যাশা করি।

হযরত হূদ (আ)-এর এই আহ্বানের পরেও আদ জাতি প্রচণ্ডভাবে তাহাদের বিরোধিতা অব্যাহত রাখে এবং তাহারা হূদ (আ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ "তাহারা বলিল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। এইসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ কিছু নহে। আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হইব না" (২৬ ঃ ১৩৬-৮)

কাওমের অহংকারী লোকেরা বলিতে থাকে, আপনি আমাদের আযাবের যে ভয় দেখান সেই আযাব নিয়া আসুন। হূদ (আ) বলেন, আযাব নিয়া আসা তো কেবল আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। আমি তো আল্লাহ্র দূতমাত্র। আমাকে যে পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমি শুধু পৌঁছাইয়া থাকি।

হযরত হূদ (আ)-এর এই আহ্বানের প্রত্যুত্তরে আদ-এর লোকেরা যাহা বলে, পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত ভাষায় তাহা বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ "তাহারা বলিল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবী হইতে নিবৃত্ত করিতে আগমন করিয়াছ? তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদেরকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা নিয়া আস। সে বলিল, ইহার জ্ঞান তো আল্লাহ্র কাছেই রহিয়াছে। আমি যে বিষয়সহ প্রেরিত হইয়াছি, কেবল তাহাই তোমাদের কাছে পৌঁছাই। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়" (৪৬ ঃ ২২-২৩)।

হযরত হূদ (আ)-এর জওয়াবের পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের বক্তব্য পবিত্র কুরআনে এইভাবে উক্ত হইয়াছে ঃ "তাহারা বলিল, হে হূদ! তুমি আমাদের নিকট কোন প্রমাণ নিয়া আস নাই। আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করিতে পারি না এবং আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না" (১১ ঃ ৫৩)।

হূদ (আ) আদ-এর লোকদের এই চরম কথার যে জওয়াব দেন তাহা পবিত্র কুরআনে এইভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ "সে বলিল, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হইয়াই আছে; তবে কি তোমরা আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইতে চাহ এমন কতকগুলি

নাম সম্বন্ধে যাহা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সৃষ্টি করিয়াছ এবং যে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন সনদ পাঠান নাই? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছি" (৭ : ৭১)।

আদ জাতির ধ্বংস

পরিশেষে অকৃতজ্ঞ, বিদ্রোহী, নাফরমান আদ সম্প্রদায়ের অন্তিম সময় উপস্থিত হয়। অন্যায় অপকর্মের শাস্তি শুরু হয়। দেখিতে দেখিতে আদ জাতির বিশাল শান-শওকতপূর্ণ ও বিরাট বিরাট স্তম্ভসমূহ এবং বিরাট উচ্চতাসম্পন্ন অট্টালিকাপূর্ণ বসতিগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। প্রথমে এই জাতিকে অনাবৃষ্টি আক্রমণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের ফলে তাহারা মারা যাইতে থাকে। অতঃপর চূড়ান্ত পর্যায়ে নিকষ কাল অন্ধকারপূর্ণ প্রচণ্ড তুফান আরম্ভ হয়।, সেই তুফান সাত রাত্র ও আট দিন ধরিয়া চলিতে থাকে এবং কাওমে আদ-এর সবকিছু ধ্বংস করিয়া দেয়। সেইসব শক্তিধর ও মজবুত বাঁধনের মানুষগুলি, যাহারা নিজেদেরকে শক্তি ও সামর্থ্যের অহংকারে মূল্যায়ন করিয়া বলিত : مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে?) এই গর্বিত ও অহংকারী জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। তাহাদের বাসগৃহসমূহ ধ্বংস্তূপে পরিণত হইল। বর্তমানে ঐ স্থানে বালির পাহাড় বা টিলা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

পবিত্র কুরআন মানবজাতির উপদেশ গ্রহণের জন্য কাওমে আদ-এর কথা বারবার উল্লেখ করিয়াছে : অতঃপর যখন উহারা উহাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন বলিতে লাগিল, 'উহা তো মেঘ, আমাদিগকে বৃষ্টি দান করিবে'। হূদ বলিল, 'ইহাই তো তাহা, যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, ইহাতে রহিয়াছে এক ঝড়-মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ্র নির্দেশে ইহা সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করিয়া দিবে'। অতঃপর উহাদের পরিণাম এই হইল যে, উহাদের বসতিগুলি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। এইভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়া থাকি। আমি উহাদিগকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলাম, তোমাদিগকে তাহা দেই নাই। আমি উহাদিগকে দিয়াছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু এইগুলি উহাদের কোন কাজে আসে নাই। কেননা উহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করিয়াছিল। যাহা লইয়া উহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত উহাই উহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল (দ্র. ৪৬ : ২৪-২৬)।

হযরত হূদ (আ) তাঁহার অনুসারী সঙ্গীগণসহ ঐ ভয়াবহ ধ্বংসলীলা হইতে আল্লাহ্র অনুগ্রহে রক্ষা পাইলেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন : "এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি হূদ ও তাঁহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদিগকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি হইতে" (দ্র. ১১ : ৫৮)। আদ সম্প্রদায়ের বিপর্যয় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন : "এবং নিদর্শন রহিয়াছে আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণকর বায়ু। ইহা যাহা কিছুর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তাহাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিল" (৫১ : ৪১-৪২)।

আদ সম্প্রদায়ের উপর কত ভীষণ শাস্তি প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"আদ সম্প্রদায় সত্য অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে কী কঠোর হইয়াছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। উহাদের উপর আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে। মানুষকে উহা উৎখাত করিয়াছিল উন্মুলিত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়" (৫৪ ঃ ১৮-২০)।

আখিরাতের আযাবের মত দুনিয়ায়ও আযাব দিয়া আল্লাহ্ মানুষের জন্য নিদর্শন রাখেন। এই সম্পর্কে সূরা হা-মীম-আস্-সাজ্‌দায় আল্লাহ্ বলেন ঃ "অতঃপর আমি উহাদিগ্‌কে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাইবার জন্য উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদিগকে সাহায্য করা হইবে না" (৪১ ঃ ১৬)।

সূরা আল-হাক্কায় কাওমে আদ-এর ধ্বংসের চিত্র নিম্নোক্তভাবে অংকন করা হইয়াছে ঃ "আর আদ সম্প্রদায়, উহাদিগকে ধ্বংস করা হইয়াছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা, যাহা তিনি উহাদের উপর প্রবাহিত করিয়াছিলেন সপ্ত রাত্রি ও অষ্ট দিবস বিরামহীনভাবে। তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখিতে উহারা সেথায় লুটাইয়া পড়িয়া আছে সারশূন্য খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়। অতঃপর উহাদের কাহাকেও তুমি বিদ্যমান দেখিতে পাও কি" (৬৯ ঃ ৬-৮)?

হযরত হূদ (আ) ও তাঁহার অনুসারীগণ আল্লাহ্‌র রহমতে রক্ষা পান। মূর্তিপূজকদের কেহই বাঁচে নাই। সূরা আল-আ'রাফে এই সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ "অতঃপর আমি তাহাকে ও তাহার সঙ্গীদিগকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করিয়াছিলাম; আর আমার নিদর্শনকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহারা মুমিন ছিল না তাহাদিগকে নির্মূল করিয়াছিলাম" (৭ ঃ৭২)।

আদ জাতির উপর আযাব আসার মুহূর্তে সংঘটিত একটি অভিনব ঘটনার বিবরণ ইব্‌ন কাছীর উল্লেখ করেন। যখন কাওমে আদ তাহাদের কুফরীর উপর অটল থাকে এবং হযরত হূদ (আ)-এর কথা অমান্য করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তিন বৎসর পর্যন্ত তাহাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ রাখেন। ফলে আদ জাতি দুর্ভিক্ষ কবলিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে হাহাকার শুরু হইয়া যায়। কা'বা শরীফ ঐ যুগেও দু'আ কবুলের জন্য বিখ্যাত ছিল। সুতরাং এই প্রত্যাশায় আদ সম্প্রদায়ের ৭০জন লোকের একটি প্রতিনিধি দল দু'আ করার জন্য কা'বা শরীফের দিকে রওয়ানা হয়। মক্কা মুআজ্জামায় ঐ সময়ে আমালিকা সম্প্রদায়ের একটি পরিবার অবস্থান করিতেছিল। তাহাদের সর্দার মুআবিয়া ইব্‌ন বাক্‌র-এর মাতা ছিল আদ সম্প্রদায়ের মেয়ে। আদ-এর প্রতিনিধি দলের লোকেরা এই আত্মীয়তার সুবাদে আমালিকার সর্দারের মেহমান হয়। তিনি তাহাদের ভালভাবে মেহমানদারী করেন। মদের সঙ্গে সঙ্গে দু'টি দাসীও মনোরঞ্জনের জন্য নিয়োজিত হয়। তাহারা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল তাহা ভুলিয়া যায় এবং আরাম-আয়েশ ও আনন্দ-স্ফূর্তিতে মগ্ন হয়। অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর মেযবানের মনে পড়ে যে, কাওমে আদ-এর কারণে যেন আবার তাহার গোত্রকে আল্লাহ্‌র গযবের শিকার হইতে না হয়। কিন্তু তিনি মেহমানদেরকে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য বলিতে পারিতেছিলেন না। পরিশেষে তিনি কতিপয় কবিতা রচনা করিয়া দাসীদেরকে গাহিবার জন্য নির্দেশ দেন। এই কবিতায়

কাওমে আদ-এর মুসিবতের কথা উল্লেখ ছিল। এই কবিতা শুনিয়া আদ-এর প্রতিনিধি দলের সদস্যদের এই স্থানে আগমনের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ হয়। অবশেষে তাহারা কা'বা শরীফে পৌঁছে এবং আল্লাহর নিকট কাওমে আদ-এর উপর আপতিত অনাবৃষ্টি দূর হওয়ার জন্য দু'আ করে। এই দু'আর ফলে আসমানে তিন রং-এর মেঘ প্রকাশিত হয়, যেমন কালো, সাদা ও লাল। অতঃপর আসমান হইতে একটি আওয়াজ আসে, তোমরা এই তিনটি মেঘের টুকরা হইতে যে কোন একটি নির্বাচন করিয়া লও। 'আদ মুখপাত্র কালো মেঘ পছন্দ করিল। কেননা তাহাদের ধারণায় উহার মধ্যে পানি বেশী ছিল। ইহার পর আসমান হইতে পুনরায় আওয়াজ আসে, তোমরা ধ্বংসকারী মেঘ পছন্দ করিয়াছ, যাহা সব কিছু তছনছ করিয়া দিবে।

অবশেষে এই কালো মেঘ আদ জাতির বসতির উপর প্রেরণ করা হয়, যাহা আল্লাহ্র আযাব হিসাবে তাহাদের উপর আট দিন ও সাত রাত্রি ধরিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতে থাকে এবং সমগ্র এলাকা ধ্বংস করিয়া দেয়। কেবল হযরত হূদ (আ) ও তাঁহার সাথিগণ রক্ষা পান। ঐ সময়ে তাহারা একটি ঘরে নিরাপদে বসিয়াছিলেন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ, ২২৬)।

হযরত হূদ (আ) -এর শেষ জীবন ও ইনতিকাল

কাওমে 'আদ-এর ধ্বংসের পর হযরত হূদ (আ) হাদরামাওতের দিকে চলিয়া যান এবং অপর এক সূত্রমতে অবশিষ্ট জীবন তিনি ঐ স্থানেই অতিবাহিত করেন। ইনতিকালের পর ঐ স্থানেই তাঁহাকে দাফন করা হয়। হাফেজ ইব্ন কাছীরের তাফসীরে ইব্ন ইসহাকের রিওয়ায়াতকৃত হযরত আলী (রা)-র হাদীছে বলা হয় যে, তিনি হাদরামাওতের এক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কি হাদরামাওতের অমুক স্থানে লাল মাটির একটি টিলা দেখিয়াছ, যাহার উপর কুল ও কাঁটাযুক্ত গাছ রহিয়াছে? হাদরামী বলেন, হাঁ, ঐ স্থানটি সম্পূর্ণ এমনই। হযরত আলী (রা) বলেন, ঐ স্থানে হযরত হূদ (আ)-এর কবর রহিয়াছে। কাহারও মতে তাঁহার কবর দামিশকের জামে মসজিদের কিবলার দিকস্থ দেওয়ালের পাশে অবস্থিত।

কাসাসুল আম্বিয়ার লেখক আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার লিখেন যে, হাদরামাওতের বাসিন্দাদের বক্তব্য যুক্তিযুক্ত। কেননা আদ জাতির আবাসভূমি হাদরামাওতের সঙ্গে মিলিত, ফিলিস্তীনের সঙ্গে নহে (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৩)।

হযরত হূদ (আ)-এর মাযার নামে হাদ্রামাওত অঞ্চলের قيم নামক স্থানের পূর্বদিকে একটি যিয়ারতগাহ অদ্যাবধি বিদ্যমান (আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, কুরআনুল হাকীম, পৃ. ৪৬৯)।

হযরত হূদ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি

হযরত হূদ (আ)-এর দুই পুত্রের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। একজনের নাম পেলগ (Peleg) এবং অপরজনের নাম يقطان (য়াকতান; Joktan)। য়াকতানকে আরবরা কাহতান বলে। বনী কাহতান তাঁহারই বংশধর (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ১খ., পৃ. ১৩৬; দ্র. বাইবেল, আদিপুস্তক, ১১ ঃ ১৪, পৃ. ১৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, মিসর; (২) ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত, লেবানন; (৩) মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মাআরেফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা ঃ মাওলানা মুহীউদ্দীন খান); (৪) ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইব্ন কাছীর, তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., বৈরূত, লেবানন ১৯৮৬ খৃ.; (৫) ইমাম কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন (তাফসীর কুরতুবী), ৫খ., বৈরূত, লেবানন ১৯৯৩ খৃ; (৬) ইব্ন কাছীর আল্-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, তা. বি., দারু ইহ্য়া আত্-তুরাছ আল্-আরাবী; (৭) আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত; (৮) আবূ তাহির মুহাম্মাদ মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (হিজরী ১৩২ /৭৫০ খৃ. পর্যন্ত), ইসালিমক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮২ খৃ.; (৯) মুহাম্মাদ রশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার, খ. ৮, ২য় সংস্করণ দারুল মারিফা, বৈরূত, লেবানন; (১০) হিফজুর রহমান সিওহারবী, কাসাসুল কুরআন, দিল্লী ১৯৭৮ খৃ.।

সিরাজ উদ্দিন আহমদ

৬

হযরত সালিহ (আ)

حضرت صالح عليه السلام

হযরত সালিহ (আ)

ছামূদ জাতির প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্‌র একজন নবী। ছামূদ জাতি ছিল পৌত্তলিক। তাওহীদের দাওয়াতের নিমিত্ত প্রতিমা পূজারীদের প্রতি যেই সকল নবী প্রেরিত হইয়াছিলেন, সালিহ (আ) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। আল-কুরআনে তাঁহার কথা নূহ (আ) ও হূদ (আ)-এর পরেই আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত, হযরত নূহ (আ) তদীয় উর্ধ্বতন পুরুষ।

ছামূদের বংশপরিচয়

সালিহ (আ)-এর বংশ তালিকা দুইটি স্তরে লিখিত আছে। একটি স্তর হইল তাহার হইতে তদীয় পূর্বপুরুষ ছামূদ পর্যন্ত। অপর স্তর হইল ছামূদ হইতে হযরত নূহ (আ) পর্যন্ত। দুইটি স্তরেই বংশতালিকা বর্ণনায় মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। পূর্ণ বংশ তালিকায় যে সকল নাম রহিয়াছে তাহাও একেক গ্রন্থে একেকভাবে লিখিত। ইমাম বাগাবী বর্ণিত বংশতালিকা অনুসারে সালিহ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন আসিফ ইব্‌ন মাশিহ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন হাদির ইবন ছামূদ (আল-বাগাবী, মাআলিমুত-তানযীল, ২খ., ১৭৪)। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণিত বংশতালিকা সালিহ ইবন উবায়দ ইব্‌ন জাবির ইব্‌ন ছামূদ (আল-আলুসী, রূহুল মাআনী, ৮ খ., ১৬২)। এই সম্পর্কে মওলানা হিফজুর রহমান বলেন, ইমাম বাগাবী (র) যদিও ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র)-এর অনেক পরের লোক, এমনকি তিনি তাওরাত গ্রন্থের একজন পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বংশতালিকা বিশেষজ্ঞগণ ইমাম বাগাবীর অভিমতকে ঐতিহাসিক দিক দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন, ১খ., ১২৩)। দ্বিতীয় স্তর ছামূদ হইতে উপরস্থ বংশতালিকা সম্পর্কেও দুইটি অভিমত রহিয়াছে। একটি হইল ঃ ছামূদ ইব্‌ন আমির ইব্‌ন ইরম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ) । অপরটি হইল ঃ ছামূদ ইব্‌ন আদ ইব্‌ন আউস ইব্‌ন ইরম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ) । দ্বিতীয় অভিমতটিকে ইমাম ছা'লাবী প্রাধান্য দিয়াছেন (আল-আলূসী, রূহুল মাআনী, প্রাগুক্ত)। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর সালিহ (আ)-এর বংশতালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ সালিহ ইব্‌ন আদ ইব্‌ন মাশিহ ইব্‌ন উবায়দ ইব্‌ন হাদির ইব্‌ন ছামূদ ইব্‌ন আবির ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ) (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১/১খ., ১২৩)। সালিহ (আ)-এর বংশতালিকা বিভিন্ন নাম সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয় (দ্র. ইব্‌ন কাছীর, বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, আল-কুরতুবী, আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন, ৭খ., ২৩৮ পৃ.; আল-আলূসী, রূহুল মাআনী; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ১খ., ৬৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে মাশিজ (ماشج), অন্যান্য গ্রন্থের সহিত ইহার মিল নাই। বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, বৈরূত তা. বি., ৬খ, ৩৩২; হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ১খ., ১২২;

পৃ. ইব্‌ন খালদূন, তারীখ, বৈরূত ১৯৭৯ খৃ., ২খ., ২৩। আল-মাসউদী, মুরূজুয যাহাব; চতুর্থ সংস্করণ মিসর ১৩৮৪ হি., ২খ., ৪৩)।

আল-কুরআনে সালিহ ও ছামূদের কথা

আল-কুরআনে সালিহ (আ)-এর কথা তিনটি সূরার আটটি স্থানে আসিয়াছে। (আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৯৮-এ বলা হইয়াছে, সালিহ (আ) কথা কুরআনে আসিয়াছে কিন্তু বাস্তবের সাথে ইহার মিল নাই) তাহা হইল নিম্নরূপ ঃ

সূরা	আয়াত নম্বর	মোট
আ'রাফ	৭৩, ৭৫, ৭৭	৩
হূদ	৬১-৬২, ৬৬,৮৯	৪
শু'আরা	১৪২	১
সর্বমোট		৮টি

ছামূদ গোত্রের কথা নিম্নোক্ত নয়টি সূরায় রহিয়াছে ঃ আরাফ, হূদ, হিজর, নামল, ফুসসিলাত (হামীম আস-সিজদা), আন-নাজ্‌ম, আল-কামার, আল-হাক্কা, আল-শাম্‌স (হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ১খ., ১২২)। আল-কুরআনুল করীমে কোন সময় স্বতন্ত্রভাবে আবার কোন সময় অন্যান্য গোত্রের সহিত মিলিতভাবে তাহাদের কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহারা হইল কওমে নূহ ও কওমে আদ্‌, আসহাবুর রাসস (أَصْحَابُ الرَّسِّ), কওমে লূত ও আসহাবুল আয়কা। আদ জাতির সহিত আলোচনা করিবার সময় একটিমাত্র স্থান ব্যতীত সকল স্থানেই তাহাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্থানটি হইলঃ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (সূরা আল-হাক্কা, আয়াত ৪)। আসহাবুর রাসসের সহিত দুইবার আলোচনা করা হইয়াছে। একবার ছামূদের কথা আগে এবং একবার পরে। যেমন وَعَاداً وَّثَمُوْدَا وَاَصْحَابَ الرَّسِّ (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত ৩৮)-এবং قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ (সূরা কাফ, আয়াত ১২) ঃ কওমে লূত ও আসহাবুল আয়কা -এর সহিত আলোচনার সময় ছামূদের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ঃ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ (সূরা সাদ, আয়াত ১৩)। তবে কোন আয়াতেই কওমে নূহের পূর্বে ছামূদের কথা উল্লেখ করা হয় নাই (ডঃ জাওয়াদ আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম, ১খ., ৩২২)।

ছামূদ শব্দের আভিধানিক বিশ্লেষণ

ثمد আরবী, শব্দের অর্থ হইল স্বল্প পানি। ছামূদ নামকরণের কারণ হইল ঃ আমর ইবনুল আলা হইতে বর্ণিত, পানি কম হইলে বলা হইত ثَمَدَ الْمَاءُ; যেহেতু এই জাতি পানি সংকটে জর্জরিত থাকিত এই কারণে তাহাদেরকে ছামূদ বলা হইত (রূহুল মাআনী, প্রাগুক্ত)। ছামূদ জাতিকে ছামূদ বলা হয় তাহাদের উর্ধ্বতন পুরুষ ছামূদের নাম অনুসারে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)। ছামূদ শব্দটি মুনসারিফ কিনা এই ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, শব্দটি গায়র

মুনসারিফ। কারণ এই শব্দটি দ্বারা একটি গোত্রের নাম রাখা হইয়াছে। আবূ হাতিমের মতে শব্দটি গায়র মুনসারিফ হইবার কারণ হইল ঃ ইহা একটি অনারব শব্দ (عجمى)। এই অভিমতকে ত্রুটিযুক্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইমাম নাহহাস। তিনি বলেন, শব্দটি اَلثَّمَدُ আরবী শব্দ হইতে নির্গত, যাহার অর্থ হইল اَلْمَاءُ الْقَلِيْلُ অর্থাৎ স্বল্প পানি (কুরতুবী, আল-জামে লিআহকামিল কুরআন, বৈরূত তা. বি., ৭খ., ২৩৭)। আল্লামা ছা'আলাবী তাঁহার প্রণীত তাফসীর গ্রন্থে বলেন, জুমহুর উলামা ছামূদ শব্দকে একটি গোত্রের নাম হিসাবে গায়র মুনসারিফ পড়েন। কিন্তু য়াহয়া ইব্ন ওয়াছছাব ও আল-আ'মাশ মুনসারিফ হিসাবে পাঠ করেন (ছা'আলাবী, তাফসীর, ২খ., ৩১)। ছামূদ জাতি আদ গোত্রের কিছু কাল পর আরবের উত্তর-পূর্ব অংশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছামূদ নামেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আরবের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই অংশটি মদীনা ও শাম (সিরিয়ার) দেশের মধ্যবর্তী স্থান। প্রাচীন আরববাসীরা ইহাকে হিজ্র বলিত (আবদুল হক দেহলাবী, তাফসীর হাক্কানী, ২খ., ৪০০)।

ছামূদ জাতির পরিচয়

বিশিষ্ট সাহাবী আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاَرْبَعَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ هُوْدٌ وَّشُعَيْبٌ وَّصَالِحٌ وَّنَبِيُّكَ يَا اَبَا ذَرٍّ .

"নবী করীম (স) বলিয়াছেন, চারজন নবী হইলেন আরব বংশোদ্ভূত ঃ হূদ, শু'আয়ব, সালিহ ও তোমার নবী (মুহাম্মাদ) হে আবূ যারর" (ছা'আলাবী, তাফসীর, ২খ., ৩১-৩২)। আলূসী ছামূদ সম্প্রদায়ের আদি মানব ছামূদ সম্পর্কে বলেন ঃ কথিত আছে, ছামূদ ছিলেন তাসাম ও জাদীসের ভ্রাতা (রূহুল মাআনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩)। হিফজুর রহমান বলেন, ছামূদ সম্প্রদায় হইল নূহ (আ)-এর পুত্র সামের বংশধরগণের (সেমিটিক) একটি শাখা। সম্ভবত ইহারা প্রথম আদ জাতির ধ্বংসের পর হযরত হূদ (আ)-এর প্রাণে বাঁচিয়া যাওয়া লোকজন। উহাদেরকে দ্বিতীয় আদ বংশ বলা হয় (কাসাসুল কুরআন, ১খ., ১২৩)। আরবী অভিধান লিসানুল আরাব ও তাজুল আরূসে উল্লেখ আছে যে, ছামূদ সম্প্রদায় হইল আদ সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদের বংশধর (ইব্ন মানজূর, লিসানুল আরাব, ১খ., ৫০; আয-যাবীদী, তাজুল আরূস, ১খ., ৩১২)। জুরজী যায়দান বলেন, ইতিহাসবিদগণের অভিমত হইল, আরবজাতি বড় দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি হইল আরবে বায়দা, আর অপরটি আরবে বাকিয়্যা। আদ ও ছামূদ জাতি হইল আরবে বায়দা বা ধ্বংসপ্রাপ্ত আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত (জুরজী যায়দান, তারীখুত তামাদদুনিল ইসলামী, ১খ., ১৫)। আল-মাসঊদী বলেন, ছামূদ জাতির প্রথম অধিপতি ছিল আবির ইব্ন ইরাম। সে দুই শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। তাহার পর ক্ষমতায় আরোহণ করে জুনদা ইব্ন আমর। সে সর্বসাকুল্যে তিন শত সাতাইশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল (আল-মাসঊদী, মুরূজুয যাহাব)।

ছামূদ জাতির আবাস

আল-মাসউদী বলেন, শাম (সিরিয়া) ও হিজাযের মধ্যবর্তী স্থান হইতে কৃষ্ণ সাগর উপকূলবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত স্থান ছামূদ ইব্ন আবিরের অধিকৃত ছিল। তাহাদের গৃহাদি ছিল ফাদলুন-নাকা নামক স্থানে। গৃহগুলির চিহ্ন পাহাড়ে খোদাইকৃত অবস্থায় এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। সিরিয়া হইতে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিলে পথিমধ্যে ওয়াদিল কুরার (وادى القرى) নিকটবর্তী স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন অট্টালিকা পরিলক্ষিত হয় (মুরূজুয যাহাব, প্রাগুক্ত)। ইব্ন জারীর তাবারী (র) ইব্ন ইসহাক সূত্রে বলেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের গৃহাদি ছিল হিজরের মরুভূমি অঞ্চলে। এই মরুময় স্থানটির নাম হইল ওয়াদিল কুরা। উহা হিজায ও শামের মধবর্তী স্থানে আঠার মাইল বিস্তৃত (তাবারী, তাফসীর, প্রাগুক্ত, ৮খ., ১৫৯)। আল্লামা কুরতুবী বলেন, কাতাদা বলিয়াছেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের আবাসভূমি ছিল মক্কা ও তাবূকের মধ্যবর্তী স্থানে (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১০খ., ৪৬)। মাওলানা আবুল আলা মাওদূদী তাঁহার তাফহীমুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের আবাস ছিল উত্তর-পশ্চিম আরবের হিজর নামক এলাকায়। বর্তমানে মদীনা তায়্যিবা ও তাবূকের মধ্যস্থিত হিজায রেলওয়ে ষ্টেশনের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এখানেই ছামূদের কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন কালে ইহাকে আল-হিজর বলা হইত। এই নীরব নগরীটি দেখিয়া মনে হয় কোন সময়ই এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা চার হইতে পাঁচ লক্ষের কম ছিল না। কুরআনুল করীম অবতরণকালে হিজাযের বাণিজ্যিক কাফেলা এই স্থান দিয়া যাতায়াত করিত (তাফহীমুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ২খ., ৪৭-৪৮)। তিনি আরও বলেন, ওয়াদিল কুরার আধুনিক নাম হইল আল-উলা। এই প্রসিদ্ধ স্থান হইতে কয়েক মাইল দূরে মদীনা তায়্যিবা ও তাবূকের মধ্যবর্তী স্থানে উত্তর দিকে ছামূদ জাতির আবাস ছিল। এখনও সেখানকার অধিবাসিগণ এই স্থানটিকে আল-হিজর বা মাদাইন সালিহ বলিয়া স্মরণ করে (তাফহীমুল কুরআন, প্রাগুক্ত, ৩খ., ৫২২)। ডঃ জাওয়াদ আলী নুওয়ায়রী রচিত নিহায়াতুল আরাব (نهاية العرب) গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়া তিনি বলেন, কবি বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা আদ জাতিকে ধ্বংস করিবার পর ছামূদ জাতি উহাদের স্থলাভিষিক্ত হয়। আদ গোত্রের আবাসভূমি আবাদ করিয়া তাহারা সেইখানে বসবাস করিতে লাগিল। ছামূদরা ছিল দশাধিক গোত্রে বিভক্ত (ডঃ জাওয়াদ আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম, পাদটীকা, ১খ., ৩২৪)। আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার বলেন, আমার কোন এক সঙ্গী ছামূদ জাতির আবাস ভূমিতে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, প্রাসাদটি বিশাল আকৃতির। ইহা খোদাইকৃত প্রস্তর নির্মিত (আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, ৫৮ পৃ.)। হাদরামাওতবাসীরা দাবি করে যে, ছামূদ জাতির আবাস ও গৃহাদি আদ জাতির শিল্পকর্মেরই ফসল হইয়াছে। তাহাদের এই দাবি এই কথার পরিপন্থী নহে যে, ছামূদ সম্প্রদায় স্থাপত্য শিল্পে খুবই পারদর্শী ছিল এবং প্রাসাদসমূহ তাহাদের নিজেদেরই নির্মিত। এইজন্য যে, প্রথম আদ জাতি ও দ্বিতীয় আদ জাতি প্রকৃতপক্ষে একই সম্প্রদায়ভুক্ত। সালিহ (আ) কর্তৃক স্বীয় উম্মতকে নিম্নোক্ত আহবান ইহার সমর্থক ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا .

"স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ" (৭ ঃ ৭৪; হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, করাচী, ১৪০০ হি., ১খ., ১২৪; আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজজার, কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত তা. বি., পৃ. ৫৯)।

ছামূদ জাতির সময়কাল

ছামূদ জাতির সময়কাল সম্পর্কে আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার ও মাওলানা হিফজুর রহমান বলেন, এই সম্পর্কে ইতিহাস নীরব থাকার ফলে এই জাতির সময়কাল সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তমূলক তথ্য প্রদান করা যায় না। তবে এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে ইহাদের সময়কাল হইল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বের যমানা। ইহারা ইবরাহীম (আ)-এর মত মহান নবীর আবির্ভাবের পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এই কথা লক্ষণীয় যে, ছামূদ জাতির আবাসসমূহের আশেপাশে এমন কতিপয় কবরের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যেইগুলিতে "আরামী" ভাষায় অনেক কিছু লেখা রহিয়াছে। এই লেখাসমূহের উপর যেই তারিখ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পূর্বের লেখা। ইহা হইতে এই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইতে পারে যে, হযরত মূসা (আ)-এর পরে ছামূদ জাতির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। আসলে ব্যাপারটি এরূপ নয়। এই কবরগুলি প্রকৃতপক্ষে ছামূদ জাতির কবর নয়, বরং কবরগুলি হইল ছামূদ জাতির ধ্বংসের হাজার হাজার বৎসর পর এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপনকারী লোকজনের। এই সকল লোক তাহাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার লক্ষ্যে আরামী লিখন পদ্ধতিতে কবরগুলির উপর ফলক স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল। এই কবরসমূহ ছামূদ জাতিরও নয়, ছামূদ জাতির সময়কালেরও নয় (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৫৯; কাসাসুল কুরআন, পৃ. ১২৫-১২৬)। ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রাচীনত্ব আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হইতে প্রতীয়মান হয় ঃ

اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ ـ

"তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসে নাই, তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, আদের ও ছামূদের এবং তাহাদের পূর্ববর্তীদের? উহাদের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ জানে না" (১৪ ঃ ৯)।

এই আয়াতটি উদ্ধৃত করিবার পর ডঃ জাওয়াদ আলী বলেন, ইহারা এত প্রাচীন জাতি ছিল যে, ইহাদের কথা মানবজাতি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। মহান আল্লাহ ব্যতীত ইহাদের কথা অন্য কেহ জানিত না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমকালীন লোকজন মনে করিত ইহারা অনেক পূর্বেকার লোক (ডঃ জাওয়াদ আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম, দারুল ইল্‌ম, বৈরূত ১৯৭৬ খৃ., ১খ., ৩০৯)। মিসরীয় খ্যাতিমান খৃস্টান ঐতিহাসিক জুরজী যায়দান তাহার গ্রন্থ আল-আরাব কাবলাল ইসলাম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, প্রমাণাদি বিশ্লেষণ করিলে এবং গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিলে যেই তথ্য উদঘাটিত হয় তাহা হইল ঃ সালিহ (আ)-এর

সম্প্রদায়ের আদি আবাসগুলি হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণের কিছু কাল পূর্বে নাবাতীয়গণের আয়ত্তে আসিয়া গিয়াছিল। হইারা ছিল বেতরাহের অধিবাসী। ইহাদের নিদর্শন ও টিল্লাসমূহকে অনেক প্রাচ্যবিদ লেখক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহাদের যে সকল কীর্তি পাথরসমূহে লেখা ছিল তাহারা তাহা পাঠ করিয়াছেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসাবশেষ হইল কাসরুল বিন্‌ত কবর বাশা কিল'আঃ ও বুরজ, ঐ শিলালিপিগুলি নাবাতী লিপিতে উৎকীর্ণ ছিল। সেখানকার কবরগুলির উপর পাশ্চাত্য ·ঐতিহাসিকরা এই স্থানে যাহা পাইয়াছিলেন তাহা ছিল নাবাতী বর্ণমালায় খোদাইকৃত। ইহা ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মগ্রহণের নিকটতম কালের লেখা। লিপিবদ্ধ বাক্যের বিষয়বস্তু ছিলঃ মাকবারাটি কুমকুম বিন্‌ত ওয়াইলা বিন্‌ত হারাম এবং কুমকুমের কন্যা কালীবা নিজের জন্য এবং নিজের সন্তানাদির জন্য তৈরী করিয়াছেন। ইহার ভিত্তি শুভ মাসে স্থাপন করা হইয়াছিল। ইহা নাবাতীগণের রাজা হারিছ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার নবম বৎসর । এই হারিছ নিজ গোত্রকে অত্যধিক ভালবাসিতেন। সুতরাং আমাযুশ-শারা ও আরশাঃ (?) লাত, অমেন্দ, মানূত এবং কায়সের ইহাদের উপর লানত হইবে যাহারা এই কবরগুলিকে বিক্রয় করিবে অথবা বন্ধক রাখিবে অথবা এই সমস্ত হইতে কোন অঙ্গকে বাহির করিবে কিংবা কুমকুম, তাহার কন্যা ও তাহার সন্তানাদি ব্যতীত কাউকে দাফন করিবে। যেই ব্যক্তি এই লিপির লেখার বিপরীত কিছু করিবে তাহার উপর যুশ-শারা, হুবল, মানূতের পাঁচটি অভিশাপ। যেই যাদুকর ইহার বিপরীত করিবে তাহার উপর এক হাজার হারিছী দিহরাম জরিমানা দেওয়া বাধ্যতামূলক হইবে। কিন্তু তাহার হাতে কুমকুম, কালীবা অথবা তাহার সন্তানাদির মধ্য হইতে কাহারও স্বহস্ত লিখিত স্পষ্ট অনুমতি পত্র ব্যতীত এই কবরস্থানে বাহিরের কাহাকেও দাফন করা যাইবে না। কবরস্থানটি ওয়াহবুল লাত ইব্‌ন উবাদা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন (কাসাসুল আম্বিয়া, প্রাগুক্ত; কাসাসুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭)। ডঃ জাওয়াদ আলী আরও বলেন, ছামূদ জাতির ইতিহাস খৃষ্ট পূর্বেরও অনেক আগের সময়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। ইহারা ছিল সেই সকল জাতির অন্তর্গত যাহারা আশুরীদের সহিত দ্বিতীয় সারগুনের রাজত্বকালে লড়াই করিয়াছিল। দ্বিতীয় সারগুন তাহাদেরকে পরাভূত করিয়া নিজ আবাসভূমি হইতে বহিষ্কার করিয়া সুমেরিয়ার দিকে পাঠাইয়াছিলেন। আশুরীগণের সহিত তাহারা যেই স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল তাহার নাম ছিল 'বারী' (BARI) । কোন কোন গবেষক মনে করেন, পঞ্চম খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কওমে ছামূদের সর্বশেষ বিশ্বাসযোগ্য আলোচনার কথা পাওয়া যায়। ইহাদের একটি গোত্র অশ্বারোহী হইয়া রোম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিল (Doughty, vol. 1., p. 229; Sprenger, s. 28)। ছামূদ জাতি ঈসা (আ)-এর জন্মের পর হিজায অঞ্চলের উচ্চভূমি দূওমাতুল জানদাল, হিজর ও পশ্চিম তায়মা নামক স্থানে বসবাস করিত। বর্ণিত আছে যে, ইহারা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে আল-আওয়ারিদ ও আল-ইব্‌হা নামক দুইটি প্রস্তরময় অঞ্চলের ভূমির অধিবাসী ছিল (Musil, Hegaz, P. 29)।

ঐতিহাসিক Doughty মনে করেন ছামূদ জাতি হিজর নামক যেই স্থানে বসবাস করিত তাহা এখন অনাবাদ ভূমি। বর্তমান মাদাইনে সালিহ হইল নাবাতীদের আবাসভূমি হিজর। ইহা ছামূদ

সম্প্রদায়ের হিজর নহে। নাবাতীগণের রাজধানী মাদাইনে সালিহ হইল ঐ ধ্বংপ্রাপ্ত স্থান হইতে দশ মাইল দূরে (Doughty, vol, 1, পৃ. ২২৯; ডঃ জাওয়াদ আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৬)। ইসলামী যুগ ও ইসলামে পূর্ববর্তী সময়ের সহিত ছামূদ জাতির কোন উল্লেখযোগ্য সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায় না। ইব্‌ন খালদূন বলেন, কথিত আছে যে, ইহাদের পরবর্তী উত্তর পুরুষ ছিল আহলুর-রাস্‌স (اهل الرس), যাহাদের নবী ছিলেন হানজালা ইব্‌ন সাফওয়ান। এই অভিমত যথার্থ নহে। অনুরূপ কোন কোন কুলজি বিশারদ মনে করেন, ছাকীফ জাতি হইল ছামূদ সম্প্রদায়ের বংশোদ্ভূত। এই মতও গ্রহণযোগ্য নহে। ছাকীফ গোত্রীয় হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফও এই অভিমত সঠিক নহে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, (তারীখে ইব্‌ন খালদূন, বৈরূত, দারুল কুতুব ১৩৯৯ হি., ২খ., ২৩-২৪)। ইহা আসলে হাজ্জাজ ইব্‌ন ইউসুফ বিরোধীরা তাহার ছাকীক গোত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য রটাইয়াছে। যেহেতু হাজ্জাজ ছিলেন অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির শাসক। ছামূদ জাতির লিখিত অনেক তথ্যাদি ইউরোপীয় যাদুঘর ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার ও প্রাচ্যবিদদের লেখনীতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমেয়, ইহারা ছিল কৃষিকাজে পারদর্শী এবং পশুপালনে অভ্যস্ত জাতি। তাহাদের লেখাসমূহে তাহারা যেই সকল প্রতিমার পূজা করিত বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায় তাহা হইলঃ ওয়াদ্দ, হুবাল, লাত, যুশ-শারা, ইত্যাদি (আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম, পৃ. ৩৩০-৩৩১)।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ছামূদ জাতি

আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার ও মাওলানা হিফজুর রহমানের মতে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদ ঐতিহাসিকগণ আরব জাহান সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের নামে ক্রটিপূর্ণ তথ্য প্রদান করিয়া থাকেন। তাহারা ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে অনেক অনুসন্ধানের পর যেইসব তথ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা বাস্তবের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে তাহারা গবেষণা চালাইয়া দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক দলের অভিমত হইল, ছামূদ সম্প্রদায় ইয়াহূদীদের একটি গোত্র যাহারা ফিলিস্তীনে না গিয়া এই স্থানেই রহিয়া গিয়াছিল। এই অভিমতটি কেবল তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুলই নহে, বরং নিতান্তই অমূলক ও ভিত্তিহীন। কারণ সকল ইতিহাসবিদ এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করিয়াছেন যে, ইয়াহূদীগণের নবী মূসা (আ) বনূ ইসরাঈলকে লইয়া মিসর হইতে বাহির হইবার অনেক পূর্বেই ছামূদ জাতির আবাসসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। মূসা (আ) তাঁহার কওমকে লইয়া মিসর হইতে বাহির হইবার যুগ ছামূদ জাতির ধ্বংসের যুগের কাছাকাছিও নহে। আল-কুরআনও স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে যে, মূসা (আ)-কে ফিরআওনের লোকেরা যখন মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করিল তখন তাহার সম্প্রদায়ের একজন মুমিন ব্যক্তি স্বীয় সম্প্রদায়কে ইহা বলিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, তোমাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও ছামূদ এবং তাহাদের পরবর্তী সম্প্রদায়সমূহ তাহাদের নবীগণকে অস্বীকার করায় যেই পরিণতি ভোগ করিয়াছিল তোমাদের অবস্থাও যেন এমন না হয়। অপর এক দল প্রাচ্যবিদ বলেন, ছামূদ জাতি হইল আমালিকা বংশোদ্ভূত জাতি। ইহারা ফুরাত নদীর পশ্চিম উপকূল হইতে চলিয়া আসিয়া এখানে আবাস স্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের কেহ

কেহ মনে করেন, ইহারা হইল সেই আমালিকা জাতি যাহাদেরকে মিসরের বাদশাহ আহমাস দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। যেহেতু তাহারা মিসরে অবস্থানকালে পাথর খোদাই সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল, ইহার ফলে "হিজর" নামক স্থানে গিয়া পাহাড় এবং পাথর খোদাই করিয়া অনুপম দালান নির্মাণ করিয়াছিল। তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আদ ও ছামূদ জাতি সাম ইব্ন নূহ (আ)-এর বংশধর। আরববাসীরা ইয়াহূদীদের ত্রুটিপূর্ণ অভিমতের অনুসরণে ইহাদেরকে আমালিকাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমালীক ইব্ন উদের ছামূদ বংশের সহিত কোন সম্পর্ক পাওয়া যায় না। ফলে এই অভিমতও সঠিক নহে। বিশেষজ্ঞগণের অভিমতে ছামূদ জাতি হইল আদ জাতির অবশিষ্ট অংশ। ইহাই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত (হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, পৃ., ১২৭; আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত তা. বি., ৫৯)।

ডঃ জাওয়াদ আলী বলেন, প্রাচ্যবিদগণ ছামূদ জাতির পরিচয় উদ্‌ঘাটনে বহু চেষ্টা চালাইয়াছেন। আশূরী দলীলপত্র ও দ্বিতীয় সারজুনের একটি দলীলে ছামূদদের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহারা ছামূদকে Tamudi, Thamubi, Thamudeni. ইত্যাদি বিভিন্ন নামে উল্লেখ করিয়াছেন। الطواف حول البحر الاريترى গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ Thamudeni-গণ صخري طويل উপকূলে বসবাস করিত। ইহা জাহাজ চলাচলের উপযোগী ছিল না। এখানে ঝড়ো বাতাস হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নৌকাগুলির কোন আশ্রয়কেন্দ্র নাই। কোন সামুদ্রিক বন্দরও নাই যেখানে জাহাজ নোঙ্গর করে যায়। এই গ্রন্থকারের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, ছামূদের আবাসমূহ হিজায অঞ্চলের লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। (Musil, Destra, P. 302,The Periples of The Erythreansea. By william vincent, London 1800, Part the second, p.262)। DioDrus ও একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া এইরূপই বর্ণনা দিয়াছেন। (Diodorus, Bibliotheca Historica, III, 44, Musil, Deserta, P. 291)। Pliny উল্লেখ করিয়াছেন যে, Tamudaei-গণ হইল Domata এবং Haegra -এর মধ্য স্থিত। ইহা একটি শহর যাহাকে Badanatha, Baclanaza (Pliny, Natur, History (Translated By H. Racham) Vol. 2,p. 456-457, vi,32)। টলেমির মতে ছামূদ সম্প্রদায় হইল Sarakenoi এবং Apatae-এর মধ্যবর্তী স্থানের অধিবাসীগণ। (Glaser, Sklzze, 2, s. 108, Ptolemly vi 7: \ 4 Vi ,7: \ 21, V 197 Hastings, A Dictionary of the Bible, Vol i. p. 630)। এই সকল মতামত প্রমাণ করে যে, ছামূদ জাতির আবাসস্থল হইল আরবের উত্তর পশ্চিমে। টলেমির ভূগোল হইতে জানা যায় যে, ছামূদ জাতির আবাসভূমি আদ জাতির আবাসস্থল হইতে দূরে নহে। তাহাদের বসতির মধ্যবর্তী স্থানে একমাত্র সারাহকানী (Sarakeny) আবাস রহিয়াছে। এই সকল আবাসভূমি হিজাযের উচ্চভূমিতে অবস্থিত। এই অভিমতটি আরবী গ্রন্থসমূহের এই অভিমতের সহায়ক যে, ছামূদ জাতির আবাসভূমি আদ জাতির আবাসভূমির নিকটবর্তী (ডঃ জাওয়াদ আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারিখীল আরাব কাবলাল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪-৩২৫)। সালিহ (আ)-এর সহিত ছামূদ জাতির সম্পর্ক আল-কুরআনে ইরশাদ

হইয়াছে ঃ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا ঃ "ছামূদ জাতির প্রতি তাহাদের ভাই সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম" (৭ঃ৭৩)। এই স্থানে ভাই বলিতে জাতি ভাই বুঝানো হইয়াছে, ধর্মীয় নহে (তাফসীরুল বাগাবী, মূলতান তা.বি., ২খ., ১৭৪)। সালিহ (আ) ছিলেন ছামূদ জাতির মধ্যে উত্তম বংশের। তিনি ঐ জাতির প্রতি নবী হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন (আয-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, বৈরূত তা. বি., ২খ., ৮৯)। হজরত সালিহ (আ) যখন তাঁহার গোত্রের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হন তখন তিনি যুবক ছিলেন। দাওয়াত দিতে দিতে তিনি বৃদ্ধ হইয়া গেলেন, তবুও তাঁহার সম্প্রদায়ের অল্প সংখ্যক লোক যাহারা সমাজে দুর্বল শ্রেণী হিসাবে বিবেচিত হইত, তাহারা ব্যতীত আর কেহই তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন করিল না (সায়্যিদ আলূসী, রূহুল মাআনী, প্রাগুক্ত, ৮খ., ১৬৬)।

ছামূদ জাতির লোকদের আয়ু

মহান আল্লাহ ছামূদ জাতির লোকদেরকে দীর্ঘ জীবন দান করিয়াছিলেন। ইহারা এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিত যে, তাহাদের কোন লোক মজবুত গৃহ নির্মাণ করিলেও তাহার জীবদ্দশায় গৃহটি ধ্বংস হইয়া যাইত। অবস্থাদৃষ্টে তাহারা পাহাড় কাটিয়া হইাতে গৃহ নির্মাণ করিতে লাগিল। এইরূপ গৃহ নির্মাণে তাহারা অত্যন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখিত। ধন-সম্পদে ইহারা অত্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জাতি ছিল (ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারিখ, দারুল কুতুব বৈরূত ১৪০৭ হি., ১খ., ৬৮; বুতরুস আল-বুসতানী, দাইফাতুল মাআরিফ, বৈরূত তা বি., ৬খ., ৩৩৯)। আল-কুরআনে هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা বাগাবী বলেন, এই সম্পর্কে আদ-দাহ্হাক বলিয়াছেন وَاسْتَعْمَرَكُمْ -এর অর্থ হইল আল্লাহ তোমাদেরকে দীর্ঘায়ু দান করিয়াছেন। কারণ ইহাদের কোন কোন লোক তিন শত বৎসর হইতে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিত (তাফসীরুল বাগাবী, প্রাগুক্ত, ২খ., ৩৯০)।

সালিহ (আ)-কে ছামূদ জাতির প্রতি প্রেরণ

ছামূদ সম্প্রদায় তাহাদের পূর্বপূরুষদের ন্যায় প্রতিমা পূজারী ছিল। তাহাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য তাহাদেরই সম্প্রদায় হইতে আল্লাহ তাআলা সালিহ (আ)-কে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিলেন। জগতের সকল বস্তুই আল্লাহ্র তাওহীদের প্রমাণ বহন করে এই কথা তিনি তাহাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দেন এবং প্রতিমা পূজার অসারতা তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন (আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, ৫৯ পৃ.; হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭)। সালিহ (আ)-কে যখন নবী হিসাবে প্রেরণ করা হয় তখন তিনি যুবক ছিলেন। তাহার নুবুওয়াত লাভ ও হূদ (আ)-এর ইন্তিকালের মধ্যে ব্যবধান ছিল এক শত বৎসরের মত। এই সময় ছামূদ সম্প্রদায়ের অধিপতি ছিল জুনদা ইব্ন আমর (আল-মাসউদী, মুরূজুয যাহাব, প্রাগুক্ত, ২খ., ৪৩)। সালিহ (আ) তাহাদেরকে লা শারীক আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহবান করিলেন। তাঁহার আহবানে অল্প মানুষ সাড়া দিল। কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা গ্রহণ করিল না। তাঁহারা তাহাকে গালমন্দ ও নির্যাতন করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিল ও তাঁহার উষ্ট্রী

হত্যা করিল। ফলে আল্লাহ তাহাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করিলেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, বৈরূত ১৯৮৮ খৃ. ৩১খ., ১২৩)। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ
لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ · وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ
عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا فَاذْكُرُوْا اٰلَاءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ
مُفْسِدِيْنَ · قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ
قَالُوْا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ · قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا بِالَّذِىْ اٰمَنْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ · فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ
رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ · فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ ·
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ ·

"আমি ছামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর।.তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালক হইতে স্পষ্ট নিদর্শন আসিয়াছে। আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহ্‌র জমিনে চরিয়া খাইতে দাও এবং ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে। স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাহাদের স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কাটিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করিতেছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইও না। তাহার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানেরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার, যাহাদেরকে দুর্বল মনে করা হইত, তাহাদেরকে বলিল, তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত? তাহারা বলিল, তাহার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হইয়াছে আমরা তাহাতে বিশ্বাসী। দাম্ভিকেরা বলিল, তোমরা যাহা বিশ্বাস কর আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি। অতঃপর তাহারা সেই উষ্ট্রীটি বধ করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, হে সালিহ! তুমি রাসূল হইলে আমাদেরকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর। অতঃপর তাহারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে তাহাদের প্রভাত হইল নিজগৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়। তৎপর সে তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে পসন্দ কর না" (৭ঃ ৭৩-৭৯)।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হূদে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ · قَالُوْا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ

هٰذَا اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ . قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ . وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْۤ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْۤءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ . فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ . فَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْىِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ . وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ . كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَاۤ اِنَّ ثَمُوْدَ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ .

"আমি ছামূদ জাতির নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিয়াছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতেই তোমাদিগকে বসবাস করাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক নিকটে, তিনি আহবানে সাড়া দেন। তাহারা বলিল, হে সালিহ! ইহার পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশাস্থল। তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করিতেছ ইবাদত করিতে তাহাদের যাহাদের ইবাদত করিত আমাদের পিতৃপুরুষেরা? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছি সে বিষয়ে, যাহার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহবান করিতেছ। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁহার নিজ অনুগ্রহ দান করিয়া থাকেন, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে, আমি যদি তাঁহার অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়াইয়া দিতেছ। হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র এই উষ্ট্রীটি তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। ইহাকে আল্লাহ্‌র জমিনে চরিয়া খাইতে দাও। ইহাকে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে। কিন্তু তাহারা উহাকে বধ করিল। অতঃপর সে বলিল, তোমরা তোমাদের গৃহে তিন দিন জীবন উপভোগ করিয়া লও। ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা হইবার নহে। এবং যখন আমার নির্দেশ আসিল তখন আমি সালিহ ও তাহার সঙ্গে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল তাহাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করিলাম এবং রক্ষা করিলাম সেই দিনের লাঞ্ছনা হইতে। তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী। অতঃপর যাহারা সীমালঙ্ঘন করিয়াছিল মহানাদ তাহাদেরকে আঘাত করিল। ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় শেষ হইয়া গেল। যেন তাহারা সেথায় কখনও বসবাস করে নাই। জানিয়া রাখ! ছামূদ সম্প্রদায় তো তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করিয়াছিল। জানিয়া রাখ! ধ্বংসই হইল ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম" (১১ ঃ ৬১-৬৮)।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আল-হিজরে ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ . وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ . وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ . فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ . فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ .

"হিজরবাসীগণও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল। আমি তাহাদেরকে আমার নিদর্শন দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল। তাহারা পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিত নিরাপদ বাসের জন্য। অতঃপর প্রভাতকালে মহানাদ উহাদেরকে আঘাত করিল। সুতরাং তাহারা যাহা অর্জন করিত তাহা তাহাদের কোন কাজে আসে নাই" (১৫ ঃ ৮০-৮৪)।

সূরা আল-ইসরা (বানূ ইসরাঈলে) ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْاٰيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ . وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيَاتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا .

"পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ ছামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়াছিলাম। অতঃপর তাহারা উহার প্রতি যুলুম করিয়াছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি" (১৭ ঃ ৫৯)।

মহান আল্লাহ্ সূরা শু'আরায় ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ . اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ . اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ . فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ . وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ . فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ . وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ . وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ . فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ . وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ . الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ . قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ . مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ . قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ . وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ . فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ . فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

"ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। যখন উহাদের ভ্রাতা সালিহ উহাদেরকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমার নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আছে। তোমাদেরকে কি নিরাপদ অবস্থায় ছাড়িয়া রাখা হইবে, যাহা এইখানে আছে উহাতে। উদ্যানে, প্রস্রবণে ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছবিশিষ্ট খর্জুর বাগানে? তোমরা তো নৈপুণ্যের সহিত পাহাড় কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করিতেছ। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর; এবং সীমালঙ্ঘকারীদের আদেশ মান্য করিও না। যাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না। উহারা বলিল, তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম। তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ। কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও,

একটি নিদর্শন উপস্থিত কর। সালিহ বলিল, এই একটি উষ্ট্রী, ইহার জন্য আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্য আছে নির্ধারিত দিনে পানি পানের পালা; এবং উহার কোন অনিষ্ট সাধন করিও না; করিলে মহাদিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হইবে। কিন্তু উহারা উহাকে বধ করিল, পরিণামে উহারা অনুতপ্ত হইল। অতঃপর শাস্তি উহাদেরকে গ্রাস করিল। ইহাতে অবশ্যই রহিয়াছে নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই মু'মিন নহে। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু" (২৬ ঃ ১৪১-১৫৯)।

মহান আল্লাহ্ সূরা আন-নাম্‌লে বলিয়াছেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَاهُمْ فَرِيْقَانِ يَخْتَصِمُوْنَ. قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ. وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ. قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَاَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ. وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ. فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ. وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ.

"আমি অবশ্যই ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাহাদের ভ্রাতা সালিহকে পাঠাইয়াছিলাম এই আদেশসহ ঃ 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর', কিন্তু উহারা বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহিতেছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ না, যাহাতে তোমরা অনুগ্রহ ভাজন হইতে পার? উহারা বলিল, তোমাকে ও তোমার সংগে যাহারা আছে তাহাদেরকে আমরা অমংগলের কারণ মনে করি। সালিহ বলিল, তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাহাদেরকে পরীক্ষা করা হইতেছে। আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যাহারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করিত এবং সৎকর্ম করিত না। উহারা বলিল, তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, আমরা রাত্রিকালে তাহাকে ও তাহার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করিব; অতঃপর তাহার অভিভাবককে নিশ্চয় বলিব, তাহার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করিলাম, কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই। অতএব দেখ, উহাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হইয়াছে--আমি অবশ্যই উহাদেরকে ও উহাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করিয়াছি। এই তো উহাদের ঘর-বাড়ী--সীমালঙ্ঘন হেতু যাহা জনশূন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে; ইহাতে জ্ঞানী লোকদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রহিয়াছে। এবং যাহারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল তাহাদেরকে আমি উদ্ধার করিয়াছি" (২৭ ঃ ৪৫-৫৩)।

আল্লাহ তা'আলা সূরা হা-মীম আস-সজদায় বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ . وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ .

"আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি উহাদেরকে পথনির্দেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করিয়াছিল। অতঃপর উহাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বজ্র আঘাত হানিল উহাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ। আমি উদ্ধার করিলাম তাহাদেরকে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল এবং যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিত" (৪১ ঃ ১৭-১৮)।

সূরা আল-কামারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ . فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ اِنَّا اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ . ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ . سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ . اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ . وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاۤءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ . فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ . اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ . وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

"ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদেরকে অস্বীকার করিয়াছিল; তাহারা বলিয়াছিল, আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব? তবে তো আমরা পথভ্রষ্টতায় এবং উন্মত্ততায় পতিত হইব। আমাদের মধ্যে কি তাহারই প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী দাম্ভিক। আগামী কল্য উহারা জানিবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আমি উহাদের পরীক্ষার জন্য পাঠাইয়াছি এক উষ্ট্রী, অতএব তুমি উহাদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও। এবং উহাদেরকে জানাইয়া দাও যে, উহাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হইবে পালাক্রমে। অতঃপর উহারা উহাদের এক সংগীকে আহবান করিল, সে উহাকে ধরিয়া হত্যা করিল। এরূপ কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি উহাদেরকে আঘাত হানিয়াছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে উহারা হইয়া গেল খোয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুষ্ক শাখা-প্রশাখার ন্যায়। আমি কুরআন সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?" (৫৪ ঃ ২৩-৩২)।

সূরা আশ-শামসে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَا . اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا . فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا . فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا . وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا .

“ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করিয়াছিল, উহাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল উহাদেরকে বলিল, আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও উহাকে পানি পান করাইবার বিষয়ে সাবধান হও। কিন্তু উহারা রাসূলকে অস্বীকার করিল এবং উহাকে কাটিয়া ফেলিল। উহাদের পাপের জন্য উহাদের প্রতিপালক উহাদেরকে সমূলে ধ্বংস করিয়া একাকার করিয়াছিলেন। এবং ইহার পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করেন না” (৯১ ঃ ১১-১৫)।

তাফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) হইতে বর্ণিত আছেঃ আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া গেলে ছামূদ জাতি তাহাদের আবাসভূমি আবাদ করে এবং তথায় বসবাস করিতে থাকে। ছামূদ সম্প্রদায় খুবই প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন যাপন করিত। ফলে তাহারাই পৃথিবীতে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করিল। তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য বাতিল ইলাহসমূহের ইবাদত করিতে লাগিল। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট নবী সালিহ (আ)-কে প্রেরণ করিলেন। যুবক অবস্থায় প্রেরিত হইয়া তিনি বৃদ্ধ হইয়া গেলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি আল্লাহ্‌র পথে নিজ সম্প্রদায়কে আহবান করিতে থাকিলেন। তবুও গুটিকয়েক দুর্বল শ্রেণীর লোক ব্যতীত আর কেহই তাঁহার অনুসরণ করিল না। সালিহ (আ) যখন বারবার স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহ্‌র পথে আহবান করিতেছিলেন এবং বারবার ভয়-ভীতি প্রদর্শন করিতেছিলেন তখন একদা তাঁহার সম্প্রদায় তাহার নিকট কোন অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শনের আবেদন জানাইল। সেই অলৌকিক ঘটনার দ্বারা তাহার নবী হইবার বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠে। তিনি তাহা শুনিয়া তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কি ধরনের অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার কথা ভাবিতেছ? তাহারা বলিল, আপনি আমাদের সহিত আগামী কল্য আমাদের ঈদ উৎসবে বাহির হইবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ছামূদ সম্প্রদায়ের একটি উৎসবের দিন ছিল। ইহাতে তাহারা বৎসরের নির্দিষ্ট একটি দিবসে তাহাদের প্রতিমাগুলিসহ বাহির হইত। তাহারা বলিল, ঐ উৎসবে আপনি আপনার ইলাহের নিকট দু'আ করিবেন। আর আমরা আমাদের ইলাহসমূহের নিকট দু'আ করিব। যদি আপনার দু'আ কবূল হয় তাহা হইলে আমরা আপনার অনুসরণ করিব। পক্ষান্তরে যদি আমাদের দু'আ কবূল হয় তাহা হইলে আপনি আমাদের অনুসরণ করিবেন। আল্লাহ্‌র নবী সালিহ (আ) তাহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ছামূদ সম্প্রদায় তাহাদের প্রতিমাসমূহ লইয়া উৎসবে রওয়ানা করিল। সালিহ (আ)ও তাহাদের সহিত রওয়ানা হইলেন। লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়া তাহারা নিজেদের প্রতিমাগুলির উপাসনা করিল এবং ইহাদের নিকট প্রার্থনা করিল যে, সালিহ যেই বিষয়ের প্রতি আহবান জানাইতেছেন তাহার কোন কিছুই যেন কবূল করা না হয়। অতঃপর তদানিন্তন ছামূদ সম্প্রদায়ের সরদার জুদা ইব্ন আমর ইব্ন জাওয়াস বলিল (তাফসীরে মাযহারী, আরবী, ৩খ., সূরা আ'রাফ, ৩৭৭), রূহুল মা'আনীতে বলা হইয়াছে ইব্ন হাবরাশ (৮খ., ১৬৬, প্রাগুক্ত) আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ায় জুনদা-এর নসবনামা আরও বাড়াইয়া বলা হইয়াছে জুনদা ইব্ন আমর ইব্ন মাহাল্লাত ইব্ন লাবীদ ইব্ন জাওয়াস (প্রাগুক্ত, ১খ., ১২৬)। হে সালিহ! যদি হিজরের পার্শ্বস্থিত আল-কাছিবা নামক শক্ত পাথর হইতে স্থূলোদর অধিক পশমযুক্ত দশ মাসের গর্ভবতী একটি উষ্ট্রী

অথবা বুখতী অর্থাৎ খুরাসানী উটের আকৃতিতে একটি উষ্ট্রী সৃষ্টি করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করিব, আপনার উপর ঈমান আনিব। তাহাদের এই স্বীকারোক্তির অনুকূলে সালিহ (আ) তাহাদের নিকট হইতে ঈমান আনার পরিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। তাহারা এই শর্তে তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া মানিয়া লইতে ও তাঁহার উপর ঈমান আনিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইল। সালিহ (আ) দুই রাকআত সালাত আদায় করিয়া আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করিলেন। ফলে ঐ পাথর ফাটিয়া তাহার ভিতর হইতে ইহাদের প্রত্যাশিত দশ মাসের গর্ভবতী ও অধিক পশমযুক্ত একটি উষ্ট্রী বাহির হইয়া আসিল। উষ্ট্রীটির উভয় বাহুর মধ্যবর্তী স্থলে বড় কি জিনিস ছিল তাহা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই জানে না। অতঃপর উষ্ট্রীটি প্রকাণ্ড একটি বাছুর প্রসব করিল। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া জুদা ও তাহার গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক সালিহ (আ)-এর উপর ঈমান আনিল। তাহার অনুসরণে ছামূদ সম্প্রদায়ের অন্যান্য অভিজাত শ্রেণীর লোকজন তাঁহার উপর ঈমান আনয়নের সংকল্প করিল। কিন্তু যুআব ইব্ন আমর ইব্ন লাবীদ, তাহাদের প্রতিমাবলীর তত্ত্বাবধায়ক হবাব এবং গণক রাবাব ইব্ন মা'র (معر) (তাফসীরে মাযহারীতে রাববাব ইবন মায়মাআ) তাহাদেরকে ঈমান আনিতে বারণ করিল। উষ্ট্রীটি বাচ্চা প্রসব করিবার পর সালিহ (আ) ছামূদ জাতিকে বলিলেন ঃ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ "ইহা আল্লাহ্র উষ্ট্রী", ইহার পানি পানের জন্য পালাক্রমে একদিন এবং তোমাদের একদিন নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইল। উষ্ট্রীটি তাহার বাছুরসহ ছামূদ সম্প্রদায়ের এলাকায় অবস্থান করিল। সে গাছপালা আহার করিত এবং পানি পান করিত, পালাক্রমে পানির ঘাটে অবতরণ করিত। তাহার পালার দিন সে আল-হিজরের কূপে মাথা রাখিত। বর্তমানে কূপটির নাম 'বি'রু'ন নাকা' (بئر الناقة)। কূপটির সম্পূর্ণ পানি পান না করা পর্যন্ত সে তাহার মাথা উত্তোলন করিত না। এক বিন্দু পানি কূপে বাকী থাকিত না। পানি পান সারিয়া সে তাহার উভয় রান মেলিয়া ধরিত যাহাতে ছামূদ সম্প্রদায় তাহাদের ইচ্ছামত দুধ দোহন করিতে পারে। তাহারা তাহার স্তন হইতে দুধ দোহন করিয়া তৃপ্তিসহকারে পান করিবার পর অবশিষ্ট দুধ সংরক্ষণ করিয়া রাখিত। সংরক্ষণ করিতে গিয়া তাহাদের সকল পাত্র ভরিয়া যাইত। যেই ঘাট দিয়া কূপে উষ্ট্রীটি অবতরণ করিত ফিরিবার সময় সে ভিন্ন পথে ফিরিয়া আসিত। অবতরণস্থল তাহার জন্য সংকীর্ণ হওয়ায় ইহা দিয়া সে ফিরিয়া আসিতে পারিত না। পরবর্তী দিনে ছামূদ জাতির পানি পানের পালা আসিলে তাহারা নিজ নিজ চাহিদামত পান করিত এবং প্রয়োজন মাফিক তাহা সংরক্ষণ করিত। যাহাতে উষ্ট্রীটির পানের দিনে তাহাদের কোন পানি সংকট দেখা না দেয়। এইভাবে তাহারা অভাবমুক্ত উন্নত জীবন যাপন করিতে লাগিল। উষ্ট্রীটির বৈশিষ্ট্য ছিল, গ্রীষ্মকালে সে মাঠে বাহির হইয়া থাকিত। ইহাতে ছামূদ সম্প্রদায়ের উট, গরু ও বকরী ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী উপত্যকার বহির্ভাগ ত্যাগ করিয়া উহার অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহাতে তাহাদের গৃহপালিত পশুগুলি কষ্ট অনুভব করিত। অনুরূপ শীতকালে উষ্ট্রীটি মাঠের অভ্যন্তরে চলিয়া যাইত। ইহাতে পালিত পশুগুলি মাঠের বাহিরে পালাইয়া আসিত। ইহাতে তাহারা বেজায় কষ্ট অনুভব করিত। পালিত পশুর এই যাতনা

ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে ছামূদ জাতির একটি পরীক্ষা। ইহা ছামূদ জাতির বিরাট মনোবেদনার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা আল্লাহ্র হুকুম লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইল। তাহারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিতে ঐক্যবদ্ধ হইল। ছামূদ সম্প্রদায়ের দুই মহিলা ছিল । একজনের নাম উনায়যাঃ বিন্ত গানম, তাহার কুন্য়াত ছিল উমমু গানম। সে ছিল যুআব ইব্ন আমরের স্ত্রী। তাহার ছিল কয়েকজন মেয়ে এবং প্রচুর উট, গরু ও বক্‌রী। অপর মহিলার নাম সাদূক (তাফসীরে মাযহারীতে সাদূফ) বিনতুল মুখতার। সে ছিল অতি সুন্দরী । তাহার অনেক পালিত পশু ছিল। তাহারা দুইজনই সালিহ (আ)-এর ঘোরতর শত্রু ছিল। তাহারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিতে অতি উৎসাহী ছিল। কারণ ইহা তাহাদের গৃহপালিত পশুর কষ্টের কারণ ছিল। ইহারই লক্ষ্যে সাদূক নাম্নী মহিলাটি আল-হুবার নামক এক লোককে আহবান করিল। সে তাহাকে বলিল, যদি তুমি এই উষ্ট্রীটি বধ করিতে পার তাহা হইলে তুমি আমাকে পাইবে। হুবাব ইহা অস্বীকার করিল। অতঃপর সে তাহার চাচাত ভাই মিসদা ইব্ন মাহরাজকে বলিল, যদি তুমি উষ্ট্রীটিকে বধ করিতে পার তাহা হইলে তুমি আমাকে পাইবে। সে ইহাতে সম্মত হইল। মহিলাটি অতি সুন্দরী ও ধনবতী হইবার ফলেই তাহার এই সম্মতি। উম্ম গানম উনায়যা কুদার ইব্ন সালিফকে আহবান করিল। কুদার ছিল গৌরবর্ণ বেঁটে লোক। ধারণা করা হয় যে, সে সালিফের অবৈধ সন্তান ছিল। উনায়যাঃ তাহাকে প্রস্তাব করিল, তুমি যদি ঐ উষ্ট্রীটি হত্যা করিতে পার তাহা হইলে আমার যেই মেয়ে তোমার পছন্দ তাহাকে আমি তোমার নিকট সমর্পণ করিব। সে ছিল তৎকালীন ছামূদ সম্প্রদায়ের একজন বীর পুরুষ। সে উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। লক্ষ্য অর্জনে কুদার ও মিসদা প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের নিকট এই ব্যাপারে সহযোগিতা প্রার্থনা করিল। তাহাদের সহযোগিতায় আরও সাত ব্যক্তি যোগ দিল। ফলে এই ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা হইল মোট নয় জন। তাহারা উষ্ট্রীটির পানি পান শেষে ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষায় ওঁত পাতিয়া রহিল। কুদার পাথরের আড়ালে লকুাইয়া রহিল, মিসদা অন্য পথে লুকাইয়া রহিল। উষ্ট্রীটি মিসদা যেই দিকে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছিল সেই দিক দিয়া ফিরিতে লাগিল, তখন মিসদা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িল। তীরটি তাহার পায়ের গোছায় তীব্র আঘাত হানিল। এই সময় উম্মু গানম উনায়যা বাহির হইল। সে তাহার খুব সুন্দরী এক মেয়েকে তাহার চেহারার অবগুণ্ঠন অপসারণের আদেশ করিল। সে অবগুণ্ঠন খুলিল এবং প্রলুব্ধ করিল, তখন সে উষ্ট্রীটিকে তরবারি দ্বারা আঘাত হানিয়া উহার পায়ের গোড়ালির রগ কাটিয়া ফেলিল। উষ্ট্রীটি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া তাহার বাচ্চাটিকে সতর্ক করিবার জন্য একটি চিৎকার দিল। অতঃপর কুদার উষ্ট্রীটির গলায় আঘাত হানিয়া তাহাকে বধ করিয়া ফেলিল। জনপদবাসীরা মাঠে বাহির হইয়া ইহার গোশত বণ্টন করিয়া লয় এবং রান্না করিয়া ফেলে। মায়ের এই মর্মান্তিক পরিণতি দেখিয়া তাহার বাছুরটি সুউচ্চ একটি পাহাড়ে পালাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। পাহাড়টির নাম ছিল সাওর (صور), মতান্তরে ফাযা (فازة)। রূহুল মাআনীতে (প্রাগুক্ত) আছে, এই সময় আল্লাহ্র নবী সালিহ (আ) তাহাদের মধ্যে আগমন করিলেন। তাহাকে উষ্ট্রীটি বধ করিবার কথা জানানো হইল। তাঁহার সহিত জনপদের অধিবাসীরা

সাক্ষাত করিয়া তাঁহার নিকট এই কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করিল। তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্‌র নবী! এই অপকর্মটি অমুক ব্যক্তি ঘটাইয়াছে। ইহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। সালিহ (আ) তাহাদেরকে বলিলেন, দেখ! ইহার বাচ্চুরটিকে পাও কি না? যদি বাছুরটি পাও তাহা হইলে আশা করা যায় তাহার মাধ্যমে শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে। তাহারা ইহাকে সন্ধান করিয়া পাড়াড়ের উপর দেখিতে পাইল। বাছুরটিকে তাহারা ধরিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিল। আল্লাহ তা'আলা এই সময় পাহাড়কে আদেশ দিলে তাহা আকাশ পর্যন্ত এত দীর্ঘায়িত হইল যে, পাখি পর্যন্ত সেখানে পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। নবী সালিহ (আ) সেখানে গেলে তাঁহাকে দেখিয়া বাছুরটি কাঁদিতে লাগিল এবং তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। সেই সময়ে বাছুরটি তিনবার চিৎকার করিল। তাহার চিৎকারের পর শক্ত একটি পাথর ফাটিয়া গেলে বাছুরটি ইহার ভিতরে প্রবেশ করিল। এই সময় সালিহ (আ) বলিলেন, প্রতিটি বেদনা বিধুর চিৎকারের বিনিময়ে একদিন করিয়া অবকাশ পাইবে।

تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ .

"তোমরা তোমাদের গৃহে তিনদিন জীবন উপভোগ করিয়া লও। ইহা একটি প্রতিশ্রুতি যাহা মিথ্যা হইবার নহে" (১১ঃ ৬৫)।

ইব্‌ন ইসহাক হইতে বর্ণিত আছে যে, উষ্ট্রীটিকে হত্যাকারী নয়জনের মধ্যে চারজন বাছুরটির অনুসরণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে মিসদা তাহার ভাই যাব ইব্‌ন মাহরাজও ছিল। মিসদা বাছুরটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলে তাহার হৃদযন্ত্রে গিয়া আঘাত হানে। অতঃপর তাহারা বাছুরটির পা ধরিয়া টানিয়া বাহির করে। ইহাকেও হত্যা করিয়া তাহারা ইহার গোশত তাহার মায়ের গোশতের সহিত মিলায়। সালিহ (আ) তাহাদেরকে বলিলেন, "তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত বস্তুকে (حرمة الله) অপমান করিয়াছ। তাই তোমরা তাহার শাস্তি ও পরিণাম ভোগের জন্য প্রস্তুত থাক"। তাহারা তাঁহার সহিত ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতে লাগিল। বলিল, এই শাস্তি কখন আসিবে? ইহার লক্ষণ কি? এইখানে উল্লেখ্য যে, ছামূদ সম্প্রদায় দিবসসমূহের নাম রাখিত এইভাবে ঃ রবিবারকে 'আল-আওয়াল', সোমবারকে 'আল-আওন', মঙ্গলবারকে 'দিবার', বুধবারকে 'হিবার', বৃহস্পতিবারকে 'মূনিস', শুক্রবারকে 'আল-আরূবা' এবং শনিবারকে 'শিয়ার'। ছামূদেরা বুধবার দিন আল্লাহ্‌র উষ্ট্রীটিকে বধ করিয়াছিল। তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে সালিহ বলিলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার (তাহাদের ভাষায় মূনিস দিবসে) তোমরা হলুদ বর্ণের মুখমণ্ডল লইয়া প্রভাত করিবে। পরবর্তী দিন শুক্রবার (তাহাদের ভাষায় য়াওমুল আরূবা) লাল বর্ণের মুখমণ্ডল লইয়া তোমরা প্রভাত করিবে। পরবর্তী দিন শনিবার (তাহাদের ভাষায় য়াওমে শিয়ার) তোমাদের চেহারা কাল বর্ণের হইয়া যাইবে। অতঃপর রবিবার (তাহাদের ভাষায় য়াওমে আওয়াল) প্রভাতে তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত হইবে। সালিহ (আ) ইহা বলিবার পর সেই নয় ব্যক্তি, যাহারা উষ্ট্রীটি হত্যা করিয়াছিল, তাহারা বলিল, আস আমরা সালিহকে হত্যা করিয়া ফেলি। কারণ যদি সে সত্যবাদী হয় তাহা হইলে আগেই তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলি, আর যদি মিথাবাদী হয় তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার উষ্ট্রীর সহিত মিলাইয়া দেই।

এই উদ্দেশে তাহারা রাত্রিকালে সালিহ (আ)-এর নিকট আসিল, যাহাতে তাঁহার পরিজনের উপর আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু ফিরিশতাগণ আক্রমণের পূর্বেই পাথর ছুঁড়িয়া তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। তাহাদের সংগী-সাথীরা যখন তাহাদের প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হইতে দেখিল তখন তাহারা সালিহ (আ)-কে বলিল, তুমিই তাহাদেরকে হত্যা করিয়াছ। অতঃপর তাহারা সালিহ (আ)-কে হত্যা করিতে মনস্থ করিল। হযরত সালিহ (আ)-এর রক্ষণার্থে তাঁহার পরিবার-পরিজন অস্ত্র সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা বলিল, "সালিহ (আ)-কে কোন অবস্থাতেই হত্যা করিতে পারিবে না। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে, তোমাদের উপর তিন দিন পর শাস্তি নামিবে। তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীতে সত্যবাদী হইলে ইহার ফলে তোমাদের উপর তোমাদের প্রভুর ক্রোধই বৃদ্ধি পাইবে, আর মিথ্যাবাদী হইলে তোমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবে"। ঐ রাত্রিতে তাহারা সরিয়া পড়িল। বৃহস্পতিবার সকালে তাহাদের চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করিল, ছোট-বড়-নারী পুরুষ সকলের চেহারায় এই বিকৃতি ঘটিল। ইহাতে তাহারা শাস্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হইয়া গেল। সালিহ (আ) সত্য বলিয়াছেন ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল। ফলে তাহারা সালিহ (আ)-কে হত্যা করিবার জন্য তালাশ করিতে লাগিল। এমতাবস্থায় সালিহ (আ) ছামূদের বানূ গানম নামক এক গোত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, বানূ গানমের নেতা নুফায়লের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। নুফায়ল ছিল মুশরিক, তাহার কুনয়া ছিল আবূ হুদার। সে সালিহ (আ)-কে লুকাইয়া রাখিল। ছামূদ সম্প্রদায় সালিহ (আ)-কে হত্যা করিতে না পারিয়া তাঁহার অনুসারীদের উপর চড়াও হইল। তাহারা নবী সম্পর্কে তথ্য আদায় করিবার উদ্দেশে তাহাদেরকে নির্যাতন করিতে লাগিল। তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম ছিল মীদা ইব্ন হারাম (ميدع بن هرم)। তিনি সালিহ (আ)-কে বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! ইহারা আপনার অবস্থানস্থল সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য আমাদেরকে নির্যাতন করিতেছে। আমরা কি তাহাদেরকে আপনার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিব? তিনি বলিলেন, হাঁ, বলিয়া দিতে পার। তুমি বল, সালিহ আমার নিকটেই আছেন। তবে তাঁহাকে আঘাত করিবার তোমাদের কোন সাধ্য নাই। তাহারা তাহাদের উপর আপতিত শাস্তি লইয়াই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাহারা তাহাকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। চেহারার বিকৃতি সম্পর্কে একজন অপরজনকে বলাবলি করিতে লাগিল। সন্ধ্যায় ধ্বংসের মুখামুখি ছামূদ সম্প্রদায় সমস্বরে চিৎকার দিয়া বলিয়া উঠিল, সাবধান! অবকাশের একটি দিবস অতিক্রান্ত হইল। দ্বিতীয় দিন ভোরে ইহারা স্বীয় মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করিতে দেখিল। তাহাদের চেহারা যেন রক্তে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে, চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, এই তো আল্লাহ্র আযাব আসা শুরু হইয়া গেল। সন্ধ্যা হইয়া গেলে অনুরূপ সকলে মিলিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, সাবধান! অবকাশের দুই দিন অতিক্রান্ত হইল। তৃতীয় ভোরে ঘুম হইতে জাগিয়া তাহারা তাহাদের চেহারা কৃষ্ণবর্ণের দেখিতে পাইল। চেহারা যেন আলকাতরা মাখানো ছিল। তখন সবাই মিলিয়া সমস্বরে চিৎকার করিতে করিতে বলিতে লাগলি, এখন তো আযাব অবধারিত হইয়া গিয়াছে। রবিবার দিবাগত রাতে সালিহ (আ) তাঁহার সঙ্গীদেরকে লইয়া সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা করিয়া ফিলিস্তীনের রামলা নামক স্থানে গিয়া অবস্থান করেন। চতুর্থ দিনে ভোর হইলে অভিশপ্ত এই ছামূদ সম্প্রদায় কাফন ও সুগন্ধি

মৃতদেহে মাখাইবার জন্য তৈরী এক প্রকার মিশ্র সুগন্ধি (হানূত) লইয়া শাস্তির প্রহর গুনিতেছিল। ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ভূমির উপর শুইয়া গিয়া তাহারা হত বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার আকাশ পানে আর একবার ভূমির দিকে তাকাইয়া কোন দিক দিয়া আযাব আসিতেছে তাহা দেখিতে লাগিল। রৌদ্র প্রখর হইলে মহানাদ তাহাদেরকে আঘাত করিল, ফলে উহারা নিজ নিজ গৃহে নতজানু অবস্থায় মারা গেল। তাহাদের উপর এই সময় আকাশ হইতে বিকট গর্জন আসিয়াছিল। ভূমণ্ডলে যত প্রকার ভয়ংকর ধ্বনি বিদ্যমান সবই তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল। এই বিভীষিকাময় ধ্বনিতে তাহাদের অন্তর বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এই পরিণতি হইতে উহাদের ছোট-বড় কেহই রক্ষা পাইল না। শুধু চলাফেরায় অক্ষম এক কিশোরী এই মহাধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

কিশোরীর নাম ছিল যারীয়া

রূহুল মাআনীতে যারীআ বিন্ত সালাফ (زارية بنت سلف) (তাফসীরে মাযহারী)। কোন কোন গ্রন্থে যারীকা বিনত সালাফও রহিয়াছে। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত। কিশোরীটি ছিল কাফির। সে সালিহ (আ)-এর সহিত কঠোর শত্রুতা পোষণ করিত। স্বীয় সম্প্রদায়ের ভয়ানক পরিণতি প্রত্যক্ষ করিবার পর মহান আল্লাহ তাহার দুইটি পা সচল করিয়া দিলেন। সুতরাং সে তীব্র গতিতে এই স্থান ত্যাগ করিয়া ওয়াদিল কুরার 'ফারখ' নামক স্থানে চলিয়া গেল। ওয়াদিল কুরার অধিবাসিগণকে তাহার স্বচক্ষে দেখা ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ প্রদান করিল। অতঃপর সে পানি চাহিল। তাহাকে পানি পান করানো হইলে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল (আত-তাফসীরুল মাযহারী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৮৭ হি., ৩খ, ৩৭৬-৩৮০; রূহুল মাআনী, বৈরূত তা. বি., ৮খ, ১৬৬-১৬৭; তাফসীরুল বাগাবী, মুলতান তা. বি, ২খ, ১৭৫)। ছানাউল্লাহ পানিপতী আরও বলেন, উষ্ট্রীটি বধ করিবার ব্যাপারে আস-সুদ্দী উল্লেখ করেন, আল্লাহ তা'আলা সালিহ (আ)-কে এই মর্মে প্রত্যাদেশ পাঠাইলেন যে, তোমার সম্প্রদায় অচিরেই তোমার উষ্ট্রী হত্যা করিবে। তিনি এই প্রত্যাদেশের কথা তাঁহার সম্প্রদায়কে অবহিত করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা উহা করিব না। তখন সালিহ (আ) বলিলেন ঃ অমুক ব্যক্তির অমুক মাসে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, পরবর্তী কালে সে-ই উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিবে। ফলে তোমাদের ধ্বংস তাহারই কৃতকর্মের ফলে হইবে। তাহারা বলিল, অমুক মাসে আমাদের যেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে আমরা উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিব। উক্ত মাসে দশটি সন্তান প্রসব করিয়াছিল। উহারা তাহা হইতে নয়জনকে হত্যা করিয়াছিল। একটি সন্তান বাঁচিয়া গিয়াছিল। তাহার চেহারা ছিল নীল ও লাল বর্ণের। সে খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। এই ছেলেটি যখন হত্যাকৃত নয়টি ছেলের জনকদের নিকট দিয়া চলাফেরা করিত তখন তাহাকে দেখিয়া তাহারা বলিত, যদি আমাদের পুত্রগুলি বাঁচিয়া থাকিত তাহা হইলে উহারা তাহার ন্যায় হইত। এই মনোবেদনায় ঐ নয়জন সন্তানহারা পিতা সালিহ (আ)-এর উপর প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হইল। সুতরাং তাহারা সালিহ (আ)-কে হত্যা করিবার জন্য আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ করিল। তাহারা শলাপরামর্শ করিল, আমরা ভ্রমণে বাহির হইবার ভান করিয়া অবস্থানস্থল ত্যাগ করিব। অতঃপর আমরা একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিব, যাহাতে লোকজন মনে করে আমরা ভ্রমণে গিয়াছি। রাত্রি হইলে যখন

সালিহ (আ) মসজিদের উদ্দেশে বাহির হইবেন তখন আমরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়া ফেলিব। হত্যার কাজ সম্পন্ন করিয়া আবার আমরা গুহায় ফিরিয়া যাইব। অতঃপর আমরা গৃহে ফিরিয়া বলিব, তাহার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। ইহাতে তাহারা আমাদেরকে সত্যবাদী বলিয়া মানিয়া লইবে। মনে করিবে ইহারা তো সফরে ছিল। সালিহ (আ)-এর আবাস ছিল মসজিদে। তিনি পরিবার-পরিজনের সহিত গ্রামে থাকিতেন না। তাহার মসজিদটিকে মসজিদ সালিহ বলা হইত। ভোরবেলা স্বীয় উম্মতগণের নিকট আসিয়া তিনি তাহাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করিতেন। সন্ধ্যা হইলে আবার মসজিদে ফিরিয়া যাইতেন। এখানে রাত্রিযাপন করিতেন। উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে ঐ নয় ব্যক্তি গুহায় প্রবেশ করিল। গুহাটি তখন ধ্বসিয়া পড়িলে তাহারা নিহত হয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

"উহারা এক চক্রান্ত করিয়াছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্ব করিলাম, কিন্তু উহারা বুঝিতে পারে নাই" (২৭ ঃ ৫০)।

উহাদের এই চক্রান্ত সম্পর্কে ছামূদ সম্প্রদায়ের যাহারা অবগত ছিল তাহাদেরকে প্রত্যাবর্তন করিতে না দেখিয়া তাহারা ঐ গুহার মুখে আসিয়া দেখিল উহারা ধ্বংস হইয়া গিয়োছে। তাহারা হট্টগোল করিয়া জনপদে ফিরিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! সালিহ এই নয়টি সন্তানকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াও ক্ষান্ত হইল না। সে উহাদের এই নয়জন পিতাকেও হত্যা করিয়া ফেলিল। ইহার ফলস্বরূপ জনপদবাসীরা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিবার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করিল। ইব্‌ন ইসহাক বলিয়াছেন, উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিবার পর উক্ত নয় ব্যক্তি সালিহ (আ)-কে হত্যা করিবার শপথ করিয়াছিল। আস-সুদদী ও অন্যান্যরা বলিয়াছেন, অন্যান্য ছেলেরা এক সপ্তাহে যতটুকু বৃদ্ধি পাইত, বাঁচিয়া যাওয়া যুহার নামক ঐ দশম ছেলেটি এক দিনে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত। অন্যরা এক বৎসরে যতটুকু বৃদ্ধি পাইত সে এক মাসে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত। সে পরিণত বয়সের অধিকারী হইলে অন্যান্য লোকদের সহিত আসন গ্রহণ করিল। উহারা মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল। মদ্যপানের নেশায় একদা তাহারা মত্ত হইয়া উঠিল। মদ বানানোর জন্য তাহাদের পানির প্রয়োজন ছিল। ঘটনাক্রমে এই দিনটি ছিল উষ্ট্রীর পানি পানের পালার দিন। পানি খুঁজিতে গিয়া দেখিল, উষ্ট্রীটি সব পানি পান করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা তাহাদের অসীম ক্রোধের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, আমরা দুধ দিয়া কি করিব? ইহার চেয়ে যদি আমরা উষ্ট্রীটি যেই পানি পান করিতেছে তাহা লাভ করি তাহা হইলে আমাদের পালিত জন্তুগুলি তৃপ্তিতে পানি পান করিত, আমাদের কৃষি খামার ইহার দ্বারা সিঞ্চিত হইত। ইহাই আমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর ছিল। ইহা শুনিয়া কুদার উষ্ট্রীটিকে বধ করিবার প্রস্তাব দিলে তাহারা তাহাতে সম্মত হইল। অতঃপর সে উহাকে বধ করিয়া ফেলিল (তাফসীরুল মাযহারী, প্রাগুক্ত; তাফসীরুল বাগাবী, প্রাগুক্ত; আল-মাসঊদী, মুরূজ, ২খ, ৪৪)। 'আমার রিসালাতকে সত্যায়ন করিবে' তাহারা স্বীকারোক্তি করিলে তিনি তাহাদের নিকট হইতে কঠিন অঙ্গীকার আদায় করিলেন। তাহাদের অবিকল

প্রত্যাশামত আল্লাহ্র আদেশে উষ্ট্রী নির্দিষ্ট পাথর হইতে বাহির হইয়া আসিলে আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা ও অত্যুজ্জ্বল অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বহু সংখ্যক লোক সালিহ (আ)-এর উপর ঈমান আনিল। কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহাদের পথভ্রষ্টতা হইতে ফিরিল না। প্রতিহিংসাপরায়ণতা পরিহার করিল না। ঈমানদারগণের সরদার ছিল জুনদা ইব্ন আমির ইব্ন মাহাল্লা ইবন লাবীদ ইব্ন জাওয়াস। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গও ইসলাম গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদেরকে যুআব ইবন আমর ইব্ন লাবীদ এবং খাব্বাব দুই প্রতিমা মালিক ও রাব্বার ইব্ন সামআর ইব্ন জালমাস ইসলাম গ্রহণ করিতে বারণ করিল। জুনদা তাহার চাচাত ভাই শিহাব ইব্ন খালীফাকে ইসলামের দিকে আহবান করিলেন। সেও ছিল তাহাদের বংশের অভিজাত শ্রেণীর লোক। ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলেও উপরিউক্ত তিন অভিশপ্ত তাহাকে বাধা প্রদান করে। ফলে সে উহাদের প্রতিই ঝুঁকিয়া পড়িয়া ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা ত্যাগ করে। এই সম্পর্কে ইব্ন কাছীর মিহরাশ ইব্ন গানামা ইবনুয যামীল (র) রচিত কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

وَكَانَتْ عَصَبَةٌ مِنْ الِ عَمْرٍو + اِلى دِيْنِ النَّبِيِّ دَعَوْا شِهَابًا ۔

عَزِيْزُ ثَمُوْدَ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا + فَهُمْ بِاَنْ يُّجِيْبُ وَلَوْ اَجَابَا ۔

لَاَصْبَحَ صَالِحٌ فِيْنَا عَزِيْزًا + وَمَا عَدَلُوْا بِصَاحِبِهِمْ ذُوَابًا ۔

وَلٰكِنَّ الْغُوَاةَ مِنْ الِ حِجْرٍ + تَوَلَّوْا بَعْدَ رُشْدِهِمْ ذَابًا ۔

"আমরের (জুনদা-এর পিতা) সহিত পারিবারিক সম্পর্ক ছিল শিহাবের। আমরের পরিজন তাহাকে আল্লাহ্র নবীর দীনের প্রতি আহবান জানাইয়াছিল। সে ছিল সমগ্র ছামূদ জাতির মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়। সংকল্প করিয়াছিল সালিহ (আ)-এর দাওয়াত গ্রহণ করিবার, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারে নাই। সালিহ আমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত হইয়া যান। ছামূদ সম্প্রদায়ের কেহই উচ্চ মর্যাদায় তাহার তুল্য নহে। হিজরের অধিবাসিগণের পথভ্রষ্টরা হিদায়াত লাভের পর আবার ভয়ে ফিরিয়া গেল অথবা মাছির ন্যায় ফিরিয়া গেল" (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মিসর ১৪০৮ হি., ১খ, ১২৬; তাফসীরে হাককানী, দিল্লী তা. বি; ২খ, ৪০০)।

হুবাব ইব্ন আমর স্বীয় আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া মু'মিনদের কাতারভুক্ত হইয়াছিলেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

كَانَتْ ثَمُوْدُ ذُوْ عِزَّةٍ وَمَكْرَمَةٍ + مَا اِنْ يُضَامُ لَهُمْ فِى النَّاسِ مِنْ جَارٍ ۔

لَا يَرْهَبُوْنَ مِنَ الْاَعْدَاءِ حَوْلَهُمْ + وَقْعَ السُّيُوْفِ وَلَا نَزْعًا بِاَوْتَارٍ ۔

فَاَهْلَكُوا فَاقَةً كَانَتْ لِرَبِّهِمْ + قَدْ اَنْذَرُوْهَا وَكَانُوْا غَيْرَ اَبْرَارٍ ۔

نَادَوْا قُدَارًا وَلَحْمَ السَّقَبِ بَيْنَهُمْ + هَلْ لِلْعَجُوْلِ وَهَلْ لِلسَّقَبِ مِنْ ثَارٍ ۔

لَمْ يَرْعَيَا صَالِحًا فِى عَقْرِنَا قَتِهِ + وَاخْفَرُوْا الْعَهْدَ هَدْيًا اَىَّ اِخْفَارٍ ۔

فَصَادَفُوْا عِنْدَهُ مِنْ رَبِّهِ حَرَسًا + فَشَدَّخُوْا رُؤُسَهُمْ شَدْخًا بِاَحْجَارٍ ۔

"ছামূদ সম্প্রদায় বড়ই সম্মানিত ও অভিজাত শ্রেণীর লোক ছিল। প্রতিবেশীর পক্ষ হইতে তাহাদের উপর অত্যাচার করা হইত না।

"উহারা তাহাদের আশেপাশের শত্রুদের পক্ষ হইতে তাহাদের উপর তরবারি চালানোর ভয় করিত না এবং ভস্মীভূত বৃক্ষের ন্যায় মূলোৎপাটনেরও আশংকা করিত না।

"উহারা আল্লাহ্র একটি উষ্ট্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিল। অথচ তাহাদেরকে এই ব্যাপারে সতর্ক করা হইয়াছিল। উহারা পুন্যবান লোক ছিল না।

"তাহারা কুদারকে আহবান করিল, এই দিকে উষ্ট্রীটির বাছুরের গোশত তাহাদের সামনে পাড়িয়া রহিয়াছিল। বাছুর হারা মা ও বাছুরের কি কোন দোষ ছিল?

"কুদার ও তাহার সঙ্গীটি উষ্ট্রীটি হত্যা করিতে সালিহ-এর পরোয়া করিল না। এই সম্প্রদায় পরিপূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিল।

"সালিহ-এর নিকট তাহারা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে প্রহরীর সম্মুখীন হইয়াছিল। অতএব চরমভাবে উহাদের মাথা পাথরের আঘাতে লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল" (আল-মাসঊদী, মুরূজুয- যাহাব, প্রাগুক্ত, ২থ, ৪৫)।

আস-সুদ্দীর বরাতে ইমাম তাবারী উষ্ট্রী সম্পর্কিত নিম্নোক্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। উষ্ট্রীটি যেই দিন পানি পান করিত সেই দিন সে দুইটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া যাত্রা করিত। এই দুইটি পাহাড়ে তাহার পদচিহ্ন রহিয়াছে। ইহা কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে। কুদার ও মিসদা ব্যতীত উষ্ট্রীটির আরও তিনজন হত্যাকারীর নাম ইব্ন ইসহাক সূত্রে আত-তাবারী উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা হইল, হাবীল ইব্ন মীলাগ (هويل بن ميلغ), সে ছিল কুদারের মামা, হিজরবাসীর বীরপুরুষ। দাঈর ইব্ন গানম ইব্ন দাইর (دعير بن غنم بن داعر)। সে ছিল হালওয়া ইবনুল মাহাল গোত্রের লোক। তৃতীয় ব্যক্তি হইল মিসদাহ ইব্ন মিহরাজের ভাই দাব ইবন মিহরাজ। তাবারী আবূ ইসহাক হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, আবূ মূসা (রা) বলিয়াছেন ঃ

اَتَيْتُ اَرْضَ ثَمُوْدَ فَذَرَعْتُ مَصْدَرًا النَّاقَةِ فَوَجَرْتُهُ سِتِّيْنَ ذِرَاعًا ·

"আমি ছামুদ সম্প্রদায়ের ভূখণ্ডে আসিয়া উষ্ট্রীটির যাতায়াত পথ মাপিয়া দেখিলাম, ইহা ষাট হাত লম্বা" (তাবারী, তাফসীর, ১৩৯৮ হি. / ১৯৭৮ খৃ., ৮খ, ১৫৮-১৬২)।

তাবারী বলেন, কাতাদা বলিয়াছেন, উষ্ট্রীটি হত্যাকারী লোকটি বলিয়াছিল ঃ

لَا اَقْتُلُهَا حَتّٰى تَرْضَوْا اَجْمَعِيْنَ فَجَعَلُوْا يَدْخُلُوْنَ عَلَى الْمَرْاَةِ فِيْ خِدْرِهَا فَيَقُلُوْنَ اَتَرْضِيْنَ فَتَقُوْلُ نَعَمْ وَالصَّبِيَّ حَتّٰى رَضُوْا اَجْمَعِيْنَ فَعَقَرُوْهَا ·

"উষ্ট্রীটি হত্যা করিবার ব্যাপারে তোমরা সকলেই সম্মতি প্রকাশ না করিলে আমি ইহাকে হত্যা করিব না। সুতরাং তাহারা মহিলাদের শিবিরগুলিতে প্রবেশ করিয়া এই সম্পর্কে মতামত গ্রহণ

করিল। মহিলা ও শিশু সকলেই এই ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। ফলে উহারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিয়াছিল" (তাবারী, তাফসীর, বৈরূত ১৩৯৮ হি. ৮খ, ১৬২)।

ঘাতকের নয় নাম

আল্লামা যামাখশারী বলেন, ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) হইতে বর্ণিত এই নয়জন ঘাতকের নাম হইল ঃ আল-হুযায়ল ইব্ন আবদ রাব্ব, গানাম ইব্ন গানম, রিয়াব ইব্ন মিহরাজ, মিসদা ইব্ন মিহরাজ, উমায়র ইব্ন কারদাবা, আসিম ইব্ন মাখরামা, সাবীত ইব্ন সাদাকা, সামআন ইব্ন সাফী (আবুস সাউদ শাম'আন), কুদার ইব্ন সালিফ। এই নয়জন ঘাতক উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল। ইহারা ছিল সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণীর লোক কিন্তু তাঁহার চরম শত্রু (আয-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, বৈরূত তা. বি., ৩খ, ১৫২)। ইব্ন ইসহাক-এর বরাতে আল্লামা কুরতুবী বলেন, ঘাতকদের নেতা ছিল কুদার ইব্ন সালিফ ও মিসদা ইব্ন মিহরাজ। আর সাতজন তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল, ইহাদের নাম সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আল-কুরতুবী, তাফসীর, ৭খ, পৃ.-২১৫-১৬; আত-তাবারসী, মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত ১৪০৬ হি. / ১৯৮৬ খৃ., ৭খ, ৩৫৪)।

ইমাম বুখারী তাহার সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِىْ عَقَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا . اِنْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِىْ رَهْطِهِ مِثْلَ اَبِىْ زَمْعَةَ .

"আবদুল্লাহ ইব্ন যামআ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভাষণ দিতে শুনিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ভাষণে উষ্ট্রীটি ও তাহার হত্যাকারীদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "উহাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হইয়া উঠিল" (৯১ঃ১২)-এর ব্যাখ্যা হইল, তৎপর হইয়া উঠিল উষ্ট্রীটিকে বধ করিবার জন্য। বলবান, চরম দুষ্ট, স্বীয় গোত্রের অপ্রতিরোধ্য একটি লোক, সে ছিল আবূ যামআর ন্যায়" (বুখারী, কিতাবু'ত-তাফসীর, সূরা শামস, ২খ, ৭৩৭)।

আবূ রিগালের ঘটনা

আল্লামা তাবারী জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

(جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ) قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجَرِ قَالَ لَا تَسْئَالُوا الْاٰيَاتِ فَقَدْ سَاَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هٰذَا الْفَجِّ وَتَصْدُرُ مِنْ هٰذَا الْفَجِّ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوْهَا وكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا وَّيَشْرَبُوْنَ لَبَنَهَا يَوْمًا فَعَقَرُوْهَا فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مِنْ تَحْتِ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ اِلَّا رَجُلًا وَّاحِدًا كَانَ فِى حَرَامِ اللّٰهِ قِيْلَ مَنْ هُوَ قَالَ اَبُوْ رِغَالٍ فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَامِ اَصَابَهُ مَا اَصَابَ قَوْمَهُ .

"জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হিজর নামক স্থান দিয়া অতিক্রম করা কালে বলিলেন ঃ তোমরা অলৌকিক নিদর্শনাবলী (মুজিযা) চাহিও না। সালিহ সম্প্রদায় এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তাহাদের মুজিযাটি এই প্রশস্ত রাস্তা দিয়া গমন করিত এবং ঐ রাস্তা দিয়া (উষ্ট্রী) ফিরিয়া আসিত। তাহারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া উষ্ট্রীটিকে হত্যা করিল। উষ্ট্রীটি একদিন তাহাদের পানি পান করিত এবং উহারা একদিন উষ্ট্রীর দুধ পান করিত। ইহার কারণে উহারা ইহাকে বধ করিল। ইহার ফলে মহানাদ তাহাদেরকে আঘাত করিল। ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল আকাশের নিম্নভাগ হইতে। তবে একটি লোক এই ভয়াবহ পরিণতি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। সে হারাম শরীফে (আশ্রয়াধীন) ছিল। সাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, এই লোকটি কে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ আবূ রিগাল! সে যখন "হারাম" হইতে বাহির হইল তখন তাহার সম্প্রদায়ের ন্যায় সেও তাহা ভোগ করিল"।

আবদুর রায্‌যাক মুআম্মার সূত্রে এবং তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন উমায়্যা সূত্রে বলেন ঃ

اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرِ اَبِىْ رِغَالٍ فَـقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَـا هٰذَا قَـالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَـالَ هٰذَا قَبْرُ اَبِىْ رِغَالٍ قَـالُوْا فَمَنْ اَبُوْ رِغَالٍ قَالَ رَجُلٌ مِنْ ثَمُوْدَ كَانَ فِىْ حَرَمِ اللّٰهِ فَمَنَعَهُ حَرَمُ اللّٰهِ عَذَابَ اللّٰهِ فَلَمَّا خَرَجَ اَصَابَهُ مَا اَصَابَ قَوْمَهُ فَدُفِنَ هٰهُنَا وَدُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ فَنَزَلَ الْقَوْمُ فَابْتَدَرُوْهُ بِاَسْيَافِهِمْ فَبَحَثُوْا عَلَيْهِ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ.

রাসূলুল্লাহ (স) আবূ রিগালের কবরের পাশ দিয়া অতিক্রম করিবার সময় সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি জান ইহা কি? তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল এই ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ইহা আবূ রিগালের কবর। তাহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ রিগাল কে? রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের এক লোক। সে আল্লাহ্‌র হারাম শরীফে অবস্থান করিয়াছিল। ফলে ইহা তাহাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হইতে রক্ষা করে। সে যখন উহা হইতে বাহির হইল তখন তাহার সম্প্রদায়ের যেই পরিণতি হইয়াছিল সেও উহা ভোগ করিল এবং তাহাকে ঐ স্থানে দাফন করা হইয়াছিল। দাফনের সময় তাহার সহিত স্বর্ণের একটি লম্বা টুকরাও দাফন করা হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া সাহাবীগণ খুব দ্রুত তরবারি লইয়া কবরটি খুঁড়িয়া স্বর্ণের লম্বা টুকরাটি তাহারা বাহির করিলেন।

আবদুর রায্‌যাক ইমাম যুহরী সূত্রে বলেন, আবু রিগাল হইল ছাকীফের পিতা (তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ৮খ, ১৬২)। আবূ রিগাল সম্পর্কিত প্রথমোক্ত হাদীছটি সম্পর্কে আল্লামা ইব্‌ন কাছীর বলেন, এই হাদীছটি সহীহ মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত। কিন্তু সিহাহ সিত্তায় ইহা বর্ণিত হয় নাই। দ্বিতীয় হাদীছ সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহা একটি মুরসাল হাদীছ।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে বলা হইয়াছে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহিত তাইফের দিকে বাহির হইয়াছিলেন। অপরাপর বর্ণনাগুলিতে রহিয়াছে হিজর

অভিমুখে রওয়ানার কথা। এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়া ইবন কাছীর বলেন, আবূ দাঊদের বর্ণনাও অনুরূপ। তিনি আরও বলেন, হাফিজ আবুল হাজ্জাজ আল-মিয্যী (র) এই হাদীছটিকে 'হাসান আযীয' বলিয়াছেন। বুহায়র ইব্ন আবূ বুহায়র একা এই হাদীছটি বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীছটি ব্যতীত তাহার অন্য কোন পরিচয় নাই। ইসমাঈল ইব্ন উমায়্যা ব্যতীত তাহার নিকট হইতে অন্য কেহ হাদীছ বর্ণনা করেন নাই। আল-মিযযী বলিয়াছেন, হাদীছটিকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করা সম্ভবত ধারণাপ্রসূত। ইহা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমরের উক্তি হইতে পারে (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুদ-দায়্যান মিসর ১৪০৮ হি., ১৯৮৮ খৃ., ১খ., ১২৯-১৩০)। আল-মাসঊদী বলেন, আবূ রিগাল তাইফ ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থান আল-মুগাম্মাস নামক স্থানের রাস্তায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার কবরকে পরবর্তী কালে প্রস্তারাঘাত করা হইত। আরবরা ইহা দ্বারা উপমা দান করিত। জারীর ইবনুল খিতফী আল-ফারাযদাক সম্পর্কে উপমাস্বরূপ বলেন ঃ

اذَا مَاتَ الْفَرَزْدَقُ فَارْجُمُوْهُ + كَمَا تَرْمُوْنَ قَبْرَ اَبِىْ رِغَالٍ ۔

"আল-ফারাযদাক যখন মারা যাইবে তখন তাহাকে প্রস্তরাঘাত কর, যেইভাবে তোমরা আবূ রিগালকে প্রস্তরাঘাত কর"। আল-মাসঊদী আরও বলেন ঃ কেহ কেহ বলেন, আবূ রিগালকে সালিহ (আ) সম্পদের সাদাকা আদায়ের জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। সে তাঁহার নির্দেশ অমান্য করিল এবং তাহার চরিত্র ছিল অসৎ। ফলে তাহার উপর ছাকীফ চড়াও ইহল। ছাকীফের নাম ছিল কাস্সী ইবন মুনাব্বিহ। হারাম শরীফের অধিবাসীদের সহিত তাহার অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে ছাকীফ আবূ রিগালকে নির্মমভাবে হত্যা করিল। গায়লান ইব্ন সালামা তাহার পূর্বপুরুষ ছাকীফ কর্তৃক আবূ রিগালের উপর কঠোরতা অবলম্বন সম্পর্কে বলেন, আমরা নির্দয় বংশীয় লোক, আমাদের পিতা কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে উমায়্যা ইব্ন আবিস-সালত আছ-ছাকীফ বলেন,

نَفَوْا عَنْ اَرْضِهِمْ عَدْنَانِ طُرًّا + وَكَانُوْا لِلْقَبَائِلِ قَاهِرِيْنَا ۔

وَهُمْ قَتَلُوا الرَّئِيْسَ اَبَا رِغَالٍ + بِمَكَّةَ اِذْ يَسُوْقُ بِهَا الْوَضِيْنَا ۔

"আদনান বংশকে তাহারা বলপূর্বক তাহাদের ভূমি হইতে বিতাড়িত করিল। ইহারা ছিল গোত্রসমূহের উপর বল প্রয়োগকারী। উহারা আবূ রিগালের মত নেতাকে হত্যা করিল। হত্যা স্থলটি ছিল মক্কায় যখন সে তথায় উৎপাত করিত"।

'আমার ইব্ন দাররাক আল-আবদী এই সম্পর্কে বলেন,

تَرَانِىْ اِنْ قَطَعْتُ حِبَالَ قَيْسٍ + وَخَالَفْتُ الْمُرُوْرَ عَلى تَمِيْمٍ ۔

لَاَعْظَمُ فَجْرَةً مِنْ اَبِىْ رِغَالٍ + وَاَجْوَرُ فِى الْحُكُوْمَةِ مِنْ سَدُوْمٍ ۔

"তুমি আমাকে দেখিবে যদি আমি কায়সের দড়িসমূহ কাটিয়া ফেলি এবং বানূ তামীমের চলাচলের বিরুদ্ধাচারণ করি। আমি আবূ রিগাল হইতে অনেক বড় দুষ্ট এবং রাজ্য পরিচালনায় সাদূম হইতে বহু গুণ বেশি অত্যাচারী"।

মিসকীন আদ-দারিমী বলেন ,

وَاَرْجُمُ قَبْرَهٗ فِيْ كُلِّ عَامٍ + كَرَجْمِ النَّاسِ قَبْرَ اَبِيْ رِغَالٍ

"আমি প্রতি বৎসর তাহার কবরে প্রস্তরাঘাত করি, যেইভাবে লোকে আবূ রিগালের কবরে প্রস্তরাঘাত করে" (আল-মাসউদী, মুরূজুয-যাহাব, ২খ, ৭৮-৭৯)।

আল্লাহ্র উষ্ট্রী আখ্যায়িত করার কারণ

আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন, هذه نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ اٰيَةً "ইহা আল্লাহ্র উষ্ট্রী, ইহা তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন" (৭ ঃ ৭৩)। এই সম্পর্কে আল্লামা কুরতুবী বলেন, উষ্ট্রীটিকে আল্লাহ্র দিকে সম্পর্ক করা হইয়াছে সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার সম্পর্ক হিসাবে। ইহা উষ্ট্রীটির মর্যাদার ইঙ্গিতবহ (কুরতুবী, আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, ৮খ, ২৩৮)। সায়্যিদ আলূসী বলেন, উষ্ট্রীটির সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে করা হইয়াছে ইহার সম্মানার্থে, যেইভাবে মসজিদকে বায়তুল্লাহ বলা হয়। তবে এখানে ইযাফতটি (সম্পর্ক) অতি নগণ্য সামঞ্জস্যের কারণে হইয়াছে। আল্লাহ্র দিকে ইযাফত করার আরও কারণ হইল, উষ্ট্রীর স্বাভাবিক জন্মলাভের পদ্ধতি ও কারণসমূহের দ্বারা সৃষ্টি হয় নাই। ফলে ইহাকে আল্লাহ্র স্পষ্ট নিদর্শন বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ ব্যতীত ইহার কোন মালিক ছিল না বিধায় তাঁহার উষ্ট্রী বলা হইয়াছে (আল-আলূসী, রূহুল মাআনী, ৮খ., ১৬৩)। ইমাম রাযী বলেন, কাহারও কাহারও মতে উহা আল্লাহ্র নিদর্শন হইল এই হিসাবে যে, ইহা পূর্ণ অবয়বে পাথর হইতে নির্গত হইয়াছিল। কাদী ইয়াদ বলেন, এই অভিমত সঠিক হইলে তিনটি কারণে ইহাতে অলৌকিকতা রহিয়াছে, তাহা হইল ঃ পর্বত হইতে ইহার আবির্ভাব, স্বাভাবিকভাবে উষ্ট্রীর পেটে জন্ম না হওয়া এবং ধাপে ধাপে বৃদ্ধি হওয়া ছাড়াই পূর্ণ উষ্ট্রী হিসাবে আত্মপ্রকাশ। দ্বিতীয় অভিমত হইল, উহা আল্লাহ্র নিদর্শন ছিল এই হিসাবে যে, এই উষ্ট্রীর পানি পানের পালা ছিল একদিন আর সমূদয় ছামূদ সম্প্রদায়ের পানের পালা ছিল আর একদিন। তৃতীয় অভিমত হইল উষ্ট্রীটি যেইদিন পানি পান করিত সেইদিন সমগ্র ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকজন তাহাদের চাহিদামত উষ্ট্রী হইতে দুধ দোহন করিত। চতুর্থ অভিমত হইল, উষ্ট্রীটি যেই দিন পানি পান করিত সেই দিন অন্যান্য সকল প্রাণী পানি পানের ঘাটে অবতরণ করা হইতে বিরত থাকিত। আর যেই দিন সে পানি পান করিত না সেই দিন সকল প্রাণী ঘাটে নামিয়া আসিত। মোটকথা, আল-কুরআন উষ্ট্রীটিকে নিদর্শন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে কিন্তু তাহা কি কারণে নিদর্শন তাহা উল্লেখ করে নাই। তবে ইহা অবশ্যই জ্ঞাতব্য যে, উষ্ট্রীটি নিঃসন্দেহ মুজিযা ছিল (ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত তা, বি., ১৪খ, ১৬২)।

ধ্বংসপ্রাপ্ত ছামূদ সম্প্রদায়কে সালিহ (আ)-এর সম্বোধন

ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল যে, ছামূদ সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়া যাইবার পর সালিহ (আ) তাহাদেরকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়াছিলাম এবং তোমাদেরকে হিত উপদেশ দিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিত উপদেশ দানকারীকে পছন্দ কর না" (৭ ঃ ৭৯)।

এই সম্পর্কে সায়্যিদ আলূসী বলেন, সালিহ (আ) কর্তৃক উহাদেরকে আহবান জানানো ছিল রাসূলুল্লাহ (স) কর্তৃক বদর যুদ্ধে নিহত মুশরিকদেরকে আহবানের মত। নিহত মুশরিকদেরকে বদরের কূপে নিক্ষেপের পর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদের নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে অমুক! আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যেই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাযথ পাইয়াছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যেই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা কি তোমরা সঠিক পাইয়াছ। সম্বোধনের ভিত্তি ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা উহাদের রূহ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, ফলে তাহারা এই সম্বোধন শুনিতে পাইয়াছিল। এইরূপ সম্বন্ধ কেবল নবী (আ)-গণেরই বৈশিষ্ট্য। ইহাও সম্ভব যে, সালিহ (আ) এই সম্বোধন করিয়াছিলেন আক্ষেপ প্রকাশার্থে, যেইভাবে গৃহাদি ও আবাসস্থলসমূহকে সম্বোধন করা যায়। ইহাও হইতে পারে যে, সালিহ (আ) কর্তৃক এই সম্বোধন সম্বলিত আয়াতকে শাস্তি শুরুর আয়াতের সহিত 'আত্ফ করা। ইহাতে অর্থ হইবে উহারা শাস্তির সম্মুখীন হইবার সময় সালিহ (আ) তাহাদেরকে এই সম্বোধন করিয়িয়াছিলেন। তবে ইহা বাহ্যিক সম্ভাবনার পরিপন্থী। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এখানে আয়াত আগে-পিছে করা হইয়াছে। আয়াত মূলত ছিল ঃ

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ.

এই অভিমতটি অন্যান্য সকল অভিমত হইতে অধিকতর দুর্বল (সায়্যিদ আলূসী, রূহুল মাআনী, ৮খ, ৬৬)।

মৃতদেরকে সম্বোধনের পক্ষে ইমাম রাযীর যুক্তি এই যে, ইহা শুনিয়া অনেক জীবিত লোক উপদেশ গ্রহণ করিবে এবং এইরূপ কর্ম হইতে সতর্ক হইয়া যাইবে (আত-তাফসীরুল কাবীর, দারু ইহয়াউত-তুরাছ, বৈরূত, তৃতীয় সংরক্ষণ, ১৪ খ, ১৬৭)।

তাবূক গমনকালে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ছামূদ জনপদ অতিক্রম

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَمَرَهُمْ اَنْ لَّا يَشْرَبُوْا مِنْ بِئْرِهَا وَلَا يَسْتَقُوْا مِنْهَا فَقَالُوْا قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّطْرَحُوْا ذٰلِكَ الْعَجِيْنَ وَيَهْرِيْقُوْا ذٰلِكَ الْمَاءَ.

"ইবন উমার (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক যুদ্ধকালে হিজর নামক স্থানে অবতরণ করিলে সাহাবীগণকে আদেশ করিলেন তাহারা যেন ছামূদ জাতির কূপ হইতে পানি পানি না করে এবং পানি সংরক্ষণ না করে। তাহারা বলিলেন, আমরা তো এই পানি হইতে রুটির খামীর তৈরি করিয়াছি, পানি সংরক্ষণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) নির্দেশ দিলেন, তাহারা যেন খামীর এবং পানি ফেলিয়া দেয় (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, কলিকাতা, ১খ, ৪৭৮; আল-আলূসী, রূহুল মাআনী)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجْرِ قَالَ لَاتَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ثُمَّ قَنَّعَ رَاْسَهُ وَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى جَازَ الْوَادِيْ۔

"ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। হিজর (ছামূদ সম্প্রদায়ের আবাসভূমি) অতিক্রম করিবার সময় রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তোমরা কান্নারত অবস্থা ছাড়া ঐ সম্প্রদায়ের আবাসস্থলে প্রবশে করিও না, যাহারা নিজেদের উপর "জুলুম" করিয়াছে যাহাতে উহারা যেই শাস্তি ভোগ করিয়াছে তাহা তোমাদেরকে স্পর্শ না করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) চাদর দ্বারা নিজ মাথা ঢাকিয়া খুব দ্রুত হাঁটিয়া উপত্যকাটি অতিক্রম করিলেন"।

ইমাম বুখারী (র) ইব্‌ন উমার (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটিতে রহিয়াছে, আযাবগ্রস্ত এই লোকদের নিকট কান্না বিজড়িত ভাব ব্যতীত প্রবেশ করিও না (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাব নুযুলিন- নাবী (স) আল-হিজর, ২খ, ৬৩৭)।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন ঃ

لَمَّا كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَاَسْرَعَ النَّاسُ اِلَى اَهْلِ الْحِجْرِ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادٰى فِى النَّاسِ اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ قَالَ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُمْسِكُ بَعِيْرَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ مَا تَدْخُلُوْنَ عَلٰى قَوْمٍ غَضِبَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُ رَجُلٌ نَعْجَبُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَعْجَبَ مِنْ ذٰلِكَ رَجُلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُمْ مَاهُوَكَائِنٌ بَعْدَكُمْ فَاسْتَقِيْمُوا وَسَدِّدُوا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايَعْبَأُ بِعَذَابِكُمْ شَيْئًا وَسَيَاْتِيْ قَوْمٌ لَايَدْفَعُوْنَ عَنْ اَنْفُسِهِمْ شَيْئًا اِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلَمْ يُخْرِجُوْهُ۔

"তাবূক যুদ্ধে গমনের পথে লোকজন হিজরবাসীদের দিকে দ্রুত ধাবিত হইয়া তাহাদের নিকট প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হইল। এই কথা রাসূলুল্লাহ (স) -এর নিকট পৌঁছিল। তিনি লোকজনকে "সালাতের জামাত আসন্ন" বলিয়া আহবান করিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি নবী কারীম (স)-এর নিকট আগমন করিলাম। এই সময় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার বাহন উষ্ট্রীটিকে আনাইয়া বলিতেছিলেনঃ তোমরা এ সম্প্রদায়ের নিকট প্রবেশ করিও না যাহাদের উপর গযব অবতীর্ণ হইয়াছিল। অতঃপর এক লোক রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহা দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। তিনি বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে ইহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্যজনক একটি সংবাদ দিব না? তোমাদেরই মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বে যাহা সংঘটিত হইয়াছিল তাহার সংবাদ দিতেছেন। তোমরা যাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছ তাহার উপর অবিচল থাক। কারণ আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করিতে মোটেই পরোয়া করিবেন না। অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হইবে যাহারা নিজেদের হইতে কোন কিছু দূর করিতে সক্ষম হইবে না"। হাদীছটির সূত্র হইল "হাসান" পর্যায়ের। অন্য কেহ হাদীছটি বর্ণনা করে নাই (ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)।

জাবির (র) হইতে এই বর্ণনাটি ইসমাঈল হাক্কী প্রণীত তাফসীরে রূহুল বায়ানে জাবির (রা) হইতে বর্ণিত ঃ

ثُمَّ زَجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاحِلَتَهُ فَاَسْرَعَ حَتّٰى خَلْفَهَا .

"অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহার সওয়ারীকে তাড়া করিলেন এবং এই স্থানটি ত্যাগ করিবার পূর্ব পর্যন্ত দ্রুত চলিলেন" (তাফসীর রূহুল-বায়ান, ৪খ, ৪৮৪)।

ছামূদ সম্প্রদায়ের শাস্তির ধরন

অবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার বলেন, ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হইয়াছিল বজ্রাঘাতের (صاعقة) দ্বারা। এই বজ্রাঘাত বুঝাইতে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে কোন সময় আর-রাজফা, কোন সময় আত-তাগিয়া এবং কোন সময় আস-সা'ইকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বজ্রাঘাত কোন সময় ভয়ংকর শব্দের সহিত সংঘটিত হয়, কোন সময় ভূমিকম্পের সহিত আবার কোন সময় এক স্থানে পতিত হইয়া অন্য স্থানে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় (আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আমবিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬)। মাওলানা হিফজুর রহমান বলেন, একটি ভয়ংকর শব্দ ছামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিয়াছিল, (দ্র, কাসাসুল কুরআন, ১খ, পৃ. ১৩৯)।

صاعقة- برق-رعد শব্দগুলির বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. আন-নাজ্জার, কাসাসুল-কুরআন, পৃ. ৬২-৬৪।

আল-আলূসী বলেন, فاخذتهم الرجفة আয়াতে উক্ত رجفة সম্পর্কে আল-ফাররা ও আয-যাজ্জাজ বলেন, ইহার অর্থ হইল ভয়ানক ভূমিকম্প। মুজাহিদ ও আস-সুদ্দী বলেন, رجفة শব্দের দ্বারা صيحة বা বিকট শব্দই বুঝানো হইয়াছে। এই দুইটি অভিমতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে বলা যায় যে, উক্ত সম্প্রদায়ের উপর নিম্নদিক হইতে ভূমিকম্প এবং উপর দিক হইতে বিকট ধ্বনি আপতিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, رجفة হইল কম্পমান হৃদয় এবং তাহার অস্থিরতা যাহার ফলে অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যায়। আল-আলূসী আরও বলেন, আল-কুরআনের কোন স্থানে رجفة কোন স্থানে صيحة আর কোন স্থানে طاغية ব্যবহারে কোন বিরোধ নাই। অপব্যাখ্যাকারী লোক অবশ্য ইহার মধ্যে ছিদ্র অন্বেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। উহাদের ইহাতে হৃদয়ের কম্পন শুরু হয় এবং উহার বিভীষিকা ও সীমাহীন প্রতিফলন হইতে طاغة -এর সৃষ্টি হয়। কারণ طغيان বলা হয় সীমা লঙ্ঘন করাকে। ইহা হইতেই আল্লাহ্‌র বাণী হইল اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ "পানি যখন সীমা অতিক্রম করিল আমি তখন তোমাদেরকে নৌযানে উঠাইয়া লইলাম।" অথবা বলা যায় উক্ত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ ছিল তাহাদের অবাধ্যতা। ইহাকে طاغية দ্বারা বুঝানো হইয়াছে (রূহুল মাআনী, ৮খ, ১৬৬৫)। সায়্যিদ আলূসী আরও বলেন, আল-কালী ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ان صيحة ثمود كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم .

"ছামূদ জাতিকে যেই বিকট ধ্বনি দ্বারা ধ্বংস করা ইহয়াছিল উহা ছিল তাহাদের নিচ হইতে নির্গত। আর মাদয়ানবাসীর ধ্বংস ছিল তাহাদের উপরের দিক হইতে আগত ধ্বনি হইতে" (রূহুল মাআনী, ১১খ, ১২৯)।

আল্লামা বাগাবী বলেন, যেই বিকট শব্দের মাধ্যমে ছামূদ সম্প্রদায় ধ্বংস হইয়াছিল উহা ছিল জিবরাঈল (আ) কর্তৃক প্রদত্ত। ফলে উহারা সকলেই মারা গিয়াছিল। আর কেহ কেহ বলেন, উহাদের উপর আকাশ হইতে এমন বিকট ধ্বনি আসিয়াছিল যাহাতে ভূমণ্ডলের সকল বিকট ধ্বনির সংমিশ্রণ ছিল। ফলে উহাদের হৃদপিণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল (আল-বাগাবী, তাফসীর, ২খ, ৩৯১)। আত-তাবাতাবাঈ বলেন, অর্ধ রাত্রি হইয়া গেলে ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট জিবরাঈল (আ) আগমন করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে এমন এক চিৎকার দেন যাহার ফলে উহাদের কান ফাটিয়া যায় ও হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া পড়ে। উহারা সেই তিন দিন কাফনসহ অন্যান্য মৃত সামগ্রী লইয়া প্রস্তুত ছিল যে, উহাদের উপর আযাব নাযিল হইবে। জিবরাঈল (আ)-এর নিকট ধ্বনি শুনিয়া মুহূর্তের মধ্যে উহারা মৃত্যুকোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। ছোট-বড় কেহই মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পায় নাই। উহাদের পাখিদের কোন কল-কাকলী ছিল না, না ছিল কোন রাখাল ছেলের পশু হাকানোর ধ্বনি। পশুপক্ষিসহ সকল বস্তু নিমিষেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা ইহার সহিত আগুনও তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফলে তাহারা ভস্মিভূত হইয়াছিল।

সালিহ (আ)-এর প্রস্থান ও ইনতিকাল

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) হইতে আবুশ-শায়খ বর্ণনা করিয়াছেন, সালিহ (আ) ও তাঁহার উপর যাহারা ঈমান আনিয়াছিলেন তাহারা শাস্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার পর সালিহ (আ) তাহাদেরকে বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! ইহা একটি জনপদ যাহার উপর ও যাহার অধিবাসীদের উপর আল্লাহ্‌র গযব আপতিত হইয়াছে। তোমরা এখান হইতে বাহির হইয়া আল্লাহ্‌র হারাম শরীফে ও তাঁহার নিরাপত্তায় চলিয়া যাও। তখন হইতে তাহারা হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন এবং মক্কা শরীফে উপনীত হইলেন, তৎপর এখানেই তাহারা মৃত্যু অবধি অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রাচীন কালের কা'বাগৃহের পশ্চিম পাশে যে সকল কবর ছিল সেইগুলি তাহাদের (আলূসী, রূহুল মাআনী, ৮খ, ১৬৮)। বাগাবী বলেন, সালিহ (আ)-এর কওমের মুমিনদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। সালিহ (আ) তাহাদেগকে লইয়া 'হাদারামাওত" রওয়ানা করিলেন। এই কারণে এই শহরটি হাদারামাওত নামে আখ্যায়িত হয়। অতঃপর এই চার হাজার মুমিনের প্রচেষ্টায় সেখানে একটি শহর গড়িয়া উঠে যাহাকে 'হাদূরা" (حاضورا) বলা হইত। একদল আলিম সালিহ (আ) সম্পর্কে বলেন, ইন্তিকালের সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল আটান্ন বৎসর (আল-বাগাবী, তাফসীর, ২খ, ১৭৯)। আল্লামা আলূসী আরও বলেন, বিশেষজ্ঞদের একটি দল হইতে বর্ণিত আছে যে, সালিহ (আ) আটান্ন বৎসর বয়সে মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেন। ইহাই নির্ভরযোগ্য অভিমত। সম্ভবত তাঁহার পরিবার-পরিজনও তাঁহার সহিত ছিল। বর্ণিত আছে যে,

ان اشقى الاولين عاقر الناقة واشقى الاخرين قاتل على كرم الله وجهه وقد اخبر صلى الله عليه وسلم بذلك عليا رضى الله عنه وكرم وجهه.

"প্রথম যুগের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য ব্যক্তি ছিল উষ্ট্রী বধকারী। আর পরবর্তী কালে সর্বাধিক জঘন্য ব্যক্তি ছিল আলী (রা)-এর হত্যাকারী। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করিয়াছিলেন" (রূহুল মাআনী, ৮খ, ১৬৮)।

ইবনুল আছীর বলেন, সালিহ (আ) শামে চলিয়া গিয়া ফিলিস্তীনে অবস্থান করিতেছিলেন। অতঃপর তিনি মক্কা শরীফে চলিয়া যান এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই স্থানে ইবাদত করিতে থাকেন। তিনি তাঁহার উম্মতগণের মধ্যে বিশ বৎসর পর্যন্ত দাওয়াতের কাজ চালাইয়াছিলেন (ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ, ১খ, ৭১)। আবুল ফিদা বলেন, হাদারামাওত নামক স্থানে একটি কবর দেখিতে পাওয়া যায় যাহাকে কবরে সালিহ বলা হয়। ওখানকার অধিবাসীরা বলেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের আদি নিবাস ছিল "হাদারামাওত"। সেখান হইতে তাহারা উত্তর দিকে চলিয়া যাইবার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন সালিহ (আ) তাঁহার গোত্রের আদি আবাসস্থলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন (আল-কামিল ফিত-তারীখ, পাদটীকা)। আবদুর রহমান ইবন ছাবিত হইতে ইবন আসাকির বর্ণনা করিয়াছেন, রুকনুল য়ামানী, মাকামে ইবরাহীম ও যমযমের মধ্যবর্তী স্থানে উনাশি জন নবীর কবর রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে নূহ, শু'আয়ব, সালিহ ও ইসমাঈল (আ) রহিয়াছেন (আলূসী, রূহুল মাআনী, প্রাগুক্ত, ৮খ, ১৬১)। সালিহ (আ)-কে তাঁহার যৌবনে তাঁহার কওমের প্রতি প্রেরণ করা হয়। তাঁহার দেহের রঙ ছিল উজ্জল শ্যামলা, চুল ছিল সোজা। নিজ কওমের মধ্যে তিনি চল্লিশ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। আশা-শামী বলেন, তাঁহাকে যুবক বয়সে প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাঁহার কওমকে দাওয়াত দিতে দিতে বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন। ইমাম নাওয়াবী বলেন, সালিহ (আ) তাঁহার কওমের মাঝে বিশ বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মক্কা শরীফে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল আটান্ন বৎসর (রূহুল মাআনী, ৮খ, ১৬২)। আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজ্জার বলেন, কোন কোন তাফসীরকার বলেন, সালিহ (আ) ও তাঁহার সহিত যাহারা ঈমান আনিয়াছিলেন ছামূদ সম্প্রদায় ধ্বংস হইবার পর তাহারা ফিলিস্তীনের রামলা-এর একটি প্রান্তে গিয়া বসবাস করিতেছিলেন। অন্য একদল তাফসীরকার বলেন, সালিহ (আ)-এর অনুসারিগণ সেখানেই রহিয়া গিয়াছিল যেখানে অবাধ্যরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অন্য একদল বলেন, উহারা মক্কা শরীফে চলিয়া গিয়াছিল এবং সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছিল। ইহাদের কবরসমূহ কা'বা শরীফের পশ্চিম দিক অবস্থিত। অতঃপর আন-নাজ্জার বলেন, আমার কাছে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অভিমত হইল, তাহারা রামলা ও ফিলিস্তীনের আশপাশে অবস্থান করিয়াছিলেন। কারণ ইহাই ছিল তাহাদের জন্য সর্বাধিক নিকটবর্তী উৎকৃষ্ট উর্বর স্থান। আরববাসীরা চাহে তাহাদের পশু পালনের জন্য চারণভূমি ও জলাশয়। আল্লামা আল-আলূসী বলেন, সালিহ (আ)-এর সহিত যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল তাহাদের সংখ্যা ছিল এক শত বিশজন। যাহারা ধ্বংসপাপ্ত হইয়াছিল তাহারা ছিল দেড় হাজার পরিবার (আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার, প্রাগুক্ত, ৫৭; হিফজুর রহমান, কাসাসুল-কুরআন, ১খ, ১৪১)।

তাওরাত গ্রন্থে সালিহ ও ছামূদ প্রসঙ্গ

ইবন খালদূন বলেন, তাওরাতের অনুসারীরা আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় সম্পর্কে মোটেই অবগত নয়। কারণ উহাদের এবং হূদ ও সালিহ (আ)-এর কথা তাওরাতে উল্লেখ নাই, এমনকি আরবে আরিবা-র কোন প্রজন্মের কথাও তাওরাতে নাই। তাওরাত গ্রন্থে কেবল মূসা (আ) ও আদম (আ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে যেইসব প্রতিষ্ঠিত জাতির আগমন ঘটিয়াছিল তাহাদের কথাই আলোচিত হইয়াছে (তারীখ ইব্‌ন খালদূন, ২খ, ২৪)। ইবনুল আছীর বলেন, আদ, হূদ, ছামূদ ও সালিহ (আ)-এর কথা তাওরাতে নাই বলিয়া ইহার অনুসারীদের ধারণা হইল, ইসলামী যুগের আরব ও জাহিলী যুগের আরবদের নিকট উহাদের পরিচিতি ইবরাহীম (আ)-এর পরিচিতির ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিল। এই তথ্য প্রদানের পর ইবনুল আছীর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করিতে গিয়া বলেন, তাওরাত অনুসারিগণ কর্তৃক ছামূদ ও সালিহ (আ)-কে অস্বীকার করা আশ্চর্যের কিছু নহে। কিন্তু আরবদের নিকট সকল যুগে উক্ত ঘটনা ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার ন্যায় প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৭১)।

আল্লাহ্‌র নবী সালিহ (আ) ও তাঁহার সম্প্রদায়ের কথা আল-কুরআনে বহুবার আলোচিত হইলেও সবিস্তারে তাঁহার জীবনের কোন দিকই আলোচনা করা হয় নাই। অনেকের মতে মুজিযা বলিতে এই উষ্ট্রীই ছিল। আবার কেহ বলিয়াছেন, উষ্ট্রীটি ছাড়াও অন্য কিছু মুজিযা সালিহ (আ)-এর থাকিতে পারে। যেই পাথর হইতে উষ্ট্রীর সৃষ্টি হইয়াছিল সেই পাথরটি সম্পর্কে একটি নূতন তথ্য প্রদান করিয়াছেন তাফসীরকার আত-তাবাতাবাঈ। তিনি বলেন, পাথরটিকে তাহারা সম্মান করিত, ইহার উপাসনা করিত। প্রতি বৎসরান্তে তাহারা উহার নিকট জমায়েত হইয়া পশু যবেহ করিত (আল-মীযান, ১০ খ, ৩২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ৭ ঃ ৭৩-৭৯; ১১ঃ ৬১-৬৮; ১৫ ঃ ৮০-৮৪, ১৭ঃ ৫৯; ২৬ ঃ ১৪১-১৫৯; ২৭ঃ ৪৫-৫৩; ৪১ ঃ ১৭-১৮; ৫৪ ঃ ২৩-৩২; ৯১ঃ ১১-১৫; (২) বুখারী, কিতাবুস-সালাত, কিতাবুল আম্বিয়া, ১খ, ৪৭৮, কিতাবুত-তাফসীর, ২খ, ৬৮২, কিতাবুল-মাগাযী, বাব গাযওয়াতি তাবূক, ২খ, ৬৩৭, কলিকাতা; (৩) ইবন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল-বারী, বৈরূত ১৪০৫/১৯৮৫, ৬, ২৯২; (৪) আল-কাসতাল্লানী, ইরশাদুস-সারী, বৈরূত তা. বি., ১খ, ৪৩৩; (৫) বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মাআরিফ, বৈরূত তা. বি., ৬খ, ৩৩২; (৬) আছ-ছা'লাবী, তাফসীরুছ-ছা'লাবী, আল মাওসুম বিজাওয়াহিরিল হিসান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৩১; (৭) আয-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৮৯, ৩খ, ১৫১; (৮) আল-কুরতুবী, আল-জামি লিআহকামিল কুরআন, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ., ৭খ, ২৩৮, ৯খ, ৫৫, ১০খ, ৪৫, ১৩খ, ২১৪; (৯) আল-বাগাবী, তাফসীরুল বাগাবী আল-মুসাম্মা মা'আলিমুত-তানযীল, মুলতান তা. বি., ২খ, ১৭৩; (১০) আত-তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, ৮খ, ১৫৭; (১১) আল-আলূসী-আল-বাগদাদী, রূহুল মাআনী, বৈরূত তা. বি., ৮খ, ১৬৩; (১২) সায়্যিদ কুতব, ফী জিলালিল-কুরআন, বৈরূত ১৯৮০, ৩খ, ১৩১২, ৪খ, ২১৫১; (১৩) হিফজুর রহমান সিউহারুবী, কাসাসুল কুরআন, দিল্লী ১৪০০/১৯৮০,

১খ, ১২২; (১৪) আল-মাসউদী, মুরূজুয-যাহাব, মিসর, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬৪ খৃ; ২খ; ৪২; (১৫) ইবনুল-আছীর, আল-কামিল ফীত তারীখ, বৈরূত ১৪০৭/ ১৯৮৭, ১খ, ১৬৮; (১৬) আবদুল হক হাককানী, তাফসীরে হাক্কানী, দিল্লী তা. বি., ২খ., ৪০০; (১৭) আবুল-আ'লা-মাওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, দিল্লী ১৯৮২ খৃ, ৩খ, ৫২২; (১৮) ইবন মানজূর, লিসানুল আরাব, বৈরূত তা.বি., ১খ, ৫০৩; (১৯) ডঃ জাওয়াদ আলী, আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আরাব কাবলাল ইসলাম, বৈরূত ১৯৭৬ খৃ., দ্বিতীয় সংস্করণ, ১খ., ৩২১; (২০) কারী আহমাদ, তারীখে মুসলমানানে আলম (তারিখে আমবিয়া অংশ), করাচী তা. বি., ১খ, ৯০; (২১) আবুল কালাম আযাদ, তরজমানুল কুরআন, লাহোর ১৯৭৬ খৃ, ২খ., ১৯৬; (২২) রাশীদ রিদা, তাফসীরুল-মানার, বৈরূত দ্বিতীয় সংকরণ, তা. বি., ৮খ, ৫০১; ২৩ ইদরীস কান্দালাবী, মাআরিফুল কুরআন, লাহোর ১৪০২/১৯৮২, ৩খ, ৭২; (২৪) মাহমূদ যুহরান, কাসাসুম মিনাল কুরআন, মিসর, ১ম সংস্করণ ১৯৫৬ খৃ, ৩৩; (২৫) মুরতাদা আয-যুবায়দী, তাজুল-আরূস, বৈরূত তা. বি., ২খ, ৩১২; (২৬) জুরজী যায়দান, তারীখুত তামাদদুনিল ইসলামী, বৈরূত, দ্বিতীয় সংস্করণ তা. বি, ১খ, ১৫; (২৭) ইব্ন খালদূন, তারীখে ইব্ন খালদূন, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ২খ, ২৩; (২৮) জারুল্লাহ আয-যামাখশারী, আল-মুসতাকসা ফী আমছালিল- আরাব, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৭, ১খ, ১৭৬; (২৯) ইবনুল-ইবারী আল-হাযিমিয়্যা, তারীখু মুখতাসারুদ-দুওয়াল, বৈরূত ১৪০৩/১৯৮৩, ১৫৮; (৩০) গোলাম নবী অনূদিত খুলাসাতুল আমবিয়া, উরদূ, মূল গ্রন্থ কাসাসুল আমবিয়া, ফারসী প্রকাশনা উল্লেখ নাই, ১৩৭৬ হি, পৃ. ৪০; (৩১) আত-তাবারসী, মাজমাউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬, ৭খ, ৩৫৩; (৩২) মুহাম্মদ হুসায়ন আত-তাবাতাবাঈ, আল-মীযান ফী তাফসীরিল কুরআন, তেহরান ১৩৬২ হি, ১০ খ, ৩২৯; (৩৩) আহমাদ আশ-শাতনাবী প্রমুখ, দাইরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়্যা, বৈরূত তা. বি, ১৪খ, ১০৬; (৩৪) দাইরা মাআরিফ ইসলামিয়্যা (উরদূ), লাহোর ১৯৬২ খৃ., ৬খ., ১০৩১; (৩৫) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মিসর ১৪০৮/১৯৮৮, ১খ, ১২৩; (৩৬) আহমাদ জাদ আল-মাওলা প্রমুখ, কাসাসুল কুরআন, বৈরূত ১৩৮৯/১৯৬৯, পৃ. ২৮; (৩৭) আবদুল ওয়াহহাব আন-নাজজার, কাসাসুল আমবিয়া, বৈরূত তা. বি, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫৮; (৩৮) আল-মাকামাতুল- হারীরিয়্যা, দেওবন্দ তা. বি, মাকামা, ১৮, পৃ. ৩৭; (৩৯) যায়নুল আবিদীন সাজজাদ, কাসাসুল কুরআন, দেওবন্দ ১৯৯৪ খৃ., ৮৪-৯৫; (৪০) সায়্যিদ কাসিম মাহমূদ, ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, (উরদূ) তা. বি, পৃ. ৯৮৭ (৪১) ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, PUBLI, 1973, VOL. VIII., 809, POL IX, 921 ; (৪২) ই. জে. ব্রিল্স, ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম সং, ১৯১৩-১৯৩৬; ১৯৮৭, ৭খ; ১০৭, (৪৩) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা ১৯৯২ খৃ, ১১খ, ৭৬, দ্র. প্রবন্ধ সালিহ (আ)।

ফয়সল আহমদ জালালী

৭

হযরত ইবরাহীম (আ)

حضرت ابراهيم عليه السلام

হযরত ইবরাহীম (আ)

হযরত ইবরাহীম (আ) একজন বিশিষ্ট নবী ও রাসূল। মুসলিম জাতির আদি পিতা (কুরআন, ২২ ঃ ৭৮)। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে কয়েকটি বিষয়ে কঠিন পরীক্ষা করেন। সকল পরীক্ষাতেই তিনি সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হন (২ ঃ ১২৪)। এইজন্য তিনি আল্লাহ্ তা'আলার খুবই প্রিয়ভাজন হন। আল্লাহ তাঁহাকে বিশেষ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন (৪ ঃ ১২৫)। তাই তাঁহার উপাধি হয় খালীলুল্লাহ (আল্লাহ্র বিশেষ বন্ধু)। তিনি মেহমানদারিতে খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপনাম হয় 'আবুদ-দায়ফীন' অর্থাৎ মেহমানদের পিতা (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৪০)।

বাইবেলের বর্ণনামতে তাঁহার পূর্বনাম ছিল 'আবরাম' অর্থাৎ মহাপিতা। তাঁহার ৯৯ বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দান করত তাঁহার নাম রাখেন 'আবরাহাম' অর্থাৎ বহু লোকের বা জাতির পিতা (Genesis, 17:5)। পরবর্তী কালের অনেক গবেষকই এই বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে, ইবরাহীম বা আবরাহাম হিব্রু শব্দ, যাহা 'আব' (পিতা) ও 'রাহাম' (দল বা অধিকাংশ লোক) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত, যাহার অর্থ বহু দল বা অধিকাংশ লোকের পিতা। ইহা অনারব শব্দ (বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল-মাআরিফ, ১খ, ২০৮)।

আবির্ভাবকাল

হযরত ইবরাহীম (আ) কখন দুনিয়াতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা একেবারে সঠিক করিয়া বলা না গেলেও বিভিন্ন বর্ণনা হইতে মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যায়। সবগুলি বর্ণনাই প্রায় একই রকম। অধিকাংশের বর্ণনামতে হযরত নূহ (আ)-এর প্লাবন হইতে ১২৬৩ (মতান্তরে ১০৭৯) বৎসর পর তিনি আবির্ভূত হন এবং হযরত আদম (আ) হইতে ৩৩৩০ (এক বর্ণনায় ৩৩৩৭) বৎসর পর (ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাজাম, ১খ, ২৫৮; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ.৭৬)। আবূ উমামা (রা) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিল, নূহ্ (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে কত ব্যবধান? তিনি বলিলেন, দশ কার্ন (প্রজন্ম) (ইব্নুল-জাওযী, প্রাগুক্ত)। উল্লেখ্য যে, প্রতি ১০০ (এক শত) বৎসরকে এক কার্ন বলা হয়। ইব্ন হাবীব তাহার আল-মুহাব্বার গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে একটি রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাতে এইভাবে হিসাব প্রদান করা হইয়াছে যে, হযরত আদম (আ) হইতে নূহ (আ)-এর সময়কাল ২২২০ (দুই হাজার দুই শত বিশ) বৎসর, নূহ (আ) হইতে ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত ১১৪৩ মতান্তরে ১১৬৫ বৎসর। তদনুযায়ী হযরত আদম (আ) হইতে ইবরাহীম (আ)-এর সময়কাল ৩৩৪৩ বা ৩৩৬৫ বৎসর (ইব্ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, পৃ. ১)। ইব্ন কুতায়বার বর্ণনায় হযরত নূহ (আ) ও ইবরাহীম

(আ)-এর মধ্যে ব্যবধান এই সকল বর্ণনা হইতে একটু বেশী বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার বর্ণনামতে উভয়ের মধ্যে ২২৪০ বৎসরের ব্যবধান (আল-মা'আরিফ, পৃ. ৩১)। অনেকের মতে তিনি খৃ.পূ. ২০১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আর্চবিশপের মতে খৃ.পূ. ১৯৯৬ সালে। তবে প্রথম মতটিই যুক্তিযুক্ত (আনওয়ার-ই আম্বিয়া, পৃ. ৪৬)।

তৎকালীন বাদশাহ্ নমরূদের পরিচয়

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ-এর মতে হযরত ইবরাহমী (আ) পরাক্রমশালী বাদশাহ নমরূদ ইবন কূশ মতান্তরে কিন'আন ইবন কূশ-এর আমলে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও কাহারও মতে সে ইযদিহাক-এর গভর্নর ছিল। কিন্তু অধিকাংশের মতে সে নিজেই বাদশাহ ছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, তাহার রাজত্ব পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। সে বাবিলে বসবাস করিত। কথিত আছে যে, সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব করেন তিন বক্তি ঃ নমরূদ, যুল-কারনায়ন ও সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (আ)। কেহ কেহ বুখত নসরকেও ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া চারজনের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ইবনুল-আছীর উহা বাতিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন (আল-কামিল, ১খ, ৭২)। তাহার বংশলতিকা হইল ঃ নমরূদ ইব্ন কিন'আন ইব্ন কূশ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১১৯)। সে-ই প্রথম স্বেচ্ছাচারী ও কঠোর আচরণকারী রাজা ছিল। সে বিবিধ ধরনের খারাপ আদর্শের প্রচলন করে। প্রথম মাথায় তাজ (রাজমুকুট) পরিধান করে, শয়তানের সহায়তায় জ্যোতির্বিদ্যার প্রসার ঘটায় এবং তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করত উহা পর্যবেক্ষণ করিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা করিতে শুরু করে (ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ৩১) এবং এই কাজে কিছু লোক নিয়োজিত করে, যাহারা কাহিন (গণক) ও মুনাজ্জিম (জ্যোতিষী) নামে পরিচিত। সে-ই প্রথম লোকজনকে তাহার পূজা করিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং নিজকে ক্ষমতাধর বিধাতা বলিয়া দাবি করে, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা ও বিরোধিতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। এক বর্ণনামতে তাহার সময়ই অগ্নিপূজার প্রচলন হয় এবং জ্যোতির্বিদ্যার উদ্ভব ঘটে (আল-মাসঊদী, মুরূজুয-যাহাব, ১খ, ৪৪)। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন। দীর্ঘদিন সে রাজত্ব করে (এক বর্ণনামতে চারি শত বৎসর)। কোনও দলীল-প্রমাণই তাহাকে গোমরাহী হইতে ফিরাইতে পারে নাই। অবশেষে তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মশক বাহিনী প্রেরণ করেন। এত অধিক পরিমাণে মশা বাহির হয় যে, সূর্যকে পর্যন্ত আড়াল করিয়া ফেলে। মশক বাহিনী নমরূদের সেনাবাহিনীর রক্ত মাংস খাইয়া ফেলিল, শুধুমাত্র হাড্ডিগুলি অবশিষ্ট রহিল। অবশেষে একটি মশা নমরূদের নাক দিয়া মগজে ঢুকিয়া পড়িল। সেখানে নানারূপ উৎপাত করিয়া নমরূদকে অস্থির করিয়া ফেলিত। তাই সর্বদাই হাতুড়ি দ্বারা তাহার মস্তক পিটাইতে হইত। মানুষ তাহার প্রতি এইভাবে দয়া প্রদর্শন করিত যে, দুই হাত দিয়া অনবরত সজোরে তাহার মাথায় আঘাত করিতে থাকিত। এইভাবে আরো চারি শত বৎসর জীবিত থাকিয়া শাস্তি ভোগ করে (মতান্তরে ৪০ বৎসর, কাহারো বর্ণনামতে ৪০ দিন)। এইরূপ অপদস্থ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয় (ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ১খ, ২৮০-২৮১; ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ৩১; মুহাম্মাদ আল-ফাকী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ.৭৭)।

ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম ও বংশপরিচয়

তাঁহার জন্মস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কাহারও মতে তিনি আহওয়ায প্রদেশের 'সূস' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, কাহারও মতে কূছার পার্শ্ববর্তী সাওয়াদ নামক স্থানে। কাহারও মতে যাওয়াবী ও কাসকার সীমান্তের পার্শ্ববর্তী ওয়ারকা নামক স্থানে। অতঃপর তাঁহার পিতা কূছার যে প্রান্তে নমরূদ বসবাস করিত তাঁহাকে সেখানে লইয়া যায়। কাহারও মতে হাররান নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে বাবিলে লইয়া আসে (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১১৯; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৬)। হাফিয ইব্ন আসাকির তাঁহার জন্মস্থান সম্পর্কে দুইটি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বাবিলকেই সঠিক বলিয়া রায় দিয়াছেন। তিনি হিশাম ইব্ন আম্মার সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ) দামিশক-এর বারযা নামক শস্য-শ্যামল গ্রামের কাসিয়ূন পর্বতের পাদদেশে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তবে সঠিক হইল তিনি বাবিলে জন্মগ্রহণ করেন। উপরিউক্ত স্থানের কথা এইজন্য তাঁহার প্রতি আরোপ করা হইয়াছে যে, লূত (আ)-এর সহায়তাকল্পে তিনি যখন সেখানে গমন করেন তখন সেখানে সালাত আদায় করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৪০; মুহাম্মাদ আল-ফাকী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬১)। খ্যাতনামা ভূগোলবিদ য়াকূত আল-হামাবী ও আল-বাকরী আল-আনদালুসীর বর্ণনা হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁহাদের বর্ণনামতে বাবিলে অবস্থিত 'কূছা রাব্বা' নামক স্থানেই ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন, সেখানেই তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় (য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল-বুলদান, ৪খ, ৪৮৭; আল-বাকরী আল-আনদালুসী, মু'জামু মাসতা'জাম, ৪খ, ১১৩৮)।

ইব্ন ইসহাক-এর বর্ণনামতে হযরত নূহ (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যখানে মাত্র দুইজন নবী হূদ (আ) ও সালিহ (আ) আগমন করেন। তাঁহাদের সময়কাল শেষ হওয়ার পর মানুষ যখন চরম গোমরাহী ও শিরক-এ লিপ্ত হইল, এক আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তিপূজা ও নক্ষত্র পূজায় নিমগ্ন হইল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বান্দাদিগকে সুপথে আনিবার জন্য ইবরাহীম (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এমতাবস্থায় জ্যোতিষী ও গণকগণ তৎকালীন পরাক্রমশালী বাদশাহ নমরূদের নিকট গিয়া বলিল, আমরা আমাদের বিদ্যার মাধ্যমে দেখিতে পাইতেছি যে, আপনার এই অঞ্চলে অমুক বৎসরের অমুক মাসে ইবরাহীম নামে এক শিশু জন্মগ্রহণ করিবে। সে আপনার ধর্ম ধ্বংস করিয়া ফেলিবে এবং মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আপনার রাজত্বের বিলুপ্তিও তাঁহার দ্বারাই হইবে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তাহারা বলিয়াছিল যে, ইহা তাহারা পূর্ববর্তী নবীদের গ্রন্থে পাইয়াছে (ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৭; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২০; ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ১খ, ২৫৯)। অতঃপর গণকদের বর্ণনাকৃত সেই বৎসরের সেই মাস শুরু হইলে নমরূদ তাহার এলাকার প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার নিকট একজন লোক প্রেরণ করিল। সে উক্ত মহিলার প্রতি নজর রাখিতে লাগিল। অতঃপর যখনই কোন মহিলা কোন পুত্রসন্তান প্রসব করিত তখনই নমরূদের নির্দেশে তাহাকে হত্যা করা হইত। কিন্তু আযরের স্ত্রী, ইবরাহীম (আ)-এর মাতার

ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন। তিনি অল্প বয়স্কা থাকায় তাঁহাকে দেখিয়া গর্ভবতী বলিয়া মনে হইত না। তাই নমরূদের মোতায়েনকৃত লোক কেহই তাহার গর্ভ আঁচ করিতে পারে নাই। ইবরাহীম (আ)-এর মাতা যখন প্রসব বেদনা অনুভব করিলেন তখন নিকটস্থ পর্বত গুহায় চলিয়া গেলেন। সেখানে ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করিলেন। অতঃপর প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাপন করত গুহার মুখ বন্ধ করিয়া তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর তিনি গুহায় গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। তিনি যখনই যাইতেন দেখিতেন যে, ইবরাহীম জীবিত আছেন এবং স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী চোষণ করিতেছেন। আল্লাহ তা'আলা এই চোষণের মাধ্যমেই তাঁহার রিযিক দিয়াছিলেন (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১১৯-১২০; আল-মুনতাজাম, ১খ, ২৫৯)। আবু রুয়ায়ক বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর মাতা যখনই আসিতেন তখনই তাঁহাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুষিতে দেখিতেন। একদিন তিনি বলিলেন, তাঁহার অঙ্গুলীতে কি আছে তাহা অবশ্যই আমি দেখিব। অতঃপর তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ইবরাহীম (আ) এক অঙ্গুলী দিয়া পানি, এক অঙ্গুলী দিয়া দুধ, এক অঙ্গুলী দিয়া মধু, এক অঙ্গুলী দিয়া খেজুর এবং এক অঙ্গুলী দিয়া ঘি চোষণ করিতেছেন (ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৮)। আযর তাহার স্ত্রীকে গর্ভ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলাম, সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আযর ইহা শুনিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং চুপ হইয়া গেলেন। ইবরাহীম (আ) সেখানে বড় হইতে লাগিলেন। খুব দ্রুত তিনি বড় হইয়া উঠেন। তাঁহার বয়বৃদ্ধির সময়-কালকে আল্লাহ তা'আলা বরকতময় করিয়া দেন। তাই তাঁহার একদিন ছিল এক মাসের ন্যায় (মতান্তরে এক সপ্তাহের ন্যায়), এক মাস ছিল এক বৎসরের ন্যায়। তিনি উক্ত পর্বত গুহায় মোট ১৫ মাস ছিলেন। এক দিন তিনি তাঁহার মাতাকে বলিলেন, আমাকে বাহির করিয়া লইয়া চলুন, আমি বাহিরের দৃশ্য দেখিব। অতঃপর মাতা তাঁহাকে রাত্রিবেলায় বাহির করিয়া লইয়া আসেন। এই বর্ণনামতে ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে জানান যে, তিনি তাহার পুত্র। তাঁহার মাতাও আযরকে জানান যে, ইবরাহীম তাহার পুত্র। ইহার পর সমস্ত ঘটনা তাহাকে অবহিত করেন। ইহাতে আযর অত্যন্ত আনন্দিত হন (আত-তাবারী, ১খ, ১২০)। উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, গুহা হইতে বাহির হইবার সময় ইবরাহীম (আ)- যুবা বয়সে উপনীত হন। কারণ এক মাস এক বৎসরের সমান হইলে ১৫ মাস অর্থাৎ ১৫ বৎসর। ছা'লাবীও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গুহায় থাকিতেই ইবরাহীম (আ) যুবকে পরিণত হন (ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৮)।

তাঁহার জন্ম সম্পর্কে সুদ্দী ইব্ন মাসউদ (রা) ও অন্যান্য সাহাবী সূত্রে ভিন্ন বর্ণনা দিয়াছেন। তাহা হইল ঃ নমরূদ একদিন স্বপ্ন দেখিল যে, একটি তারকা উদিত হইয়াছে। উহা চন্দ্র ও সূর্যের আলোকে স্তিমিত করিয়া দিয়াছে, এমনকি উহাদের আর একটুও আলো নাই। ইহাতে নমরূদ দারুণভাবে ঘাবড়াইয়া গেল। সে যাদুকর, গণক, জ্যোতিষী প্রমুখকে ডাকিয়া ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল, আপনার রাজত্বে এক শিশু জন্মগ্রহণ করিবে, যাহার হাতে আপনার ও আপনার রাজত্বের ধ্বংস অনিবার্য (ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৭)। নমরূদের বাসস্থান ছিল বাবিল শহরে। অতঃপর সে সেখান হইতে বাহির হইয়া অন্য এলাকায় চলিয়া গেল এবং

মহিলাদিগকে রাখিয়া সকল পুরুষকে বাহির করিয়া লইয়া আসিল, যাহাতে উক্ত শিশু কোন মহিলার গর্ভে আসিতে না পারে। অতঃপর সে নির্দেশ দিল যে, কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেই যেন তাহাকে হত্যা করা হয়। এইভাবে নমরূদ তাহাদের বহু পুত্রসন্তান হত্যা করিয়া ফেলিল। অতঃপর শহরে তাহার কোন একটি প্রয়োজন দেখা দিল। সে ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযরকে ছাড়া আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কাজ বুঝাইয়া দিল এবং বলিল ঃ দেখিও, তোমার স্ত্রীর সহিত মেলামেশা করিও না। আযর তাহাকে বলিল, আমি আমার দীনকে উহা হইতে বেশী গুরুত্ব দিই। আযর যখন এলাকায় গিয়া উক্ত কাজ সমাপন করিল তখন তাহার মনে হইল, পরিবারের কি অবস্থা একটু দেখিয়া যাই না! অতঃপর স্ত্রীকে দেখিয়া নিজকে আর বশে রাখিতে পারিল না। তাহার সহিত মেলামেশা করিল। অতঃপর স্ত্রীকে লইয়া সে বর্তমান কূফা ও বসরার মধ্যবর্তী উর নামক স্থানে চলিয়া গেল। সেখানে একটি গর্তে সে স্ত্রীকে লুকাইয়া রাখিল। সেখানেই সে স্ত্রীর খানাপিনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়া আসিত। এদিকে যখন অনেক দিন অতিবাহিত হইল তখন বাদশাহ্ বলিল, গণকদের কথা মিথ্যা। তোমারা তোমাদের স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাও। তখন তাহারা ফিরিয়া আসিল। ওদিকে সেই গুহায় ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রতিদিন তাঁহার এক সপ্তাহ, প্রতি সপ্তাহ এক মাস, প্রতি মাস এক বৎসরের মত অতিবাহিত হইতে লাগিল। বাদশাহ তাহা ভুলিয়া গেল। ইবরাহীম (আ) বড় হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার পিতামাতা ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টি দেখেন নাই। ইবরাহীমের পিতা তাহার সঙ্গী-সাথীদিগকে বলিল, আমার একটি পুত্র আছে যাহাকে আমি লুকাইয়া রাখিয়াছি। তাহাকে যদি আমি লইয়া আসি তাহা হইলে কি বাদশাহের ভয় আছে? তাহারা বলিল, না, তাহাকে লইয়া আস। তিনি গিয়া তাহাকে গুহা হইতে বাহিরে লইয়া আসিল (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২০-১২১; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৭-৭৮; ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৭৩)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ)-এর মাতা যখন গর্ভবতী হইলেন তখন গণকগণ নমরূদকে বলিল, যে শিশু পুত্রের সংবাদ আমরা আপনাকে দিয়াছিলাম সে অদ্য রাত্রে মায়ের গর্ভে আসিয়াছে। তখন নমরূদ পরবর্তীতে ভূমিষ্ট সকল শিশুপুত্রকে হত্যার নির্দেশ দিল। অতঃপর ইবরাহীম (আ)-এর মাতার যখন সন্তান প্রসবের সময় ঘনাইয়া আসিল এবং প্রসব বেদনা আরম্ভ হইল তখন এই ভয়ে তিনি বাড়ি হইতে পলায়ন করিলেন যে, জানাজানি হইয়া গেলে তাহার সন্তানকে হত্যা করা হইবে। অতঃপর শুষ্ক একটি ঝর্ণার নিকট আসিয়া তিনি সন্তান প্রসব করিলেন। সন্তানকে একটি বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত করিয়া একটি গর্তে রাখিলেন। অতঃপর ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে তিনি একটি পুত্রসন্তান প্রসবের কথা জানাইলেন এবং তাহাকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছেন তাহাও জানাইলেন। অতঃপর তাহার পিতা আসিয়া তাহাকে উক্ত স্থান হইতে লইয়া গিয়া শুষ্ক ঝর্ণার নিকট একটি গর্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে রাখিল এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে উহার মুখ পাথর দ্বারা বন্ধ করিয়া দিল। তাঁহার মাতা বিভিন্ন সময়ে আসিয়া তাহাকে দুধ পান করাইয়া যাইতেন (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৭)।

বংশ লতিকা

তাওরাত-এর বর্ণনামতে তাঁহার বংশলতিকা হইল ঃ ইবরাহীম ইবন তারাহ (বয়স ২৫০ বৎসর) ইব্‌ন নাহূর (বয়স ১৪৮ বৎসর) ইব্‌ন নূহ আলায়হিস সালাম (Genesis, 11: 10-27; ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৩৯; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১১৯)। তাঁহার বংশ লতিকার ছক নিম্নরূপ ঃ

সাম এর		জন্মের	সময়	তাহার	পিতা	নূহ (আ)-এর		বয়স	৫০০	বৎসর
আরফাখশায-এর		"	"	"	"	সাম	"	"	১০০	"
শালিহ	"	"	"	"	"	আরফাখশায	"	"	১২৫	"
আবির	"	"	"	"	"	শালিহ	"	"	৩০	"
ফালিজ	"	"	"	"	"	আবির	"	"	৩৪	"
রাউ	"	"	"	"	"	ফালিজ	"	"	৩০	"
সারূজ	"	"	"	"	"	রাউ	"	"	৩২	"
নাহূর	"	"	"	"	"	সারূজ	"	"	৩০	"
তারাহ	"	"	"	"	"	নাহূর	"	"	২৯	"
আবরাম/ইবরাহীম		"	"	"	"	তারাহ	"	"	৭৫	"

মোট-৯৮৫ বৎসর।

(আল-নাজজার, কাসাসুল-আম্বিয়া,পৃ. ৭৩)।

ইতিহাস ও বাইবেলে ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম তারাহ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কুরআন কারীমে তাহাকে আযর বলা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে; وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً "স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন?" (৬ ঃ ৭৪)? তাই উলামায়ে কিরাম এই অসামঞ্জস্য দূরীকরণে বিভিন্ন প্রকারের ব্যাখ্যা পেশ করিয়াছেন।

(১) কাহারও মতে তারাহ ও আযর একই ব্যক্তি। তারাহ তাহার নামবাচক বিশেষ্য (علم إسمى) আর আযর গুণবাচক বিশেষ্য (علم وصفى)। ইহাদের মতে আযর হিব্রু শব্দ যাহার অর্থ মূর্তি প্রেমিক, তারাহ মূর্তির সহিত সর্বদাই জড়িত ছিল। সে মূর্তি তৈরি করিত এবং মূর্তির পূজাও করিত। এইজন্য তাহাকে আযর উপাধি দেওয়া হয় এবং এই উপাধিতেই সে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর কিছু লোকের ধারণা, আযর শব্দের অর্থ أعوج অর্থাৎ নির্বোধ বা বেওকূফ ও অকেজো বৃদ্ধ (আয-যাবীদী, তাজুল-আরূস, ৩খ, ১১)। তারাহ-এর মধ্যে এই বিশেষণ বর্তমান ছিল বিধায় এই গুণবাচক

বিশেষ্যের দ্বারাই সে পরিচিত হইয়া যায়। তাই কুরআন কারীমে তাহার উক্ত প্রসিদ্ধ গুণবাচক বিশেষ্য তথা উপাধিতেই উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লামা সুহায়লী তাঁহার রাওদুল উনুফ গ্রন্থে এই মত বর্ণনা করিয়াছেন (১খ, ৭৪)।

(২) কাহারও কাহারও মতে উক্ত আয়াতে ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম উল্লেখ নাই। এখানে আয়াতের অর্থ সেই মূর্তি যাহা তাহার পিতা তৈরি করিত এবং যাহার সে পূজাও করিত। এই মর্মে মুজাহিদ (র) হইতে একটি রিওয়ায়াত রহিয়াছে যে, কুরআন কারীমের উল্লিখিত আয়াতের অর্থ হইল أَتَتَّخِذُ آزَرَ آلِهَةً অর্থাৎ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً তুমি কি আযরকে উপাস্য বলিয়া মান্য কর, অর্থাৎ মূর্তিকে উপাস্য মান? আল্লামা সানআনীর ধারণাও ইহাই। মোটকথা ইহাদের মতে কুরআন কারীমে ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম উল্লেখ করা হয় নাই। আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার-এর রায় হইল, মুজাহিদ (র)-এর মতটিই যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য। কারণ মিসরের প্রাচীন দেবতাদের মধ্যে একটির নাম ছিল আয়ুরীস, যাহার অর্থ "শক্তিশালী ও সাহায্যকারী খোদা"। আর মূর্তি পূজারীদের মধ্যে পূর্ব হইতেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, তাহারা প্রাচীন দেবতাদের নামে নূতন দেবতাদের নামকরণ করিত। তাই এই মূর্তিটির নামও প্রাচীন মিসরীয় দেবতার নাম অনুসারে আযর রাখা হয়। আর উহারই কথা কুরআন কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে (হিফজুর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল-কুরআন, ১খ, ১৫২-১৫৩)।

(৩) একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম তারাহ আর চাচার নাম আযর। চাচাই তাহাকে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করে। তাই কুরআন কারীমে তাহাকে ইবরাহীম (আ)-এর পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। চাচা তো পিতার সমপর্যায়ের। রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীছেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন : العم صنو أبيه। "চাচা পিতার ন্যায়ই" (সিউহারবী, প্রাগুক্ত)।

তবে কুরআন কারীমের সুস্পষ্ট বর্ণনায় আযরকে ইবরাহীম (আ)-এর পিতা বলা হইয়াছে। তাই অযথা উহার কোন রূপক অর্থ গ্রহণ বা অন্য কোনও জটিল বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে বলিয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। যদি স্বীকারও করিয়া লওয়া হয় যে, আযর অর্থ মূর্তি প্রেমিক বা উহা দেবতার নাম, তবুও ইহার জটিল বিশ্লেষণে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। উভয় অবস্থাতেই বলা যায় যে, আযর তাহার নামই ছিল। যেমন মূর্তিপূজারিগণ প্রাচীন কাল হইতেই নিজেদের সন্তানদিগের দেবতার গোলামসূচক নাম রাখিত (যথা আবদুল 'উযযা, আবদ মানাত প্রভৃতি), আর কখনো কখনো সরাসরি মূর্তির নামে নাম রাখিত। এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়া থাকিবে।

প্রকৃতপক্ষে কালদীয় ভাষায় বড় পূজারীকে বলা হয় আদার। আরবী ভাষায় ইহাকেই আযর বলা হয়। ইবরাহীম (আ)-এর পিতা তারাহ যেহেতু মূর্তি নির্মাতা এবং সবচেয়ে বড় পূজারী ছিল, এইজন্য আযর নামেই সে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অথচ ইহা তাহার নাম নহে, উপাধি। আর উপাধি যেহেতু নামের স্থান দখল করে সেহেতু কুরআন কারীমেও তাহাকে উক্ত নামেই উল্লেখ করা হইয়াছে (হিফজুর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ১খ, ১৫৩)।

নির্বোধ, বেওকুফ বা অকেজো বৃদ্ধ প্রভৃতি বিশেষণের কারণে আযর বলা মোটেও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর চরিত্র এতই উন্নত ছিল যে, পিতার সম্মুখে যখন তিনি মূর্তি পূজার অসারতা তুলিয়া ধরিলেন তখন পিতা রাগান্বিত হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা ও হুমকি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিল ঃ

اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا ـ

"হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হইতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করিবই। তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও" (১৯ ঃ ৪৬)।

এত কর্কশ ভাষা ও কঠোর আচরণের পরও তিনি স্বীয় পিতার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিয়া বিনয়াবনতভাবে তাহার শান্তি কামনা করিয়াছিলেন এবং তাহার জন্য আল্লাহ্র নিকট দুআ করার অঙ্গীকার করেন। তিনি বলেন ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ اِنَّهُ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ـ

"তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল" (১৯ঃ ৪৭)।

সুতরাং এমন মহামানব হইতে স্বীয় পিতাকে নির্বোধ, বেওকুফ, অকেজো বৃদ্ধ প্রভৃতি অসম্মান-সূচক বিশেষণে সম্বোধন করা বা তাহার সামনে উক্ত শব্দ ব্যবহার করা একেবারেই অসম্ভব (আবদুল ওয়াহ্হাব নাজজার, পৃ. ৭০)। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইতিহাস ও বাইবেলে বর্ণিত তারাহ ও কুরআনে বর্ণিত আযর একই ব্যক্তি। আযর তাহার নামবাচক বিশেষ্য (علم اسمى) ; গুণবাচক বিশেষ্য (علم وصفى) নহে। আর তারাহ হয়ত-বা তাহার নাম নহে, আযর শব্দের অনুবাদ, ভুলক্রমে তারাহ নামটি উল্লিখিত হইয়াছে। আর তাওরাতের অন্যান্য অনূদিত নামের ন্যায় ইহা অনুবাদ না থাকিয়া বরং প্রকৃত নাম হইয়া গিয়াছে (সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ১খ, ১৫৩-১৫৪)।

ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর ছিল কাঠমিস্ত্রী। সে কাঠের মূর্তি তৈরি করিত এবং মূর্তি-পুজকদের নিকট উহা বিক্রয় করিত (আন-নাজজার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৯)।

হাফিজ ইব্ন আসাকির ইসহাক ইব্ন বিশর আল-বাহিলী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর মাতার নাম ছিল উমায়লা। আল-কালবীর বর্ণনামতে তাহার নাম ছিল বূনা বিনত কারবানা ইব্ন কারছী। আস-সুহায়লী "লায়ূছা" বলিয়া তাহার আরো একটি নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন আরফাখশায ইবন সাম ইবন নূহ (আ)-এর বংশধর (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৪০; ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১১৯; আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, ৭৫)।

তারাহ্-এর বয়স যখন ৭৫ বৎসর তখন পুত্র ইবরাহীম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তারাহ্-এর অপর দুই পুত্র ছিল নাহূর ও হারান। হারান জ্যৈষ্ঠ, ইবরাহীম (আ) মধ্যম ও নাহূর কনিষ্ঠ। হারানের

পুত্র লূত (আ)। হারান তাহার পিতার জীবদ্দশায় স্বীয় জন্মভূমি কালদানীদের ভূমি অর্থাৎ বাবিলে মারা যান। ইতিহাস ও সীরাতবিদগণের নিকট ইহাই প্রসিদ্ধ। হাফিজ ইবন আসাকির ইহাকেই সহীহ বলিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ, ১৪০; ঐ লেখক, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ১১৯; মুহাম্মদ আল-ফাকী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬১)।

আল-কুরআন কারীমে হযরত ইবরাহীম (আ)

কুরআন কারীমের বহু স্থানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার হিদায়াত প্রাপ্তি, পিতা ও কওমের প্রতি তাওহীদের দাওয়াত এবং মূর্তির অসারতা প্রতিপাদন করিয়া যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান, জালিম ও জাহিল বাদশাহের সহিত বিতর্ক, তাঁহার অগ্নিপরীক্ষা, বার্ধক্যে সন্তান লাভ, সন্তান ও পরিবারবর্গের জন্য দু'আ, ফেরেশতাদের সহিত কথোপকথন, কা'বা গৃহ নির্মাণ ও হজ্জের ঘোষণা প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে মাক্কী ও মাদানী উভয় প্রকার সূরাতেই তাঁহার ব্যাপক আলোচনা করা হইয়াছে। একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সূরাও তাঁহার নামে নামকরণ করা হইয়াছে, যাহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। কুরআনুল কারীমের মোট ২৫টি সূরার ৬৯টি স্থানে তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সূরা বাকারা, আল-ই ইমরান, আন-নিসা, আল-আন'আম, হূদ, আন-নাহল, মারয়াম, আল-আম্বিয়া, আল-হাজ্জ ও আস-সাফফাত-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। যে সকল সূরা ও আয়াতে তাঁহার আলোচনা করা হইয়াছে তাহার একটি ছক নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	সূরার নাম ও ক্রমিক নং	আয়াত সংখ্যা
১.	আল-বাকারা-২	১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ২৫৮, ২৬০।
২.	আল-ইমরান-৩	৩৩, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৮৪, ৯৫, ৯৭।
৩.	আন-নিসা-৪	৫৪, ১২৫, ১৬৩।
৪.	আল-আন'আম-৬	৭৪, ৭৫, ৮৩, ১৬১।
৫.	আত-তাওবা-৯	৭০, ১১৪।
৬.	হূদ-১১	৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৬।
৭.	ইউসুফ-১২	৬, ৩৮।
৮.	ইবরাহীম-১৪	৩৫।
৯.	আল-হিজর-১৫	৫১।
১০.	আন-নাহল-১৬	১২০, ১২৩।
১১.	মারয়াম-১৯	৪১, ৪৬, ৫৮।
১২.	আল-আম্বিয়া-২১	৫১, ৬০, ৬২, ৬৯।
১৩.	আল-হাজ্জ-২২	২৬, ৪৩, ৭৮।
১৪.	আশ-শু'আরা-২৬	৬৯।

১৫.	আল-আনকাবূত-২৯	১৬, ৩১।
১৬.	আল--আহযাব-৩৩	৭।
১৭.	আস-সাফফাত-৩৭	৮৩, ১০৪, ১০৯।
১৮.	সাদ-৩৮	৪৫।
১৯.	আশ-শূরা-৪২	১৩।
২০.	আয-যুখরুফ-৪৩	২৬।
২১.	আয-যারিয়াত-৫১	২৪।
২২.	আন-নাজম-৫৩	৩৭।
২৩.	আল-হাদীদ-৫৭	২৬।
২৪.	আল-মুমতাহানা-৬০	৪।
২৫.	আল-আ'লা-৮৭	১৯।

(আন-নাজজার, পৃ. ৭৭; সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ১খ, ১১৭-১৬৮)।

কুরআনুল কারীমে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে উহার বিশদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ۔ وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ۔ وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهُ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۔ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔ وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۔ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ اٰبَائِكَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ ۔ (٢ : ١٢٤-٣٣)

"এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তাঁহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি সে পূর্ণ করিয়াছিল। আল্লাহ বলিলেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করিতেছি। সে বলিল, আমার বংশধরগণের মধ্য হইতেও? আল্লাহ বলিলেন, আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। এবং সেই সময়কে স্মরণ কর যখন কা'বাগৃহকে মানবজাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী ই'তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিবার আদেশ দিয়াছিলাম। স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! ইহাকে নিরাপদ শহর করিও। আর ইহার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে তাহাদিগকে ফলমূল হইতে জীবিকা প্রদান করিও। তিনি বলিলেন, যে কেহ কুফরী করিবে তাহাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করিতে দিব। অতঃপর তাহাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য করিব এবং কত নিকৃষ্ট তাহাদের প্রত্যাবর্তনস্থল! স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের প্রাচীর তুলিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও। আমাদিগকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করিও যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। যে নিজকে নির্বোধ করিয়াছে সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হইতে আর কে বিমুখ হইবে! পৃথিবীতে তাহাকে আমি মনোনীত করিয়াছি; আর আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণের অন্যতম। তাহার প্রতিপালক যখন তাহাকে বলিয়াছিলেন, আত্মসমর্পণ কর, সে বলিয়াছিল, জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মাসমর্পণ করিলাম। এবং ইবরাহীম ও ইয়া'কূব এই সম্বন্ধে তাহার পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হইয়া তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না। ইয়া'কূবের নিকট যখন মৃত্যু আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে? তখন তাহারা বলিয়াছিল, আমরা আপনার ইলাহ-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর ইলাহ-এরই ইবাদত করিব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী" (২ ঃ ১২৪-১৩৩)।

وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ . (٢ : ١٣٥-٣٦)

"তাহারা বলে, ইয়াহূদী বা খৃস্টান হও, ঠিক পথ পাইবে। বল, বরং একনিষ্ঠ হইয়া আমরা ইবরাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ) অনুসরণ করিব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" (২ ঃ ১৩৫-৬)।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ أَنَّ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

"তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁহার বংশধরগণ অবশ্যই ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিল? বল, তোমরা কি বেশী জান, না আল্লাহ? আল্লাহ্র নিকট হইতে তাহার কাছে যে প্রমাণ আছে তাহা যে গোপন করে তাহার অপেক্ষা অধিকতর জালিম আর কে হইতে পারে? তোমরা যাহা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নহেন" (২ ঃ ১৪০)।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاجَّ إِبْرٰهِيْمَ فِيْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْيِيْ وَاُمِيْتُ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ . (٢ : ٢٥٨)

"তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখ নাই, যে ইবরাহীমের .. সহিত তাহার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিল, যেহেতু আল্লাহ তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন। যখন ইবরাহীম বলিল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলিল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলিল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও তো। অতঃপর যে কুফরী করিয়াছিল সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (২ ঃ ২৫৮)।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. (٢: ٢٦٠)

"যখন ইবরাহীম বলিল, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও। তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস করনা? সে বলিল, কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য। তিনি বলিলেন, তবে চারিটি পাখি লও এবং উহাদিগকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। তৎপর তাহাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদিগকে ডাক দাও। উহারা দ্রুত গতিতে তোমার নিকট আসিবে। জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (২ ঃ ২৬০)।

إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ إِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ . ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. (٣ : ٣٣-٣٤)

"নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন। ইহারা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (৩ ঃ ৩৩-৩৪)।

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ إِبْرَاهِيْمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ الاَّ مِنْ بَعْدِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. هٰاَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَالَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ. مَاكَانَ إِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِىُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاللّٰهُ وَلِىُّ الْمُؤْمِنِيْنَ. (٣: ٦٥-٧٨)

"হে কিতাবীগণ! ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইনজীল তো তাহার পরেই অবতীর্ণ হইয়াছিল? তোমরা কি বুঝ না? হাঁ, তোমরা তো সেইসব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরাই তো তর্ক করিয়াছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করিতেছ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নহ। ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না। নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তাহারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম যাহারা তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং এই নবী ও যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক" (৩ ঃ ৬৫-৬৮)।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا أُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ. (٣ : ٨٤)

"বল, আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি; আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী" (৩ ঃ ৮৪)।

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. (٣ : ٩٥)

"বল, আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং তোমারা একনিষ্ঠ ইবরাহীমের (ধর্মাদর্শ) অনুসরণ কর, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে" (৩ ঃ ৯৫)।

إِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ. فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا. (٣ : ٩٧)

"নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায়; উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। উহাতে (কা'বা গৃহে) অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেহ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ" (৩ ঃ ৯৬-৯৭)।

أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ عَلٰى مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ اٰتَيْنَا اٰلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاٰتَيْنٰهُمْ مُلْكًا عَظِيْمًا . (٤ : ٥٤)

"অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যাহা দিয়াছেন সেজন্য কি তাহারা তাহাদিগকে ঈর্ষা করে? আমি ইবরাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান করিয়াছিলাম" (৪ ঃ ৫৪)।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَّاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا . (٤ :١٢٥)

"তাহার অপেক্ষা দীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ) অনুসরণ করে? আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন" (৪ ঃ ১২৫)।

إِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا إِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمَانَ وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا . (١٦٣: ٤)

"আমি তো তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি, যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকটও ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাঊদকে যাবূর দিয়াছিলাম" (৪ ঃ ১৬৩)।

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً إِنِّيْ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ . وَكَذٰلِكَ نُرِيْ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ . فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰى كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ . فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ . فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَا اَكْبَرُ فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ . اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ . وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّيْ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ . وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَاَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা আযরকে বলিয়াছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? আমি তো আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখিতেছি। এইভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই, যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাহাকে আচ্ছন্ন করিল তখন সে নক্ষত্র দেখিয়া বলিল, ইহাই আমার প্রতিপালক। অতপর যখন উহা অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, 'যাহা অস্তমিত হয় তাহা আমি পছন্দ করি না'। অতঃপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হইতে দেখিল তখন বলিল, ইহা আমার প্রতিপালক। যখন ইহাও আস্তমিত হইল তখন সে বলিল, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইব। অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হইতে দেখিল তখন বলিল, 'ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ।' যখন ইহাও অস্তমিত হইল তখন সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর তাহার সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি। তাহার সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাহার সহিত শরীক কর তাহাকে আমি ভয় করি না। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অনুধাবন করিবে না? তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব? অথচ তোমরা আল্লাহ্র শরীক করিতে ভয় কর না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই। সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের বেশী হকদার" (৬ ঃ৭৪-৮১)?

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. (٦ : ٨٣-٨٤)

"আর ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব, ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাঊদ, সুলায়মান ও আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করি" (৬ ঃ ৮৩-৮৪)।

قُلْ إِنَّنِىْ هَدَانِىْ رَبِّىْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

(٦:١٦١)

"বল, 'আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। উহাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না" (৬ ঃ ১৬১)।

اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيْمَ وَاَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكٰتِ اَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ. (٩ : ٧٠)

"উহাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসিগণের সংবাদ কি উহাদের নিকট আসে নাই? উহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের রাসূলগণ আসিয়াছিল। আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তাহাদের উপর জুলুম করেন, কিন্তু উহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে" (৯ ঃ ৭০)।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ. (١١٤ : ٩و)

"ইবরাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া। অতঃপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু, তখন ইবরাহীম উহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল" (৯ ঃ ১১৪)।

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ. فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ. وَامْرَاَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ. قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ. قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ. إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ. يٰاِبْرَاهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ. (٧٦-٦٩ : ١١)

"আমার ফেরেশতাগণ তো সুসংবাদ লইয়া ইবরাহীমের নিকট আসিল। তাহারা বলিল, 'সালাম'। সেও বলিল, 'সালাম'। সে অবিলম্বে এক কাবাবকৃত গো-বৎস লইয়া আসিল। সে যখন দেখিল, তাহাদের হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইতেছে না, তখন তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত মনে করিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। তাহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা তো লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। আর তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান এবং সে হাসিয়া ফেলিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলিল, কী আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভূত ব্যাপার। তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করিতেছ? হে পরিবারবর্গ!

তোমাদের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি তো প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ। অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী। হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে; উহাদের প্রতি তো আসিবে শাস্তি যাহা অনিবার্য" (১১ ঃ ৬৯-৭৬)।

وكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنَ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ٠ (٦ : ١٢)

"এইভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করিবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন এবং তোমার প্রতি ও ইয়া'কূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ পূর্ণ করিবেন, যেভাবে তিনি ইহা পূর্বে পূর্ণ করিয়াছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (১২ ঃ ৬)।

واتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاءِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ ٠ (٣٨ : ١٢)

"আমি (ইউসুফ) আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সহিত কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নহে। ইহা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না" (১২ ঃ ৩৮)।

واِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ٠ رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٠ رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ٠ رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ٠ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ ٠ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ٠ رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ٠

(١٤ : ٣٥-٤١)

"স্মরণ কর, ইবরাহীম বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে নিরাপদ করিও এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা হইতে দূরে রাখিও। হে আমার প্রতিপালক! এই সকল প্রতিমা তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করিয়াছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করিবে সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেহ আমার অবাধ্য হইলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের

প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করাইলাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! এইজন্য যে, উহারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কিছু লোকের অন্তর উহাদের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা উহাদের রিযিকের ব্যবস্থা করিও, যাহাতে উহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জান যাহা আমরা গোপন করি ও যাহা আমরা প্রকাশ করি। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবূল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! যেই দিন হিসাব অনুষ্ঠিত হইবে সেই দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করিও" (১৪ ঃ ৩৫-৪১)।

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ۔ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۔ قَالُوْا لَاتَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ ۔ قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ ۔ قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ۔ قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ۔ قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۔ اِلَّا اٰلَ لُوْطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۔ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ۔ (١٥:٥١-٦٠)

"আর উহাদিগকে বল ইবরাহীমের অতিথিদের কথা, যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম', তখন সে বলিয়াছিল, আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত! উহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিতেছি। সে বলিল, তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিতেছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিতেছ? উহারা বলিল, আমরা সত্য সংবাদ দিতেছি; সুতরাং তুমি হতাশ হইও না। সে বলিল, যাহারা পথভ্রষ্ট তাহারা ব্যতীত আর কে তাহার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হইতে হতাশ হয়? সে বলিল, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে? উহারা বলিল, আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে, তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নহে, আমরা অবশ্যই ইহাদের সকলকে রক্ষা করিব, কিন্তু তাহার স্ত্রীকে নহে। আমরা স্থির করিয়াছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (১৫ ঃ ৫১-৬০)।

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ اِجْتَبٰهُ وَهَدٰهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔ وَاٰتَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔ ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۔ (١٦ : ١٢٠-١٢٣)

"ইবরাহীম ছিল এক 'উম্মাত', আল্লাহ্‌র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে। আমি তাহাকে দুনিয়ায় দিয়াছিলাম এবং

আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না” (১৬ ঃ ১২০-১২৩)।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا ۔ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِىْ عَنْكَ شَيْئًا ۔ يٰاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۔ يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ۔ يٰاَبَتِ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۔ قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا ۔ قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا ۔ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ عَسٰٓى اَلَّآ اَكُوْنَ بِدُعَآءِ رَبِّىْ شَقِيًّا ۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۔ (١٩ : ٤١-٥٠)

“স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী। যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, হে আমার পিতা! তুমি তাহার ইবাদত কর কেন যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজেই আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি তো আশংকা করি যে, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে, তখন তুমি হইয়া পড়িবে শয়তানের বন্ধু। পিতা বলিল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হইতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করিবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও। ইবরাহীম বলিল, তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদিগের হইতে ও তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের ইবাদত কর তাহাদিগ হইতে পৃথক হইতেছি। আমি আমার প্রতিপালককে আহবান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহবান করিয়া আমি ব্যর্থকাম হইব না। অতঃপর সে যখন তাহাদিগ হইতে ও তাহারা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের ইবাদত করিত সেই সকল হইতে পৃথক হইয়া গেল তখন আমি তাহাকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব এবং প্রত্যেককে নবী করিলাম। এবং তাহাদিগকে আমি দান করিলাম আমার অনুগ্রহ ও তাহাদের নাম-যশ সমুচ্চ করিলাম” (১৯ ঃ ৪১-৫০)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ ۔ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ۔ قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۔ قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ ۔ قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ

الشّٰهِدِيْنَ. وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ. فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ. قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ. قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ. قَالُوْا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰاِبْرٰهِيْمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ. فَرَجَعُوْا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ. ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ. قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ. قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ. وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ. وَنَجَّيْنٰهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ. وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ. وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ. (٢١ : ٥١-٧٣)

"আমি তো ইহার পূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিল, এই মূর্তিগুলি কী, যাহাদের পূজায় তোমরা রত রহিয়াছ? উহারা বলিল, আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে ইহাদের পূজা করিতে দেখিয়াছি। সে বলিল, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষগণও রহিয়াছ সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে। উহারা বলিল, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য আনিয়াছ; না তুমি কৌতুক করিতেছ? সে বলিল, না, তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী। শপথ আল্লাহ্‌র! তোমরা চলিয়া গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করিব। অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল মূর্তিগুলিকে, উহাদের প্রধানটি ব্যতীত; যাহাতে উহারা তাহার দিকে ফিরিয়া আসে। উহারা বলিল, আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করিল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। কেহ কেহ বলিল, এক যুবককে উহাদের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি, তাহাকে বলা হয় ইবরাহীম। উহারা বলিল, তাহাকে উপস্থিত কর লোকসম্মুখে, যাহাতে উহারা সাক্ষ্য দিতে পারে। উহারা বলিল, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করিয়াছ? সে বলিল, সেই তো ইহা করিয়াছে, এই তো ইহাদের প্রধান। ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যদি ইহারা কথা বলিতে পারে। তখন উহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এবং একে অপরকে বলিতে লাগিল, তোমরাই তো সীমালংঘনকারী! অতঃপর উহাদের মস্তক অবনত হইয়া গেল এবং উহারা বলিল, তুমি তো জানই যে, ইহারা কথা বলে না। ইবরাহীম বলিল, তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যাহা তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না? ধিক তোমাদিগকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর তাহাদিগকে! তবে কি তোমরা বুঝিবে না? উহারা বলিল, তাহাকে পোড়াইয়া দাও এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলিকে, তোমরা যদি কিছু করিতে চাহ। আমি বলিলাম, হে অগ্নি!

তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও। উহারা তাহার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্তু আমি উহাদিগকে করিয়া দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি কল্যাণ রাখিয়াছি বিশ্ববাসীর জন্য। এবং আমি ইবরাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়া'কূব; আর প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ এবং তাহাদিগকে করিয়াছিলাম নেতা। তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করিত; তাহাদিগকে ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে, সালাত কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে; তাহারা আমারই ইবাদত করিত" (২১ : ৫১-৭৩)।

وَاِذْ بَوَّأْنَا لِاِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ. وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. (٢٢:٢٦-٢٧)

"এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান, তখন বলিয়াছিলাম, আমার সহিত কোন শরীক করিও না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখিও তাহাদের জন্য যাহারা তাওয়াফ করে এবং দাঁড়ায়, রুকূ করে ও সিজদা করে। এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করিয়া দাও, উহারা তোমার নিকট আসিবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করিয়া". (২২ : ২৬-২৭)।

وَقَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَقَوْمُ لُوْطٍ. وَاَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوْسٰى فَاَمْلَيْتُ لِلْكٰفِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ. (٤٣-٤٤ : ٢٢)

"ইবরাহীম ও লূতের সম্প্রদায় এবং মাদয়ানবাসীরা (তাহাদের নবীগণকে অস্বীকার করিয়াছিল)। আর অস্বীকার করা হইয়াছিল মূসাকেও। আমি কাফিরদিগকে অবকাশ দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহাদিগকে শাস্তি দিয়াছিলাম। অতএব কেমন ছিল শাস্তি" (২২ : ৪৩-৪৪)।

مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. (٧٨ : ٢٢)

"ইহা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করিয়াছেন 'মুসলিম' এবং এই কিতাবেও; যাহাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানবজাতির জন্য" (২২ : ৭৮)।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ. قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ. اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ. قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ. قَالَ اَفَرَءَيْتُمْ مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ. اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ. وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ. وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ. وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ

يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ. رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ. وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِى الْاٰخِرِيْنَ. وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ. وَاغْفِرْ لِاَبِىْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ. وَلَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ. (٧٩ - ٦٩ : ٢٦)

"উহাদের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা কিসের ইবাদত কর? উহারা বলিল, 'আমরা মূর্তির পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সহিত উহাদের পূজায় নিরত থাকিব'। সে বলিল, তোমরা প্রার্থনা করিলে উহারা কি শোনে অথবা উহারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে? উহারা বলিল, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি। সে বলিল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, কিসের পূজা করিতেছ, তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা? উহারা সকলেই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত; যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয় এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর। আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর, তিনি তো পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন। এবং আমাকে লাঞ্ছিত করিও না পুনরুত্থান দিবসে, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি কোন কাজে আসিবে না; সে দিন উপকৃত হইবে কেবল সে, যে আল্লাহ্র নিকট আসিবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ লইয়া" (২৬ ঃ ৬৯-৭৯)।

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَّتَخْلُقُوْنَ اِفْكًا اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَهٗ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. (١٧ - ١٦ : ٢٩)

"স্মরণ কর ইবরাহীমের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাহাকে ভয় কর; তোমাদের জন্য ইহাই শ্রেয় যদি তোমরা জানিতে! তোমারা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্তিপূজা করিতেছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করিতেছ। তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের পূজা কর তাহারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নহে। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহ্র নিকট এবং তাঁহারই ইবাদত কর ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁহারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে" (২৯ ঃ ১৬-১৭)।

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْٓا اِنَّا مُهْلِكُوْٓا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ. قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. (٣٢ - ٣١ : ٢٩)

"যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহীমের নিকট আসিল, তাহারা বলিয়াছিল, আমরা এই জনপদবাসীদিগকে ধ্বংস করিব, ইহার অধিবাসীরা তো জালিম। ইবরাহীম বলিল, এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে। উহারা বলিল, সেথায় কাহারা আছে তাহা আমরা ভাল জানি, আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (২৯ ঃ ৩১-৩২)।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا. (٣٣ : ٧)

"স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম-তনয় ঈসার নিকট হইতেও। তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অংগীকার" (৩৩ ঃ ৭)।

وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ. اِذْ جَاءَ رَبَّهٗ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ. اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ. فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ. فَرَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ. مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ. فَاَقْبَلُوْا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ. قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ. قَالُوا ابْنُوْا لَهٗ بُنْيَانًا فَاَلْقُوْهُ فِى الْجَحِيْمِ. فَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَسْفَلِيْنَ. وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ. رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ. فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ. فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ. وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرَاهِيْمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ. وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ. سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ. كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ. وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ. وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰٓى اِسْحٰقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ. (٣٧ : ٨٣ - ١١٣)

"আর ইবরাহীম তো তাহার (নূহের) অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ কর, সে তাহার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল বিশুদ্ধ চিত্তে। যখন সে তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তোমরা কিসের পূজা করিতেছ; তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অলীক ইলাহগুলিকে চাও? জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি? অতঃপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাইল এবং বলিল, আমি অসুস্থ। অতঃপর উহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল; পরে সে সন্তর্পণে উহাদের দেবতাগুলির নিকট গেল এবং বলিল, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না কেন? তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা কথা বল না? অতঃপর সে উহাদের উপর সবলে আঘাত

হানিল। তখন ঐ লোকগুলি তাহার দিকে ছুটিয়া আসিল। সে বলিল, তোমরা নিজেরা যাহাদিগকে খোদাই করিয়া নির্মাণ কর তোমরা কি তাহাদেরই পূজা কর? প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদিগকে এবং তোমরা যাহা তৈরী কর তাহাও। উহারা বলিল, ইহার জন্য এক ইমারত নির্মাণ কর, অতঃপর ইহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। উহারা তাহার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করিয়াছিল; কিন্তু আমি উহাদিগকে অতিশয় হেয় করিয়া দিলাম। সে বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম। তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করিবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর। অতঃপর আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইবরাহীম বলিল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলিল, হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন, তাহাই করুন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন। যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইবরাহীম তাহার পুত্রকে কাত করিয়া শায়িত করিল, তখন আমি তাহাকে আহবান করিয়া বলিলাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে! এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম। আমি তাহাকে সুসংবাদ দিয়াছিলাম ইসহাকের। সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। আমি তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইসহাককেও; তাহাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী" (৩৭ ঃ ৮৩-১১৩)।

وَاذْكُرْ عِبْدَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ أُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ . اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ .
وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ . (٤٧ - ٤٥ : ٣٨)

"স্মরণ কর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা। উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাহাদিগকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, উহা ছিল পরলোকের স্মরণ। অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৮ ঃ ৪৫-৪৭)।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ
اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (١٣ : ٤٢)

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে আর যাহার আমি ওহী করিয়াছি তোমাদের এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না" (৪২ ঃ ১৩)।

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ اِنَّنِىْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ. اِلَّا الَّذِىْ فَطَرَنِىْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. (٢٨ - ٢٦ : ٤٣)

"স্মরণ কর, ইবরাহীম তাহার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, 'তোমরা যাহাদের পূজা কর তাহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই; সম্পর্ক আছে শুধু তাঁহারই সহিত, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণীরূপে রাখিয়া গিয়াছে তাহার পরবর্তীদের জন্য, যাহাতে উহারা প্রত্যাবর্তন করে" (৪৩ ঃ ২৬-২৮)।

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ. فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ. فَقَرَّبَهٗ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ. فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ. فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ. قَالُوْا كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ. قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ. (٣٤ - ٢٤ : ٥١)

"তোমার নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি? যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলিল, 'সালাম'। ইহারা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর ইবরাহীম তাহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিল ও তাহাদের সামনে রাখিল এবং বলিল, তোমরা খাইতেছ না কেন? ইহাতে উহাদের সম্পর্কে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, ভীত হইও না। অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। তখন তাহার স্ত্রী চিৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, এই বৃদ্ধা-বন্ধ্যার সন্তান হইবে। তাহারা বলিল, তোমার প্রতিপালক এইরূপ বলিয়াছেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ইবরাহীম বলিল, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কি? উহারা বলিল, আমাদিগকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে, উহাদের উপর নিক্ষেপ করিবার জন্য মাটির শক্ত ঢেলা, যাহা সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে" (৫১ ঃ ২৪-৩৪)।

وَاِبْرَاهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى. اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى. (٣٨ - ٣٧ : ٥٣)

"এবং (তাহাকে কি অবগত করানো হয় নাই যাহা আছে) ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব? উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না" (৫৩ ঃ ৩৭-৩৮)।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرَاهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ.

(٢٦ : ٥٧)

"আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহার বংশধরগণের জন্য স্থির করিয়াছিলাম নবুওয়াত ও কিতাব, কিন্তু উহাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী" (৫৭ ঃ ২৬)।

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاۤؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (٦٠:٤-٥)

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ, যখন তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাহার ইবাদত কর তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা তোমাদিগকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হইল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আন। তবে ব্যতিক্রম তাহার পিতার প্রতি ইবরাহীমের উক্তি, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট আমি কোন অধিকার রাখি না।' ইবরাহীম ও তাহার অনুসারিগণ বলিয়াছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে কাফিরদের পীড়নের পাত্র করিও না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে ক্ষমা কর; তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৬০ ঃ ৪-৫)।

اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى. صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى. (٨٧:٧-١٩)

"ইহা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে- ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে" (৮৭ঃ ১৮-১৯)।

হাদীছে হযরত ইবরাহীম (আ)

হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে কতিপয় হাদীছ উল্লেখ করা হইল।

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم اباه ازر يوم القيامة وعلى وجه ازر قترة وغبرة فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصنى فيقول ابوه فاليوم لا أعصى لك فيقول ابراهيم يارب انك وعدتنى ان لا تخزينى يوم يبعثون فاى خزى اخزى من أبى الأبعد فيقول الله تعالى انى حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا ابراهيم ما تحت رجليك فنظر فاذا هو بذ بح ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار (بخارى ٢٧٨-٢٧٧:٤)

"আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতা আযরের সাক্ষাত পাইবেন। আযরের চেহারা থাকিবে কালিমালিপ্ত ও ধূলিমলিন।

ইবরাহীম তাহাকে বলিবেন, আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম না যে, আমার অবাধ্য হইও না? তখন তাহার পিতা বলিবে, আজ আর তোমার অবাধ্য হইব না। তখন ইবরাহীম বলিবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আমাকে অপদস্থ করিবেন না। আল্লাহ্র রহমত হইতে আমার পিতা দূরীভূত, ইহা হইতে বড় অপমান আমার জন্য আর কি হইতে পারে! তখন আল্লাহ তা'আলা বলিবেন, আমি কাফিরদের উপর জান্নাত হারাম করিয়া দিয়াছি। অতঃপর তাহাকে বলা হইবে, হে ইবরাহীম! তোমার পায়ের নীচে কি? তিনি সেই দিকে তাকাইবেন। তাকাইয়া দেখিবেন নোংরা এক পুরুষ হায়েনা। অতঃপর উহার চার পা ধরিয়া উহাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ৪ খ., ১৭৭-২৭৮, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল-আম্বিয়া)।

عن ابن عباس قال خطب النبى صلى الله عليه وسلم فقال انكم محشورون الى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فعلين. ثم ان اول من يكسى يوم القيامة ابراهيم (بخارى شرح كرما نى ١٧/٢١٣).

"ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) খুতবা দিতে গিয়া বলিলেন, তোমরা হাশরের ময়দানে উত্থিত হইবে নগ্নপদে, নগ্ন মস্তকে ও নগ্ন শরীরে। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করিব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি ইহা পালন করিবই। অতঃপর কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম যাহাকে কাপড় পরানো হইবে তিনি ইবরাহীম (আ) (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিরমানীর ভাষ্যযুক্ত, ১৭খ., ২১৩; কিতাবুত তাফসীর, সূরাতুল-আম্বিয়া)।

عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانى الليلة اتيان فاتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه ابراهيم عليه الصلوة والسلام.

"সামুরা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, গত রাত্রে (মিরাজের রাত্রে) আমার নিকট দুইজন আগন্তুক আসিল। অতঃপর আমরা লম্বা এক ব্যক্তির নিকট আসিলাম। সোজাসুজিভাবে আমি তাহার মস্তক দেখিতে পাইতেছিলাম না। তিনি ইবরাহীম আলায়হিস সালাম" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ৪ খ., ২৭৯, হাদীছ নং ৩১৩৮)।

عن مجاهد انه سمع ابن عباس وذكروا له الدجال بين عينيه مكتوب كافر او ك-ف-ر قال لم اسمعه ولكنه قال اما ابراهيم فانظروا الى صاحبكم.

"মুজাহিদর হইতে বর্ণিত। তিনি এক মজলিসে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট হইতে শুনিলেন যে, লোকজন তাহার নিকট দাজ্জালের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিল যে, তাহার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যখানে লিখিত থকিবে كافر (কাফির) অথবা ك-ف-ر (কাফ, ফা, রা)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, আমি ইহা শুনি নাই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, আর ইবরাহীম (-এর আকৃতি জানিতে চাহ?) তবে

তোমাদের সঙ্গীর (রাসূলুল্লাহ্‌র) প্রতি তাকাও" (বুখারী, আস-সাহীহ, ৪ খ, ২৭৯, হাদীছ নং ৩১৩৯; মুসলিম, আস-সাহীহ, ৭ খ., ৯৭)।

عن ابى هريرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم عليه الصلوة والسلام الا ثلث كذبات ثنتين منهن فى ذات الله عز وجل قوله انى سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بينا هو ذات يوم وسارة اذ اتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن ههنا رجلا معه امرأة من احسن الناس فارسل اليه فسأله عنها فقال من هذه قال اختى فاتى سارة قال ياسارة ليس على وجه الارض مؤمن غيرى وغيرك وان هذا سألنى فاخبرته أنك اختى فلا تكذبينى فارسل اليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ فقال ادعى الله لى ولا أضرك فدعت الله فاطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثله اوأشد فقال ادعى الله لى ولا أضرك فدعت فاطلق فدعا بعض حجبته فقال انكم لم تأتونى بأنسان إنما أتيتمونى بشيطان فاخدمها هاجر فاتته وهو قائم يصلى فاومأ بيده مهيا قالت راد الله كيد الكافر او الفاجر فى نحره واخدم هاجر قال ابوهريرة تلك أمكم يابنى ماء السماء.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে। বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ) তিনটি ছাড়া কখনও (আপাত দৃষ্টিতে) মিথ্যা বলেন নাই। উহার দুইটি আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি অসুস্থ; আর বলিয়াছিলেন, বরং উহাদের এই বড়টি উহা করিয়াছে। আর একটি হইল, একদিন তিনি ও সারা এক স্বৈরাচারী জালিম বাদশাহ্‌র রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর বাদশাহকে বলা হইল, অমুক স্থানে এক ব্যক্তি আসিয়াছে, তাহার সহিত এক মহিলা আছে যে পরমা সুন্দরী। অতঃপর বাদশাহ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট লোক পাঠাইল। (তিনি আসার পর) বাদশাহ তাহাকে সারা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল যে, এই মহিলা কে? ইবরাহীম (আ) বলিলেন, সে আমার ভগ্নী। অতঃপর তিনি সারার নিকট আসিয়া বলিলেন, সারা! এই ভূখণ্ডে আমি আর তুমি ছাড়া কোন মুমিন নাই। আর এই বাদশাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহাকে জানাইয়াছি যে, তুমি আমার ভগ্নী। তাই আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিও না। অতঃপর বাদশাহ সারার নিকট লোক পাঠাইল। সারা যখন তাহার নিকট প্রবেশ করিলেন তখন সে হাত দিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে তাহার হাত অবশ হইয়া গেল। অতঃপর সে বলিল, আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য দু'আ কর, আমি আর তোমার ক্ষতি করিব না। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিলেন। তাহার হাত ঠিক হইয়া গেল। সে দ্বিতীয়বার পুনরায় তাঁহাকে ধরিতে গেল, তখন অনুরূপভাবে অথবা তাহার চেয়ে আরো শক্তভাবে তাহার হাত অবশ হইয়া গেল। সে বলিল, আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্য দু'আ কর। আমি আর তোমার ক্ষতি করিব না। তিনি দু'আ করিলেন। তাহার হাত ঠিক হইয়া গেল। তখন সে তাহার এক প্রহরীকে ডাকিয়া বলিল, তোমরা আমার নিকট কোন মানুষ আননি, আনিয়াছ এক শয়তান। অতঃপর হাজারকে তাহার খিদমত করিতে দিল। অতঃপর সারা ইবরাহীমের নিকট আসিলেন। তিনি তখন সালাতে দণ্ডায়মান ছিলেন। তাই হাত দিয়া ইশারায় তাহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। সারা বলিলেন, আল্লাহ কাফিরের অথবা বলিয়াছিলেন, পাপিষ্ঠের চক্রান্ত নস্যাত করিয়া দিয়াছেন এবং হাজারকে খিদমত করিতে দিয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হে আরববাসী! তিনি

হইলেন তোমাদের মাতা" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ৪খ., ২৮০, হাদীছ নং ৩১৪৩; মুসলিম, আস-সাহীহ, ৭খ., ৯৮-৯৯)।

عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ علي ابراهيم عليه السلام.

"উম্মু শুরায়ক (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) গিরগিটি হত্যা করার নির্দেশ দিয়াছেন। উহা ইবরাহীম (আ)-এর অগ্নিতে ফুৎকার দিয়াছিল" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ৪খ., ৫৯৮, কিতাবুখ আম্বিয়া)।

عن ابن عباس قال دخل النبى صلى الله عليه وسلم البيت ووجد فيه صورة ابراهيم وصورة مريم فقال اما هم فقد سمعوا ان الملئكة لا تدخل بيتا فيه صورة هذا ابراهيم مصور فماله يستقسم.

"ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে ইবরাহীম (আ) ও মারয়াম (আ)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, তাহাদের কি অবস্থা! তাহারা তো শুনিয়াছে যে, যে গৃহে প্রতিকৃতি থাকে ফেরেশতাগণ সেখানে প্রবেশ করেন না। এই যে ইবরাহীমের প্রতিকৃতি, তিনি কখনও তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করেন নাই" (বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল আম্বিয়া, ৪খ. ৫৯৭)।

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور فى البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت ورأى ابراهيم واسماعيل بايدي هما الازلام فقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط.

"ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) যখন বায়তুল্লাহ্-য় মূর্তি দেখিলেন তখন সেখানে প্রবেশ করিলেন না। তিনি সেইগুলি সরাইয়া ফেলিবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উহা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া হইল। তিনি ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আ)কে দেখিলেন যে, তাহাদের হাতে তীর। তিনি বলিলেন, আল্লাহ উহাদের (মুশরিকদের) ধ্বংস করুন। আল্লাহ্র কসম! এই দুইজন কখনো তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করেন নাই" (বুখারী, প্রাগুক্ত)

عن ابى هريرة قال اتى النبى صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فقال ان الله يجمع يوم القيامة الاولين والاخرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم فذكر حديث الشفاعة فيأتون ابراهيم فيقولون انت نبى الله وخليله فى الارض اشفع لنا الى ربك فيقول فذكر كذباته نفسى نفسى اذهبوا الى موسى.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গোশ্ত আনা হইল। তিনি বলিলেন, আল্লাহ কিয়ামতের দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে এক ময়দানে একত্র করিবেন। অতঃপর ঘোষণাকারী তাহাদিগকে ঘোষণা শুনাইবে এবং সমস্ত ময়দান সমতল হওয়ার কারণে সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে এবং সূর্য নিকটবর্তী হইবে। অতঃপর তাহারা ইবরাহীম (আ) -এর নিকট গিয়া বলিবে, আপনি দুনিয়াতে আল্লাহ্র নবী ও বন্ধু ছিলেন। আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের

নিকট সুপারিশ করুন। অতঃপর তিনি তাঁহার আপাত মিথ্যাগুলির কথা উল্লেখ করিয়া বলিবেন, ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! তোমরা মূসার নিকট যাও" (বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল আম্বিয়া, ৪খ., ৫৯৯, হাদীছ নং-৩১৪৬)।

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم.

"ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ইবরাহীম (আ) আশি বৎসর বয়সে বাইস (কাদূম) দ্বারা খাতনা করেন অথবা কাদূম নামক স্থানে খতনা করেন" (বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল আম্বিয়া, ৪খ., ২৭৯, হাদীছ নং ৩১৪০; মুসলিম আস-সাহীহ, ৭খ, ৯৭)।

عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن اباكما كان يعوذ بها اسماعيل واسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

"ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) হাসান ও হুসায়নকে ঝাড়ফুঁক করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের (আদি) পিতা ইসমাঈল ও ইসহাককে এই বলিয়া ঝাড়ফুক করিতেন ঃ

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.

"আমি আল্লাহ্র পূর্ণ শব্দাবলী দ্বারা শরণ লইতেছি সকল শয়তান হইতে এবং সকল ভীতিপ্রদ বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ হইতে এবং সকল ক্ষতিকর কুদৃষ্টি হইতে"।

عن ابى ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مررت بابراهيم فقال مرحبا بالنبى الصالح ولابن الصالح قلت من هذا قال هذا ابراهيم.

"আবূ যার (রা) মি'রাজের হাদীছ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন.... অতঃপর আমি ইবরাহীম (আ)-এর নিকট দিয়া গেলাম। তিনি বলিলেন, মারহাবা! পুণ্যবান নবী এবং পুণ্যবান বৎস! আমি বলিলাম, ইনি কে? জিবরীল বলিলেন, ইনি ইবরাহীম" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, বাদউল খালক, হাদীছ নং ৪১২৭)।

عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكة وانى أحرم مابين لا بتيها.

"আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য উহুদ পর্বত উদ্ভাসিত হইল। অতঃপর তিনি বলিলেন, এই পর্বত আমাদিগকে ভালবাসে, আমরাও উহাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম মক্কা হারাম করিয়াছেন আর আমি উহার দুই কঙ্করময় মরুভূমির মধ্যখানে যাহা আছে তাহা হারাম করিতেছি" (আল-বুখারী, বাদউল-খালক, হাদীছ নং ৩১৫১)।

عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم ترى ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم فقلت يارسول الله الا تردها على قواعد ابراهيم فقال لولا حدثان قومك بالكفر.

"উম্মুল মুমিনীন আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি কি দেখ নাই যে. তোমার সম্প্রদায় যখন কা'বা নির্মাণ করে তখন তাহা ইবরাহীম-এর ভিত হইতে কমাইয়া দেয়? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি উহাকে ইবরাহীমের ভিত-এর উপর ফিরাইয়া দেন না কেন? তিনি বলিলেন, তোমার সম্প্রদায় যদি সদ্য কুফরী হইতে (ইসলামে) না আসিত (তবে আমি উহা করিতাম)" (আন-নাসাঈ, আস-সুনানুল-কুবরা, কিতাবুত-তাফসীর, ৬খ, ২৯০; আল-বুখারী, বাদউল-খালক, হাদীছ নং ৩১৫২)।

عن كَعب بن عجرة قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الصلوة عليكم اهل البيت فان الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد .

"কা'ব ইবন উজরা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাদের আহলে বায়ত-এর উপর কিভাবে সালাম পেশ করিতে হইবে? কারণ সালাম কিভাবে পেশ করিব তাহা তো আল্লাহ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তোমরা বলিও ঃ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلي ال ابراهيم انك حميد مجيد .

(বুখারী, বাদউল খালক, হাদীছ নং ৩১৫৩)।

عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى من ولد اسماعيل بنى كنانة واصطفى من بنى كنانة قريشا واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم .

"ওয়াছিলা ইবনুল আসকা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ ইবরাহীমের বংশধরদের মধ্যে ইসমাঈলকে মনোনীত করেন, ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্য হইতে বানূ কিনানাকে, বানূ কিনানার বংশধরদের মধ্য হইতে কুরায়শকে এবং কুরায়শদের মধ্য হইতে বানূ হাশিমকে এবং বানূ হাশিমের মধ্য হইতে আমাকে মনোনীত করেন" (তিরমিযী, আল-জামি আস-সাহীহ, ৫খ., ৫৮৩, কিতাবুল মানাকিব, হাদীছ নং ৩৬০৫)।

عن زيدبن ارقم قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله ما هذه الاضاحى قال سنة ابيكم ابراهيم .

"যায়দ ইবন আরকাম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যবাহগুলি কিজন্য? তিনি বলিলেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত" (ইব্ন মাজা, ২খ, ২০৪, আবওয়াবুল-আদাহী)।

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ذرارى المؤمنين فى الجنة يكفلهم ابراهيم عليه السلام.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুমিনদের শিশুরা জান্নাতবাসী হইবে। ইবরাহীম (আ) হইবেন তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক" (আল-হাকেম আন-নায়সাবূরী, আল-মুসতাদরাক, ২খ, ৩৭০, কিতাবুত-তাফসীর)।

عن ابن عباس قال كان اخر كلام ابراهيم حين القى فى النار حسبى الله ونعم الوكيل وقال نبيكم مثلها الذين قال لهم الناس ان الناس قدجمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

"ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবরাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয় তখন তাঁহার শেষ বাক্য ছিল حسبى الله ونعم الوكيل "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক"। আর তোমাদের নবী অনুরূপ বলিয়াছেন, "যাহাদিগকে লোকে বলিয়াছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হইয়াছে, সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে ভয় কর। কিন্তু ইহা তাহাদের ঈমানকে দৃঢ়তর করিয়াছিল এবং তাহারা বলিয়াছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক" (আল-হাকেম, আল-মুসতাদরাক, ২খ, ২৯৮, কিতাবুত-তাফসীর)।

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم ابراهيم الخليل عليه السلام هذا اللسان العربى.

জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "ইবরাহীম খলীল (আ)-কে এই আরবী ভাষা ইলহাম করা হইয়াছিল" (প্রাগুক্ত, ২খ, ৩৪৪)।

عن ابن عباس قال سهام الاسلام ثلثون سهما لم سهما احد قبل ابراهيم عليه السلام قال الله عز وجل وابراهيم الذى وفى.

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "ইসলামের ত্রিশটি অংশ। ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে আর কেহ উহা পূর্ণ করেন নাই। আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, وابراهيم الذى وفى. " (৫৩: ৩৭)।

"এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছিল তাহার দায়িত্ব" (প্রাগুক্ত, ২খ, ৪৭০)।

عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياخير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ابراهيم عليه السلام.

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত। এক লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া খায়রা'ল-বারিয়্যা ঃ (হে সৃষ্টির সর্বোত্তম ব্যক্তি)! রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, "তাহা তো ইবরাহীম (আ)" (মুসলিম, আস-সাহীহ, ৭খ, ৯৭, কিতাবুল-ফাদাইল)।

বাইবেলে হযরত ইবরাহীম (আ)

বাইবেলের আদিপুস্তকে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় উহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, সদাপ্রভু হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নিজ আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া কানআনে হিজরত করিতে বলেন এবং তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি তাঁহার মাধ্যমে এক মহাজাতি উদগত করিবেন। যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিবে তাহারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হইবে এবং যাহারা তাঁহার অবাধ্যাচরণ হইবে তাহারা অভিশপ্ত হইবে। তদনুসারে তিনি পঁচাত্তর বৎসর বয়সে নিজ স্ত্রী সারা ও ভ্রাতষ্পুত্র লূত (আ)-কে সঙ্গে লইয়া নিজের পশপাল ও সম্পদরাজিসহ কানআনে হিজরত করেন। এখানে পৌঁছিবার পর সদাপ্রভু তাঁহাকে এই এলাকা দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে এই এলাকায় দুর্ভিক্ষ শুরু হইলে তিনি সস্ত্রীক মিসরে রওয়ানা হইলেন। সেখানে পৌঁছিবার পর সমসাময়িক মিসর-রাজ অসদুদ্দেশ্যে সারাকে অপহরণ করে। তাঁহার সহিত অসৎ আচরণ করিতে উদ্যত হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহার হস্তদ্বয় অবশ করিয়া দেন এবং সারা (রা) সসম্মানে ফিরিয়া আসেন। মিসর-রাজ ইবরাহীম (আ)-কে উপঢৌকনস্বরূপ অনেক ধন-সম্পদ দান করে এবং সারার সেবিকা হিসাবে হাজার (রা)-কে দান করে (দ্র. বাইবেলের আদিপুস্তক, ১২ঃ১-২০)। অনুরূপ আরও একটি ঘটনা বাইবেলে উক্ত হইয়াছে (দ্র. আদিপুস্তক, ২০ ঃ ১-১৮)।

অতঃপর ইবরাহীম (আ) সারা ও লূত (আ)-কে রইয়া তথা হইতে পুনরায় কানআনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। লূত (আ)-এরও পর্যাপ্ত গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদ ছিল। তাঁহাদের দুইজনের পশুসম্পদের প্রাচুর্যের কারণে একত্রে বসবাস অসম্ভব হইয়া পড়িলে ইবরাহীম (আ) ভ্রাতুষ্পুত্রকে জর্দানে স্থানান্তরের পরামর্শ দিলে তিনি তথায় স্থানান্তরিত হইলেন এবং ইবরাহীম (আ) কানআনে থাকিয়া গেলেন (দ্র, আদিপুস্তক, ১৩ ঃ ১৮; আরও দ্র,লূত নিবন্ধ)।

ইবরাহীম (আ) তাঁহার নিঃসন্তান অবস্থার কথা উল্লেখ করিলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সন্তানদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং আরও বলিলেন যে, তাঁহার অধস্তন বংশধর প্রায় চারি শত বৎসর বিদেশীদের অধীনস্ত থাকিবে। অবশেষে তাহারা প্রচুর সহায়-সম্পদসহ এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবে। সদাপ্রভু তাঁহার বংশধরকে মিসর হইতে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিশাল ভূভাগ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন (আদিপুস্তক, ১৬ ঃ ১-২১)। এখানে তাঁহাকে যেই সন্তান দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল তিনি হইলেন হযরত ইসমাঈল (আ)। কারণ আদিপুস্তকে পরবর্তী অধ্যায়ে ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম ও তাঁহার বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে।

ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম ঃ সারা (রা) নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁহার সেবিকা হাজার (রা)-কে স্বউদ্যোগে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত বিবাহ দিলেন এবং তাঁহার গর্ভে হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। সতীনের সহিত মনোমালিন্যের কারণে একদা হাজার (রা) গৃহ হইতে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে সদাপ্রভুর দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে ও সারার অনুগত হইয়া থাকিতে বলেন। তিনি তাহাকে আরও সুসংবাদ দিলেন যে, তাঁহার গর্ভ

হইতে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে এবং তাহার পর্যাপ্ত বংশবৃদ্ধি ঘটিবে। ইবরাহীম (আ)-এর ছিয়াশি বৎসর বয়সে ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন (আদিপুস্তক, ১৬ ঃ ১-১৬)।

ত্বকচ্ছেদের নিয়ম স্থাপন ঃ সদাপ্রভু ইবরাহীম (আ)-কে দর্শন দিয়া তাঁহার আব্রাম (মহাপিতা) নাম পরিবর্তন করিয়া আব্রাহাম (বহু লোকের পিতা) রাখিলেন এবং ইহার কারণ স্বরূপ বলিলেন যে, তিনি বহু জাতির পিতা হইবেন। সদাপ্রভু এই পর্যায়ে তাঁহাকে লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদের স্থায়ী নির্দেশ দান করেন। তখন তাঁহার বয়স নিরানব্বই বৎসর এবং ইসমাঈল (আ)-এর বয়স তের বৎসর। নির্দেশ অনুসারে তিনি তাঁহার ও তাঁহার পোষ্যবর্গের লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদ করেন। এই পর্যায়ে সদাপ্রভু তাঁহাকে সারার গর্ভে আরও একজন পুত্রসন্তান লাভের সুসংবাদ দান করেন, অপরদিকে ইসমাঈল (আ)-এর বংশে প্রতাপশালী বারোজন শাসকের আবির্ভাব হইবারও সুসংবাদ দিলেন (দ্র. আদিপুস্তক, ১৭ ঃ ১-২৭)।

লূত (আ)-এর কওমের জন্য ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা ঃ মম্রির এলোন বনের নিকটে অপরিচিত মানববেশে তিনজন ফেরেশতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন। তিনি তাহাদের জন্য যথাসাধ্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করিলেন। আহার শেষে তাহারা তাঁহাকে ইসহাক (আ)-এর জন্মলাভের এবং তাঁহার হইতে এক মহাজাতির আবির্ভাবের সুসংবাদ দিলেন, অতঃপর লূত (আ)-এর কওমের ধ্বংসের দুঃসংবাদ জানাইলেন (আদিপুস্তক, ১৮ ঃ ১-২২)। বাইবেলে এই ঘটনার বর্ণনা কুরআন মজীদের বর্ণনার প্রায় অনুরূপ (দ্র. ১৫ ঃ ৫১-৫৯; ৫১ ঃ ২৪-৩৩)।

ইসহাক (আ)-এর জন্ম ও ইসমাঈল (আ)-এর নির্বাসন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর একশত বৎসর বয়সে ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি পুত্রের আট দিন বয়সে তাহার লিঙ্গাগ্রের ত্বকেচ্ছেদ করিলেন। দুই স্ত্রীর মধ্যকার মনোমালিন্যের কারণে এবং প্রথমা স্ত্রীর দাবিতে ইবরাহীম (আ) হাজার (রা)-কে শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ)-সহ সংগে কিছু রুটি ও পানি দিয়া বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তিনি শিশুপুত্রসহ বের শেবা প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এদিকে পানীয় ফুরাইয়া গেলে তিনি শিশু পুত্রের জীবন নাশের আশংকা করিলেন এবং তাহাকে এক স্থানে শোয়াইয়া রাখিয়া দূরে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই অসহায় মুহূর্তে আল্লাহ্‌র দূত আগমন করিয়া তাঁহাকে অভয় দিলেন এবং তাঁহার জন্য পানির একটি ঝর্ণা প্রবাহিত করিলেন। বালকটি বড় হইয়া ধনুর্দ্ধর হইল এবং পারণ প্রান্তরে বসতি বসতি স্থাপন করিল (দ্র. আদিপুস্তক, ২১ ঃ ১-২১; বিস্তারিত দ্র. শিরো. ইসমাঈল (আ))।

ইবরাহীম (আ)-এর মহাপরীক্ষা ঃ এই সকল ঘটনার পর সদাপ্রভু ইবরাহীম (আ)-এর পরীক্ষা নিলেন। তিনি তাঁহাকে পুত্র ইসহাক (আ)-কে মোরিয়া দেশে লইয়া গিয়া সেখানে তাহাকে কুরবানী করার নির্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী তিনি দুইজন দাসসহ ইসহাক (আ)-কে লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি কোরবানগাহ নির্মাণ করিয়া পুত্রের হস্ত-পদ বাঁধিয়া খড়গহস্তে তাহাকে কুরবানী করিতে উদ্যত হইলে আকাশ হইতে সদাপ্রভুর দূত তাহাঁকে ডাকিয়া কহিলেন, ইসহাকের প্রতি তোমার হস্ত বিস্তার করিও না। কারণ তুমি সদাপ্রভুকে ভয় কর এবং নিজের

অদ্বিতীয় পুত্রকেও দিতে অসম্মত নাও। ইবরাহীম (আ) পশ্চাৎদিকে তাকাইয়া কোপেরদ্ধ একটি মেষ দেখিতে পাইলেন এবং তিনি উহাকে কুরবানী করিলেন। ইহার পর সদাপ্রভু তাঁহার পর্যাপ্ত বংশবৃদ্ধির এবং তাঁহাদেরকে পৃথিবীতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে ইবরাহীম (আ) সপরিবারে বের-শেবাতে বসতি স্থাপন করেন (দ্র. আদিপুস্তক, ২২ ঃ ১-১৯; ইসমাঈল (আ) শীর্ষক নিবন্ধে বিস্তারিত দ্র.)।

ইবরাহীম (আ)-এর বিবাহ ও মৃত্যু ঃ পরবর্তী পর্যায়ে ইবরাহীম (আ) কটূরা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সিম্রন, যকষন, মদান, মিদিয়ন, যিশবক ও শূহ জন্মগ্রহণ করেন। ইবরাহীম (আ) আপন সর্বস্ব ইসহাক (আ)-কে দান করেন এবং অপরাপর স্ত্রীর সন্তানদিগকে বিভিন্ন দান দিয়া নিজ জীবদ্দশায় পূর্বদেশে প্রেরণ করেন। অতঃপর ইবরাহীম (আ) একশত পঁচাত্তর বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন। পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) তাঁহাকে মম্রির সম্মুখে হেতীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোনের ক্ষেত্রস্থিত মক্‌পলা গুহাতে দাফন করেন। স্ত্রী সারার কবরও এখানেই। ভূমিটির ক্রয় সূত্রে মালিক ছিলেন ইবরাহীম (আ) (দৃ. আদিপুস্তক, ২৫ ঃ ১-১৮)।

দাওয়াত ও তাবলীগ

হযরত ইবরাহীম (আ) কখন নবুওয়াত প্রাপ্ত হন তাহার সঠিক সময় জানা না গেলেও আল-কুরআনুল কারীমের বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বাল্যকাল হইতেই আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সঠিক জ্ঞান ও হিদায়াত দান করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ. (٢١:٥١)

" আমি তো ইহার পূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত" (২১ : ৫১)।

সীরাত ও ইতিহাসবিদগণ কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাল্যকাল হইতেই তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। ইমাম ছা'লাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, গুহার মধ্যে থাকিয়া ইবরাহীম (আ) যখন যুবক হইলেন তখন একদিন তাঁহার মাতাকে বলিলেন, আমার প্রতিপালক কে? মাতা বলিল, আমি। তিনি বলিলেন, আপনার প্রতিপালক কে? মাতা বলিল, তোমার পিতা। তিনি বলিলেন, আমার পিতার প্রতিপালক কে? মাতা বলিল, নমরূদ। তিনি বলিলেন, নমরূদের প্রতিপালক কে? তখন মাতা তাহাকে এক ধমক দিয়া বলিল, চুপ কর। তখন ইবরাহীম (আ) চুপ করিয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহার মাতা স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমাদের নূতন বালক, যে তোমার পুত্র, আমি দেখিতেছি যে, সে জগৎবাসীর দীন পরিবর্তন করিয়া ফেলিতেছে। অতঃপর ইবরাহীম (আ) যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্বামীকে শুনাইল। ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতাকে অনুরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মায়ের অনুরূপ জবাব দিয়াছিলেন। নমরূদের প্রতিপালক কে? এই প্রশ্নের জবাবে পিতা তাহাকে একটি চপেটাঘাত করিয়া বলিল, চুপ কর (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৭৮)।

ইবরাহীম (আ) যুবক অবস্থায় একদিন পিতার সহিত (এক বর্ণনামতে মাতার সহিত) গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে। তিনি চতুষ্পদ জন্তু ও অন্যান্য সৃষ্টি দেখিয়া কৌতুহলবশত সেইগুলি সম্পর্কে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পিতাও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন যে, এইটি উট, এইটি গাভী, ঐটি ঘোড়া, ঐটা বকরী প্রভৃতি। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, নিশ্চয়ই এইগুলির একজন প্রতিপালক আছেন যিনি তাহাদের সৃষ্টিকর্তা। অতঃপর তিনি আসমান-যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিলেন এবং বলিলেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, রিযিক দিয়াছেন, আহার করাইয়াছেন, পান করাইয়াছেন, তিনিই ঠিক আমার প্রতিপালক। তিনি ভিন্ন আমার আর কোন ইলাহ (উপাস্য) নাই (ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৮-৭৯)। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলিলেন। সেখানে তিনি যুহরাঃ (শুক্র) মতান্তরে মুশতারী (বৃহস্পতি) নক্ষত্র দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই আমার রব। কিছুক্ষণ পর তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, যাহা অস্ত যায় আমি তাহা পছন্দ করি না অর্থাৎ যে প্রতিপালক অদৃশ্য হয় তাহাকে আমি পছন্দ করি না। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে তিনি মাসের শেষদিকে বাহির হইয়াছিলেন তাই নক্ষত্রোদয়ের পূর্বে তখন চন্দ্র দেখিতে পান নাই। অতঃপর রজনীর মধ্য অথবা শেষভাগে তিনি সমুজ্জ্বল চন্দ্র উদিত হইতে দেখিলেন এবং বলিলেন, এই আমার প্রতিপালক। উহা যখন অদৃশ্য হইল তখন তিনি বলিলেন, আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করিলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইব। অতঃপর ভোর হইলে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হইতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, ইহা আমার প্রতিপালক, ইহা সর্ববৃহৎ। যখন তাহা অদৃশ্য হইল তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বলিলেন, "আত্মসমর্পণ কর"। তিনি বলিলেন, "জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম" (২ ঃ ১৩১)।

অতঃপর তিনি তাঁহার কওমের নিকট আসিয়া তাহাদিগকে দাওয়াত দিয়া বলিলেন, "হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর তাহার সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি" (৬ ঃ ৭৬-৭৯; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২১)। ইব্ন কাছীর প্রমুখ এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন যে, ইবরাহীম (আ) গুহা হইতে বাহির হইয়াই এই সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। কারণ তখন তিনি ছোট ছিলেন। তাহারা ইহাকে ইসরাঈলী রিওয়াত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৪৩)। তাহাদের মতে ইবরাহীম (আ) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নক্ষত্র, চন্দ্র ও সূর্যকে প্রতিপালক বলিয়াছিলেন এবং তাহা অস্ত যাওয়ার পর ঐ সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কওমের সামনে প্রশ্ন রাখা এবং তাহাদের বিবেক জাগ্রত করা। কাহারও কাহারও মতে সম্প্রদায়ের নিকট এই কথা প্রমাণ করার জন্য যে, যাহা পরিবর্তনশীল তাহা কখনও প্রতিপালক হওয়ার উপযুক্ত নহে। ইহাই অধিকাংশ 'আলিমের মত যে, তিনি কওমকে হুশিয়ার করার জন্য অথবা তাহাদের সহিত বিদ্রূপ করার জন্য এইরূপ বলিয়াছিলেন (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ.,৭৩)। তবে যেহেতু পূর্বেই ইমাম ছা'লাবীর বরাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর গুহার মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ার সময়ের মধ্যে বরকত

দেওয়ার ফলে তিনি দ্রুত বড় হইয়া উঠেন এবং যখন তিনি গুহার বাহিরে আসেন তখন যুবা বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ইমাম তাবারী বর্ণিত প্রথমোক্ত মতটি সঠিক হইতে পারে যে, গুহা হইতে বাহির হইয়া সত্যানুসন্ধানের জন্য তিনি ঐ সকল বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। আর ইহাই আয়াতের (৬ ঃ ৭৬-৭৯) সহজ-সরল ব্যাখ্যা।

ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর মূর্তি বানাইত। অতঃপর উহা সন্তানদিগকে বিক্রয় করিতে দিত। ইবরাহীম (আ) গুহা হইতে বাহিরে আসিবার পর সে তাহাকেও উহা বিক্রয় করিবার জন্য দিল। ইবরাহীম (আ) উহা লইয়া বাজারে গিয়া জোরে জোরে বলিতেন, "কে এমন জিনিস ক্রয় করিবে যাহা তাহার কোন ক্ষতিও করিবে না, উপকারও করিবে না"। তাঁহার ভ্রাতাগণ মূর্তি বিক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিত। কিন্তু তাঁহার মূর্তি সেইভাবেই পড়িয়া থাকিত, কেহই ক্রয় করিত না। অতঃপর তিনি উহা নদীতে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার কওম যে গোমরাহী ও মূর্খতায় ডুবিয়া ছিল তাহার প্রতি বিদ্রূপবশত উহাদের মস্তক পানিতে ডুবাইয়া বলিতেন, 'পানি পান কর'। আস্তে আস্তে তাঁহার মূর্তির প্রতি এই আচরণের কথা এবং তাহাদের সহিত এই বিদ্রূপের কথা ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ.,৭৩; তাবারী, তারীখ, ১খ., ১২০)।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) বিভিন্ন পন্থায় তাঁহার সত্যের প্রতি আহবান করার কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। পিতাকে তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে বুঝাইলেন যে, তাঁহার নিকট সত্যের জ্ঞান আসিয়াছে যাহা দ্বারা তিনি জানিতে পরিয়াছেন যে, এই সকল মূর্তির পূজা করা শয়তানের ইবাদত, যাহার ফলে আল্লাহ্র শাস্তি অবধারিত। কিন্তু পিতা উহা কবূল করিল না, বরং উল্টা তাঁহার প্রাণনাশের হুমিক দিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ) তাহার সহিত অত্যন্ত নম্র ও মার্জিত আচরণ করেন, তাহার কল্যাণ কামনা করেন এবং আল্লাহ্র নিকট তাহার জন্য মাগফিরাত চাওয়ার অঙ্গীকার করেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا . اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا . يٰاَبَتِ اِنِّيْ قَدْ جَاءَنِيْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا . يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ
الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا . يٰاَبَتِ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ
وَلِيًّا . قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يٰاِبْرَاهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا . قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُ
لَكَ رَبِّيْ اِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيًّا . وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْ رَبِّيْ عَسٰى اَنْ لَّا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّيْ
شَقِيًّا (١٩:٤١-٤٧)

"স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। যখন সে তাহার পিতাকে বলিল, হে আমার পিতা! তুমি তাহার ইবাদত কর কেন যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজেই আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকট তো আসিয়াছে জ্ঞান যাহা তোমার নিকট আসে নাই; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাইব। হে আমার পিতা!

শয়তানের ইবাদত করিও না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি তো আশঙ্কা করি যে, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করিবে, তখন তুমি হইয়া পড়িবে শয়তানের বন্ধু। পিতা বলিল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হইতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করিবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হইতে দূর হইয়া যাও। ইবরাহীম বলিল, তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব, নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের হইতে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাহাদের ইবাদত কর তাহাদের হইতে পৃথক হইতেছি। আমি আমার প্রতিপালককে আহবান করি; আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহবান করিয়া ব্যর্থকাম হইব না" (১৯ ঃ ৪১-৪৮)।

কওমকে দাওয়াত

তিনি তাঁহার সম্প্রদায়কে ও পিতাকে বুঝাইলেন যে, মূর্তি কখনো উপাস্য ও প্রতিপালক হইতে পারে না, বরং প্রতিপালক তো তিনি যিনি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা। কুরআন শরীফে এই ব্যাপারে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ اِبْرَاهِيْمَ. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ. قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ. اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ. قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ. قَالَ اَفَرَاَيْتُمْ مَاكُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ. اَنْتُمْ وَاٰبَاءُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيْ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ. وَالَّذِيْ هُوَ يُطْعِمُنِيْ وَيَسْقِيْنِ. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ وَالَّذِيْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ. وَالَّذِيْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِيْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ. (٢٦:٦٩-٨٢)

"তাহাদের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে যখন তাহার পিতা ও তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল তোমরা কিসের ইবাদত কর? তাহারা বলিল, আমরা মূর্তির পূজা করি এবং আমরা নিষ্ঠার সহিত উহাদের পূজায় নিরত থাকিব। সে বলিল, তোমরা প্রার্থনা করিলে ইহারা কি শোনে? অথবা উহারা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করিতে পারে? তাহারা বলিল, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদিগকে এইরূপই করিতে দেখিয়াছি। সে বলিল, তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ কিসের পূজা করিতেছ, তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা? উহারা সকলেই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত; যিনি আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয় এবং রোগাক্রান্ত হইলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাইবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করিবেন। এবং আশা করি তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া দিবেন" (২৬ ঃ ৬৯-৮২)।

সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, প্রতি বৎসর তাহাদের একটি ঈদ হইত। তাহারা সকলেই সেখানে সমবেত হইত। সেই ঈদ হইতে যখন তাহারা প্রত্যাবর্তন করিত তখন মূর্তিগৃহে প্রবেশ করিয়া

উহাকে সিজদা করিত। ইহার পর বাড়ি ফিরিত (ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮০)। ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর তাহাকে বলিল, হে ইবরাহীম! আমাদের একটি ঈদ আছে। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাইতে তবে আমাদের দীন অবশ্যই তোমার ভাল লাগিত। অতঃপর ঈদের দিন তাহারা ঈদে গমন করিল। ইবরাহীম (আ) তাহাদের সহিত বাহির হইলেন। কিছু দূর গিয়া তাঁহার মনে কিছু একটা উদয় হইল। তিনি বলিলেন, আমি অসুস্থ। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহাদের দেবতাদিগকে অপদস্থ করত উহাদের অক্ষমতা ও অসারতা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করিতে এবং আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। আল্লাহ্‌র সত্য দীনকে সহায়তা কল্পেই তিনি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। কুরআন শরীফে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ. فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ. (٣٧ : ٨٨-٩٠)

"অতঃপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাইল এবং বলিল, আমি অসুস্থ। অতঃপর উহারা তাহাকে পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল" (৩৭ ঃ ৮৮-৯০)।

অতঃপর তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ. (٢١ : ٥٧)

"শপথ আল্লাহ্‌র, তোমরা চলিয়া গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করিব" (২১ ঃ ৫৭)।

তাহাদের মধ্যে দুর্বল এক ব্যক্তি পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল, সে ইহা শুনিয়া ফেলিল। মুজাহিদ ও কাতাদার বর্ণনামতে, ইবরাহীম (আ) ইহা আস্তে আস্তে বলা সত্ত্বেও সে উহা শুনিয়া ফেলে এবং প্রচার করিয়া দেয়। অতঃপর ইবরাহীম (আ) দ্রুতপদে ও সন্তর্পণে তাহাদের দেবতা গৃহে আসিলেন। তিনি বিরাট এক মন্দিরে আসিলেন। মন্দিরের দরজায় বিরাটকায় একটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। উহার পার্শ্বে ছিল আরো ছোট একটি, তাহার পার্শ্বে আরো ছোট একটি। এমনিভাবে প্রত্যেকটির পার্শ্বে ছিল তাহার চাইতে ছোট একটি মূর্তি। তাহার সম্প্রদায় বিভিন্ন রকমের খাবার তৈরি করিয়া তাহাদের দেবতাদের সম্মুখে ভোজ হিসাবে রাখিয়া দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করিব এবং ততক্ষণে আমাদের দেবতাগণ আমাদের খাবারে আশির্বাদ দিয়া দিবে তখন আমরা উহা খাইব। ইবরাহীম (আ) মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যখন উহাদিগকে এবং উহাদের সম্মুখে রাখা খাবার দেখিলেন তখন বলিলেন, "তোমরা খাদ্য গ্রহণ করিতেছ না কেন" (৩৭ ঃ ৯১)? উহারা যখন ইবরাহীম (আ)-এর কথার কোন উত্তর দিল না তখন তিনি ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের কী হইয়াছে যে, তোমরা কথা বল না"? অতপর তিনি উহাদের উপর সজোরে আঘাত হানিলেন" (৩৭ ঃ ৯২-৯৩)। তিনি একখানি লোহার কুঠার লইয়া প্রতিটি মূর্তিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। প্রধান মূর্তিটি ছাড়া আর একটিও অবশিষ্ট রহিল না। তখন কুঠারখানি উহার ঘাড়ে ঝুলাইয়া রাখিলেন যাহাতে তাহার সম্প্রদায় উহাকে দোষারোপ করে। ইহার পর তিনি বাহির হইয়া আসিলেন। ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে কুরআন কারীমে ঃ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ۰ (۲۱:۵۸)

"অতপর সে চূর্ণ -বিচূর্ণ করিয়া দিল মূর্তিগুলিকে উহাদের প্রধানটি ব্যতীত; যাহাতে উহারা তাহার দিকে ফিরিয়া আসে" (২১ ঃ ৫৮)।

প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, তাহারা যদি কোন কিছু বুঝিতে পারিত তবে অবশ্যই যে তাহাদের প্রতি এইরূপ খারাপ আচরণ করিতে ইচ্ছা করে তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের মূর্খতা, বুদ্ধির স্বল্পতা ও গোমরাহীর প্রচণ্ডতায় কোন শিক্ষাই গ্রহণ করিল না বরং ঈদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেবতা গৃহে প্রবেশ করিল এবং উহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া বলিল ঃ

مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۰ قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ (۶۰-۵۹:۲۱) ۰

"আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করিল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। কেহ কেহ বলিল, এক যুবককে উহাদের সমালোচনা করিতে শুনিয়াছি; তাহাকে বলা হয় ইবরাহীম" (২১ ঃ ৫৯-৬০)।

তাহাকেই আমরা এই ব্যাপারে সন্দেহ করি। কেননা সে দেবতাদিগকে গালি দেয় ও সমালোচনা করে। এই সংবাদ যখন বাদশাহ নমরূদ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের নিকট পৌঁছিল তখন তাহারা বলিল, তাহাকে উপস্থিত কর লোক সম্মুখে, যাহাতে উহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারে (২১ ঃ ৬১) যে, সে-ই ইহা করিয়াছে। তাহারা বিনা প্রমাণে তাঁহাকে দোষারোপ করিতে অপছন্দ করিল। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম (আ)-এর উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, সকল লোক একত্র হউক। তাহা হইলে সকল মূর্তিপূজকের সম্মুখে তিনি প্রমাণ করিয়া দিবেন যে, তাহারা গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে, যেমন মূসা (আ) ফিরআওনকে বলিয়াছিলেন ঃ

مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (۵۹:۲۰)

"তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হইবে" (২০ ঃ ৫৯)।

অতঃপর যখন তাঁহাকে আনা হইল তখন লোকজন বাদশাহ নমরূদের নিকট সমবেত হইল। তাহারা বলিল,

ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يَا اِبْرَاهِيْمُ (۶۲ : ۲۱)

"হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলির প্রতি এইরূপ করিয়াছ" (২১ ঃ ৬২)? উত্তরে ইবরাহীম (আ) বলিলেন,

بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۰ (۶۳:۲۱)

"বরং ইহাদের এই প্রধান, সেই তো ইহা করিয়াছে, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যদি ইহারা কথা বলিতে পারে" (২১ ঃ ৬৩)।

প্রকৃতপক্ষে ইহার উদ্দেশ্যে ছিল তাহাদের নিকট হইতে এই কথার স্বীকারোক্তি আদায় করা যে, ইহারা কথা বলিতে পারে না। এইগুলি জড় পদার্থ, অন্যান্য জড় পদার্থের ন্যায়ই। তখন তাহারা মূর্তি ভাঙ্গার জন্য তাহাকে যে দোষারোপ করিয়াছিল উহা হইতে ফিরিয়া আসিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরাই তাহার উপর জুলুম করিয়াছি; সে তো ঠিকই বলিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ. (٢١:٦٤)

"তখন তাহারা মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিল এবং একে অপরকে বলিতে লাগিল, তোমরাই তো সীমালংঘনকারী" (২১ ঃ ৬৪)।

ইহার পর তাহারা বুঝিতে পারিল এবং বলিল, উহারা তো কোন ক্ষতি করিতে পারে না, উপকার করিতে পারে না, কোন কিছু ধরিতেও পারে না। উহারা তো কথা বলিতে পারে না যে, কে এইরূপ করিয়াছে তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিবে। হাত দিয়া ধরিতেও পারে না যে, আমরা তোমাকে সত্য বলিয়া সমর্থন করিব। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَاۤءِ يَنْطِقُوْنَ. (٢١:٦٥)

"অতঃপর উহাদের মস্তক অবনত হইয়া গেল এবং উহারা বলিল, তুমি তো জানই যে, ইহারা কথা বলে না" (২১ ঃ ৬৫)।

অতঃপর তাহাদের উপর ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তি প্রমাণ যখন অকাট্য বলিয়া বিবেচিত হইল এবং তাহারা পরাজয়ের গ্লানি লইয়া মাথা নোয়াইয়া ফেলিল তখন ইবরাহীম (আ) বলিলেন ঃ

اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ. اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. (٢١:٦٦-٦٧)

"তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যাহা তোমাদের কোন উপকার করিতে পারে না, ক্ষতিও করিতে পারে না? ধিক তোমাদিগকে এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাহাদের ইবাদত কর তাহাদিগকে! তবুও কি তোমরা বুঝিবে না" (২১ ঃ ৬৬-৬৭)?

তখন তাঁহার সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র ব্যাপারে তাঁহার সহিত বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের দাবি ছিল, ইবরাহীম (আ) যাহার ইবাদত করেন তাহা হইতে তাহাদের উপাস্য ও দেবতারাই উত্তম। তখন ইবরাহীম (আ) উদাহরণ দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইলেন যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে, তাহারা যাহার ইবাদত করে উহা অপেক্ষা আল্লাহ্‌ই ইবাদত পাওয়ার বেশী যোগ্য এবং তাঁহাকেই ভয় করা উচিৎ। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَحَاجَّهٗ قَوْمُهٗ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ رَبِّىْ شَيْئًا وَّسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ. وَكَيْفَ اَخَافُ مَاۤ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (٦:٨٠-٨١)

"তাহার সম্প্রদায় তাহার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইল। সে বলিল, তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করিলে তোমরা যাহাকে তাঁহার শরীক কর তাহাকে আমি ভয় করি না। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অনুধাবন করিবে না? তোমরা যাহাকে আল্লাহ্র শরীক কর আমি তাহাকে কিরূপে ভয় করিব? অথচ তোমরা আল্লাহ্র শরীক করিতে ভয় কর না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদিগকে কোন সনদ দেন নাই। সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের বেশী হকদার" (৬ ঃ ৮০-৮১)?

নমরূদের সহিত বিতর্ক

অতঃপর নমরূদ ইবরাহীম (আ)-কে বলিল, তুমি যে ইলাহের ইবাদত কর এবং যাঁহার ইবাদত করিতে অন্যকে দাওয়াত দাও, যাঁহার শক্তির কথা উল্লেখ কর এবং অন্যের উপর প্রাধান্য দাও তিনি কে? ইবরাহীম (আ) বলিলেন, তিনি আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। নমরূদ বলিল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলিল, তুমি কিভাবে জীবন দান কর ও মৃত্যু ঘটাও? নমরূদ বলিল, আমি দুই ব্যক্তিকে ধরিয়া আনিব যাহাদিগকে আমার নির্দেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর উহাদের একজনকে হত্যা করিব। এইভাবে আমি তাহার মৃত্যু ঘটাইলাম। আর অপরজনকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দিব। এইভাবে আমি তাহার জীবন দান করিলাম। তখন ইবরাহীম (আ) বলিলেন, "আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হইতে উদয় করান, তুমি উহাকে পশ্চিম দিক হইতে উদয় করাও তো'। তখন যে কুফরী করিয়াছিল সে (নমরূদ) হতবুদ্ধি হইয়া গেল" (২ ঃ ২৫৮)। সে বুঝিতে পারিল যে, ইহা তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। দলীল-প্রমাণে সে পরাস্ত হইল (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২২-১২৩; ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৭৯)।

এইসব বাদানুবাদে ও দলীল-প্রমাণে পরাস্ত হইয়া নমরূদ ও তাহার সম্প্রদায় ইবরাহীম (আ)-এর উপর দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হইল। তাহারা আলোচনা করিল যে, ইবরাহীমকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে হইবে। কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখিল যে, এই শাস্তি তো কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে, তাহাতে তাহাদের অন্তরে ক্রোধের যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে উহা নিভিবে না। তাই তাঁহাকে এমন শাস্তি দিতে হইবে যাহা তিল তিল করিয়া তাঁহাকে দগ্ধীভূত করিবে। তাহারা সবশেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, তাঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধিভূত করিয়া হত্যা করিতে হইবে। আর এমন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে যে, উহার উপর দিয়া উড্ডীয়মান পাখিও যেন পুড়িয়া যায় এবং যাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে (মাহমূদ যাহরান, কাসাস মিনাল-কুরআন, পৃ. ৫৬)।

কুরআন কারীমে এই দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে ঃ

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ. (٢١:٦٨)

"উহারা বলিল, তাহাকে পোড়াইয়া দাও এবং সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলিকে, তোমরা যদি কিছু করিতে চাহ" (২১ঃ ৬৮)।

মুজাহিদ বলেন, আমি একবার আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা)-এর সম্মুখে উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, মুজাহিদ! তুমি কি জান কে সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিতে দগ্ধীভূত করার প্রস্তাব করিয়াছিল? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, পারস্যের এক বেদুঈন। আমি বলিলাম, হে আবূ আবদুর রাহমান! পারস্যে কি বেদুঈন আছে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কুর্দীরাই পারস্যের বেদুঈন। তাহাদেরই এক ব্যক্তি ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে দগ্ধীভূত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৩)। ইব্ন জুরায়জ শু'আয়ব আল-জুব্বাঈ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি এই প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার নাম 'হায়যান'। আল্লাহ তাহাকে মাটিতে ধ্বসাইয়া দিয়াছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে মাটির নীচে ধ্বসিতে থাকিবে (ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৭৫)।

অতঃপর নমরূদ কাষ্ঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দিল এবং ইবরাহীম (আ)-কে বন্দী করিয়া রাখিল। তাঁহার জন্য একটি পাকা প্রাচীরযুক্ত ইমারত নির্মাণ করিল (ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮১; তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৩-১২৪)। এই সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে ঃ

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. (৩৭:৯৭)

"তাহারা বলিল, ইহার জন্য এক ইমারত নির্মাণ কর, অতঃপর ইহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর" (৩৭ঃ ৯৭)।

ইহার পর তাহারা বিভিন্ন প্রকারের কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল। এক বর্ণনামতে এক মাস যাবত এই কাষ্ঠ সংগ্রহ অভিযান চলে। ইহাকে তাহারা ধর্মীয় দিক হইতে পূণ্যের কাজ মনে করিত, এমনকি কোন মহিলা রোগাক্রান্ত হইলে তাহা আরোগ্যের জন্য অথবা কোন কাম্য বস্তু পাওয়ার জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করার মানত করিত (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৩-১২৪; ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮১)। কাষ্ঠ সংগৃহীত হইলে চতুর্দিক হইতে তাহারা উহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। এই অগ্নির তেজ এত তীব্র ছিল যে, উপর দিয়া কোন পাখি উড়িয়া যাইতে লাগিলে তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। অগ্নি প্রজ্জ্বলনের পর তাহারা ইবরাহীম (আ)-কে ইমারতের উপরে উঠাইয়া হাত-পা বাঁধিল। অতঃপর ইবলীসের পরামর্শ মত একটি প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্র (মিনজানীক) বানাইল এবং ইবরাহীম (আ)-কে উহাতে উঠাইল। তাহারা যখন তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে ফেলিতে উদ্যত হইল তখন জিন ও মানব ব্যতীত আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত ও উহার মধ্যে যত সৃষ্টি আছে ফেরেশতাসহ সবাই একবাক্যে চীৎকার করিয়া আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ জানাইল, "হে আল্লাহ! পৃথিবীর বুকে ইবরাহীম ছাড়া আর দ্বিতীয় কেহ নাই যে, তোমার ইবাদত করিবে। তোমার জন্যই তাঁহাকে অগ্নিতে জ্বালানো হইতেছে। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আমাদিগকে অনুমতি দাও।"

তখন আল্লাহ তাআলা বলিলেন, আমি তাঁহার ব্যাপারে অধিক অবগত। সে যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে অথবা কাহারো সাহায্য কামনা করে তবে সে যেন তাঁহাকে সাহায্য করে। আমি তাঁহাকে সেই ব্যাপারে অনুমতি দিলাম। আর যদি আমি ছাড়া অন্য কাহারো

সাহায্য প্রার্থনা না করে তবে আমিই তাঁহার জন্য যথেষ্ট (ইবনুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৭৬)। এক বর্ণনামতে ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে পানির ফেরেশতা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, আপনি চাহিলে আমি অগ্নি নিভাইয়া দিব। কারণ পানি ও বৃষ্টির ভাণ্ডার আমার হাতে। বাতাসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা আসিয়া বলিল, আপনি চাহিলে এই অগ্নিকুণ্ড আমি বাতাসে উড়াইয়া দিব। কিন্তু ইবরাহীম (আ) বলিলেন, তোমাদের কাহারো নিকট আমার কোন প্রয়োজন নাই (ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৮১)।

অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মাথা উঠাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আকাশে তুমিই একক সত্তা এবং দুনিয়াতে আমি এক ব্যক্তি। দুনিয়াতে আমি ছাড়া আর এমন কেহ নাই, যে তোমার ইবাদত করিবে (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৪; ছা'লাবী, প্রাগুক্ত)। ইবন কাছীরের বর্ণনা মতে ইবরাহীম (আ) এই বলিয়া দু'আ করিয়াছিলেন, "তুমিই আসমানে একক ও যমীনেও একক। আমার জন্য তুমিই যথেষ্ট ও উত্তম কর্মবিধায়ক" (আল কামিল, ১খ, পৃ. ৭৬)। মুতামির আরকাম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ)-কে হাত পা বাঁধিয়া যখন তাহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছিল তখন তিনি বলিলেন,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

"তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই। তুমি জগৎসমূহের প্রতিপালক, প্রশংসা তোমারই। রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নাই" (প্রাগুক্ত)। এক বর্ণনামতে তখন জিবরীল (আ) আসিয়া বলিলেন, ইবরাহীম! তোমার কোন প্রয়োজন আছে কি? তিনি বলিলেন, আপনার কাছে কোন প্রয়োজন নাই। জিবরীল (আ) বলিলেন, তবে তোমার প্রতিপালকের নিকট আবেদন কর। তিনি বলিলেন, তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে সব কিছুই অবগত আছেন। তাই তাঁহার অবগতিই যথেষ্ট।

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক" (প্রাগুক্ত; ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৪৬)। অতঃপর তাহারা মিনজানীকের সাহায্যে তাঁহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিল। তখন আল্লাহ্ ত'আলা আগুনকে বলিলেন ঃ

يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ. (٢١:٦٩)

"হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া যাও" (২১ঃ ৬৯)।

সুদ্দীর বর্ণনামতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে জিবরীল (আ) এই ঘোষণা দিয়াছিলেন (ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৮২)। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ইবরাহীম (আ)-এর জন্য শীতল ও নিরাপদ হইয়া গেল। শুধু তাহাই নহে, উহা তাঁহার জন্য পরম আরামদায়ক স্থান হইয়া গেল। তাঁহার হাত-পায়ের রশিগুলি আগুনে পুড়িয়া তিনি মুক্ত হইয়া গেলেন। আগুনের প্রতি আল্লাহ ত'আলার উক্ত নির্দেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত অগ্নিই সেই দিন নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। কা'ব আল-আহবার, কাতাদা ও যুহরী (র) বলেন, পৃথিবীর বুকে ঐদিন কেহই অগ্নি দ্বারা কোন কাজ

করিতে পারে নাই। ইবরাহীম (আ)-এর হাত-পায়ের রশি ব্যতীত অগ্নি ঐদিন কোন কিছুকেই দগ্ধীভূত করে নাই (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৪)। আলী ইবন আবী তালিব ও ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁহার নির্দেশের মধ্যে برد (শীতল) শব্দের পর سلام (নিরাপদ) শব্দ না আনিতেন তবে অগ্নি এমন ঠাণ্ডা হইয়া যাইত যে, ঠাণ্ডায় ইবরাহীম ইন্তিকাল করিতেন (প্রাগুক্ত)। গিরগিটি (وزغ) ব্যতীত সকল প্রাণীই সেই দিন ইবরাহীম (আ)-এর আগুন নিভাইতে চেষ্টা করে। এই জন্যই নবী (স) উহাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহাকে ক্ষুদ্র দুষ্কৃতিকারী (فويسقة) নামে অভিহিত করিয়াছেন (বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল-আম্বিয়া, ৪খ, ৫৭৮)।

ইবরাহীম (আ) ৭ দিন (ইবন আবী হাতিমের বর্ণনায় ৪০ দিন, আম্বিয়া-ই কুরআন, 'খ., পৃ. ১৯৯) উক্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে অবস্থান করেন। মিনহাল ইবন উমার হইতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) বলিয়াছেন, আমি আগুনের মধ্যে অবস্থানকালীন দিনগুলিতে যে সুখ-স্বচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশ ভোগ করিয়াছিলাম তেমন সুখ-স্বচ্ছন্দ ও আরাম-আয়েশ জীবনে আর কখনো পাই নাই (ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮২)। ইব্ন ইসহাক প্রমুখ বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর আকৃতিতে ছায়ার ফেরেশতাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পর নমরূদ একটি বাহনে করিয়া সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকট দিয়া যাইতেছিল। ইবরাহীম (আ) যে পুড়িয়া ছাইভস্ম হইয়া গিয়াছেন এই ব্যাপারে তাহার কোনই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু সে তাঁকাইয়া দেখিল, ইবরাহীম (আ) উহার মধ্যে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে তাঁহারই মত এক লোক। সে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সে যাত্রা বিরতি করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং তাহার সম্প্রদায়কে ডাকিয়া বলিল, আমি যেন ইবরাহীমকে আগুনের মধ্যে জীবিত দেখিলাম। আমার সন্দেহ হইতেছে। তোমরা আমার জন্য একটি সুউচ্চ স্তম্ভ নির্মাণ কর যেখান হইতে আমি নিম্নে তাঁকাইয়া অগ্নির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে পারি। তাহারা স্তম্ভ নির্মাণ করিলে নমরূদ সেখান হইতে তাঁকাইয়া দেখিল, ইবরাহীম (আ) একটি ফুল বাগানে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টে তাঁহারই মত এক লোক অর্থাৎ ফেরেশতাকেও সে দেখিতে পাইল।

নমরূদ ইবরাহীম (আ)-কে ডাকিয়া বলিল, ইবরাহীম! তোমার উপাস্য অতি মহান, যাহার শক্তির ফলে তোমার মধ্যে এবং আগুনের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে। তাই তোমার কোন ক্ষতি হয় নাই। ইবরাহীম! তুমি কি উহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার? ইবরাহীম (আ) বলিলেন, হাঁ। নমরূদ বলিল, তুমি কি এই ভয় কর যে, তুমি ঐখানে অবস্থান করিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে? ইবরাহীম (আ) বলিলেন, না। নমরূদ বলিল, উঠিয়া দাঁড়াও এবং উহা হইতে বাহির হইয়া আস। ইবরাহীম (আ) উঠিয়া উহার মধ্য দিয়া হাঁটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

নমরূদের নিকটে আসিলে সে বলিল, ইবরাহীম! তোমার পার্শ্বে উপবিষ্ট তোমারই আকৃতিতে যে লোকটিকে দেখিয়াছিলাম সেই লোকটি কে? ইবরাহীম (আ) বলিলেন, তিনি ছায়ার ফেরেশতা। আমাকে সঙ্গ দিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। নমরূদ বলিল, হে

ইবরাহীম! আমি তোমার উপাস্যের উদ্দেশ্যে কিছু কুরবানী করিব। কারণ আমি তাঁহার শক্তি ও দৃঢ়তা দেখিয়াছি, যাহা তোমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, যখন তুমি কেবল তাঁহারই ইবাদত কর এবং তাঁহারই একত্ব স্বীকার করা ব্যতীত আর সবকিছুই অস্বীকার করিয়াছিলে। আমি তাঁহার জন্য চার হাজার গাভী যবাহ করিব। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, তুমি তোমার এই দীনে থাকাবস্থায় তিনি তোমার কিছুই কবূল করিবেন না, যতক্ষণ না তুমি উহা ত্যাগ করিয়া আমার দীন গ্রহণ কর। নমরূদ বলিল, হে ইবরাহীম! আমি আমার রাজত্ব ত্যাগ করিতে পারি না। তবে শীঘ্রই আমি উহা যবাহ করিব। অতঃপর সত্যই সে উহা যবাহ করিল এবং ইবরাহীম (আ)-কে নূতন কোন শাস্তি দেওয়া হইতে বিরত রহিল। সে ইবরাহীম (আ)-কে বলিল, তোমার প্রতিপালক কতই না উত্তম হে ইবরাহীম! (ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮২-৮৩; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৪; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৭৬)।

বিবাহ

হযরত ইবরাহীম (আ) কত বৎসর বয়সে বিবাহ করেন তাহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না। তবে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হওয়ার অব্যবহিত পরই তিনি বিবাহ করেন বলিয়া ধারণা করা হয়। স্বীয় চাচাতো ভগ্নি সারা বিনত হারান আল-আকবারকে তিনি বিবাহ করেন। সুদ্দীর বর্ণনামতে সারা ছিলেন হাররান সম্রাটের কন্যা। তিনি তাহার কওমের দীনের ব্যাপারে সমালোচনা করিতেন। ইবরাহীম (আ) যখন শাম অভিমুখে রওয়ানা হন তখন সারার সাক্ষাত পান এবং তাহাকে এই শর্তে বিবাহ করেন যে, তিনি তাহাকে পরিবর্তন করিতে পারিবেন না (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৫; ছালাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৩; ইবনুল জাওযী, তারীখুল মুনতাজাম, ১খ, ২৬২)। তবে হাফিজ ই্ন কাছীর এই মতটিকে বিরল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর কেহ কেহ ধারণা করেন, যেমন সুহায়লী কুতায়বা ও মাক্কাশ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সারা ইবরাহীম (আ)-এর ভ্রাতা হারানের কন্যা, লূত (আ)-এর ভগ্নী। ইহাদের দাবি হইল, তখনকার শরীআতে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। কিন্তু হাফিজ ইবন কাছীর এই মতটিকে জোরদারভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইহা অজ্ঞতার ফল এবং ইহার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে, তখনকার সময়ে উহা বৈধ ছিল, যেমন ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ হইতে বর্ণিত আছে, তবুও আম্বিয়া-ই কিরাম উহার উপর আমল করেন নাই। ইব্ন কাছীর -এর মতে সারা ইবরাহীম (আ)-এর চাচা হারান এর কন্যা ছিলেন। ইহাই অধিকতর সঠিক ও প্রসিদ্ধ বলিয়া তিনি মত ব্যক্ত করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৫০)।

হিজরত

হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পিতা, তাঁহার সম্প্রদায় ও বাদশাহকে অত্যন্ত নম্রভাবে নসীহতের দ্বারা, যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা বিভিন্নভাবে এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন। তাঁহার সহিত শরীক করিতে নিষেধ করিলেন এবং মূর্তিপূজা ত্যাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু তাহারা উহা

প্রত্যাখ্যান করিল। তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহাকে আগুনে ফেলিল। কিন্তু আল্লাহ্ তাহা ঠাণ্ডা ও নিরাপদ করিয়া দিলেন। আর পিতা তাঁহাকে উক্ত পথ তাগ না করিলে প্রস্তরাঘাতে প্রাণনাশ করার হুমকি দিল। তাঁহার প্রতি কেবল স্ত্রী সারা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র লূত (আ) ইব্ন হারান ব্যতীত আর কেহ ঈমান আনয়ন করিল না (আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৮৩)। ইহাতে ইবরাহীম (আ) ভীষণভাবে মনক্ষুণ্ন হইলেন এবং স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করত অন্যত্র গিয়া দীন প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ

اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ. (٣٧:٩٩)

"আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎ পথে পরিচালিত করিবেন" (৩৭ঃ ৯৯)।

অতঃপর নিরাশ হইয়া তিনি বাবেলের কূছা হইতে বাহির হইয়া কালদানীগণের বাসস্থান ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরের কাছাকাছি 'উর' নামক একটি জনপদে হিজরত করিলেন। এই সফরে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন স্বীয় স্ত্রী সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লূত (আ) (ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ৩২; আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৩)। কিছুদিন পর এখান হইতে হারান (হাররান) চলিয়া যান এবং সেখানে দীন-ই হানীফের প্রচার শুরু করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় পিতা আযর-এর হিদায়াতের জন্য দু'আ করিতে থাকেন। কারণ অত্যন্ত নম্র ও দয়াদ্র্ হৃদয়ের অধিকারী হওয়ার কারণে পিতা কর্তৃক দীন-ই হানীফের দাওয়াত প্রতাখ্যান এবং তাঁহাকে ভর্ৎসনা করা সত্ত্বেও তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

سَلٰمٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا (١٩:٤٧)

"তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল" (১৯ ঃ ৪৭)।

অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার পিতা ঈমান আনয়ন করিবে না, সে আল্লাহ্র শত্রুই থাকিয়া যাইবে। এই কথা জানার পর ইবরাহীম (আ) তাঁহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতে বিরত থাকেন। কুরআন কারীমে ইহাই সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ. (٩:١١٤)

"ইবরাহীম তাহার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাকে ইহার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল বলিয়া। অতঃপর যখন ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইল যে, সে আল্লাহ্র শত্রু তখন ইবরাহীম উহার সম্পর্ক ছিন্ন করিল। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল" (৯ ঃ ১১৪)।

বাইবেলের বর্ণনামতে এই সফরে ইবরাহীম (আ)-এর পিতা তারাহ (আযর) ও সঙ্গে ছিল। এই হারানে অবস্থানকালে ২০৫ (মতান্তরে ২৫০) বৎসর বয়সে তারাহ মৃত্যুবরণ করে (Genesis, 11 : 31-32; মুহাম্মদ আল-ফুকা, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৬১; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান- নিহায়া, ১খ, ১৫০)। এইভাবে দীন-ই হানীফ-এর দাওয়াত দিতে দিতে তিনি হারান হইতে হিজরত করিয়া ফিলিসতীন পৌঁছিলেন। এই সফরেও তাঁহার সঙ্গী ছিলেন স্বীয় স্ত্রী সারা, ভ্রাতুষ্পুত্র লূত এবং তাঁহার স্ত্রী কুরআন কারীমে লূত (আ) কর্তৃক ইবরাহীম (আ)-এর উপর ঈমান আনয়ন এবং তাঁহার সহিত হিজরত করার কথা এইভাবে বিবৃত হইয়াছে ঃ

فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۔ (٢٦:٢٩)

“লূত তাহার (ইবরাহীম-এর) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিল। ইবরাহীম বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করিতেছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়” (২৯ ঃ ২৬)।

আর হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, উছমান (রা) যখন স্বীয় স্ত্রী হযরত রুকায়্যা (রা)-কে লইয়া হাবশা হিজরত করেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছিলেনঃ

إن عثمان اول مهاجر باهله بعد لوط عليه السلام

“নিশ্চয়ই লূত (আ)-এর পর উছমানই প্রথম ব্যক্তি, যে সস্ত্রীক হিজরত করিয়াছে (আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার, কাসাসুল কুরআন, পৃ. ৮৪)।

অতঃপর ইবরাহীম (আ) ফিলিসতীনের পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। তৎকালে এই অঞ্চলটি কান‘আনীদের অধীনস্থ ছিল। অতঃপর নিকটেই শাকীম (বর্তমান নাম নাবলুস) নামক স্থানে চলিয়া যান। আহলে কিতাবের বর্ণনামতে ফিলিসতীনে থাকাকালে আল্লাহ তাঁহার নিকট ওহী প্রেরণ করেন, তোমার পর এই ভূমিকে আমি বরকতময় করিব। তখন ইবরাহীম (আ) সেখানে একটি কুরবানীর স্থান তৈরি করিলেন এই নি‘মাতের শুকরিয়াস্বরূপ (Genesis, 12 : 8 ; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৫০)। নাবলুসেও তিনি বেশি দিন অবস্থান করেন নাই। আরো পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া মিসর চলিয়া যান। মিসরের রাজত্ব ছিল তখন ‘আমালীক সম্প্রদায়ের হাতে রোমানগণ যাহাদিগকে 'হাকসূস' নামে অভিহিত করিত (আবদুল ওয়াহহাব নাজজার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৪)। কোন কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনামতে মিসরের তৎকালীন ফির‘আওন ছিল অত্যাচারী বাদশাহ আদ-দাহ্হাক-এর ভ্রাতা। দাহ্হাক-এর পক্ষ হইতে সে তখন মিসরের গভর্নর ছিল। আর কাহারও মতে তাহার নাম ছিল সিনান ইব্ন ‘আলওয়ান ইব্ন ‘উবায়দ ইব্ন ‘উওয়ায়জ ইব্ন ‘আমলাক ইব্ন লাউদ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আ)। ইব্ন হিশাম তাঁহার তীজান গ্রন্থে ‘আমর ইব্ন ইমরুউল কায়স ইব্ন মাইলূন (মায়ালবূন) ইব্ন সাবা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে ছিল মিসরে। কোন কোন বর্ণনায় তাহার নাম সাদূফ বা সাদূক বলিয়াও উল্লেখ আছে (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ., ৭৭)। সুহায়লী ইহা বর্ণনা করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৫২)।

ইবরাহীম (আ) স্ত্রী সারাসহ মিসরে প্রবেশ করিলেন। সারা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৫)। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে সম্মান দিয়াছিলেন। ফির'আওন ছিল দুশ্চরিত্র । কোন এক লোক তাহাকে গিয়া খবর দিল, আপনার রাজ্যের অমুক স্থানে এক লোক আপসয়াছে। তাহার সহিত এক অপূর্ব সুন্দরী মহিলা আছে। তখন ফির'আওন ইবরাহীম (আ)-কে ডাকিয়া পাঠাইল। ইবরাহীম (আ) তাহার নিকট গেলে ফির্আওন জিজ্ঞাসা করিল, তোমনর সঙ্গের মহিলাটি কে? ইবরাহীম (আ) বলিলেন, আমার ভগ্নী। তিনি আশংকা করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী পরিচয় দিলে দুস্তরিত্র ফিরআওন তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে এবং সারাকে গ্রহণ করিবে। ফিরআওন ইবরাহীম (আ)-কে বলিল, উহাঞ্চেসজ্জিত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। আমি উহাকে সেখিব। ইবরাহীম (আ) সারার নিকট আসিয়া বলিলেন, বাদশাহ আমার নিকট তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিয়াছি যে, তুমি আমার ভগ্নী। তাই তাহার নিকট গিয়া অষ্ঠাকে আবার মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিও না। কারণ তুমি আমার দীনী ভগ্নী। এই দেশে তুমি আর আমি ছাড়া আর কোন মুমিন ব্যক্তি নাই।

অতঃপর সারা বাদশাহর নিকট গেলেন। এদিকে ইবরাহীম (আ) নামাযে দণ্ডায়মান হইলেন। সারাকে দেখিয়া বাদশাহ বিমোহিত হইয়া গেল এবং তাঁহাকে ধরিতে গেলে তাহার হাত অবশ হইয়া গেল। ইহাতে সে ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিল, তোমার প্রতিপালকের কাছে দু'আ কর যেন আমার হাত ঠিক হইয়া যায়। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে আর কষ্ট দিব না। তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করিব। সারা তখন দু'আ করিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। সে পুনরায় তাহাকে ধরিতে গেল। এইবারও পূর্বের ন্যায় অথবা তদপেক্ষা কঠিনভাবে হাত অবশ হইয়া গেল। এইবারও বাদশাহ বলিল, আমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর, আমি তোমার আর কোন ক্ষতি করিব না। সারা দু'আ করিলেন। তাহার হাত ঠিক হইয়া গেল। কোন কোন বর্ণনামতে বাদশাহ তিনবার এইরূপ আচরণ করিয়াছিল এবং তিনবারই সারার দু'আয় ভালো হইয়া যায়। অতঃপর বাদশাহ তাঁহার এক প্রহরীকে ডাকিয়া বলিল, তুমি কোন মানুষ আমার কাছে আন নাই, বরং আনিয়াছ এক ডাইনী (জিন্ন)। বাদশাহ অতঃপর হাজারসহ বেশ কিছু উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে ইবরাহীম ((আ)-এর নিকট পাঠাইয়া দিল। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। ইবরাহীম (আ) তখন নামাযরত ছিলেন। তিনি নামায শেষ করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর? সারা বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা কাফির দুর্বৃত্তদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। আর সে হাজারকে খেদমতের জন্য দিয়াছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই হাদীছ বর্ণনা করিয়া বলেন, তিনিই তোমাদের মাতা, হে আরব সম্প্রদায়! (বুখারী, আস-সাহীহ, ৪খ, ২৭০, কিতাবুল-আম্বিয়া; মুসলিম, আস-সাহীহ, ৭খ, ৯৮-৯৯; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৫০; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৫-১২৬)।

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, সারা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হইতে রওয়ানা হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা সারা ও ইবরাহীমের মধ্যে পর্দা তুলিয়া দেন, যাহাতে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট

হইতে বাহির হওয়ার সময় হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাহার সকল কর্মকাণ্ড দেখিতে পান। কিভাবে তিনি বাদশাহর নিকট পৌঁছিলেন এবং কিভাবে আল্লাহ তাহাকে হেফাজত করিলেন সব কিছুই তিনি স্বচক্ষে দেখিতে পান। সারার সম্মানার্থে এবং ইবরাহীম (আ)-এর মানসিক প্রশান্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারণ সারাকে তিনি অত্যধিক ভালবাসিতেন। কথিত আছে, হাওয়া (আ)-এর পরে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক সুন্দরী মহিলা (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৫২; ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৪)।

হাজার (রা)-এর পরিচয়

বাইবেলে হযরত হাজার (আ)-কে ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারার 'মিসরীয় দাসী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. Genesis, 16 : 1)। সারা বন্ধ্যা ও নিঃসন্তান ছিলেন। ইবরাহীম (আ) নিঃসন্তান ও নির্বংশ থাকিবেন ইহা তাহার নিকট খুবই দুঃখের বিষয় ছিল। তাই সন্তানের আশায় তিনি আপন দাসী হাগারকে আপন স্বামী আব্রামের সহিত বিবাহ দেন (Genesis, 16 : 3)। এই সূত্র ধরিয়া পাশ্চাত্যের সকল লেখক এবং কোন কোন মুসলিম লেখকও তাহাদের অনুসরণ করত হাজারকে সাধারণ একজন দাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সঠিক নহে, বরং বলা যায় অজ্ঞতা বা বিদ্বেষের ফল। প্রকৃতপক্ষে হাজার ছিলেন মিসরের রাজকন্যা (দ্র. আল-কিসাঈ, কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, ১৪২; ইসলামী বিশ্বকোষ ২০ খ, ৫৬০-৬১)।

আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, অবিচল আস্থা, ও মজবুত ইয়াকীন ছিল। তাই সম্পূর্ণ জনমানবহীন মরু প্রান্তরে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় মাত্র কয়েকটি খেজুর ও কিছু পানি দিয়া ইবরাহীম (আ) যখন চলিয়া যাইতেছিলেন তখন শিশু সন্তানসহ নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি দেখিয়া তিনি ইবরাহীম (আ)-এর পিছু গমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে এই জনমানবহীন মরুপ্রান্তরে রাখিয়া আপনি কোথায় যাইতেছেন?" কয়েকবার এইরূপ বলার পরও ইবরাহীম (আ)-এর পক্ষ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আল্লাহই আপনাকে এইরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন কি?" ইবরাহীম (আ) বলিলেন, হাঁ। তখন যেন তিনি আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলিলেন, اذا لا يضيعنا "তাহা হইলে আল্লাহ আমাদিগকে ধ্বংস করিবেন না" (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৫৪)।

তিনটি মিথ্যা কথন

পূর্বে আলোচিত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কর্মকাণ্ডে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, তিনটি স্থানে তিনি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন ঃ (১) তাঁহার সম্প্রদায় তাঁহাকে মেলায় যাইতে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন 'আমি অসুস্থ'; (২) মন্দিরের মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া বড়টির ঘাড়ে কুঠার রাখিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছিলেন ঃ 'উহাদের এই বড়টিই এই করিয়াছে'; (৩) হিজরত করিয়া মিসরে উপস্থিত হইলে সেখানকার জালিম বাদশাহর নিকট স্বীয় স্ত্রী সারাকে ভগ্নী পরিচয় দেন। হাদীছেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

لَمْ يَكْذِبْ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا ثَلٰثَ كَذْبَاتٍ.

"নবী ইবরাহীম (আ) তিনটি স্থলে ছাড়া আর কখনও মিথ্যা (বাহ্যত) বলেন নাই...." (বুখারী, আস-সাহীহ, ৪খ, ২৮০; মুসলিম, আস-সাহীহ, ৭খ, ৯৭-৯৮)।

এই হাদীছটি হাদীছের বিভিন্ন কিতাবে উল্লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত বুখারীতে আরো একটি দীর্ঘ হাদীছ আছে যাহা শাফা'আতের হাদীছ নামে খ্যাত (উহা বিভিন্ন অধ্যায়ে, যথা সূরা বাকারার তাফসীর অধ্যায়ে, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুত-তাওহীদ-এ উল্লিখিত হইয়াছে)। উহাতে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহার সারাংশ হইল ঃ হাশরের ময়দানে যখন সকল মানুষ হযরত আদম ও নূহ (আ)-এর নিকট আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশের অনুরোধ করিয়া এক পর্যায়ে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট গিয়া বলিবে, আপনি আল্লাহ্‌র খলীল! আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন যেন শীঘ্রই তিনি আমাদের ফায়সালা করেন। তখন তিনি বলিবেন, আমি লজ্জাবোধ করিতেছি। কারণ দুনিয়াতে আমি তিনটি মিথ্যা বলিয়াছিলাম ঃ اني سقيم ، بل فعله كبيرهم هذا এবং স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম انى اخوك। সাহীহ বুখারী ছাড়াও এই রিওয়ায়াত মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, সাহীহ ইবন খুযায়মা, হাকেমের মুসতাদরাক, মু'জাম তাবারানী, মুসান্নাফ ইব্‌ন আবী শায়বা, তিরমিযী ও মুসনাদ আবী আওয়ানাতে বিভিন্ন সাহাবী হইতে রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। কোনটিতে সংক্ষিপ্ত, কোনটিতে বিস্তারিত। ইহারই কোন কোন বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ما منها كذبة الا حل بها عن دين الله অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "ইবরাহীম (আ)-এর তিনটি মিথ্যার প্রতিটিই কেবলমাত্র আল্লাহর দীনের স্বার্থেই বলিয়াছিলেন।"

মোটকথা এই উভয় রিওয়ায়াতই বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়াত যাহা সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত। এই রিওয়ায়াত ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় একজন উঁচু স্তরের মহান নবীর প্রতি 'মিথ্যা' আরোপ করে। যদিও এই সকল রিওয়ায়াতের কোন কোনটিতে স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) এই ক্ষেত্রে 'মিথ্যা' (كذب) -এর দ্বারা সেই প্রচলিত সাধারণ অর্থ বুঝান নাই যাহা কথাবার্তা ও আচার-আচরণে খুবই ঘৃণ্য ও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। ইহার বিপরীত তিনি এই কথা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, ইবরাহীম (আ) এই তিনটি কথা কোন ব্যক্তিস্বার্থে কিংবা পার্থিব কোন লাভের জন্য বলেন নাই; বরং সত্যের দুশমনদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার খাঁটি দীনের স্বার্থেই বলিয়াছিলেন।

ইহা ঠিক যে, কোন কোন রিওয়ায়াত সুস্পষ্টভাবে ইহাকে 'মিথ্যা' (كذب) -এর সাধারণ অর্থ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে। তবুও প্রথমত, এই 'অতিরিক্ত ব্যাখ্যা' বুখারী-মুসলিমের রিওয়ায়াতে নাই, যদিও সাহীহ রিওয়ায়াতে তাহা উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়ত, 'সত্যবাদিতা' যখন নবীদের অবিচ্ছেদ্য এবং নবীর পবিত্র ও নিষ্পাপ থাকার জন্য অপরিহার্য একটি গুণ, উপরন্তু কুরআন কারীমে যখন বিশেষভাবে ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন তাঁহার সম্পর্কে বাহ্যিক মিথ্যার আরোপ শোভনীয় হয় না।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا (١٩ : ٤١) (১)

"স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী" (১৯ঃ ৪১)।

এখানে صديق শব্দটি আধিক্যবোধক (مبالغة) শব্দ। সেই সত্তার প্রতি উহা ব্যবহৃত হয় 'সত্যবাদিতা' যাহার স্বভাবগত গুণ।

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَاكِرًا لِّاَنْعُمِهٖ اِجْتَبٰهُ وَهَدَاهُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٢١-١٢٠ :١٦) (২)

"ইবরাহীম ছিল এক 'উম্মাত', আল্লাহ্‌র অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত; সে ছিল আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে পরিচালিত করিয়াছিলেন সরল পথে" (১৬ ঃ ১২০-১২১)।

এখানে اجتبى মনোনীত করা ও هدى (হিদায়াত করা) এমন দুইটি গুণ যাহার সহিত 'মিথ্যা (كذب) বাহ্যিক কিংবা বাস্তব কোন ভাবেই সম্পৃক্ত হইতে পারে না।

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا (١٢٣:١٦) (৩)

"আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করিলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অসুরণ কর" (১৬ ঃ ১২৩)।

ইনি সেই ইবরাহীম (আ) যাঁহার মিল্লাতের অনুসরণ-অনুকরণ করিতে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার উম্মতকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّابِهٖ عَالِمِيْنَ (٥١:٢١) (৪)

"আমি তো ইহার পূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়াছিলাম এবং আমি তাহার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত" (২১ ঃ ৫১)।

ইহাতে এবং এই জাতীয় অন্যান্য আয়াতে ইবরাহীম (আ)-এর যেই সকল বিশেষ গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার পর এক মুহূর্তের জন্যও আর এমন পূত-পবিত্র ও মহান সত্তা সম্পর্কে মিথ্যার কল্পনাও করা যায় না। সে মিথ্যা বাস্তবিক অর্থে (حقيقى) হউক বা শুধুমাত্র বাহ্যিক অর্থেই হউক। অবশ্য আলোচনার বিষয় এই যে, উক্ত দুই সাহীহ রিওয়ায়াতের এই তিনটি বিষয়কে রাসূলুল্লাহ (স) এমন একজন সম্মানিত নবী সম্পর্কে "মিথ্যা" (كذب) বলিয়া কেন অভিহিত করিলেন, অথচ তাঁহার পবিত্র সত্তা দীনের প্রয়োজন ও ইসলামী আকীদা সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয় দূর করার উপকরণস্বরূপ, সন্দেহ সংশয় সৃষ্টির করার জন্য নহে। বিশেষত এই তিনটি কথা যখন স্ব স্ব স্থানে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা নহে, না বাহ্যিকভাবে আর না প্রকৃত অর্থে।

নিঃসন্দেহে হযরত সারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীনী ভগ্নী এবং চাচাতো বোন ছিলেন (ইব্‌নে কাছীর)। আবার مسقيم এইজন্য বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মন-মানসিকতা খুবই খারাপ ছিল

যদিও তিনি শারীরিক দিক দিয়া মারাত্মকভাবে রোগাক্রান্ত ছিলেন না। তাই انى سقيم বলাও সঠিক। আবার নিঃসন্দেহে তিনি বিতর্কের পদ্ধতিতে প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করিয়া দেওয়ার জন্য বলিয়াছিলেন, بل فعله كبيرهم هذا. আর ইহা, কোনক্রমেই মিথ্যা ছিল না। তাহা হইলে উক্ত হাদীছদ্বয়ে এইভাবে কেন বর্ণনা করা হইল?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া উলামায়ে কিরাম দুইটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন ঃ (১) ইহা খবরে ওয়াহিদ। এইজন্য জোর গলায় ইহা বলিয়া দেওয়া উচিৎ যে, যদিও এই রিওয়ায়াতদ্বয় সাহীহায়নে আছে এবং এইজন্য ইহা মাশহূর-এর পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে কিন্তু রাবীদের এই রিওয়ায়াতে মারাত্মক ভ্রম হইয়াছে। তাই ইহা মোটেও গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ একজন নবীর প্রতি মিথ্যারোপের তুলনায় রাবীদের ভুল স্বীকার করা বহু গুণ ভাল এবং সঠিক পন্থা। ইমাম রাযী (র)-এর মতও অনুরূপ; তিনি এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন।

(২) ইহা অকাট্য, সর্বসম্মত ও সুনিশ্চিত আকীদা যে, নবী-রাসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা কোন অবস্থাতেই সঠিক নহে। এমতাবস্থায় যদি মাশহূর বা মুতাওয়াতির পর্যায়ের কোন সহীহ রিওয়ায়াতে এমন ধরনের কোন বিষয় থাকে যাহা নবুওয়তের শান বিরোধী, তবে সেই রিওয়ায়াত সাহীহ বলিয়া গণ্য করত সেই বিশেষ বাক্যসমূহের এমন ব্যাখ্যা করা উচিৎ যাহা দ্বারা মূল বিষয়েরও ক্ষতি না হয় এবং সহীহ রিওয়ায়াতসমূহও অস্বীকার করিতে না হয়। তাই সাহীহায়ন-এর এই সকল রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না এবং ثلث كذبات তথা "তিনটি মিথ্যা" শীর্ষক বাক্যাংশের এই ব্যাখ্যা করা উচিত যে,এই স্থলে মিথ্যা (كذب) অর্থ "এমন কথা যাহা সঠিক (صحيح) ও সৎ উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে কিন্তু শ্রোতা উক্ত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া নিজের মনমত একটা অর্থ বুঝিয়া লইয়াছে"। আর এই অর্থ শুধুমাত্র ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার জন্যই উদ্ভব করা হয় নাই, বরং অলঙ্কার শাস্ত্রের (علم البديع) পরিভাষায় উহাকে 'মা'আরীদ"-এর মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। বাগ্মীদের কথায় ইহার বিস্তর প্রচলন রহিয়াছে। শাফা'আতের হাদীছের ما منها كذبة الا ما حل بها عن دين الله বাক্যটিও এই ব্যাখ্যার সমর্থন করে। জমহূর আলিমগণের মত ইহাই। তাঁহারা ইমাম রাযী ও তাঁহার এ মতের অনুসারী আলিমগণের মত সঠিক বলিয়া স্বীকার করেন না।

হিফজুর রাহমান সিউহারবী উল্লিখিত? দীর্ঘ আলোচনার পর স্বীয় মতামত এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উপরিউক্ত মত দুইটি হইতে পৃথক সাদামাটা ও পরিষ্কার রাস্তা এই যে, সহীহ হাদীছকে অস্বীকার এবং উহার শব্দাবলীর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করা ছাড়াই বিষয়টি এমনভাবে সমাধা করা যায় যাহাতে আসল বিষয় "নবীদের নিষ্পাপ" (عصمت انبياء) হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন না উঠিতে পারে, আর এই ধরনের ক্ষেত্র হইতে অবৈধভাবে ফায়দা হাসিলকারী ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছের সহিত ঠাট্টা-বিদ্রূপকারিগণেরও কুফরী করার সাহস না হয় এবং তাহারা সে অবকাশ না পায়। ইহার বিশদ বিবরণ এই যে, "নবীগণের নিষ্পাপ" হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে দীন-এর মৌলনীতি ও গুরুত্বপূর্ণ আকীদার অন্তর্ভুক্ত, বরং বলিতে গেলে দীন ও মাযহাবের সত্যতার ভিত্তি শুধু এই একটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ 'নবীগণও কোন কোন অবস্থায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ

করিতে পারেন', তাই উহা দীন ও হকের সাহায্যের জন্যই হউক না কেন—এই কথা স্বীকার করিয়া লইলে যে নবীর আনীত সকল শিক্ষার মধ্যে কোন্‌টি তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহিত সম্পৃক্ত ও অকাট্য সত্য, আর কোন্‌টি মিথ্যার রঙ্গে রঙ্গীন তাহা পৃথক করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে নবীর দীন ও মাযহাব কোনটিরই আর বিশ্বাসযোগ্যতা থাকিবে না। তাই "নবীগণ নিষ্পাপ" এই অকাট্য বিশ্বাস ও আকীদা উহার স্বস্থানে অপরিবর্তনীয়। তাই নিঃসন্দেহে যাহা এই আকীদার অন্তরায় ও পরিপন্থী হইবে তাহাই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, নতুবা উহার সঠিক ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত আকীদার অনুকূল করিতে হইবে।

এমনিভাবে ইহাও স্বতসিদ্ধ যে, কুরআন কারীমের তাফসীর কেবল আরবী শব্দের অভিধানের ভিত্তিতেই করা সম্ভব নহে, বরং উহা বুঝিবার জন্য অভিধানের সাহায্য ও মাধ্যম যেমন প্রয়োজন, তদপেক্ষা আরো বেশী প্রয়োজন আল্লাহ্‌র নবী (স)-এর কথা, কাজ ও অবস্থাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের যাহা সাহাবায়ে কিরাম-এর মাধ্যমে রাবী-পরম্পরায় আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অবশ্য এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সকল হাদীছই অবিকল তাঁহার মুখ নিসৃত বাণী নহে; বরং কিছু কিছু এমনও রহিয়াছে যাহা রাবী নিজের শব্দে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণীর সারমর্ম বর্ণনা করিয়াছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের পক্ষ হইতে কিছু ব্যাখ্যাও তিনি পেশ করিয়াছেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি সামনে রাখিয়া আলোচ্য বিষয়টি এইভাবে সমাধান করা যাইতে পারে যে, বুখারীর হাদীছ নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। আর ইহাও স্বীকৃত যে, এই গ্রন্থ সমালোচনা ও যাচাই-বাছাই করার পর উম্মাতের মধ্যে প্রসিদ্ধি ও গ্রহণযোগ্যতা লাভের এমন মর্যাদা লাভ করিয়াছে যে, কিতাবুল্লাহ্‌র পর উহাকে অধিকতর শুদ্ধ কিতাব বলা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহা সম্ভব যে, রিওয়ায়াতের ভাবার্থ বর্ণনা (روايت بالمعنى) হওয়ার কারণে উহার কোনও রিওয়ায়াতে রাবীর পক্ষ হইতে শব্দের ব্যাখ্যায় বা শব্দের প্রয়োগে কোন রকম ক্রুটি সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং রিওয়ায়াত যদিও উহার সনদ-পরম্পরা ও মতনের দিক দিয়া মৌলিক বা আইনতভাবে স্বীকার্য হয় তবুও উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যাকে ক্রুটিযুক্ত (سقم) বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং আসল রিওয়ায়াত প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে শুধু উহার ক্রুটি প্রকাশ করা হইবে। ইহার উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হইল বুখারীর মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীছ। মুহাদ্দিছগণ এই ব্যাপারে এক মত যে, আনাস (রা) হইতে বর্ণিত মুসলিমের হাদীছ-এর তুলনায় আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী নামিরা (রা) হইতে বর্ণিত বুখারীর হাদীছের বর্ণনায় ক্রুটি (سقم) রহিয়াছে এবং ইহার বিন্যাসে (ترتيب) ভুল বিদ্যমান। আর মুসলিমের রিওয়ায়াত উক্ত দুর্বলতা ও ভুলক্রুটি হইতে মুক্ত। অথচ এই উভয় বর্ণনাই রিওয়ায়াত (বর্ণনা) ও দিরায়াত (যুক্তি)-এর দিক দিয়া সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

তাই কোন সন্দেহ ও সংশয় ছাড়াই এই কথা মানিয়া নিতে হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কিত এই দীর্ঘ রিওয়ায়াত দুইটি অর্থগত রিওয়ায়াত (روايت بالمعنى) -এর অন্তর্ভুক্ত। আর কখনো এই দাবি করা যাইবে না যে, শব্দ ও বাক্যের এই পরিপূর্ণ কাঠামো অবিকল রাসূলুল্লাহ

(সা)-এর মুখ-নিঃসৃত বাক্য; বরং ইহা তাঁহার বক্তব্যের মর্ম ও অর্থ প্রকাশ করে। কাজেই উভয় রিওয়ায়াতে বর্ণনাকৃত ঘটনা সত্য হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য বিষয়ের হাদীছের শব্দাবলী সনদ-পরম্পরায় কোন রাবীর শাব্দিক ত্রুটির পরিণতি এবং তাহার দ্বারাই এই দুর্বলতা (سقم) -এর সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বিশেষত যখন উহার জন্য এই আলামতও রহিয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ), সারা ও মিসরের বাদশাহর এই ঘটনা তাওরাতে (বাইবেলে)ও উল্লিখিত আছে এবং সেখানে অসতর্কতামূলক ও অসংলগ্ন বাক্যও প্রচুর রহিয়াছে। তাই সম্ভবত রাবীর দ্বারা এই ইসরাঈলী (রিওয়ায়াত এবং উক্ত সাহীহ রিওয়ায়াতের মধ্যে বর্ণনার সময় তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। আর এইজন্যই তিনি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়া আলোচ্য বিষয়ে উল্লিখিত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন (হিফজুর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল-কুরআন, ১খ., ১৯৭-২০৮)।

মিসর হইতে সিরিয়া প্রত্যাবর্তন ঃ অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) মিসর হইতে সিরিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পবিত্র ভূমি ফিলিসতীনের আস-সাব' নামক স্থানে অবতরণ করিলেন। তাঁহার সহিত তখন বহু চতুষ্পদ জন্তু, দাসদাসী ও প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। হাজার (আ)ও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আ)-এর নির্দেশে লূত (আ) তাঁহার সম্পদ লইয়া সাদূমে চলিয়া যান (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৫২)। ইবরাহীম (আ) এখানে একটি কূপ খনন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। উক্ত কূপের পানি ছিল স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট। তাঁহার বকরিগুলি সেখান হইতে পানি পান করিত। ইবরাহীম (আ) সেখানে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেন।

ফিলিসতীনের নিকটস্থ কিত্‌তা' বা 'কাত' নামক স্থানে হিজরত

অতঃপর সেখানকার অধিবাসিগণ তাহাকে কষ্ট দিল। তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া ফিলিসতীনের পার্শ্ববর্তী রামলা ও ঈলিয়ার মধ্যবর্তী 'কিত্‌তা' নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁহাকে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে সুসংবাদ দিলেন যে, এই ভূমি সবটাই তোমার এবং তোমার পরবর্তী বংশধরদের জন্য একেবারে শেষ যমানা পর্যন্ত আমি বরাদ্দ করিব। আর তোমার বংশধর অতিশয় বৃদ্ধি করিব, এমনকি তাহাদের সংখ্যা হইবে মাটির ধুলিকণা সম। এই সুসংবাদ বর্তমান উম্মতের সহিত সংশ্লিষ্ট, বরং উহার বিরাট এক সংখ্যাই উম্মাতে মুহাম্মাদ (স)। রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি হাদীছ হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন ঃ

ان اللّٰه زوى لى الارض فرايت مشارقها ومغار بها وسيبلغ ملك أمتيّ ما زوى لى منها ·

"আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য পৃথিবীকে একত্রিত করিয়া দিয়াছেন। আর আমি উহার পূর্ব-পশ্চিম দর্শন করিয়াছি। আমার উম্মাতের রাজত্ব ততদূর পর্যন্ত পৌঁছিবে যতদূর আমার জন্য একত্র করা হইয়াছিল" (ইব্ন কাছীর, আল-ইব্নুল-আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৭৯)।

সাব'বাসীদের নিকট হইতে চলিয়া আসার পর উক্ত কূপের পানি শুকাইয়া যায়। ফলে তাহারা নিজদের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা করে এবং বলে, আমরা একজন সৎ লোককে

আমাদের নিকট হইতে বিতাড়িত করিয়াছি। অতঃপর তাহারা ইবরাহীম (আ)-এর অনুগমন করিয়া তাঁহার সন্ধান লাভ করে এবং তাঁহাকে ফিরিয়া যাইবার আবেদন করে। তিনি বলিলেন, যে দেশ হইতে আমাকে বহিষ্কার করা হইয়াছে সেখানে আমি আর ফিরিয়া যাইব না। তাহারা বলিল, আপনি যে কূপ হইতে পানি পান করিতেন এবং আমরাও আপনার সহিত পান করিতাম তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে তাহার ছাগলের পাল হইতে সাতটি ছাগল দিয়া বলিলেন, এইগুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। ইহাদিগকে পানি পান করিতে দিলেই কূপ হইতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানি বাহির হইবে। উহা হইতে তোমরাও পান করিও। তবে কোন ঋতুবতী মহিলা যেন অঞ্জলী ভরিয়া উক্ত পানি পান না করে। তাহারা ছাগলগুলি লইয়া চলিয়া আসিল। সেইগুলি কূপের নিকট গেলেই উহা হইতে স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হইল। তাহারা উহা হইতে পানি পান করিল। এইভাবে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হইবার পর একদিন উহার নিকট এক ঋতুবতী মহিলা আসিল এবং উহা হইতে অঞ্জলী পূর্ণ করিয়া পানি পান করিল। সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কূপের পানি শুকাইয়া গেল এবং আজ পর্যন্ত উহা শুষ্ক রহিয়াছে (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৭; ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ.৮৫; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ৭৯)।

ফেরেশতাদের আগমন এবং পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান

ইবরাহীম (আ) এই কিত্‌তা বা কাত্‌ত নামক স্থানেই বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার নিকট যাহারা আগমন করিত তিনি তাহাদের মেহমানদারী করিতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও চাকর-বাকর দান করিয়ছিলেন। এই সময় লূত (আ)-এর সম্প্রদায় এক জঘন্য অপকর্ম করিত যাহা বিশ্ববাসীর কেহ ইতিপূর্বে করে নাই। সঙ্গে সঙ্গে লূত (আ)-কে তাহারা অমান্য করিত এবং তাঁহার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করিত। অতঃপর তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ এই সময় ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাহারা প্রথমে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আগমন করেন মেহমানের বেশে। ইবরাহীম (আ)-এর অভ্যাস ছিল সব সময় মেহমানকে সঙ্গে লইয়া আহার করা। কিন্তু ইহাদের আগমনের পূর্বে পনের দিন পর্যন্ত কোন মেহমানের আগমন ঘটে নাই। ইহাতে তিনি খুবই বিচলিত ছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাগণ মেহমানদের বেশে আগমন করিলে তিনি খুবই খুশী হন। তিনি তাহাদের জন্য একটি ভুনা মাংসল গোবৎস লইয়া আসিলেন। কিন্তু তাহারা উহা না খাইয়া হাত গোটাইয়া বসিয়া রহিলেন। ইবরাহীম (আ) তাহাদিগকে বলিলেন, আপনারা খাইতেছেন না কেন? তাহাদের হস্তসমূহ খাবার স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া ইবরাহীম (আ) শংকিত হইয়া পড়িলেন। তাহারা বলিলেন, আপনি ভীত হইবেন না। আমরা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি। তাঁহার স্ত্রী সারা নিকটে দণ্ডায়মান ছিলেন। আর ইবরাহীম (আ) তাহাদের সহিত আহারে বসিয়াছিলেন। তাহারা তাহাদের প্রেরিত হইবার কারণ অবহিত করিলেন এবং তাঁহার পুত্র ইসহাক-এর জন্মের ও ইসহাকের পর ইয়া'কূবের জন্মের সুসংবাদ দিলেন। ইহা শুনিয়া সারা হাসিয়া ফেলিলেন। কুরআন কারীমে উক্ত ঘটনা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَامْرَاَتُهٗ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ. قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ. (١١:٧١-٧٣)

"আর তাহার স্ত্রী দণ্ডায়মান এবং সে হাসিয়া ফেলিল। তারপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলিল, কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাহারা বলিল, আল্লাহ্র কাজে তুমি বিস্ময়বোধ করিতেছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রহিয়াছে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি তো প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ" (১১ ঃ ৭১-৭৩)।

সারার এই হাসির কারণ সম্পর্কে আলিমগণ বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সুদ্দী বলেন, তাহারা যখন আহার গ্রহণ করিতেছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, কি অদ্ভুত আমাদের এই সকল মেহমান! আমরা তাহাদের সম্মানার্থে প্রাণপণ খেদমত করিতেছি, আর তাহারা আমাদের আহার গ্রহণ করিতেছেন না! কাতাদা বলেন, লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড এবং শাস্তি নিকটবর্তী জানিয়া তিনি হাসিয়াছিলেন। মুকাতিল ও কালবী বলেন, তিনি ইবরাহীম (আ)-এর ভয় পাওয়ায় হাসিয়াছিলেন। কারণ তিনি চাকর-বাকর ও পরিবার-পরিজন বেষ্টিত থাকিয়া ভয় পাইয়াছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর বার্ধক্যে পৌঁছা সত্ত্বেও সন্তান হওয়ার সংবাদে তিনি হাসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ছিল তখন ৯০ বৎসর। আর ইবরাহীম (আ)-এর বয়স এই বর্ণনামতে ১২০ বৎসর। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনামতে সুসংবাদ দেওয়া এই পুত্র ইসহাক (আ) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ১০০ বৎসর (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১২৮; ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া; পৃ. ৮৬; Genesis, 21ঃ 5)। তবে মুজাহিদ ও ইকরিমা (র) বলেন, কুরআন কারীমে উল্লিখিত ضحكت শব্দটির অর্থ "তিনি হাসিলেন" নহে; বরং "তিনি ঋতুবতী হইলেন"। আরবী পরিভাষায় ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন খরগোশ যখন ঋতুবতী হয় তখন বলা হয়, ضحكت الا رنب "খরগোশটি ঋতুবতী হইয়াছে" (ছা'লাবী, প্রাগুক্ত)।

লূত সম্প্রদায়ের ব্যাপারে বাদানুবাদ

হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন খুবই কোমল হৃদয়। তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে, ফেরেশতাগণ লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিতে আসিয়াছেন তখন সেই সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি ফেরেশতাদের সহিত তাহাদের ব্যাপারে বাদানুবাদ শুরু করিলেন। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমত কামনা করিলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ. اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ. (١١:٧٤-٧٥)

"অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী" (১১ ঃ ৭৪-৭৫)।

তাঁহার এই বাদানুবাদের বিষয়টি কুরআন কারীমে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, বরং বাইবেলে উহার উল্লেখ রহিয়াছে (আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ৯৫)। মুসলিম সীরাতবিদগণও উহার উল্লেখ করিয়াছেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, সুদ্দী, কাতাদা ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফেরেশতাগণ বলিলেন যে, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদিগকে ধ্বংস করিব। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, তোমরা কি এমন জনপদ ধ্বংস করিবে, যেখানে তিন শত মু'মিন রহিয়াছে? তাহারা বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, যেখানে দুই শত মু'মিন রহিয়াছে? তাহারা বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, চল্লিশজন মু'মিন থাকিলে? তাহারা বলিলেন, না। তিনি বলিলেন, চৌদ্দজন মু'মিন থাকিলে? তাহারা বলিলেন, না। ইবরাহীম (আ) ধারণা করিয়াছিলেন যে, লূত (আ)-এর স্ত্রীসহ সেখানে চৌদ্দজন মু'মিন রহিয়াছে। তাই তাহাদের কথায় তিনি স্বস্তি লাভ করিলেন এবং চুপ হইয়া গেলেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, এইভাবে বলিতে বলিতে বলিতে সর্বশেষ বলিলেন, সেখানে একজন মুমিন থাকিলে তোমাদের কি অভিমত? তাহারা বলিলেন, না, একজন মু'মিন থাকিলেও সেই জনপদ আমরা ধ্বংস করিব না। তারপর ইবরাহীম (আ) যখন ফেরেশতাদের নিকট হইতে লূত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে অবহিত হইলেন যে,তাহাদিগকে মাটির ঢেলা নিক্ষেপ করিয়া বিলীন করিয়া দেওয়া হইবে (৫১ঃ ৩৩)। তখন লূত (আ)-এর প্রতি স্নেহভরে বলিলেন,

اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. (۲۹:۳۳)

"সেখানে তো লূত রহিয়াছে। তাহারা বলিল, সেথায় কাহারা আছে, তাহা আমরা ভাল জানি। আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই। তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত; সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (২৯ ঃ ৩২)।

অতঃপর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইল ঃ

يٰاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ (۱۱:۷٦)

"হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও। তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে; উহাদের প্রতি তো আসিবে শাস্তি যাহা অনিবার্য" (১১ঃ৭৬) (দ্র. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৭৮-১৭৯; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৫৩-১৫৪)।

পুত্রের সুসংবাদ ঃ ইবরাহীম (আ) সৎ সন্তানের জন্য যে দু'আ করেন আল্লাহ তা'আলা উহা কবুল করেন। জিবরীল (আ) সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে সারার গর্ভে এক সন্তান দিবন। তাঁহার বংশধরদের মধ্যে অসংখ্য নবী আগমন করিবে (আল-কিসাঈ, কাসাসুল-আম্বিয়া, ১খ, ১৪২)।

প্রথম পুত্র ইসমাইল (আ)-এর জন্ম

আল-কুরআনে ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয় নাই। বাইবেলের বর্ণনামতে ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র নিকট সুসন্তান প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁহাকে উহার সুসংবাদ দেন। কুরআন কারীমেও ইহার উল্লেখ আছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ (٣٧ : ١٠٠-١٠١)

"(ইবরাহীম বলিল,) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর। অতঃপর

আমি তাহাকে এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম" (৩৭ঃ ১০০-১০১)।

বায়তুল মাকদিসের কাছে যখন তাঁহার বিশ বৎসর কাটিয়া গেল তখন স্ত্রী সারা তাঁহাকে বলিলেন, আল্লাহ তো আমাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাই আপনি হাজারের সহিত মেলামেশা করুন। হয়তবা আল্লাহ তাহা হইতে আপনাকে একটি সন্তান দান করিবেন। সারা হাজারকে ইবরাহীম (আ)-এর সহিত বিবাহ দেন। ইবরাহীম (আ) তাহার সহিত মেলামেশা করিলেন, ফলে তিনি গর্ভবতী হইলেন। বাইবেলের বর্ণনামতে গর্ভবতী হইয়া হাজার নিজকে বড় মনে করিল এবং স্বীয় মালিক সারার উপর বড়াই করিতে লাগিল। সারা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং এই সম্পর্কে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট অভিযোগ করিলেন। ইবরাহীম (আ) তাহাকে বলিলেন, তাহার ব্যাপারে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। ইহাতে হাজার ভয় পাইয়া পলায়ন করিলেন এবং সেখানে একটি কূপের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন কোন এক ফেরেশতা তাহাকে বলিলেন, তুমি ভয় পাইও না। তোমার গর্ভস্থ এই শিশু কল্যাণময়। ফিরিশতা তাহাকে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিলেন এবং বলিলেন যে, অতিসত্বর সে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিবে। তাহার নাম রাখিবে ইসমাঈল। তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধে ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধে হইবে; সে তাহার ভ্রাতৃবর্গের সকল দেশের মালিক হইবে। হাজার তখন আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করিলেন (দ্র. Genesis, 16ঃ 2-13; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৫৩)। এই সুসংবাদ তাঁহার পরবর্তী বংশধর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উপর প্রযোজ্য হয়। কারণ তাঁহার দ্বারাই আরববাসী নেতৃত্ব লাভ করে এবং পূর্ব-পশ্চিম তথা সমগ্র ভূখণ্ডের মালিক হয়। আল্লাহ তাহাদিগকে উপকারী ইলম ও সৎকাজের তাওফীক দান করিয়াছেন যাহা তাহাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মতকেই দান করেন নাই। আর ইহা কেবল তাহাদের রাসূলের মর্যাদার কারণে এবং তাঁহার রিসালাতের বরকতে (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, প্রাগুক্ত)। অতঃপর হাজার ফিরিয়া আসিলেন এবং ইসমাঈল (আ) ভূমিষ্ঠ হইলেন। বাইবেলের বর্ণনামতে তাঁহার জন্মের সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ৮৬ বৎসর। দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক (আ)-এর জন্মের ১৩ বৎসর পূর্বে প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া- নিহায়া,১খ, ১৫৩)।

ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের পর আল্লাহ পৃথকভাবে ইবরাহীম (আ)-কে সারার গর্ভে ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ দেন। ইবরাহীম (আ) তখন আল্লাহ্র উদ্দেশে সিজদায় পড়িয়া যান। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে বলিলেন, ইসমাঈলের ব্যাপারে তোমার দু'আ কবুল করিয়াছি। তাহার উপর আমি বরকত নাযিল করিয়াছি। তাহাকে অধিক সন্তান দান করি এবং অধিক সন্তানের দাদা হিসাবে তাহার মৃত্যু দিব। তাহার বংশে ১২ জন মহান ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করিবে। তাহাকে আমি বিরাট এক গোষ্ঠীর সর্দার বানাইব।

ইহাও এই বিরাট উম্মতের জন্য সুসংবাদ। আর সেই ১২ জন মহান ব্যক্তিত্ব হইলেন খুলাফায়ে রাশিদীন, যাহাদের সম্পর্কে জাবির ইব্ন সামুরা (রা) বর্ণিত হাদীছে সুসংবাদ আসিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ (আমার উম্মতে) ১২ জন আমীর হইবে। ইহার পর কি একটা কথা বলেন তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। অতঃপর আমি আমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি বলিলেন? আমার পিতা বলেন, তিনি বলিয়াছেন, সকলেই হইবে কুরায়শ বংশের। বুখারী ও মুসলিম এই হাদীছ রিওয়ায়াত করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৫৩)। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, এই বিষয়টি সর্বদাই কায়েম থাকিবে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ১২ জন খলীফা হইবে সকলেই কুরায়শ বংশীয়। ইহাদের মধ্যেই চার খলীফা আবূ বাক্র, উমার, উছমান ও আলী (রা)। ইহাদের মধ্যে উমার ইবন আবদিল-আযীযও রহিয়াছেন। আব্বাসী বংশের কতক খলীফাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। ইহার দ্বারা পরপর ১২ জন বুঝানো হয় নাই, বরং যে কোন সময়ের ১২ জন হইতে পারে। অনুরূপভাবে শী'আগণ ১২ জন ইমামের যে বিশ্বাস করিয়া থাকে, যাহাদের প্রথম হইলেন হযরত আলী (রা) ইবন আবী তালিব এবং শেষ হইল মুহাম্মদ ইবনু'ল-হাসান আল আসকারী- তাহাও বুঝানো হয় নাই [প্রাগুক্ত; আরও দ্র. নিবন্ধ ইসমাঈল (আ)]।

হাজার ও ইসমাঈল (আ)-এর মক্কায় আবাসন

এই সম্পর্কে এক দীর্ঘ হাদীছের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ اُمِّ اِسْمَاعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعْفِى اَثَرَهَا عَلٰى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاُمِّ اِسْمَاعِيْلَ وَبِابْنِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَهِىَ تُرْضِعُهُ حَتّٰى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِىْ اَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفّٰى اِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتْ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِى الَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِ اِنْسٌ وَلَا شَىْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مِرَارًا وَّجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا قَالَتْ لَهُ اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلَاءِ الدَّعْوَاتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ حَتّٰى بَلَغَ (يَشْكُرُوْنَ) وَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ تُرْضِعُ اِسْمَاعِيْلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا فِى السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ اِلَيْهِ يَتَلَوّٰى اَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَنْظُرَ اِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا اَقْرَبَ جَبَلٍ فِى الْاَرْضِ يَلِيْهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِىْ تَنْظُرُ هَلْ تَرٰى اَحَدًا فَلَمْ تَرَى اَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْوَادِىْ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الْاِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْوَادِىْ ثُمَّ اَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرٰى اَحَدًا فَلَمْ تَرٰى اَحَدًا فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذٰلِكَ سَعْىُ النَّاسِ (سَعَى النَّاسُ)

بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهْ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ اَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ اَسْمَعْتَ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَوَاثٌ فَاِذَا هِىَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ اَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتّٰى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هٰكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرُفُ مِنَ الْمَاءِ فِىْ سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَا تَغْرُفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرُفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتْ وَاَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تَخَافِىْ (تَخَافُوْا) الضَّيْعَةَ فَاِنَّ هٰهُنَا بَيْتًا لِلّٰهِ يَبْنِيْهِ هٰذَا الْغُلَامُ وَاَبُوْهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَاْتِيْهِ السُّيُوْلُ فَتَاْخُذُ عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتّٰى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ اَوْ اَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءَ فَنَزَلُوْا فِىْ اَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَاَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا اِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلٰى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِىْ وَمَا فِيْهِ مَاءٌ فَاَرْسَلُوْا جَرِيًّا اَوْ جَرِيَّيْنِ فَاِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوْا فَاَخْبَرُوْهُمْ بِالْمَاءِ فَاَقْبَلُوْا قَالَ وَاُمُّ اِسْمَاعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوْا اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلٰكِنْ لَاحَقَّ لَكُمْ فِى الْمَاءِ قَالُوْا نَعَمْ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَلْفٰى ذٰلِكَ اُمَّ اِسْمَاعِيْلَ وَهِىَ تُحِبُّ الْاُنْسَ فَنَزَلُوْا فَاَرْسَلُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِهَا اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ وَاَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا اَدْرَكَ زَوَّجُوْهُ امْرَاَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ فَجَاءَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اِسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ اِسْمَاعِيْلَ فَسَاَلَ امْرَاَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا وَفِىْ رِوَايَةٍ يَصِيْدُ لَنَا ثُمَّ سَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِىْ ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ اِلَيْهِ قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِىْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُوْلِىْ لَهُ يُغَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِهٖ فَلَمَّا جَاءَ اِسْمَاعِيْلُ كَاَنَّهُ اٰنَسَ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ اَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَاَلَنَا عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَسَاَلَنِىْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا فِىْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ اَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ اَبِىْ وَقَدْ اَمَرَنِىْ اَنْ اُفَارِقَكِ الْحَقِىْ بِاَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ اُخْرٰى فَلَبِثَ عَنْهُمْ اِبْرَاهِيْمُ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلٰى امْرَاَتِهٖ فَسَاَلَ عَنْهُ قَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ وَسَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَاَثْنَتْ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُوْ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ اِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِىْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيْهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهٖ فَلَمَّا جَاءَ اِسْمَاعِيْلُ قَالَ هَلْ اَتَاكُمْ مِنْ اَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ اَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَاَثْنَتْ عَلَيْهِ

فَسَأَلَنِىْ عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَسَأَلَنِىْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا بِخَيْرٍ قَالَ فَاَوْصَاكِ بِشَيْئٍ قَالَتْ نَعَمْ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكَ اَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكَ اَبِىْ وَاَنْتِ الْعَتَبَةَ اَمَرَنِىْ اَنْ اُمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِسْمَاعِيْلُ يَبْرِىْ نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِّنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَاٰهُ قَامَ اِلَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمَاعِيْلُ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِاَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا اَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِيْنُنِىْ قَالَ وَاُعِيْنُكَ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَبْنِىَ بَيْتًا هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى اَكْمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلٰى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمَاعِيْلُ يَاْتِىْ بِالْحِجَارَةِ وَاِبْرَاهِيْمُ يَبْنِىْ حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِىْ وَاِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتّٰى يَدُوْرَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوْلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীরা ইসমাঈল (আ)-এর মাতার নিকট হইতে সর্বপ্রথম কোমরবন্ধের ব্যবহার রপ্ত করে। তিনি তাঁহার (সতীন) সারা (রা) হইতে স্বীয় চিহ্নাদি লুকাইবার জন্য একটি কোমরবন্ধ ধারণ করেন। অতঃপর ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইসমাঈলের মাতা ও তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে (ইসমাঈল) লইয়া আসিলেন। তাহাদেরকে তিনি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিচে, মসজিদের উচ্চ ভূমিতে যমযমের স্থানে রাখিলেন। সে সময় মক্কায় কোন জনবসতি কিংবা পানির ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাহাদেরকে সেখানে রাখিলেন। আর তাহাদের পাশে এক ঝুড়ি খেজুর ও এক মশক (চামড়ার তৈরী পানির পাত্র) পানি রাখিলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আ) তথা হইতে রওয়ানা হইলেন। ইসমাঈলের মাতা তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে এই জনপ্রাণীহীন উপত্যকায় রাখিয়া কোথায় যাইতেছেন? এখানে তো বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত পরিবেশ কিছুই নাই। তিনি তাঁহাকে এই কথা বারবার বলিতে থাকিলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ) তাহার কথায় ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ কি আপনাকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন? ইবরাহীম (আ) বলিলেন : হাঁ। তখন ইসমাঈলের মাতা বলিলেন, তবে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করিবেন না। অতঃপর তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিদায় হইলেন। তিনি তাহাদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে 'সানিয়াহ্' নামক স্থানে পৌঁছিয়া কা'বা ঘরের দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং দুই হাত তুলিয়া দু'আ করিলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি পানি ও তরুলতাশূন্য উষর এক প্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশ তোমার মহাসম্মানিত ঘরের কাছে আনিয়া বসবাসের জন্য রাখিয়া গেলাম। .... অতএব তুমি লোকদের অন্তরকে তাহাদের প্রতি অনুরক্ত করিয়া দাও, ফলমূল হইতে তাহাদেরকে খাবার দান কর, যেন তাহারা কৃতজ্ঞ ও শোকরকারী বান্দাহ হইতে পারে" (১৪ : ৩৭)।

ইসমাঈলের মাতা ইসমাঈলকে বুকের দুধ পান করাইয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে মশকের পানি পান করিতে থাকিলেন। পরিশেষে পাত্রের পানি শেষ হইয়া গেল, তিনি নিজে এবং তাঁহার সন্তান পিপাসাকাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশু পিপাসায় ছটফট করিতেছে। তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে সাফা পাহাড়কে তিনি তাঁহার সর্বাধিক নিকটে দেখিতে পাইলেন। তিনি সাফা পাহাড়ে উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। উপত্যকার দিকে এই আশায় তাকাইলেন যে, কাহারো দেখা পাওয়া যায় কি না, কিন্তু কাহারো দেখা পাইলেন না। অতএব তিনি সাফা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন এবং উপত্যকা পার হইয়া মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে পৌছিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া তিনি এদিক-সেদিক তাকাইয়া দেখিলেন কাহাকেও দেখা যায় কি না, কিন্তু কোন লোকজন দেখিতে পাইলেন না। এমনিভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়াইলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ এই কারণেই লোকেরা (হজ্জের সময়) উভয় পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াইয়া (সাঈ করিয়া) থাকে। ইসমাঈলের মা (শেষবারের মত) দৌড়াইয়া মারওয়া পাহড়ে উঠিলে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার! আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যেন। অতঃপর তিনি শব্দের প্রতি কান খাড়া করিলেন। তিনি আবার শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং মনে মনে বলিলেন, তুমি আমাকে আওয়াজ শুনাইলে, হয়তো তোমার কাছে আমার বিপদের কোন প্রতিকার আছে। হঠাৎ তিনি (বর্তমান) যমযমের কাছে একজন ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার পায়ের গোড়ালি দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিলেন এবং এইভাবে পানি ফুটিয়া বাহির হইল। তিনি ইহার চারিপাশে বাঁধ দিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া মশকে পানি ভরিতে লাগিলেন। তিনি মশকে পানি ভরিতে ছিলেন, এদিকে পানি উথলিয়া পড়িতে থাকিল। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি মশক ভরিয়া পানি রাখিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হউক। যদি তিনি যমযমকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিতেন, অথবা বলিয়াছেন ঃ তাহা হইতে যদি মশক ভরিয়া তিনি পানি না রাখিতেন, তবে যমযম একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হইত। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ তিনি পানি পান করিলেন এবং তাঁহার সন্তানকে দুধ পান করাইলেন। ফেরেশতা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি ধ্বংস হইয়া যাওয়ার ভয় করিবেন না। কেননা এখানে আল্লাহ্‌র ঘরের স্থান নির্দিষ্ট আছে, যাহা এই ছেলে ও তাঁহার পিতা নির্মাণ করিবেন। আল্লাহ এখানকার বাসিন্দাদেরকে ধ্বংস করেন না। ঘটনাক্রমে বনী জুরহুমের কাফেলা অথবা বনী জুরহুম গোত্রের লোক এই পথ ধরিয়া 'কাদাআ' নামক স্থান দিয়া আসিতেছিল। তাহারা মক্কার নিম্নভূমিতে পৌছিলে সেখানে কিছু পাখি বৃত্তাকারে উড়িতে দেখিয়া বলিল, এসব পাখি নিশ্চয়ই পানির উপর চক্কর খাইতেছে। আমরা তো এই মরুভূমিতে আসিয়াছি অনেক দিন হইল, কিন্তু কোথাও পানি দেখি নাই। তাহারা একজন অথবা দুইজন অনুসন্ধানকারীকে খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠাইল। তাহারা গিয়া পানি দেখিতে পাইল এবং ফিরিয়া গিয়া তাহাদেরকে জানাইল। কাফেলার লোকেরা অনতিবিলম্বে পানির দিকে চলিয়া আসিল।

ইসমাঈলের মাতা তখন পানির কাছে বসা ছিলেন। তাহারা আসিয়া তাঁহাকে বলিল, আপনি কি আমাদেরকে এখানে আসিয়া অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু পানির উপর তোমাদের কোন মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাহারা বলিল, হাঁ, তাহাই হইবে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের সহিত পরিচিত হইয়া একটা অন্তরংগ ও সহানুভূতিসম্পন্ন পরিবেশ গড়িয়া তোলা। ঐ সকল লোক আসিয়া এখানে বসতি স্থাপন করিল এবং কাফেলার অন্যান্য লোকও তাহাদের পরিবার-পরিজনদেরকে ডাকিয়া আনিল। অবশেষে সেখানে বেশ কয়েক ঘর বসতি গড়িয়া উঠিল। ইসমাঈল যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে আরবী ভাষা শিখিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য-চেহারা ও সুরুচিপূর্ণ জীবন তাহারা খুবই পছন্দ করিল। তিনি বড় হইলে ঐ লোকেরা তাহাদের এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিল।

ইতিমধ্যে ইসমাঈলের মা ইন্তিকাল করিলেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইবরাহীম (আ) মক্কায় আসিলেন নিজের রাখিয়া যাওয়া পরিজনের খোঁজে। তিনি ইসমাঈলকে বাড়িতে পাইলেন না। তিনি পুত্রবধূর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসমাঈল কোথায় গিয়াছে? সে বলিল, খাদ্যের সংস্থান করার জন্য তিনি বাহিরে গিয়াছেন। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তিনি শিকারে বাহির হইয়াছেন। ইবরাহীম (আ) তাহাদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক বিষয়াদির খোঁজ নিলেন। পুত্রবধূ বলিল, আমরা খুব খারাপ অবস্থায় আছি। কঠোরতা ও সংকীর্ণতা আমাদেরকে গ্রাস করিয়াছে। এসব কথা বলিয়া সে অভিযোগ করিল। তিনি বলিলেন, তোমার স্বামী আসিলে তাহাকে আমার সালাম জানাইয়া বলিবে, সে যেন তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।

বাড়ী ফিরিয়া ইসমাঈল (আ) যেন কিছু অনুভব করিতে পারিলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ আসিয়াছিলেন কি? স্ত্রী বলিল, হাঁ, এরূপ একজন বৃদ্ধ লোক আসিয়াছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাঁহাকে অবহিত করিলাম। আমাদের সংসারযাত্রা কিভাবে চলিতেছে তিনি তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমরা খুব কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছি। ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি তোমাকে কোন কথা বলিয়া গিয়াছেন? স্ত্রী বলিল, হাঁ! তিনি আমাকে আপনাকে সালাম পৌঁছাইতে বলিয়াছেন এবং আপনাকে আপনার ঘরের চৌকাঠ পরিবর্তন করিতে বলিয়াছেন। ইসমাঈল (আ) বলিলেন, তিনি আমার পিতা। তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে চলিয়া যাও। পরে তিনি তাহাকে তালাক দিলেন এবং ঐ গোত্রেরই অন্য এক মেয়েকে বিবাহ করিলেন।

আল্লাহ্র ইচ্ছামত ইবরাহীম (আ) বেশ কিছু দিন আর এদিকে আসেন নাই। পরে তিনি যখন আবার আসিলেন তখনও ইসমাঈলের সাথে তাঁহার দেখা হইল না। পুত্রবধূর কাছে গিয়া ইসমাঈলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তিনি আমাদের খাদ্যের সন্ধানে গিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাহাদের সাংসারিক জীবন ও অন্যান্য বিষয়েও

জানিতে চাহিলেন। ইসমাঈলের স্ত্রী বলিল, আমরা খুব ভাল এবং স্বচ্ছল অবস্থায় দিন যাপন করিতেছি। এই কথা বলিয়া সে মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করিল। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি খাও? পুত্রবধূ বলিল, গোশ্ত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পান কর? সে বলিল, পানি। তখন ইবরাহীম (আ) দু'আ করিলেন ঃ হে আল্লাহ! ইহাদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ সেই সময় তাহাদের কাছে কোন খাদ্যশস্য ছিল না, যদি থাকিত তাহা হইলে ইবরাহীম (আ) তাহাদের খাদ্যশস্যেও বরকতের দু'আ করিতেন। এইজন্যই মক্কা ছাড়া অন্য কোথায়ও শুধু গোশ্ত ও পানির উপর নির্ভর করিলে তাহা স্বাস্থ্যের জন্য অনুকূল হয় না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, তোমার স্বামী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার সালাম জানাইয়া বলিবে, সে যেন তাহার ঘরের চৌকাঠ হিফাজত করিয়া রাখে।

ইসমাঈল (আ) ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছে কেহ কি আসিয়াছিল? স্ত্রী বলিল, হাঁ! আমার কাছে একজন সুন্দর সুঠাম বৃদ্ধ লোক আসিয়াছিলেন। স্ত্রী বৃদ্ধের কিছু প্রশংসাও করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে আমাদের জীবিকা ও ভরণপোষণ চলিতেছে? আমি বলিলাম, আমরা বেশ ভাল আছি। ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়াছেন? স্ত্রী বলিল, হাঁ! তিনি আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং ঘরের চৌকাঠ হিফাজত করার হুকুম দিয়া গিয়াছেন। সব কথা শুনিয়া ইসমাঈল (আ) বলিলেন, তিনি আমার পিতা এবং তুমি ঘরের চৌকাঠ। তিনি আমাকে তোমার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র ইচ্ছায় বেশ কিছু দিন পর্যন্ত আর এখানে আসেন নাই। একদিন ইসমাঈল (আ) যমযম কূপের পাশে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিচে বসিয়া তাঁহার তীর ঠিক করিতেছিলেন। এমন সময় ইবরাহীম (আ) আসিলেন। ইসমাঈল (আ) পিতাকে দেখিয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলেন। অতঃপর যেভাবে পিতা পুত্রের সঙ্গে এবং পুত্র পিতার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করিয়া থাকে, তাঁহারাও তাহাই করিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়াছেন। ইসমাঈল (আ) বলিলেন, আপনার প্রভু আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়াছেন তাহা আঞ্জাম দিন। তিনি বলিলেন, তুমি এই কাজে আমাকে সাহায্য কর। পুত্র বলিলেন, আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করিব। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একখানা ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি একটি উঁচু টিলার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহার চারিদিকে ঘর নির্মাণ করিতে হইবে। অতঃপর তাঁহারা এই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ইসমাঈল (আ) পাথর বহিয়া আনিতেন, আর ইবরাহীম (আ) তাহা দ্বারা ভিত গাঁথিতেন। চতুর্দিকের দেয়াল অনেকটা উঁচু হইয়া গেলে ইবরাহীম (আ) এই পাথরটি আনিয়া (মাকামে ইবরাহীম) উহার উপর দাঁড়াইয়া ভিত গাঁথিতে থাকিলেন এবং ইসমাঈল (আ) পাথর আনিয়া যোগান দিতে থাকিলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে ঘর নির্মাণকালে প্রার্থনা করিতে থাকিলেন ঃ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম কবুল করুন। আপনি সব কিছু শুনেন এবং জানেন"

(২ঃ ১২৭)। রাবী বলেন, তাঁহারা নির্মাণ কাজ করিতে থাকিলেন। তাঁহারা উভয়ে কা'বা ঘরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেনঃ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ১খ, পৃ. ৪৭৪-৬)। বুখারীর অপর বর্ণনায়ও প্রায় অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

হাজার ও ইসমাঈল (আ)কে জনমানবহীন মরু ভূমিতে রাখিয়া যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বাইবেলে এমন তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে যাহাতে উভয় পূণ্যবতী মহিলার চরিত্রে কালিমা লেপন করা হয়। এদিকে হাজার (আ)-এর কথা বলা হইয়াছে যে, "সে নিজের গর্ভ হইয়াছে দেখিয়া স্বীয় মালিক সারাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল" (Genesis, 16 ঃ 4)। ইহাতে সারার প্রতি তাঁহার হিংসা সুস্পষ্ট। অপরদিকে ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের পর সারার উক্তিতে হিংসা প্রকাশ পায় ঃ "তুমি ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর করিয়া দাও; কেননা আমার পুত্র ইসহাকের সহিত ঐ দাসীপুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না" (Genesis, 21ঃ 10)। শুধু তাহাই নহে, প্রকারান্তরে ইবরাহীম (আ)-এর উপরও এই দোষ গিয়া আপতিত হয় যে, তিনি সারার এহেন অযৌক্তিক আবদার রক্ষা করিয়া অন্যায়ের সমর্থন করেন। অনেক মুসলিম ইতিহাস ও সীরাতবিদও ইহার অনুসরণে অনেক ঘটনা লিখিয়াছেন যাহা মূলত অলীক ইসরাঈলী রিওয়ায়াত বৈ কিছুই নহে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁহার খলীলকে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষায় নিপতিত করিয়াছিলেন। আর তিনি সে পরীক্ষাসমূহে সফলতার সহিত উত্তীর্ণও হইয়াছিলেন (দ্র. ২ ঃ ১২৪)। হাজার ও ইসমাঈল (আ)-কে মক্কায় আবাসনের নির্দেশ মূলত আল্লাহই দিয়াছিলেন। সম্ভবত ইহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) ইবরাহীম (আ)-কে ঈমানী পরীক্ষা করা; আল্লাহ্র নিকট অনেক আবেদন-নিবেদনের পর বার্ধক্যে আসিয়া এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। কিন্তু প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ও আদরের সেই সন্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে রাখিয়া আসিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন। এই নির্দেশ পালন করা যে কত কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাইতো তাহাদিগকে রাখিয়া আসিবার সময় একটি বারও তিনি পিছনে ফিরিয়া তাকান নাই, এমনকি হাজার-এর প্রশ্নের সময়ও না। অবশেষে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পাহাড়ের আড়ালের কারণে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না, তখন তিনি কা'বাগৃহের দিকে ফিরিয়া দু'আ করিলেন। এইভাবে সফলতার সহিত এই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন। (২) হাজার ও ইসমাঈলকে মক্কায় আবাসন করার মাধ্যমে বায়তুল্লাহকে পুন প্রতিষ্ঠিত করা এবং ইহাকে সমস্ত বিশ্ব মুসলিমের কিবলারূপে নির্ধারণ করা। এইজন্য প্রয়োজন ছিল উহার পুনর্নির্মাণ যাহা ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর দ্বারা তিনি করাইয়াছিলেন। আর পরবর্তীতে ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন ছিল এখানে একটি জাতির গোড়াপত্তন ও বসতি স্থাপন। উক্ত নির্দেশের মাধ্যমে ইহাই বাস্তবায়িত হইয়াছে। সুতরাং একমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থেই তিনি তাহাদিগকে এই মরু প্রান্তরে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

স্বীয় পুত্রকে যবেহ্ করার নির্দেশ

পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, ইবরাহীম (আ) যখন তাঁহার কওমের নিকট হইতে হিজরত করেন তখন আল্লাহ্র নিকট তিনি একজন নেককার সন্তান প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহাকে

একজন স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দেন। আর সেই 'স্থিরবুদ্ধি' পুত্র হইলেন ইসমাঈল (আ), যিনি ইবরাহীম (আ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সকালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই তাঁহার প্রথম সন্তান। আর ইসহাক (আ)-এর জন্মের সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছির ৯৯ বৎসর (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৪খ, ১৪)। ইহাতে কাহারও কোন দ্বিমত নাই। অতঃপর ইসমাঈল (আ) যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে পিতার ন্যায় নিজের কাজসমূহ নিজেই আঞ্জাম দিতে সক্ষম হইলেন, তখন ইবরাহীম (আ)-কে স্বপ্নে দেখানো হইল ইসমাঈলকে যবাহ করিতে। হাদীছে বর্ণিত আছে, নবীগণের স্বপ্নও ওহীর অন্তর্ভুক্ত (ইবন কাছীর, আল-বিদায়া, ১খ, ১৫৭)।

কাহারও মতে ইসমাঈল (আ)-এর বয়স হইয়াছিল তখন ১৩ বৎসর, আর কাহারও মতে ৭ বৎসর (ছানাউল্লাহ পানীপতি, আত-তাফসীরুল মাযহারী, ৮খ, ১২৮; ইমাদ যুহায়র হাফিজ, আল কাসাসুল-কুরআনী, পৃ. ১০৫)। ইহা ছিল ইবরাহীম (আ)-এর জন্য কঠিন এক পরীক্ষা। বার্ধক্যে প্রাপ্ত অতি কামনার ধন স্নেহ ও আদরের দুলালকে একবার তো জনমানবহীন মরু প্রান্তরে নির্বাসন দিতে হইয়াছে। তাহাতেও সান্তনা ছিল যে, মাঝেমধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু এইবার যে একেবারে যবাহ্ করার নির্দেশ, তাহাও আবার স্বহস্তে। আর কোন দিন সেই মুখ আর দেখা যাইবে না। কিন্তু এই পরীক্ষায়ও তিনি সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালনের জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়া গেলেন এবং স্বীয় পুত্রের নিকট বিষয়টি উপস্থাপন করিলেন যাহাতে প্রফুল্ল চিত্তে সে রাজী হইয়া যায় এবং জোর-যবরদস্তি করিয়া যবাহ্ করিতে না হয়। ইহার বিবরণ কুরআন কারীমে এইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে ঃ

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى

.(٣٧:١٠١-١٠٢)

"অতঃপর আমি তাহাকে (ইবরাহীমকে) এক স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সঙ্গে কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল তখন ইবরাহীম বলিল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবাহ্ করিতেছি, এখন তোমার অভিমত কি বল" (৩৭ ঃ ১০১-১০২)।

পুত্র ইসমাঈল এই কথার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্বিধায় ও সোৎসাহে উত্তর দিলেন ঃ

قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ. (٣٧:١٠٢)

"সে বলিল, হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন" (৩৭ ঃ ১০২)।

কোন কোন ইতিহাসবিদের বর্ণনামতে ইবরাহীম (আ) প্রথমেই যবাহের কথাটি প্রকাশ করেন নাই, বরং যবাহের স্থানে (মিনা) পৌঁছিয়া তাঁহাকে এই কথা জানান এবং ইসমাঈল (আ) তখন উক্ত উত্তর দেন। প্রথমে তাঁহাকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করার কথা বলা হইয়াছিল (তাবারী, তারীখ, ১খ., ১৪০-১৪১)।

কোন কোন রিওয়ায়াত হইতে জানা যায় যে, ইবরাহীম (আ) যাহাতে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারেন সেইজন্য শয়তান আপ্রাণ চেষ্টা করে। আবূ হুরায়রা (রা) কা'ব আল-আহবার (রা) হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, এই সময় অর্থাৎ তাঁহারা রওয়ানা হইলে শয়তান একজন মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া ইসমাঈলের মাতার নিকট গিয়া বলে, তুমি কি জান, ইবরাহীম তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? তিনি বলিলেন, তাহাকে ঐ ঘাটিতে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য লইয়া যাইতেছে। সে বলিল, না, আল্লাহ্র কসম! তাহাকে যবাহ করিতে লইয়া যাইতেছে। তিনি বলিলেন, কখনও না। সে তাহার প্রতি আমার চাইতে বেশি দয়াশীল এবং বেশি মহব্বত করে। শয়তান বলিল, সে নাকি মনে করে যে, আল্লাহ তাহাকে উহা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আল্লাহ যদি তাঁহাকে সে আদেশ দিয়াই থাকেন তবে তাঁহার প্রতিপালকের আনুগত্য করাতে এবং তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ভালই করিয়াছেন। শয়তান এখানে বিফল হইয়া দ্রুত তাঁহার পুত্রের নিকট চলিয়া গেল। অতঃপর তাঁহাকে পিতার পেছনে চলিতে দেখিল। সে নিকটে গিয়া বলিল, হে বালক! তুমি কি জান, তোমার পিতা তোমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? ইসমাঈল (আ) বলিলেন, ঐ ঘাটি হইতে আমরা আমাদের পরিবারের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিব। সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! সে তোমাকে যবাহ করিতে লইয়া যাইতেছে। তিনি বলিলেন, কেন? শয়তান বলিল, সে মনে করে যে, আল্লাহ তাহাকে ঐরূপ নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তবে তিনি যে বিষয়ে নির্দেশিত হইয়াছেন তাহা পালন করুন। আমি আল্লাহ্র নির্দেশ শুনিব ও মান্য করিব। এখানেই বিফল হইয়া শয়তান ইবরাহীম (আ)-এর নিকট গিয়া বলিল, শায়খ! কোথায় যাইতেছ ? ইবরাহীম (আ) বলিলেন, ঐ ঘাটিতে আমার প্রয়োজনে যাইতেছি। সে বলিল, আল্লাহ্র কসম! আমি শয়তানকে দেখিয়াছি সে তোমার নিকট আসিয়া তোমার পুত্রকে যবাহ করিতে নির্দেশ দিয়াছে। ইবরাহীম (আ) তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তিরস্কার করিয়া বলিলেন, আমার নিকট হইতে দূর হ, হে অভিশপ্ত! আল্লাহ্র কসম! আমি আমার প্রতিপালকের হুকুম তামীল করিবই। অতঃপর শয়তান ব্যর্থ হইয়া রাগান্বিত অবস্থায় ফিরিয়া আসিল, তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না। আল্লাহ্র মদদ ও সাহায্যে তাঁহারা শয়তান হইতে নিরাপদ রহিলেন (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৪০-১৪১; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ১০১)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ)-কে যখন এই আদেশ দেওয়া হইল তখন আল মাশ'আরুল-হারামে ইবলীস তাঁহার নিকট পৌঁছে। তিনি দ্রুত তাহাকে পিছনে ফেলিয়া সম্মুখে চলিয়া যান। তিনি আল-জামরাতুল আকাবার নিকট গেলে ইবলীস তাঁহার নিকট হাজির হয়। তিনি ইবলীসকে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করিলে সে চলিয়া যায়। জামরাতুল উসতার নিকট আবার সে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হাজির হয়। ইবরাহীম (আ) এখানেও তাহাকে ৭টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন, ফলে সে চলিয়া যায়। অতঃপর আবার সে আল-জামরাতুল-কুবরায় তাঁহার নিকট আগমন করে। এবারও তিনি তাহার প্রতি সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। ফলে সে চলিয়া যায় এবং ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করেন (আছ-ছা'লাবী, প্রাগুক্ত)।

অতঃপর পর্বত ঘাটিতে যবাহ্-এর জন্য পিতাপুত্র উভয়েই সন্তুষ্ট চিত্তে প্রস্তুত হইলেন এবং ইসমাঈলকে কাত করিয়া, আর কাহারো মতে উপুড় করিয়া শোয়াইলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তাঁহাকে কাত করিয়া শোয়াইয়া কাঁধের দিক হইতে যবাহ্ করিতে উদ্যত হন এইজন্য যাহাতে যবাহ্-এর সময় তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি না পড়ে। কাহারও মতে অন্যান্য প্রাণী যবাহ্-এর ন্যায় চীৎ করিয়াই শোয়াইয়াছিলেন কিন্তু মাথাটি ঘুরাইয়া কাত করিয়া দিয়াছিলেন। ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনামতে ইসমাঈল (আ) পিতাকে বলিয়াছিলেন, হে পিতা! আমাকে যবাহ্ করার সময় শক্ত করিয়া বাঁধিবেন যাহাতে আমার হইতে আপনার শরীরে কিছু না লাগে। তাহা হইলে আমার ছওয়াব ও পুরস্কার কম হইয়া যাইবে। কারণ মৃত্যু খুবই কঠিন। আমি ছট্‌ফট্ করিতে পারি। আর আপনার ছুরি ভালমত ধারালো করুন যাহাতে উহা ভালোমত চালাইয়া আমার কষ্ট লাঘব করিতে পারেন। আর আমাকে কাত করিয়া শায়িত করাইবেন এবং আমার মুখমণ্ডল নীচের দিকে রাখিবেন, পার্শ্বদেশে শয়ন করাইবেন না। কারণ আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার মুখমণ্ডলে আপনার দৃষ্টি পড়িলে আপনার অন্তর বিগলিত হইয়া যাইবে, ফলে উহা আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। আর আপনি যদি ভাল মনে করেন যে, আমার জামাটি আমার মাতার নিকট ফেরৎ দিলে ইহা তাঁহার জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ হইবে তাহা হইলে দিবেন। তখন ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে তুমি কতইনা ভাল সাহায্যকারী! অতঃপর ইসমাঈল (আ) যেভাবে বলিয়াছিলেন সেইভাবেই তিনি তাঁহাকে শক্ত করিয়া বাঁধিলেন, ছুরি ধারালো করিলেন। অতঃপর কাত করিয়া শয়ন করাইলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া রাখিলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র নাম লইলেন এবং তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে ছুরি চালনা করিলেন। ইসমাঈলও তাশাহ্‌হুদ (اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ) পড়িয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাঁহার হাতের মধ্যেই ছুরি উল্টাইয়া দিয়াছিলেন। ইবরাহীম (আ) যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌র নির্দেশে ছুরি একটুও কাটিল না। এক বর্ণনামতে ছুরি ও গলার মধ্যখানে আল্লাহ ধুম্রজালের একটি আবরণ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ঘোষণা আসিল, যাহা কুরআন কারীমে এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ . اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ .

(٣٧:١٠٤-١٠٦)

"তখন আমি তাহাকে আহবান করিয়া বলিলাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করিলে! এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা" (৩৭ ঃ ১০৪-১০৬)।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বিরাট এক দুম্বা প্রেরণ করিয়া তাহাই যবাহ্ করার নির্দেশ দিলেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ (٣٧:١٠٧) وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ "আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম বিরাট এক কুরবানীর বিনিময়ে" (৩৭ ঃ ১০৭)।

জমহূর আলিমদের মতে উহা ছিল সাদা রংয়ের, ডাগর কালো চোখ ও জোড়া ভ্রূবিশিষ্ট একটি দুম্বা, যাহা ইবরাহীম (আ) একটি পেরেক দ্বারা ছাবীর পর্বতের পাদদেশে বাঁধা অবস্থায় পাইয়াছিলেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান- নিহায়া, ১খ, ১৫৮)। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, তাঁহার নিকট অবতরণ করানো হয় একটি ডাগর কালো চোখ, জোড়া ভ্রূবিশিষ্ট দুম্বা যাহা ডাকিতেছিল। ইহা ছিল সেই দুম্বা, যাহা আদম (আ)-এর পুত্র হাবীল কুরবানী হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন এবং তাহা কবুল হইয়াছিল। ছাওরী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, দুম্বাটি জান্নাতে চল্লিশ (মতান্তরে ৭০) বৎসর যাবত চরিয়া বেড়াইয়াছিল। অতঃপর ছাবীর পর্বতে উহা অবতরণ করানো হয় (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০০)।

মুজাহিদের বর্ণনামতে তিনি উহা মিনায় যবাহ করেন। উবায়দ ইব্ন উমায়রের বর্ণনামতে মাকামে ইবরাহীমে । উক্ত দুম্বার শিং মাকামে ইবরাহীমে লটকানো ছিল বলিয়া জানা যায়। ইমাম আহমাদ (র) সাফিয়্যা বিনত শায়বা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা বিজয়ের পর কা'বা শরীফের তত্ত্বাবধায়ক ও চাবিরক্ষক উছমান ইবন তালহা (রা)-কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি যখন বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করিয়াছিলাম তখন উহাতে দুইটি শিং দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে উহা ঢাকিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাই এখন উহা ঢাকিয়া দাও। কারণ বায়তুল্লাহতে এমন কিছু থাকা সমীচীন নহে যাহা মুসল্লীর সালাতে বিঘ্ন ঘটায়। সুফইয়ান (র) বলেন, দুম্বার দুইটি শিং সর্বদাই বায়তুল্লাহ-এ লটকানো ছিল। অতঃপর বায়তুল্লাহ -এ আগুন লাগিলে উহাও পুড়িয়া যায়। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইসমাঈল (আ) যবীহ ছিলেন. ইসহাক (আ) নহে। কারণ তিনি বাল্যকালে কখনও মক্কায় আসেন নাই (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ, ১৫৮)। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, উক্ত দুম্বার খুলি সর্বদাই মীযাব- এর নিকট লটকানো ছিল (প্রাগুক্ত)।

ইবরাহীম (আ)-এর পুনঃ আগমন ও বায়তুল্লাহ নির্মাণ

পূর্বে বর্ণিত আগমনের বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হইবার পর ইবরাহীম (আ) পুনরায় (মক্কায়) আগমন করিলেন। ইসমাঈল তখন যমযমের নিকটেই একটি গাছের নীচে তীর ঠিক করিতেছিলেন। পিতাকে দেখিয়াই তিনি তাঁহার নিকট গেলেন এবং দীর্ঘদিন পর সাক্ষাত হইলে পিতা পুত্রের সহিতও পুত্র পিতার সহিত যেমন করে তেমনই করিলেন (অর্থাৎ উভয়ে উভয়কে জড়াইয়া ধরিলেন এবং কোলাকুলি করিলেন)। অতঃপর তিনি বলিলেন, ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে যেই নির্দেশ দিয়াছেন তাহা পালন করুন। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, তুমি কি আমাকে সাহায্য করিবে? তিনি বলিলেন, আমি আপনাকে সাহায্য করিব'। এক বর্ণনামতে ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়াছেন আমাকে উক্ত কাজে সাহায্য করিতে। ইসমাঈল উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহা করিব (তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৩৩)। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে ঐখানে একটি গৃহ নির্মাণের নির্দেশ দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি ইশারায় পার্শ্ববর্তী একটি উঁচু টিলা দেখাইয়া দিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এই সময়ে তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করিলেন ইসমাঈল (আ) পাথর আনিয়া দিতেছিলেন, আর ইবরাহীম (আ) উহা দ্বারা ভিত তৈরি করিতেছিলেন। এইভাবে ভিত উঁচু হইয়া গেলে ইসমাঈল এই পাথরটি (মাকামে ইবরাহীম) লইয়া আসিলেন। অতঃপর উহা তাঁহার জন্য রাখিলেন। ইবরাহীম (আ) উহার উপর দাঁড়াইয়া বায়তুল্লাহ নির্মাণ করিতেছিলেন। আর ইসমাঈল পাথর আনিয়া দিতেছিলেন। এই সময় তাঁহারা বলিতেছিলেন ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٢:٢٧)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা" (২ঃ ১২৭)।

ইব্ন 'আব্বাস (বা) বলেন, তাঁহারা উহা নির্মাণ করিতে করিতে বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে চক্কর দেন আর বলেনঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (٢:٢٧)

(আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল-আম্বিয়া, ৪খ, ৬০২)।

এক বর্ণনামতে তিনি ভিত্তি নির্মাণ করিয়া যখন রুকনে য়ামানীর কাছে পৌঁছিলেন তখন ইবরাহীম (আ) ইসমাঈলকে একটি সুন্দর পাথর আনিতে নির্দেশ দেন এবং বলেন, আমি রুকনের উপর উহা স্থাপন করিব যাহা বিশ্ববাসীর জন্য একটি প্রতীক হইয়া থাকিবে। ইসমাঈল (আ) একটি পাথর আনিলে ইবরাহীম (আ) ইহা পছন্দ করিলেন না। বলিলেন, অন্য একটি লইয়া আইস। ইসমাঈল (আ) পাথরের সন্ধানে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সেখানে পাথর স্থাপন করা হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা! কে এই পাথর আনিয়া দিল? তিনি বলিলেন, যিনি তোমার উপর নির্ভর করেন নাই। জিবরাঈল উহা আকাশ হইতে লইয়া আসিয়াছেন (তাবারী, তারীখ, ১খ., ১২৯)। এক বর্ণনামতে নূহ (আ)-এর প্লাবনের সময় আল্লাহ কা'বাকে আকাশে উঠাইয়া লন এবং হাজারে আসওয়াদকে আবূ কুবায়স পর্বতে উঠাইয়া রাখেন। অতঃপর ইবরাহীম (আ)-এর নির্মাণের সময় যখন তিনি ইসমাঈল (আ)-কে সুন্দর পাথর আনিতে নির্দেশ দেন যাহা বিশ্ববাসীর জন্য প্রতীক হইবে তখন আবূ কুবায়স পর্বত হইতে ডাক আসে যে, আমার নিকট তোমার একটি আমানত আছে। এই সেই আমানত, গ্রহণ কর। এই বলিয়া আবূ কুবায়স পর্বত হাজারে আসওয়াদকে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট সোপর্দ করে। অতঃপর ইবরাহীম (আ) উহা যথাস্থানে স্থাপন করেন (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৯২-৯৩)।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "হাজারে আসওয়াদ জান্নাতের পাথর। ইহা বরফের চাইতেও অধিক সাদা ছিল। কিন্তু পাপীদের পাপ উহাকে কালো বানাইয়া ফেলিয়াছে" (আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, ৫খ., ১৯, হাদীছ নং ৩০৪৭)।

ইবরাহীম (আ) বায়তুল্লাহ কোথায় নির্মাণ করিবেন আল্লাহ তাহা জানাইয়া দেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ (٢٦:٢٢)

"এবং স্মরণ কর, আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলাম সেই গৃহের স্থান" (২২ঃ ২৬)।

তবে কিভাবে তিনি তাহা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা পাওয়া যায় যাহার অধিকাংশই অলীক ইসরাঈলী রিওয়ায়াত। এক বর্ণনামতে আল্লাহ তা'আলা জিবরীল (আ) -কে প্রেরণ করেন। তিনি আসিয়া ইবরাহীম (আ)-কে উহার স্থান দেখাইয়াদেন (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ১২৯)। ইমাম বাগাবীর বর্ণনামতে আল্লাহ প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত করেন। ফলে কা'বার ভিত্তিমূলের আশপাশের অংশ নিচু হইয়া যায় এবং কা'বার ভিতটুকু উঁচু থাকে। ইবরাহীম (আ) সেই উঁচু স্থানে কা'বা নির্মাণ করেন (ছানাউল্লাহ পানিপতি, আত-তাফসীরুল-মাযহারী, ৬খ., ২৭৪)। ইব্ন জারীর, ইব্ন আবী হাতিম, বায়হাকী প্রমুখ সুদ্দী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একটি বায়ু প্রেরণ করেন যাহার নাম খাজূজ। উহার দুইটি ডানা ও একটি মস্তক ছিল। তাহা সর্পের আকৃতিবিশিষ্ট। উক্ত বায়ু প্রথম বায়তুল্লাহর ভিত্তিস্থলের চতুষ্পার্শ্বের সব কিছু নীচু করিয়া দেয়। অতঃপর তাহারা দুইজন সেই উচু স্থানে কা'বা নির্মাণ করেন (প্রাগুক্ত; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১৬৫)।

বায়তুল্লাহ্র ভিত্তি পূর্ব হইতেই ছিল, না ইবরাহীম (আ) প্রথম উহার ভিত্তি স্থাপন করেন- এই ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়। একটি মত হইল, পূর্ব হইতেই উহা ছিল। সর্বপ্রথম আদম (আ) উহা নির্মাণ করেন। তিনি সেখানে একটি গম্বুজের মত প্রতিষ্ঠিত করেন। ফেরেশতাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনার পূর্বে আমরা এই গৃহ তাওয়াফ করিয়াছি। নূহ (আ)-এর নৌকাও চল্লিশ দিন যাবত ইহার তাওয়াফ করিয়াছে। তবে এ সবই ইসরাঈলী বর্ণনা যাহার সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মত হইল, ইহার সত্যায়নও করা যাইবে না, মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্তও করা যাইবে না, (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১৬৩)। অপর এক বর্ণনা পাওয়ায় যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ফেরেশতাগণ জান্নাত হইতে একটি তাঁবু লইয়া সেখানে স্থাপন করেন হযরত আদম (আ)-এর ইবাদতের জন্য। অতঃপর তাঁহার পুত্র শীছ (আ) মাটি ও প্রস্তর দ্বারা সেখানে কা'বা নির্মাণ করেন (ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ১২, শীছ শিরো.)। অতঃপর নূহ (আ)-এর প্লাবনের সময় ইহা আকাশে উঠাইয়া লওয়া হয় এবং ইবরাহীম (আ)-কে পুনরায় উহা নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই ইবরাহীম (আ) উহার পুনঃনির্মাণ করেন।

বিশুদ্ধতম মতটি হইল ইবরাহীম (আ)-ই কা'বা শরীফ প্রথম নির্মাণ করেন। তাঁহার পূর্বে এখানে কা'বাগৃহ ছিল না। কারণ কোন সহীহ হাদীছে পাওয়া যায় না যে, পূর্বে এখানে কা'বা ছিল। যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা ইসরাঈলী রিওয়ায়াত যাহার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা

হইয়াছে। হাফিজ ইব্ন কাছীরও এই মতটি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, কা'বা শরীফ আকাশে অবস্থিত বায়তুল মা'মূরের ঠিক সোজা নীচে অবস্থিত, এমনকি যদি উহা নিম্নে পতিত হয় তবে কা'বা গৃহের উপরই পতিত হইবে। তেমনিভাবে উহা সাত আসমানের ইবাদত গৃহের সোজা নিচে। যেমন সালাফদের কেহ কেহ বলেন, প্রত্যেক আসমানেই একটি করিয়া ইবাদত গৃহ আছে। সেখানে সেই আসমানবাসী আল্লাহ্র ইবাদত করিয়া থাকে। বিশ্ববাসীদের জন্য যেরূপ কা'বা গৃহ, আসমানবাসীদের জন্যও উক্ত গৃহ সেইরূপ। অতঃপর আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে তাহার একটি গৃহ বানাইবার নির্দেশ দিলেন যাহা বিশ্ববাসীর জন্য সেই পর্যায়ের হইবে। আকাশের ফেরেশতাদের জন্য যেমন ঐ সকল ইবাদাত গৃহ এবং আল্লাহ তাঁহাকে উহার জন্য পূর্ব হইতেই নির্ধারণ করিয়া রাখা স্থান নির্দেশ করেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১৬৩; ড. সালাহ আল-খালিদী, আল-কাসাসুল কুরআনী, ১খ., ৪০৭-৪০৯; ইমাদ যুহায়র হাফিজ, আল-কাসাসুল কুরআনী, পৃ. ১১৮-১১৯)।

যে পাথরের উপর দাঁড়াইয়া ইবরাহীম (আ) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেন তাহা প্রাচীন কাল হইতেই কা'বা শরীফের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন অবস্থায় ছিল। উমর (রা)-এর সময়কালে তিনি উহা বায়তুল্লাহ হইতে কিছুটা (পূর্বে) সরাইয়া দেন, যাহাতে বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফকারীদের দ্বারা উহার নিকট দাঁড়াইয়া সালাতরত ব্যক্তিদের সালাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়। উক্ত পাথরে সুস্পষ্টরূপে ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের ছাপ পড়িয়া যায়। ইসলামের প্রথম যুগেও উক্ত ছাপ সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল এবং মানুষের মনে রেখাপাত করিত। যেমন আবূ তালিবের একটি কবিতায় উক্ত হইয়াছে ঃ

وموطئ ابراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل

"পাথরে ইবরাহীমের জুতাবিহীন নগ্ন পায়ের চিহ্ন" (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., ১৬৪)। উল্লেখ্য যে, অদ্যাবধি উক্ত চিহ্ন সুস্পষ্ট রহিয়াছে।

এই কা'বা গৃহই ইবাদতের জন্য নির্মিত বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। আল্লাহ ইহাকে বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে যেই প্রবেশ করুন না কেন আল্লাহ তাহার নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়াছেন এবং সেখানে যাওয়ার সামর্থ্যবানদের জন্য এই গৃহকে কেন্দ্র করিয়া হজ্জ সম্পন্ন করা ফরয করিয়া দিয়াছেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ۔ فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (٣:٩٦-٧٩)

"মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায়; উহা বরকতময় ও বিশ্ব জগতের দিশারী। উহাতে অনেক সুস্পষ্ট নির্দশন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম এবং যে কেহ সেথায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যাহার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাহার অবশ্য কতর্ব্য" (৩ঃ ৯৬-৯৭)।

এই ঘরকে আল্লাহ্ তা'আলা মানবজাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছেন। এখানে অবস্থিত মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাইবার নির্দেশ দিয়াছেন ইহার তাওয়াফকারী. ইহাতে ইতিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য। তাই কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَّاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (٢:١٢٥)

"এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কা'বা গৃহকে মানবজাতির মিলন কেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম, তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াইবার স্থানকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকূ' ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখিতে আদেশ দিয়াছিলাম" (২ঃ ১২৫)।

হজ্জের ঘোষণা

কা'বা গৃহের নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে হজ্জের ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ. لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِى اَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ. (٢٢:٢٧-٢٨)

"এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করিয়া দাও। উহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে, ইহারা আসিবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করিয়া যাহাতে তাহারা তাহাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হইতে পারে এবং তিনি তাহাদিগকে চতুষ্পদ জন্তু হইতে যাহা রিযক হিসাবে দান করিয়াছেন উহার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করিতে পারে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্তকে আহার করাও" (২২ঃ ২৭-২৮)।

বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ)-কে যখন হজ্জের ঘোষণা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল তখন তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! এই ঘোষণা আমি কিভাবে মানুষের নিকট পৌঁছাইব, আমার আওয়ায তো তাহাদের পর্যন্ত যাইবে না? আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, তুমি ঘোষণা দাও, পৌঁছাইবার দায়িত্ব আমার। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়াইয়া গেলেন। এক বর্ণনামতে তিনি পাথরের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন, অপর এক বর্ণনাতে সাফা পর্বতে, ভিন্নমতে আবূ কুবায়স পর্বতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হে লোকসকল! তোমাদের প্রতিপালক একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন; তোমরা উহার হজ্জ কর।" বর্ণিত আছে যে, এই ঘোষণার সময় পাহাড়সমূহ নীচু হইয়া যায়, বিশ্বের সর্বত্র তাঁহার আওয়ায পৌঁছিয়া যায় এবং মাতৃগর্ভে ও পিতৃ ঔরসে যাহারা রহিয়াছে সকলেই উহা

শুনিতে পায়। পাথর, কাঁচা-পাকা ঘরবাড়ী, গাছপালা ও কিয়ামত পর্যন্ত যাহাদের তাকদীরে আল্লাহ তা'আলা হাজ্জ লিখিয়াছেন- তাহারা সকলেই উহা শুনিয়াছে এবং উহার উত্তর দিয়াছে। এইজন্য হজ্জ আদায়কারী বলিয়া থাকে, لبيك اللهم لبيك "আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির" (ইব্‌ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩খ, ২১৬)। ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) নিজেদের হাজ্জ সমাপনের নিয়ম-কানুন জানাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন এবং ভুল-ত্রুটি হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁহাদিগকে পূর্ণ অনুগত করার জন্যও দু'আ করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ . (٢:١٢٨)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হইতে তোমার এক অনুগত উম্মত করিও। আমাদিগকে ইবাদতের (অর্থাৎ হজ্জের) নিয়ম-কানুন দেখাইয়া দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দায়ালু" (২ঃ ১২৮)।

তাঁহারা আরো দু'আ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বংশধরদের মধ্যে যেন আল্লাহ একজন মহান রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি উম্মাতকে হিদায়াত করিবেন। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. (٢:١٢٩)

"হে আমাদের প্রতিপালক! তাহাদের মধ্য হইতে তাহাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করিও যে তোমার আয়াতসমূহ তাহাদের নিকট তিলাওয়াত করিবে, তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিবে। তুমি তো পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়" (২ঃ ১২৯)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের এই দু'আ কবূল করিয়াছিলেন। অতঃপর ইসমাঈল (আ)-এর বংশে প্রেরণ করেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, "আমি আল্লাহ্‌র নিকট রক্ষিত উম্মুল কিতাবে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' হিসাবেই লিপিবদ্ধ ছিলাম। আর তখন আদম (আ)-এর রূহ দেহে প্রবেশ করে নাই। অতি সত্ত্বর আমি তোমাদিগকে ইহার ব্যাখ্যা দিব। আমি হইলাম আমার আদি পিতা ইবরাহীমের দু'আ এবং ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৪খ, ১২৭-১২৮; ডঃ সালাহ আল-খালিদী, আল-কাসাসুল-কুরআনী, ১খ, ৪০৯)।

আবু উমামা (রা) বলেন, আমি বলিলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রথম সৃষ্টি কিভাবে? তিনি বলিলেন, "আমি ইবরাহীমের দু'আ ও ঈসার সুসংবাদ। আমার মাতা এমন আলোকচ্ছটা দেখিয়াছিলেন যাহা দ্বারা শাম-এর প্রাসাদসমূহ আলোকিত হইয়া গিয়াছিল" (আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৫খ, ২৬২)। বায়তুল্লাহ নির্মাণের পর ইবরাহীম (আ) আরো দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন (আবদুল ওয়াহ্‌হাব নাজ্জার, কাসাসুল-কুরআন, পৃ. ১০৬)।

আল-মাসজিদুল আকসা নির্মাণ

বায়তুল মাকদিস-এ অবস্থিত আল-মাসজিদুল আকসাও সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেন। বায়তুল্লাহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর তিনি উহা নির্মাণ করেন। আবূ যার্‌র (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদ নির্মিত হইয়াছে? তিনি বলিলেন, আল-মাসজিদুল-হারাম। আমি বলিলাম, ইহার পর? তিনি বলিলেন, আল-মাসজিদুল আকসা। আমি বলিলাম, এতদোভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত? তিনি বলিলেন, চল্লিশ বৎসর (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল- আম্বিয়া/ বাদউল-খালক, হাদীছ নং ৩১৫০)।

খতনার সুন্নাত

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হইতে খতনা করার অঙ্গীকার লইয়াছিলেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইবরাহীম (আ) কাদ্দূম নামক স্থানে বা কাদূম নামক অস্ত্র দ্বারা খতনা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৮০ বৎসর (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীছ নং ৩১৪০)। অন্য এক বর্ণনামতে তাঁহার ৯৯ বৎসর বয়সকালে তিনি এই সুন্নাত পালন করেন। ইসমাঈল (আ)-এর বয়স ছিল তখন ১৩ বৎসর। তখন ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) এবং ইবরাহীম (আ)-এর যত দাস ছিল সকলেই খাতনা করেন। বারনাবাসের বাইবেলে খতনার কারণস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, আদম (আ) যখন স্বীয় প্রভুর নাফরমানী করেন তখন মানত করেন যে, আল্লাহ তওবা কবূল করিলে তিনি শরীরের কোন একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবেন। অতঃপর তাঁহার তওবা কবূল হইলে তিনি মানত পূর্ণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু কিভাবে তাহা করিবেন সেই ব্যাপারে পেরেশান হইয়া গেলেন। তখন জিবরীল (আ) আসিয়া উক্ত স্থানটি নির্দেশ করিলেন। অতঃপর তিনি উহা কাটিয়া ফেলিলেন। সম্ভবত তাঁহার বংশধরগণ এই সুন্নাত ত্যাগ করিয়াছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে উক্ত সুন্নাত জীবিত করার নির্দেশ দেন (আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৯৪)।

মৃতকে জীবিত করা স্বচক্ষে দেখার আবেদন

হযরত ইবরাহীম (আ) বাল্যকাল হইতেই অজানাকে জানিবার প্রতি কৌতুহলী ছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁহার নিকট ওয়াহী পাঠাইলেন যে, তিনি একদিন সকল মৃতকে জীবিত করিবেন এবং সবাইকে একদিন তাঁহার নিকট একত্র করিবেন, অতঃপর সৎকর্মপরায়ণকে প্রতিদান ও পুরস্কার হিসাবে জান্নাত দান করিবেন এবং অসৎকর্মপরায়ণকে তাহার কর্মের প্রতিফল হিসাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন তখন তিনি মৃতকে আবার কিভাবে জীবিত করিবেন তাহা স্বচক্ষে দেখিবার কৌতুহল জাগিল তাঁহার মধ্যে। তিনি আল্লাহকে বলিলেন, رَبِّ أَرِنِىْ كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى "হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর তাহা আমাকে দেখাও"। আল্লাহ বলিবেন, أَوَلَمْ تُؤْمِنْ "তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না"। তিনি বলিলেন, بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ "কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য।" তখন আল্লাহ তাঁহাকে উহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য বলিলেন ঃ

فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا

.(٢:٢٦٠)

"তবে চারটি পাখী লও এবং উহাদিগকে তোমার বশীভূত করিয়া লও। তৎপর তাহাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর উহাদিগকে ডাক দাও। উহারা দ্রুত গতিতে তোমার নিকট আসিবে" (২ঃ ২৬০)।

ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনামতে ইবরাহীম (আ) চারটি পাখী ঃ বক, ময়ুর, মোরগ ও কবুতর লইলেন। মুজাহিদ বকের স্থলে কাকের কথা বলিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনায় কবুতরের স্থলে হাঁস আর কোন কোন বর্ণনায় শকুনের কথা উল্লেখ আছে। পাখীগুলিকে যবাহ্ করার পর উহাদের গোশত, রক্ত, লোম সবই একত্রে মিশাইয়া ফেলার নির্দেশ দেওয়া হইল। অতঃপর ইব্ন আব্বাস, হাসান ও কাতাদার বর্ণনামতে ঐগুলিকে চারটি পর্বতের উপর রাখিয়া আসিতে বলা হইল। কোন কোন বর্ণনামতে ৭টি, আবার কোন কোন বর্ণনা মতে ১০টি পর্বতের উপর। অতপর নির্দেশমত উক্ত কাজ সম্পন্ন করার পর ইবরাহীম (আ) ডাক দিলেনঃ হে টুকরা টুকরা হইয়া যাওয়া হাড্ডিসমূহ, বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া গোশ্তসমূহ এবং যোগাযোগ বন্ধ হইয়া যাওয়া শিরাসমূহ! তোমরা একত্র হও। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা রূহ ফিরাইয়া দিবেন। ইহা শুনিবা মাত্রই এক হাড্ডি অপর হাড্ডির উপর, ঝাপাইয়া পড়িল, একটি পাখা অপর পাখার উপর উড়িয়া গিয়া পড়িল এবং এক রক্ত অন্য রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলে প্রতিটি পাখির কাছে তাহার রক্ত , মাংস ও পাখা ফিরিয়া আসিল এবং সবগুলিই পূর্বের ন্যায় জীবিত হইয়া গেল (আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৩খ, ২৮-২৯; আল-কুরতুবী, আল-জামি'লি আহকামিল কুরআন, ৩খ, ৩০০-৩০১)।

ইবরাহীম (আ)-এর ইনতিকাল

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইনতিকালের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইব্ন আসাকির প্রমুখ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট মালাকুল মওত আগমনের বিবিধ বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু তাহার সত্যতা নিশ্চিত নহে। তম্মধ্যে একটি এই যে, মালাকুল মওত এক বৃদ্ধের আকৃতিতে তাঁহার নিকট আগমন করেন। সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ) ধনী লোক ছিলেন। তাঁহার প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ছিল। তিনি লোকজনকে উহা দ্বারা মেহমানদারী করিতেন। একবার তিনি লোকজনকে আহার করাইতেছিলেন। তখন তিনি এক বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন, যে রৌদ্রে হাঁটিয়া যাইতেছিল। তখন তিনি একটি গাধা প্রেরণ করিয়া তাহাকে আনাইলেন এবং আহার করিতে দিলেন। বৃদ্ধ তাহার মুখে আহার দিতে গিয়া একবার চোখের মধ্যে দিলেন, একবার কানের মধ্যে দিলেন। অতঃপর এক লোকমা যখন মুখে দিলেন তখন উহা পেটের মধ্য দিয়া তাহার মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। ইবরাহীম (আ) পূর্বে আল্লাহ্র নিকট দরখাস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহার রূহ যিনি কবয করিবেন তাঁহাকে তিনি মৃত্যু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন। বৃদ্ধের এই হাল দেখিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃদ্ধ! তোমার কি অবস্থা? এইরূপ করিতেছ কেন? বৃদ্ধ

বলিল, ইবরাহীম! বয়সের ভারে আমার আজ এই অবস্থা'। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বয়স কত? বৃদ্ধ বলিল, এত... এত....। ইবরাহীম (আ) হিসাব করিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধের বয়স তাঁহার বয়স হইতে মাত্র দুই বৎসর বেশী। ইবরাহীম (আ) তাহাকে বলিলেন, তোমার ও আমার মধ্যে মাত্র দুই বৎসরের ব্যবধান। আমি যখন তোমার বয়সে উপনীত হইব তখন তো তোমার মতই হইয়া যাইব। বৃদ্ধ বলিল, হ্যাঁ। ইবরাহীম (আ) দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাহার পূর্বেই উঠাইয়া লউন। বৃদ্ধ তখন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার জান কবয করিল। এই বৃদ্ধই ছিলেন মালাকুল মওত। ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল তখন ২০০, মতান্তরে ১৯৫ ও ১৭৫ বৎসর (আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ১৬০-১৬১; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ১০৪)।

কাহারও কাহারও বর্ণনামতে তিনি আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন। আহলে কিতাবদের বর্ণনামতে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া ১৭৫, মতান্তরে ১৯৫ বৎসর বয়সে ইনতিকাল কলেন। তাঁহাকে কানআনে অবস্থিত হেবরূন নামক গ্রামের সেই স্থানে দাফন করা হয় যাহা তিনি স্বীয় স্ত্রী সারাকে কবর দেওয়ার জন্য ইফরূন আল-হায়ছী নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে ৪০০ মিছকালের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছিলেন এবং সারাকে সেখানে দাফন করিয়াছিলেন। পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক (আ) মিলিয়া তাঁহাকে উক্ত স্থানে সারার নিকট দাফন করেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৭৪)। উক্ত স্থানের নামকরণ করা হইয়াছে 'মাদীনাতুল–খালীল'। বর্তমানেও এই নামই প্রচলিত আছে। পূর্বে ইহার নাম ছিল কারয়া আওবা' (قرية أوبع) (আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১১০)। ইহা হেবরূনেরই একটি অংশ। বর্তমানে গোটা হিবরূনকেই 'মাদীনাতুল খালীল' বলা হয়। ইবনুল-কালবীর বর্ণনামতে ইবরাহীম (আ) ২০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। আবূ হাতিম ইবন হিববান তাঁহার সাহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুফাদ্দাল ইব্ন মুহাম্মদ জুনদী সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ইবরাহীম (আ) কাদূম নামক স্থানে (কাহারো কাহারো মতে কাদূম নামক অস্ত্রের সাহায্যে) খাতনা করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ১২০ বৎসর। ইহার পর তিনি ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। হাফিজ ইব্ন আসাকির ইহা আবূ হুরায়রা (রা) হইতে মাওকূফরূপে রিওয়ায়াত করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৭৪)।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতি

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর চার পত্নীর নাম জানা যায়, যাহাদের গর্ভে তাঁহার বহু সন্তান-সন্তুতির জন্ম হয়। প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আ) হাজার-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর দ্বিতীয় সন্তান ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন সারার গর্ভে। সারার মৃত্যুর পর ইবরাহীম (আ) কানআনের কানতূরা, মতান্তরে কাতূরা বিনত য়াকতান (মতান্তরে য়াকতার) নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে ছয় পুত্রঃ মাদয়ান, যামরান, সারাজ, য়াকশান ও বুসর জন্মগ্রহণ করে। ইহার পর ইবরাহীম (আ) হাজূন (মতান্তরে হাজূরা) বিন্ত আমীন (মতান্তরে উহায়ব)-কে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে পাঁচ পুত্র ঃ কায়সান, সূরাজ (মতান্তরে শামরূখ)। আমীম, লুতান ও নাফিস

জন্মগ্রহণ করে। আবুল কাসিম আস-সুহায়লী তাঁহার আত-তা'রীফ ওয়া'ল-আ'লাম গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৭৫; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ১৫৯; আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ১০৩)।

ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ)-সহ তাঁহার মোট ১৩ পুত্রের নাম জানা যায়। ইবন কুতায়বা অবশ্য বলিয়াছেন, কাতূরার গর্ভে ৪ সন্তান এবং হাজূরার গর্ভে ৭ সন্তানের জন্ম হয়। সর্বমোট ইবরাহীম (আ)-এর ১৩ সন্তান ছিল (ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ৩৩)।

ইবরাহীম (আ) জীবিত থাকিতেই তাঁহার পুত্রদিগকে বিভিন্ন স্থানে বসতি করান। ইসমাঈল (আ)-কে মক্কায়, ইসহাক (আ)-কে শামে এবং অন্যান্য পুত্রকে বিভিন্ন দেশে আবাসন করান। তাঁহারা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আরয করিল, হে পিত! আপনি ইসহাক ও ইসমাঈলকে আপনার নিকটস্থ জায়গায় বসবাস করাইলেন এবং আমাদিগকে অপরিচিত জায়গায়, দূরদেশে বসবাস করিতে বলিয়াছেন! তিনি বলিলেন, আমাকে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর নামসমূহ হইতে একটি নাম শিক্ষা দিলেন। তাঁহারা সেই নাম লইয়াই পানি ও অন্যান্য সাহায্য প্রার্থনা করিত (আছ-ছা'লাবী, পৃ. ১০৪)।

পরবর্তী কালে যত নবী-রাসূল আগমন করিয়াছেন সবই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ)-এর বংশধর হইতে। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর আর অন্যান্য সকল নবী ইসহাক (আ)-এর বংশধর। ইসহাক (আ)-এর পুত্র ইয়া'কূব (আ)। তাঁহার পুত্র ইউসুফ (আ) নবী ছিলেন। ইতিহাস ও তাফসীর বিশারদ ইব্ন জারীর তাবারী ইবরাহীম (আ)-এর অন্যান্য পুত্রের এবং তাঁহাদের বংশধরদের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন (দ্র. তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৫৯-৬০)।

দৈহিক অবয়ব

একাধিক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দৈহিক গঠন ও আকৃতি ছিল হযরত রাসূলে কারীম (আ)-এর ন্যায়। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি ঈসা ইব্ন মারয়াম, মূসা ও ইবরাহীম (আ)-কে দেখিয়াছি। ঈসা হইলেন লাল বর্ণের হাল্কা পাতলা গড়ন ও প্রশস্ত বক্ষধারী, মূসা হইলেন গৌর বর্ণের বিশাল দেহধারী। সাহাবীগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইবরাহীম (আ) কেমন ছিলেন? তিনি বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীর (অর্থাৎ তাঁহার নিজের) প্রতি তাকাও (বুখারী, আস-সাহীহ, ৪খ, ২৭৯, কিতাবুল-আম্বিয়া, হাদীছ নং ৩১৩৯)।

ইমাম বুখারী ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, লোকজন তাঁহাকে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল, যাহার উভয় চক্ষুর মধ্যখানে কাফির অথবা ك-ف-ر লেখা। তিনি বলিলেন, আমি তাহা শুনি নাই। তবে রাসূল (স) বলিয়াছেন, ইবরাহীম (আ)-এর আকৃতি, তাহা তোমাদের সঙ্গীর প্রতি তাঁকাও (আল-বুখারী, ৪খ, ২৭৯, হাদীছ নং ৩১৩৯)। ইমাম বুখারী কিতাবুল-হাজ্জ ও কিতাবুল-লিবাস-এ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৭৩)।

বৈশিষ্ট্যাবলী

ইবরাহীম (আ) ছিলেন আল্লাহ্র খলীল। কুরআন কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا (٤:١٢٥)

"আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন" (৪ঃ ১২৫)।

তিনিই প্রথম মেহমানদারী করেন, ছারীদ (রুটি ও গোশতের শুরুয়া মিশ্রিত খাদ্য) বানান এবং তাহা মিসকীনদিগকে খাওয়ান। মেহমানকে সাথে না লইয়া সকাল বা সন্ধ্যার তিনি আহার গ্রহণ করিতেন না। কখনো একজন মেহমান তালাশ করিতে দুই বা ততোধিক মাইল যাইতেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁহার এই মেহমানদারী চালু থাকিবে। তিনিই প্রথম গোঁফ খাটো করেন, ক্ষৌরকর্ম করেন, নখ কর্তন করেন, মিসওয়াক করেন, চুলে সিঁথি করেন, কুলি করেন, নাকে পানি দেন এবং নাক ঝাড়িয়া সাফ করেন, পানি দ্বারা ইসতিনজা করেন (ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ৩০)। তিনিই প্রথম খাতনা করেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইবরাহীম (আ) ৮০ বছর বয়সে 'কাদূম' নামক স্থানে, মতান্তরে বাইস দ্বারা খাতনা করেন (বুখারী, আস-সাহীহ, ৪খ, ২৭৯, কিতাবুল-আম্বিয়া, হাদীস নং ৩১৪০; মুসলিম, আস-সাহীহ, ৭খ, ৯৭)। কোন কোন বর্ণনামতে ইহার কারণ ও ঘটনা এইরূপ ছিল যে, আমালেকাদের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হয়। দাফনকালে ইবরাহীম (আ) তাঁহার সঙ্গীদিগকে শনাক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। তখন তিনি মুসলমানদের চিহ্ন রূপ খাতনা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। অতঃপর কাদূম নামক স্থানে তিনি সেই দিন খাতনা করেন (ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ১০৫)। তিনিই প্রথম পাজামা পরিধান করেন। সুফ্য়ান ইব্ন উয়ায়না (র)-এর আযাদকৃত দাস ফাদিল হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন, হে ইবরাহীম! পৃথিবীবাসীর মধ্যে তুমিই আমার নিকট অধিক সম্মানিত ব্যক্তি। কাজেই যখন তুমি সিজদা করিবে তখন মাটি যেন তোমার সতর দেখিতে না পায়। তখন তিনি পাজামা বানাইয়া লন (ছা'লাবী, প্রাগুক্ত)। ১৫০ বৎসর বয়সে সর্বপ্রথম বার্ধক্যের চিহ্নরূপ তাঁহার চুল-দাড়ি সাদা হয়। বর্ণিত আছে যে, সারার গর্ভে যখন ইসহাকের জন্ম হয় তখন কানআনবাসিগণ বলিতে থাকে, তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হইবে না এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার ব্যাপারে! তাহারা একটি পুত্র সন্তান কুড়াইয়া আনিয়া তাহাকে পালক পুত্র বানাইয়াছে। তখন আল্লাহ ইসহাকের আকৃতি ইবরাহীমের মত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য করা যাইত না। তাই আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে বাধ্যর্কের চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দিলেন (ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ৩০-৩১)। অতঃপর তিনি তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! ইহা কি? আল্লাহ বলিলেন, ইহা সম্মানের বিষয়। তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্মান আরো বৃদ্ধি করিয়া দিন (ছা'লাবী, কাসাস, পৃ. ১০৫)।

তিনি আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিয়াছিলেন যে, নবূওয়াত যেন তাঁহার বংশে অব্যাহত থাকে। আল্লাহ এই দু'আ কবূল করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশের দুইটি ধারা ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)

হইতেই পরবর্তী কালের সকল নবী আগমন করিয়াছিলেন। আনাস ইবন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি বনী ইসরাঈলের আট হাজার জন নবীর পর আগমন করিয়াছি (ছা'লাবী, কাসাস, পৃ. ১০৪)। তাঁহাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী করা হইয়াছে। তিনি দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (٢٦:٨٤)

"আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর" (২৬ঃ ৮৪)।

আল্লাহ উহা কবূল করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে যে, তিনি উহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং দায়িত্ব পালন করিয়াছেন (দ্র. ২ঃ ১২৪; ৫৩ ঃ ৩৭)। সেই সকল পরীক্ষায় সফলতার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর আল্লাহ তাঁহাকে মানুষের নেতা বানাইয়া দেন। তিনি এই নেতৃত্ব যেন তাঁহার বংশের মধ্যে থাকে সেই দু'আ করিয়াছিলেন এই শর্তে যে, জালিমগণ উহা পাইবে না (২ঃ ১২৪)। তাই পরবর্তীতে যত নবী আগমন করিয়াছেন সবই তাঁহার বংশধর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيْفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"ইবরাহীম ছির এক উম্মাত আল্লাহ্র অনুগত , একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত" (১৬ঃ ১২০)।

তাঁহাকে বাল্যকালেই সঠিক জ্ঞান ও হিদায়াত দেওয়া হইয়াছিল (২১ঃ ৫১)। তিনি ছিলেন একত্ববাদীদের নেতা। একত্ববাদের ক্ষেত্রে তাঁহার ছিল জোরালো বক্তব্য ও সুদৃঢ় যুক্তি-প্রমাণ। বাল্যকাল হইতেই তিনি উক্ত জোরালো বক্তব্য ও সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা মানুষকে হকের দিকে আহবান করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ . (٦:٨٣)

"আর ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাহাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় আমি উন্নীত করি" (৬ঃ ৮৩)।

তাঁহাকেই সর্বপ্রথম আল্লাহ 'একনিষ্ঠ মুসলিম' নাম দিয়াছেন। ইয়াহূদী খৃস্টানগণ ইবরাহীম (আ) তাহাদের দলভুক্ত বলিয়া যে দাবী করিয়াছিল আল্লাহ তাহা নাকচ করেন এবং তাঁহার ইসলাম ও ইখলাসের সাক্ষ্য দেন (দ্র. ৩ঃ ৬৭)। তিনিই প্রথম কুরবানীর রীতি চালু করেন। তাঁহাকেই প্রথম আল্লাহ কাবাগৃহের স্থান দেখাইয়া দেন এবং সেখানে তিনি বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেন। তিনিই প্রথম আল্লাহ্র জন্য অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন। অতঃপর আগুনকে তাঁহার জন্য ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক করা হয়। তিনিই প্রথম নবী, যাঁহার আবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করিয়া দেখান। তাঁহাকে কিয়ামতের দিন সাদা চাদর পরিধান করানো হইবে এবং আল্লাহ্র আরশের বাম পার্শ্বে তাঁহার জন্য মিম্বর স্থাপন করা হইবে (ছা'লাবী, কাসাস, পৃ. ১০৬)। রাসূল (স) বলেন, কিয়ামতের দিন সকলকে

নগ্ন পা, নগ্ন মস্তক ও নগ্ন শরীর তথা জন্মের দিনের ন্যায় উঠানো হইবে। প্রথম যাহাকে কাপড় পরানো হইবে তিনি ইবরাহীম (আ) (বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুত তাফসীর, সূরাতুল আম্বিয়া, কিরমানী ভাষ্য ১৭খ., ২১৩)। রাসূল (স) আরো বলেন, তিনি হইবেন মুসলিম শিশুদের অভিভাবক এবং জান্নাতবাসীদের নেতা। তিনিই প্রথম আল্লাহ্র জন্য হিজরত করেন। আল্লাহ তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত স্থানকে মানুষের কিবলারূপে নির্ধারণ করেন এবং তাঁহাকে মানুষের ইমাম ও উত্তম আদর্শের ধারক বানান (৬০ঃ ৪)। সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ উম্মতকেও ইবরাহীম (আ)-এর মিল্লাতের আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে (১৬ঃ ১২৩)। আল্লাহ তাঁহাকে حَلِيْمٌ (সহনশীল), اَوَّاهٌ (কোমল হৃদয়) ও مُنِيْبٌ (সতত আল্লাহ অভিমুখী) বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন (১১ঃ ৭৫)। এই সকল বৈশিষ্ট্য দ্বারা আল্লাহ তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল-আম্বিয়া, পৃ. ১০৪-১০৬; তু. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৬৬-১৭২)।

ইবরাহীম (আ)-এর উপর নাযিলকৃত সহীফা ও উহার বিষয়বস্তু

হাদীছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ হইতে জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর দশখানা সহীফা নাযিল হইয়াছিল। আবার ইদরীস আল-খাওলানী আবূ যারর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা কতখানি কিতাব নাযিল করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, এক শত সহীফা আর চারখানি কিতাব। আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর উপর দশখানি, শীছ (আ)-এর উপর পঞ্চাশখানা, খানুখ বা ইদরীস (আ) -এর উপর ত্রিশখানা এবং ইবরাহীম (আ)-এর উপর দশখানা সহীফা নাযিল করেন। ইহা ছাড়া তিনি তাওরাত, যাবূর, ইনজীল ও ফুরকান নাযিল করেন। আবূ যারর্ (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় কি ছিল? তিনি বলিলেন সবই উপদেশমূলক নীতিকথা (مثال)। উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যায় ঃ

"হে স্বেচ্ছাচারী, অহংকারী বাদশাহ! আমি তোমাকে এইজন্য প্রেরণ করি নাই যে, তুমি একটার পর একটা দুনিয়ার সম্পদ জমা করিবে, বরং এইজন্য প্রেরণ করিয়াছি যে, তুমি আমা হইতে মজলুমের বদদোআ ফিরাইয়া রাখিবে। কারণ আমি তাহা ফেরৎ দেই না, যদিও তাহা কোন কাফিরের পক্ষ হইতেও আসে। উহাতে আরও উপদেশ বাক্য ছিল যে, বুদ্ধিমান যতক্ষণ পর্যন্ত বুদ্ধিহারা না হয়, তাহার উচিৎ সময়কে চার ভাগে ভাগ করা ঃ এক ভাগে সে আল্লাহকে ডাকিবে এবং তাঁহার সহিত গোপনে কথোপকথন করিবে; এক ভাগে আল্লাহ্র সৃষ্টি-নিচয় লইয়া চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করিবে; এক ভাগে নিজের কৃতকর্মসমূহের হিসাব লইবে এবং একভাগ নিজের প্রয়োজন যথা হালাল জীবিকা জোগাড় করার জন্য রাখিবে। বুদ্ধিমানের উচিৎ সে যেন তিনটি কাজ ছাড়া আর কিছুর জন্য প্রচেষ্টা না চালায় ঃ (১) পরকালের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করা; (২) নিজের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা এবং (৩) হারাম নহে এমন বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করা। জ্ঞানীর উচিৎ তাহার সময়কাল সম্পর্কে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া; নিজের অবস্থা অনুযায়ী অগ্রগামী হওয়া এবং নিজের জিহ্বাকে

হেফাজত করা। যে জানে যে, তাহার কথা তাহার কাজ হইতে নিকৃষ্ট প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ছাড়া অনর্থক ও অবান্তর কথাবার্তা তাহার কম হইবে (আত্-তাবারী, তারীখ, ১খ, ১৬১; আছ্-ছা'লাবী. কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০৬-১০৭)।

তাঁহার সাহীফার আরও উপদেশ হইল ঃ শান্তি বর্ষিত হউক সেই ব্যক্তির উপর যে মেহমানের সম্মান করে। যে তাহাকে অপদস্থ করে সে জাহান্নামের সর্বশেষ স্তরে থাকিবে। আবূ যার্র (রা) বলেন, এইজন্যই ইবরাহীম (আ) মেহমান ছাড়া আহার করিতেন না (ইবনুল-জাওযী, তারীখুল-মুনতাজাম, ১খ, ২৭২-২৭৩)।

জান্নাতে তাঁহার প্রাসাদ ঃ হাফিজ আবূ বাকর আল-বায্যার আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, জান্নাতে একটি প্রাসাদ আছে, আমার মনে হয় তিনি বলিয়াছিলেন, উহা মুক্তার তৈরী, যাহাতে কোন ফাটল কিংবা ভাঙ্গন নাই। আল্লাহ উহা তাঁহার বন্ধু ইবরাহীম (আ)-কে আপ্যায়িত করার জন্য তৈরি করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, ১৭২)।

একটি অযৌক্তিক আপত্তি ও উহার জবাব

লাইডেন হইতে প্রকাশিত ইংরাজী ইসলামী বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণে ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে কতগুলি অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কুরআন কারীমে একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইবরাহীম (আ)-কে কা'বাঃ গৃহের নির্মাতা এবং দীন-ই হানীফ-এর প্রবর্তক হিসাবে তুলিয়া ধরা হয় নাই। অবশ্য দীর্ঘকাল পর তাঁহাকে এই সকল বিশেষণে বিশেষিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মাক্কী সূরাগুলির কোথাও ইবরাহীম (আ)-এর সহিত ইসমাঈল (আ)-এর সম্পর্ক দৃষ্টিগোচর হয় না এবং তাঁহাকে প্রথম মুসলমান বলিয়াও কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই; বরং তাঁহাকে কেবল একজন নবী ও পয়গাম্বর হিসাবে দেখা যায়। সেখানে তাঁহাকে কা'বাঃ গৃহের প্রতিষ্ঠাতা, ইসমাঈলের পিতা, 'আরব-এর পয়গাম্বর ও পথপ্রদর্শক এবং দীন-ই হানীফ-এর প্রচারক বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য মুহাম্মাদ (স)-এর মাদানী যিন্দেগী শুরু হইলে তখন মাদানী সূরায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উল্লেখকালে সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখও করিতে দেখা যায়। প্রশ্নকারিগণ ইহার কারণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মাক্কী যিন্দিগীতে তিনি (রাসূলুল্লাহ স.) সকল বিষয়েই ইয়াহূদীদের উপর নির্ভর করিতেন এবং তাহাদের রীতিনীতি পছন্দ করিতেন। তাই ইবরাহীম (আ)-কেও সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিতেন ইয়াহূদীগণ যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিত। কিন্তু মদীনায় যখন ইয়াহূদীগণ ইসলামের দা'ওয়াত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল তখন তিনি ইয়াহূদীদের ইয়াহূদীবাদ হইতে পৃথক ইবরাহীমী দা'ওয়াতের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং ইবরাহীম (আ)–কে দীনে হানীফ-এর প্রচারক, আরবের পয়গাম্বর, ইসমাঈল (আ)-এর পিতা এবং কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপনকারী হিসাবে পেশ করিলেন। এই প্রশ্ন এবং এই সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. মুহাম্মাদ হিফজুর রাহমান সিউহারবী, কাসাসুল-কুরআন, দিল্লী,

১খ, ১৪০-১৫১)। এই সম্পর্কে দা'ইরাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া ঃ ১/১খ, ২৮প.-এ মুহাম্মদ ফারীদ ওয়াজদীর একটি সংযোজন দেওয়া হইয়াছে যাহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

মুসলিম-অমুসলিম কোন ঐতিহাসিক এই কথা বলেন নাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার-প্রসারের জন্য ইয়াহূদীদের সাহায্য লইয়াছেন; বরং তাঁহারা সকলেই ইহার বিপরতীত বর্ণনা করিয়াছে যে, মক্কা ও মদীনা উভয় জায়গার ইয়াহূদীরই তাঁহার ঘোর বিরোধী ছিল এবং তাঁহার বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কানী দিত। খোদ কুরআন কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে, "তুমি ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকে মু'মিনদের প্রতি সর্বাধিক কট্টর দুশমনরূপে দেখিতে পাইবে এবং তাহাদিগকে তুমি মু'মিনদের সর্বাধিক নিকটতম বন্ধুরূপে দেখিতে পাইবে যাহারা নিজদিগকে খৃস্টান বলিয়া দাবি করে" (৫ঃ ৮২)।

জাহিলী যুগে আরবগণ ইয়াহূদীগণকে কোন মূল্যই দিত না; বরং তাহাদের সম্পর্কে এমনও বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ইয়াহূদীদের প্রতিবেশী থাকাও তাহারা পছন্দ করিত না এবং যে সকল স্থান তাহারা নিজেদের হিজরতের জন্য মনোনীত করিয়াছিল সেইখান হইতে ইয়াহূদীগণকে তাহারা বিতাড়নের পক্ষপাতী ছিল।

ইসমাঈল (আ)-এর জন্মদাতা বা আদনানী আরবের প্রথম পুরুষ যে ইবরাহীম (আ), কুরআন কারীমেই এই কথা প্রথম ঘোষণা করা হয় নাই। বরং তাওরাতে ইহার পূর্বেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ইব্‌রাহীম তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী (?) হাজার এবং তাঁহার সন্তান ইসমাঈলকে আরব ভূমিতে নির্বাসিত করেন এবং সেইখান হইতেই ইসমাইলী আরবের সৃষ্টি হয়।

ইসলাম ইব্‌রাহীম (আ)-কে ইয়াহূদীবাদের সহিত সম্পৃক্ত হওয়াকে কখনও সম্মানজনক বলিয়া বিবেচনা করে নাই বরং উল্টাভাবে ইয়াহূদীদের এই দাবি যে, ইবরাহীম ইয়াহূদী ছিলেন- দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাই ইরশাদ হইয়াছে ঃ

مَاكَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ۔

"ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিল না, খৃস্টানও ছিল না, সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম" (৩ঃ ৬৭)।

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ اِبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتِ التَّوْرٰةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ۔

আরবী দিন "তুমি বল, হে কিতাবীগণ! ইবরাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইন্‌জীল তো তাহার পরেই নাযিল হইয়াছিল; তোমরা কি বুঝ না" (৩ঃ ৬৫)?

ইসলাম কখনও ইয়াহূদীবাদের সহায়তায় মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার পক্ষপাতী ছিল না। কারণ কুআনের শিক্ষাই হইল, ইসলাম বনী আদমের জন্য মনোনীত সেই প্রাচীন দীন যাহা আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পর বিভিন্ন দীন ও মতবাদের প্রবক্তাগণ উহাতে পরিবর্তন করিয়া উহার আসল পথ হইতে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই পরিবর্তন-পরিবর্ধন হইতে উহাকে পাক-পবিত্র করিবার জন্য যুগে যুগে রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। এইভাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আগমন করিয়াছেন।

কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ. وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ. فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

আরবী যোগ করুন "তিনি তোমাদের জন্য দীন-এর সেই পথই বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে, আর যাহা আমি প্রত্যাদেশ করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন মূসা ও ঈসাকে এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না।... উহাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পর কেবল বিদ্বেষবশত উহারা নিজেগিদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়; এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকিলে উহাদের বিষয়ে ফয়সালা হইয়া যাইত। উহাদের পর যাহারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছে তাহারা কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রহিয়াছে। সুতরাং তুমি উহার দিকেই আহবান কর (অর্থাৎ সেই সম্মিলিত ভিত্তির উপর ঐক্যবদ্ধ করিতে যাহা সকল দীন-এর মধ্যে রহিয়াছে, যাহাতে সকল দীন এক হইয়া যায়- ওয়াজদী) এবং উহাতেই প্রতিষ্ঠিত থাক যেইভাবে তুমি আদিষ্ট হইয়াছ এবং উহাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করিও না। বল, 'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করিয়াছেন আমি তাহাতে বিশ্বাস করি (সকল দীনের ঐক্য প্রতীয়মান করার জন্য) এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিতে। আল্লাহ্ই আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদেরকে কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ নাই (অর্থাৎ কোন শত্রুতা ও ঝগড়া নাই)। আল্লাহ্ই আমাদিগকে একত্র করিবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট" ৪২ঃ ১৩-১৫)।

উপরে উল্লিখিত এই সকল আয়াত সূরা আশ-শূরা-র, যাহা মক্কায় নাযিল হয়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন দীনকে ইহার প্রথম ভিত্তির উপর ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাহে যাহা নূহ (আ)-এর যুগে কায়েম হইয়াছিল, ইবরাহীম (আ)-এর যুগে নহে। স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, ইবরাহীম (আ) সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবার ব্যাপারে নূহ (আ)-এর অনুসারীমাত্র, নূতন ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা নহেন। কুরআন কারীমে প্রত্যক্ষভাবে মিল্লাতে ইবরাহীম-এর অনুসরণ করার যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা এইজন্য নহে যে, তিনি ইসলামের প্রথম প্রবর্তক, বরং এইজন্য যে, তিনি আরবের একটি বৃহৎ গোত্রের আদি পিতা। তাই এমনিভাবে তাহাদের মধ্যে

তাঁহার অনুসরণের আগ্রহ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

কা'বা সম্পর্কে কথা এই যে, উহা অদ্ভুত আকৃতির কোন মন্দির ছিল না, যেমন কারনায়ক (দ্র. ৫০৭) অথবা জনগণের পছন্দমত কোন সুরম্য অট্টালিকা ছিল না, যাহাতে বিচিত্র কারুকার্য খচিত থাকিবে এবং বিভিন্ন গোত্র উহা দখল করিতে বিবাদে লিপ্ত হইবে। উহা ছিল নিতান্তই সাধারণ চতুষ্কোণ একটি ইমারত আর আরবগণ চতুষ্কোণ ইমারতকেই কা'বা বলে। আর তাহা ছিল সেই ধরনের ইমারত যাহা লোকে স্বহস্তে নির্মাণ করে। তাই তাহাতে স্থাপত্যের কোন অলংকরণ নাই, কারণ উহা ইবাদতখানা। অতএব ইবরাহীম (আ), যাঁহাকে সকল উম্মতই নবী বলিয়া মান্য করে নিজের জন্য এবং নিজের সন্তানদের সালাত আদায় করার জন্য এমনি একটি গৃহ নির্মাণ করিবেন, ইহা কি অসম্ভব ব্যাপার!

আর ইহা যখন প্রমাণিত যে, ইবরাহীম (আ) তাঁহার পুত্রকে এই অঞ্চলে বসবাস করিবার জন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, যেমন তাওরাতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে, তখন সেইখানে তাঁহার জন্য সাধারণ একটি ইবাদাতখানা নির্মাণ করা ছিল অতীব জরুরী। আজ পর্যন্ত কেহই এই ব্যাপারে মতভেদ করেন নাই যে, ইবরাহীম (আ)-ই উক্ত ইবাদাতখানার ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর এই উক্তি করা কিভাবে সঠিক হইতে পারে যে, মুহাম্মাদ (স) কেবল উক্ত গৃহের মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য উহাকে ইবরাহীম (আ)-এর নির্মিত বলিতেছেন [যদিও ইবরাহীম (আ) ইহার নির্মাতা ছিলেন না)]। এই গৃহের নাম বায়তুল্লাহ হওয়া কা'বার কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে নহে। মুসলমানদের নিকট সকল মস্‌জিদই বায়তুল্লাহ। কা'বার মর্যাদা এইজন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, উহা মক্কায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম বায়তুল্লাহ যাহা মানুষের ইবাদতের জন্য নির্মিত হইয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার ইসলামের প্রচারের ভিত্তিসমূহের মধ্যে খানা-ই কা'বাকে যে একটি ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন নাই তাহার প্রমাণ হইল, মক্কায় অবস্থানের গোটা সময়টিতে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকেই মুখ করিয়া সালাত আদায় করেন।

ইসলাম যাহাকে তাহার দা'ওয়াতের ভিত্তি স্বরূপগ্রহণ করিয়াছে তাহা হইল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত দীন। আর এই দীন-এর দ্বারাই ইসলাম মানুষের মধ্যকার মতপার্থক্যের অবসান করিতে প্রয়াসী। ইসলাম প্রত্যেককে সুষ্ঠুভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলের যিম্মাদার এবং তার জন্য জওয়াবদিহি করিতে হইবে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইর্‌শাদ করেন (অনু) ঃ ইয়া'কূব--এর নিকট যখন মওত আসিয়াছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে'? তাহারা বলিয়াছিল, আমরা আপনার ইলাহ-এর ও আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক-এর ইলাহ-এরই 'ইবাদত করিব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী। সেই উম্মাত অতীত হইয়াছে- উহারা যাহা অর্জন করিয়াছে তাহা উহাদের, তোমরা যাহা অর্জন কর তাহা তোমাদের। তাহারা যাহা করিত সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কোন প্রশ্ন করা হইবে না" (২ঃ ১৩৩-১৩৪)।

উপরের বক্তব্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম কোনও ব্যক্তি, গোত্র বা বংশের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার পক্ষপাতী নহে। আল্লাহ্ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধানের উপর উহা নির্ভরশীল, অন্য কিছুর উপর নহে। তাই ইসলাম বংশ, দেশ ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পারে। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন" (৪৯ঃ ১৩)।

অতঃপর ইসলাম ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে যে, মানুষের ঐক্যের চাহিদা হইল, তাহাদের দীনও এক হইবে, আর তাহাই হইল সেই সর্বপ্রাচীন দীন যাহা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আ)-কে প্রদান করিয়াছিলেন যাহা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।

স্মর্তব যে, এই দীন একটি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ভিত্তির উপর কায়েম হওয়া উচিত, আর তাহা হইল মানুষের ফিত্রাত আর বুদ্ধি ও বিদ্যা উহার মূল বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এই দুইটি বিষয়ই জাহিরী ও বাতিনী উন্নতির মূল উৎস। ইহা ছাড়া মানুষের আর কোনও গত্যন্তর নাই। কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের মানসিক প্রশান্তির জন্য এই দীনের বিকল্প আর কোন পন্থা নাই (দাইরাতু'ল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়্যা)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল-কারীম, স্থা; হাদীছ ঃ (২) আল-বুখারী, আস-সাহীহ, স্থা; আল-বুখারী বিশারহি'ল কিরমানী, দার ইহয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, ২য় সং ১৪০১/১৯৮১, ১৭ খ., ১৮ খ., স্থা; (৩) মুসলিম, আস-সাহীহ, দারুল-আফাক আল-জাদীদা, বৈরূত তা. বি., ৭খ, ৯৭-৯৮; (৪) আত-তিরমিযী, আল-জামি', মিসর, ১ম সং ১৩৮৫/১৯৬৫, ৫খ, ৩২২, ৫৮৩; ((৫) আন-নাসাঈ , আস-সুনান, দারুল 'ইল্মিয়্যা, বৈরূত লেবানন, ১ম সং. ১৪১১/১৯৯১, ৬খ, ২৯০; (৬) ইব্ন মাজা, আস-সুনান, আর-রিয়াদ, ১ম সং. ১৪০৩/১৯৮৩, ২খ, ২০৪; (৭) আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, আল-মুসনাদ, দারুল-মা'আরিফ, মিসর ১৩৭৭/১৯৫৭, ৫খ, ১৯; (৮) আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন তা. বি., ১খ, ৩৮৪, কিতাবুল জানাইয, ২খ, ২৯৮, ৩৭০, ৩৪৪, ৪৭০।

তাফসীর ঃ (৯) আল-আলূসী, রূহুল-মা'আনী, দার ইহ্য়াইত-তুরাছ আল-'আরাবী, ৪র্থ সং. বৈরূত ১৪০৫/১৯৮৫, ৩খ, ২৮-২৯, আরও স্থা.; (১০) আল-কুরতুবী, আল-জামিলি-আহকামিল-কুরআন, মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছা তা. বি, ৩খ, ৩০০-৩০১, আরও বহু স্থা; (১১) আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান, দারুল মা'আরিফ, মিসর তা. বি., ৩খ, ৩০-৯৬; আরো বহু স্থা.; (১২) ইব্ন কাছীর, তাফসীর, দারুল-মা'রিফা, ২য় সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ.; ১৬৯-১৯০, আরও বহু স্থা., (১৩) আশ-শাওকানী, ফাতহুল-কাদীর, মাকাতাবা মুসতাফা আল-হালাবী, মিসর ২য় সং. ১৩৮৩/১৯৬৪, ২খ, ৫০৯-৫১৩, স্থা.।

মিসর তা. বি., ১খ, ১৩৯-১৮৩; (১৭) ইবনুল আছীর, আল-কামিল-দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, ১ম সং. ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ, ৭২-৯৫; (১৮) ইব্ন খালদূন, তারীখ, দারুল-কিতাব, বৈরূত ১৯৮১ খৃ., ১খ, ৫৮-৭১; (১৯) মুহাম্মাদ ইয্যা দারওয়াযা, তারীখুল জিন্স আল-'আরাবী, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, ১ম সং, বৈরূত ১৩৭৯/১৯৫৯, ১খ, ১১৫-১১৯; (২৮) ইব্নুল জাওযী, আল-মুনতাজাম, ফী তারীখিল-মুলূক ওয়াল-উমাম, দারুল-কুতুব আল-'ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, ২য় সং. ১৪১৫/১৯৯৫, ১খ, ২৫৭-৩০৩; (২১) আল-মাস'উদী, মুরূজুয-যাহাব, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত ১৪০৩/১৯৮২, ১খ, ৪৪-৪৬; (২২) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, দারুল-মা'আরিফ. মিসর, ২য় সং. ১৯৬৯ খৃ., পৃ. ৩০-৩৩; (২৩) ইব্ন হাবীব আল-বাগদাদী, কিতাবুল-মুহাব্বার, আল-মাকতাব আত-তুজজারী, বৈরূত তা.বি., পৃ. ৪।

কাসাসঃ (২৪) আত-তাবারী, কাসাসুল- আম্বিয়া, দারুল-ফিকর, বৈরূত ১৪০৯/১৯৮৯, পৃ. ১৩৩-২০৪; (২৫) ইব্ন কাছীর, কাসাসুল আম্বিয়া, মু'আস্সাসাতুল মা'আরিফ, বৈরূত, লেবানন, ১ম সং. ১৪১৬/১৯৯৬, পৃ. ১৫১-১৭৬; (২৬) আল-কিসাঈ, কাসাসুল-আম্বিয়া, লাইডেন ১৯২২ খৃ., ১খ. ১২৮-১৪৫; (২৭) আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল- আম্বিয়া, তুরস্ক ১২২৬ হি., পৃ. ৭৬-১০৯; (২৮) আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, দারুল-ফিকর, বৈরূত তা. বি., পৃ. ৭১-১১০; (২৯) ড. মুহাম্মদ আত-তায়্যিব আন-নাজ্জার, তারীখুল আম্বিয়া, দারুত-তিবা'আ আল-মুহাম্মাদিয়্যা, আল-আযহার, মিসর, ১ম সং. ১৩৯৯/১৯৭৯, পৃ. ৯৫-১১৫; (৩০) মুহাম্মাদ আল-ফাকী, কাসাসুল-আম্বিয়া, মাতাবি'উশ-শা'রানী আল-হাদীছা আর-রিয়াদ, ১ম সং. ১৩৯৯/১৯৭৯, পৃ. ৬০-১১০; (৩১) 'আফীফ আবদুল-ফাত্তাহ তাব্বারা, মা'আল-আম্বিয়া ফিল-কুরআন, দারুল-মালাবিস, বৈরূত, ১৬ সং. ১৯৮৭ খৃ., ১০৫-১৩৬; (৩২) ড. সালাহ আল-খালিদী, আল-কাসাসুল-কুরআনী, দারুল কালাম, দিমাশক, ১ম সং. ১৪১৯-১৯৯৮, ১খ, ৩০১-৪৭০; (৩৩) ইমাদ যুহায়র আল-হাফিজ, আল-কাসাসুল-কুরআনী, দারুল কালাম, দিমাশক, ১ম সং. ১৪১০/১৯৯০, পৃ. ৫৫-১৪৩; (৩৪) মাহমূদ যাহরান, কাসাসুল-কুরআন, দারুল-কিতাব আল-'আরাবী, মিসর, ১ম সং, ১৩৭৫/১৯৫৬ খৃ., ৪৭-৭৯; (৩৫) মুহাম্মাদ আহমাদ জাদুল-মাওলা ও অন্যান্য, কাসাসুল-কুরআন, দারুল-জীল, বৈরূত তা. বি., পৃ. ৩২-৪৯; (৩৬) হিফজুলরাহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ১খ, ১৫১-২২৩।

বিবিধ ঃ (৩৭) আল-বাকরী আল-আনদালুসী, মু'জামু মাস্তা'জাম, 'আলামুল-কুতুব, বৈরূত, অন্যান্য, ৩য় সং. ১৪০৩/১৯৮৩, ৪খ, ১১৩৯; (৩৮) ইয়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল-বুলদান, দার সাদির, বৈরূত ১৩৭৬/১৯৫৭, ৪খ, ৪৮৭; (৩৯) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল-উনুফ, দারু'ন-নাসর, কায়রো, ১ম সং. ১৩৮৭/১৯৬৭, ১খ, ৭৪-৭৫; (৪০) বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত তা. বি., ১খ, ২৪৪-২৪৫; (৪১) মাওসূ'আ 'আব্বাস মাহমূদ আল-'আক্কাদ, দারুল-কিতাব আল-'আরাবী, বৈরূত-লেবানন, ১ম সং. ১৯৭০ খৃ., পৃ. ৩১৯-৫৩৮; (৪২) আল-মাওসূ'আতুল- 'আরবিয়্যা আল-আলামিয়্যা, মাকতাবা আল-মালিক ফাহদ

আল-ওয়াতানিয়্যা, রিয়াদ, ১ম. সং. ১৪১৬/১৯৯৬, ১খ, ৫৯-৬০; (৪৩) মুহাম্মাদ মুরতাদা আয-যাবীদী, তাজুল-আরূস, দার সাদির, বৈরূত ১৩৮৬/১৯৬৬, ৩খ, ১১; (৪৪) Bible. Genesis, স্থা.; (৪৫) বাংলা অনু. পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক; (৪৬) The Encyclopedia of Religion, Macmillan publishing Co., New York 1993, vol. 1, P. 13-17; (47) The New Encyclopedia of Britannica, U.S.A. 1995, vol. 1, 36-37; (48) Encyclopedia Americana, U.S.A. 1972, vol. 1, 45; (49) Jewish Encyclopedia, New York 1901, vol. 1, 83-91; (50) Colliers Encyclopedia, Crowell Collier and Macmillan, Ine., 1966, vol. 1, 26; (51) The New Caxton Encyclopedia, The caxton publishing Co. Ltd., London 1977, vol. 1, 11; (52) Everyman's Encyclopaedia, 6Th. ed., J.M. Dent Ltd., London- Melbourne- Toronto 1978, vol. 1, 29-30; (53) The new book of Knowledge, Grolier incorporcted. New York 1979, vol. I 7; (54) Encyclopedia Italiana, Roma 1949, vol. I, 115-116; (55) E. I, E. J. Brill, Leiden 1971, vol. 1, 980-981; (৫৬) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ঢাকা ১৯৮৫ খৃ., ৪খ, ৩৭৯-৩৮৪।

আবদুল জলীল

৮

হযরত লূত (আ)

حضرت لوط عليه السلام

হযরত লূত (আ)

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত লূত (আ) কুরআন মজীদে উল্লিখিত ২৫ জন মহান নবীর অন্তর্ভুক্ত এবং ৬ ঃ ৮৩-৮৬ আয়াতে যে ১৮ জন নবীর নাম উক্ত হইয়াছে, তিনি তাঁহাদেরও অন্তর্ভুক্ত। তিনি আনু. ২১২০ খৃ. পূ. অব্দে (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ১খ, পৃ. ৩৭৭) তাঁহার পিতৃপুরুষের জন্মভূমি ফাদ্দান আরাম-এ জন্মগ্রহণ করেন (আরাইস, পৃ. ৭৯)। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহোদর হারান-এর পুত্র (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৪৯; আরাইস, পৃ. ১০৯; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৭৬; নাজ্জার, পৃ. ৮৩; আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬১; আদিপুস্তক, ১১ ঃ ২৭)। তাঁহার বংশলতিকা নিম্নরূপ ঃ লূত ইব্‌ন হারান ইব্‌ন আযর (তারিখ অথবা তারিহ্‌) ইব্‌ন নাখূর ইব্‌ন সারূগ ইব্‌ন আবগু ইব্‌ন ফালিগ ইব্‌ন আবির ইব্‌ন শালিখ ইব্‌ন কায়নান ইব্‌ন আরফাখশায ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ) (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৭২)। কোনও কোনও সূত্রে হারান-এর পরিবর্তে হারূন ও ফারান এবং নাখূর-এর পরিবর্তে বাখূর উক্ত হইয়াছে (আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬১; জামহারাতু আনসাবিল আরাব, নির্ঘণ্ট)। হযরত লূত (আ)-এর পিতামহ এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা তারিখ বাইবেলে তেরাহ (আদি পুস্তক, ১১ ঃ ৩১) এবং কুরআন মজীদে (৬ ঃ ৭৪) আযার (ازار) নামে উক্ত হইয়াছে। ইব্‌ন সা'দ-এর মতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর চতুর্থ স্ত্রী হাজূনী (حَجُوْنِى) অথবা হাজূরা-এর গর্ভজাত সপ্ত সন্তানের মধ্যে ষষ্ঠ সন্তানের নাম ছিল লূত (তাবাকাত, ১খ, পৃ. ৪৮; আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬০)। উক্ত স্ত্রী হাজূরা (حجورا)-কে ইবরাহীম (আ) সারার মৃত্যুর পর বিবাহ করিয়াছিলেন (আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬০)। ইনি এবং নবী হযরত লূত (আ) একই ব্যক্তি বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাফসীরকারগণ, ঐতিহাসিকগণ, উপরন্তু বাইবেল-ভিত্তিক সাহিত্যে লূত (আ) ইবরাহীম (আ)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

দৈহিক গঠন

লূত (আ)-এর গাত্রবর্ণ ছিল শুভ্র, মুখমণ্ডলের গড়ন চমৎকার, সরু নাসিকা, কর্ণদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, হস্ত-পদের অঙ্গুলিসমূহ লম্বা এবং দাঁতগুলি ছিল উজ্জ্বল। তাঁহার হাসিতে তাঁহার গাম্ভীর্যপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিত। তাঁহার জাতি তাঁহাকে নানাভাবে নির্যাতন করিলেও তিনি তাহাদেরকে কষ্ট দেন নাই (আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬১-৬২)। তাঁহার সরু নাসিকা ও লম্বা আঙ্গুল তাঁহার দীর্ঘদেহী হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। ফলে শৈশব হইতেই তিনি নিঃসন্তান পিতৃব্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর গৃহে লালিত-পালিত হন। তিনি ছিলেন পিতৃব্যের একান্ত স্নেহভাজন। ছা'আলাবী তাঁহার নামের ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে আন্তরিকভাবে স্নেহ করিতেন

বিধায় তিনি যেন তাঁহার অন্তরের সহিত আঁটিয়া গিয়াছিলেন, জড়াইয়া গিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নামকরণ করা হইয়াছে লূত। লাতা, ইয়ালূতু অর্থাৎ সংযুক্ত হওয়া, বিজড়িত হওয়া (আরাইস, পৃ. ১০৯; বিদায়া, ১খ, ১৪৯)। তিনি শৈশবেই পিতৃহারা হইয়াছিলেন। ইবরাহীম (আ) তাঁহার পৌত্তলিক জাতির সহিত বিশ্বাস ও আদর্শগত বিরোধের কারণে তাঁহার জন্মভূমি ফাদ্দান আরাম (فدان ارام) (আরাইস, পৃ. ৭৯) হইতে কালদীয় এলাকার উর (اور) নামক শহরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন (আরাইস, পৃ. ৮৩)। এই শহরটি দক্ষিণ ইরাকে ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমান তাল্লুল আবীদ উর-এর স্থানেই অবস্থিত। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে এই শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে (ই.বি., ২৩খ, পৃ. ৩৭১)। ই.বি.-তে বলা হইয়াছে যে, তিনি উর-এ জন্মগ্রহণ করেন (পৃ. ৩৭১)। অতঃপর তাঁহারা দুর্ভিক্ষের কারণে (ই.বি., ২৩খ, পৃ. ৩৭১) উক্ত স্থান ত্যাগ করিয়া হারান বা হাররান নামক এলাকায় স্থানান্তরিত হন। এখানে লূত (আ)-এর পিতা হারান তাহার পিতা আযার-এর জীবদ্দশায় ইনতিকাল করেন (আদিপুস্তক, ১১ ঃ ২৮)। স্থানান্তর গমনের এই সকল সফরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারা, পিতা তারিখ (আযার), ভ্রাতা নাহূর, ভ্রাতার স্ত্রী মালিকা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র লূত (আ)-ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫০; আরাইস, পৃ. ১০৯; নাজ্জারের কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৩; বাইবেলের আদিপুস্তক, ১১ ঃ ৩১-৩২)। ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনামতে তিনি বাবিল হইতে হাররানে আসেন (১খ, পৃ. ১৫০)। উর হইতে তিনি পুনরায় স্থানান্তরিত হইয়া পবিত্র ভূমি ফিলিস্তীনে চলিয়া আসেন এবং এই সফরেও তাঁহার স্ত্রী সারা, ভ্রাতুষ্পুত্র লূত এবং লূতের স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন (নাজ্জার, পৃ. ৮৩)। ইবরাহীম (আ)-এর এইভাবে ঘন ঘন স্থানান্তরের কারণ এই যে, উক্ত এলাকাসমূহের জনগোষ্ঠী ও শাসকগোষ্ঠী ছিল পৌত্তলিক বা মুশরিক। তাওহীদের আকীদায় বিশ্বাসীদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। সুতরাং ইবরাহীম ও লূত (আ) নির্যাতনের শিকার হইয়াই বারবার আবাসিক এলাকা পরিবর্তন করিয়াছেন। এই দেশত্যাগ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ .

"এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলাম সেই দেশে যেথায় আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রাখিয়াছি" (২১ ঃ ৭১)।

উবায় ইব্‌ন কাব (রা), আবুল 'আলিয়া, কাতাদা (র) প্রমুখের মতে উক্ত আয়াতে তাহাদের সিরিয়া গমন বুঝানো হইয়াছে এবং ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-র মতে মক্কাকে বুঝানো হইয়াছে (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫০; তাফসীরে কবীর, ২২খ, পৃ. ১৯০; রূহুল মাআনী, ১৭খ, পৃ. ৭০)। রূহুল মাআনীতে মিসরের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে, তবে সিরিয়া সম্পর্কিত মতকে সহীহ বলা হইয়াছে। তাফসীরে কাশশাফে শুধু সিরিয়ার উল্লেখ আছে (২খ, পৃ. ৫৭৮)। পৃথিবীর বুকে ইবরাহীম (আ)-ই সর্বপ্রথম হিজরত করেন এবং তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গী হন। লূত (আ)-ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। হযরত উছমান (রা) সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত করিলে মহানবী (স) বলেন ঃ

اِنَّ عُثْمَانَ اَوَّلُ مُهَاجِرٍ بِاَهْلِهِ بَعْدَ لُوْطٍ .

"লূত (আ)-এর পর উছমানই সস্ত্রীক সর্বপ্রথম মুহাজির" (নাজ্জারের কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৪)।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, লূত (আ)-এর স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অতঃপর চাচা-ভ্রাতুষ্পুত্র সিরিয়ায় পৌঁছিয়া কিন'আনীদের এলাকা সিক্কীম (নাবলুস)-এ বসবাস করিতে থাকেন (নাজ্জার, পৃ. ৮৪)। এই এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাঁহারা মিসর গমন করেন, বিভিন্ন বিপদাপদের পর প্রচুর সম্পদসহ পুনরায় পবিত্র ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫২; আরাইস, পৃ. ১০৯; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯১)। প্রত্যাবর্তনের পথে লূত (আ) পিতৃব্যের সম্মতিক্রমে সাদূমে বসতি স্থাপন করেন এবং এই ভ্রমণের এক পর্যায়ে নুবুওয়াত লাভ করেন (নাজ্জার, পৃ. ৯০-৯১; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯১; আরাইস, পৃ. ১০৯; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫২, ১৭৬; আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬২)। বাইবেলে বলা হইয়াছে ঃ "আর ইবরাহীমের সহযাত্রী লূতেরও অনেক মেষ ও গো এবং তাম্বু ছিল। আর সেই দেশে একত্র বাস সম্পোষ্য হইল না, কেননা তাঁহাদের প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে তাঁহারা একত্র বাস করিতে পারিলেন না। আর ইবরাহীমের পশুপালকদের ও লূতের পশুপালকদের পরস্পর বিবাদ হইল। ... তাহাতে ইবরাহীম লূতকে কহিলেন, বিনয় করি, তোমাতে ও আমাতে এবং তোমার পশুপালকগণে ও আমার পশুপালকগণে বিবাদ না হউক। কেননা আমরা পরস্পর জ্ঞাতি। তোমার সম্মুখে কি সমস্ত দেশ নাই? বিনয় করি, আমা হইতে পৃথক হও, হয় তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই, নয় তুমি দক্ষিণে যাও আমি বামে যাই" (আদিপুস্তক, ১৩ ঃ ৫-৯)।

এখানে দুইজনের পৃথক হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট। (১) তাঁহাদের উভয়ের সহায়-সম্পত্তি ও গবাদিপশুর প্রাচুর্যের কারণে স্থান সংকুলান হইতেছিল না। (২) তাঁহাদের দুইজনের পশুপালকদের মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল এবং পশুপালকদের মধ্যে বিবাদ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। যাহাতে সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে স্থান সংকুলান হয় এবং যাহাতে তাহাদের পশুচারকদের মধ্যে বিবাদ বাধিতে না পারে সেই লক্ষ্যে তাঁহারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পৃথক হইয়াছিলেন। কোন কোন ইসলামী সূত্রে বলা হইয়াছে যে, দুই মহান নবীর পশু সম্পদে অত্যধিক বরকত হওয়ায় তাঁহারা স্থান সংকুলানের জন্য পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে দুই ভিন্ন এলাকায় নিজ নিজ সম্পত্তি স্থানান্তরিত করেন (নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৯-৯০)। লূত (আ) স্থানান্তরিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে এলমের কদলায়মূর শাহ তাহার অপর তিনজন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাহগণকে সঙ্গে লইয়া সাদূম ও ইহার চার যুক্তরাষ্ট্রীয় বাদশাহগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়যুক্ত হইল এবং অন্যান্য লুণ্ঠিত সম্পদের সহিত হযরত লূত (আ)-কে তাঁহার সম্পদসহ বন্দী করিয়া লইয়া গেল। হযরত ইবরাহীম (আ) এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং জয়যুক্ত হইয়া লূত (আ)-কে মুক্ত করেন ও অনেক গানীমাত লাভ করেন (আদিপুস্তক, ১৪ ঃ ১-১৬; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫২-৫৩)।

কুরআন ও হাদীছে হযরত লূত (আ)

কুরআন মজীদের মোট ১৭টি সূরায় সাতাশবার নামোল্লেখসহ হযরত লূত (আ) ও তাঁহার কাওম সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান ঃ ৬ ঃ ৮৬; ৭ ঃ ৮০-৮৪; ১১ ঃ ৬৯-৮৩; ১৫ ঃ ৫১-৭৭; ২১ ঃ

৫১-৭৫; ২২ ঃ ৪২-৪৩; ২৫ ঃ ৪০; ২৬ ঃ ১৬০-১৭৫; ২৭ ঃ ৫৪-৫৮; ২৯ ঃ ২৬-৩৫; ৩৭ ঃ ১৩৩-১৩৮; ৩৮ ঃ ১৩; ৫০ ঃ ১৩; ৫১ ঃ ২৪-৩৭; ৫৩ ঃ ৫৩-৫৪; ৫৪ ঃ ৩৩-৩৮ এবং ৬৬ ঃ ১০।

সূরা আল-আন'আম (৬)-এ ৮৩-৮৬ আয়াতে মোট আঠারজন নবীর নামোল্লেখ করা হইয়াছে, এই ৮৬ নং আয়াতে তিনজন নবীর নাম সহীহ্ আল-বুখারীর কিতাবুত তাফসীরে, বাব ঃ "উলাইকাল্লাযীনা হাদাল্লাহু ফাবিহুদাহুম ইকতাদিহ্" (৬ ঃ ৯০) অনুচ্ছেদেও উক্ত হইয়াছে। সূরা আম্বিয়া (২১)-র ৭১ নং আয়াতে ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তাঁহার বরকতময় ভূমিতে হিজরতের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। সূরা হজ্জের ৪২-৪৮ আয়াতে কয়েকজন নবীর উম্মতের করুণ পরিণতির উল্লেখপূর্বক মহানবী (স)-কে সান্ত্বনা দিয়া বলা হইয়াছে যে, তাঁহার জাতি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাদেরও অনুরূপ পরিণতি হইবে। এই প্রসঙ্গে কওমে লূতেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা 'আনকাবূতের ২৬ নং আয়াতে ইবরাহীম (আ)-এর উপর তাঁহার ঈমান আনার কথা ব্যক্ত হইয়াছে। ৩৮ ঃ ১৩ এবং ৫০ ঃ ১৩ আয়াতে লূত (আ)-কে তাঁহার জাতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করার কথা উক্ত হইয়াছে। ৬৬ ঃ ১০ আয়াতে লূত (আ)-এর স্ত্রীর কুফরী এবং পরিণামে তাহার জাহান্নামী হওয়ার কথা বলা ইয়াছে। ৫৩ ঃ ৫৩ আয়াতে "আল-মু'তাফিকাহ" (উল্টানো আবাসভূমি) দ্বারা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে বুঝানো হইয়াছে (তাফসীরে ইব্ন 'আব্বাস, পৃ. ৪৪৮; তাফসীরে তাবারী, ২৭ খ, পৃ. ৪৭; তাফসীরে কুরতুবী, ২৭খ, পৃ. ১২০; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৭০১, টীকা ৬; তাফহীমুল কুরআন, উক্ত সূরার টীকা ৪৬; মাআরেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত সং, পৃ. ১৩১১) এবং পরবর্তী (৫৪) আয়াতে তাহাদের সর্বগ্রাসী শাস্তিতে আচ্ছন্ন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অবশিষ্ট সূরাসমূহে লূত (আ)-এর দাওয়াত, তাঁহার জাতি কর্তৃক তাহা প্রত্যাখ্যান, তাঁহার জাতির অপকর্ম এবং পরিণতিতে তাহাদের করুণভাবে ধ্বংস হওয়ার বিষয় উক্ত হইয়াছে (যাহা নিবন্ধের সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে উল্লেখ করা হইবে)।

সহীহ বুখারীতে হযরত লূত (আ) সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ বিদ্যমান ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِلُوْطٍ اِنْ كَانَ لَيَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ـ

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ "আল্লাহ লূত (আ)-কে ক্ষমা করুন। তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় লইতে চাহিয়াছিলেন" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ঃ লাকাদ কানা ফী ইয়ূসুফা..., ভারতীয় সং, ১খ, পৃ. ৪৭৯; ২খ, পৃ. ৬৭৯, তাফসীর সূরা ইয়ূসুফ ঃ লাকাদ কানা ফী ইয়ূসুফা...)।

সুনান ইব্ন মাজায় হাদীছটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ لُوْطًا لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِى السِّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِثَ يُوْسُفُ لَاَجَبْتُ الدَّاعِىَ ـ

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর তুলনায় আমরাই সন্দেহ পোষণের অধিক উপযুক্ত, যখন তিনি বলিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর (তাহা) আমাকে দেখাও। তিনি বলিলেন, তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না? সে বলিল, কেন করিব না, তবে ইহা কেবল আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য" (২ ঃ ২৬০)। আল্লাহ লূত (আ)-কে অনুগ্রহ করুন। তিনি এক শক্তিশালী স্তম্ভের আশ্রয় চাহিয়াছিলেন। আমি ইয়ূসুফ (আ)-এর মত তত কাল জেলখানায় বন্দী থাকিলে অবশ্যই আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম" (কিতাবুল ফিতান, বাবুস সাব্র আলাল বালা, দেওবন্দ সং, পৃ. ২৯১; বৈরূত সং, ২খ, পৃ. ১৩৩৫-৬, নং ৪০২৬)।

ইমাম ইব্ন কাছীর (র) তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থে (১খ, পৃ. ১৮০) একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহা হইতে "শক্তিশালী স্তম্ভ" (রুকন শাদীদ)-এর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ঃ

رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلٰى لُوْطٍ لَقَدْ كَانَ يَاْوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ يَعْنِى اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا بَعَثَ اللّٰهُ بَعْدَهُ مِنْ نَبِىٍّ اِلَّا فِىْ ثَرْوَةٍ مِّنْ قَوْمِهِ ·

"লূত (আ)-এর উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক। তিনি একটি সুদৃঢ় স্তম্ভের অর্থাৎ মহামহিম আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পর হইতে যে কোনও জাতির নিকট তাহাদের মধ্যকার প্রভাবশালী বংশ হইতেই নবী পাঠাইয়াছে"। হাদীছটি আল-মুসতাদরাক গ্রন্থেও সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ উক্ত হইয়াছে (২খ, পৃ. ৫৬১)।

দাওয়াত ও তাবলীগের বিবরণ

হযরত লূত (আ) পিতৃব্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত বর্তমান ইরাকের বাবিল অর্থাৎ মেসোপটামিয়ার ঊর নামক স্থান হইতে বসতি ত্যাগ করিয়া কিছুকাল যাবত সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর পরিভ্রমণ করিয়া দীনের প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। এইভাবে তিনি নুবুওয়াত লাভের পূর্ব হইতেই দীনের প্রচারকার্যে ব্যাপৃত হন। তিনিই সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর ঈমান আনেন (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৭৬; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৪৯)। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ "লূত তাঁহার প্রতি ঈমান আনিল" (২৯ ঃ ২৬)। নমরূদের অগ্নিকুণ্ড হইতে ইবরাহীম (আ) মুক্তিলাভ করার পরপরই তিনি তাঁহার প্রতি প্রথম ঈমান আনেন। তিনি হিজরতেও ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গী ছিলেন। উপরিউক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হইয়াছেঃ

وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ·

"এবং ইবরাহীম বলিল, আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশে দেশত্যাগ করিতেছি। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (২৯ ঃ ২৬)।

উক্ত আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতের কথা বলা হইলেও তাঁহার সহিত লূত (আ)-ও ছিলেন। এখানে মুখ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। মতান্তরে ২৯ ঃ ২৬ আয়াতের

বক্তব্য হযরত লূত (আ)-এর (আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬২; নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৩)। কিন্তু এই মত প্রসঙ্গের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে (মাআরেফুল কোরআন, সৌদী সংস্করণ, পৃ. ১২২৭; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৫৩১, টীকা ৯)। এখানে আরও একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর ঈমান আনার পূর্বে লূত (আ)-এর ধর্মীয় বিশ্বাস কি ছিল? তাঁহার জাতি ছিল মুশরিক। কুরআন মজীদের যত জায়গায় তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা আছে, উহার কোথায়ও বলা হয় নাই যে, তিনিও তাঁহার জাতির মত বিভ্রান্ত ছিলেন। তিনি শিশুকাল হইতে পিতৃব্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হওয়ায় তাঁহার চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এই কথা বলা যায়। আল্লাহ তা'আলা যাঁহাদেরকে নুবুওয়াত ও রিসালাতের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন তাঁহাদের জন্মাবধি তাঁহাদেরকে পৌত্তলিকতা (শির্ক)-সহ সকল প্রকারের পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত ও পবিত্র রাখিয়াছেন। অতএব হযরত লূত (আ)-ও যাবতীয় পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত ছিলেন। কয়েকজন নবীর নামোল্লেখের পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ‎.

"তাহারা যদি শির্ক করিত তাহা হইলে তাহাদের কৃতকর্ম নিষ্ফল হইয়া যাইত" (৬ ঃ ৮৮)।

অনন্তর ২১ ঃ ৭১ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ‎.

"এবং আমি তাহাকে ও লূতকে উদ্ধার করিয়া সেই দেশে লইয়া গেলাম যেথায় আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ রাখিয়াছি"।

উক্ত আয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর সহিত লূত (আ)-কেও নিমরূদের (প্রচলিত নমরূদ) অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে তাঁহাকেও বরকতময় ভূমিতে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। অতএব আয়াতদ্বয়ের প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, তিনি সর্বাবস্থায় নিষ্পাপ ছিলেন।

হযরত লূত (আ) কখন নুবুওয়াতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব নহে। হাকেম নীশাপুরীর মতে তিনি মিসর হইতে সিরিয়ায় প্রত্যাবর্তনকালে নুবুওয়াত লাভ করেন। ৬ ঃ ৮৪-৮৬ আয়াতে উক্ত ১৮জন নবীর তালিকায় তিনিও অন্তর্ভুক্ত। ৬-৮৬ আয়াতের শেষাংশ ঃ

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا ‎.

"ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ, ইউনুস ও লূত"।

নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ে তাঁহাকে পরিষ্কার ভাষায় "রাসূল" বলা হইয়াছে ঃ

اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ‎.

"নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল" (২৬ ঃ ১৬২)।

وَاِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ·

"নিশ্চয় লূতও ছিল রাসূলগণের একজন" (৩৭ ঃ ১৩৩)।

ইহা ব্যতীত অন্যান্য সূরাসমূহে তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট আলোচনা হইতেও তাঁহার নুবুওয়াত লাভের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সাদূমবাসীর হেদায়াতের জন্য তাহাদের নবীরূপে তথায় প্রেরণ করেন। হাকেম-এর বর্ণনায় সাদূম ছাড়াও আমূদ, আরূম, মাউর ও সাবূর এই চারটি শহরের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। কুরআন মজীদে তাহাদেরকে "লূত সম্প্রদায় (قوم لوط) নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

লূত (আ) তাহাদেরকে সৎপথে আনয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি তাহাদেরকে লা শারীক আল্লাহ্‌র আনুগত্য এবং পাপাচার ত্যাগ করিবার আহ্বান জানান, তাহাদের কুকর্মের সমালোচনা করেন।

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ · اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ · فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ · وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ·

"যখন উহাদের ভ্রাতা লূত উহাদেরকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে" (২৬ ঃ ১৬১-১৬৪)।

অর্থাৎ তিনি তাঁহার জাতিকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন যে, তিনি তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাইয়া দিতেছেন এবং তাহাদের কুকর্মের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করিতেছেন, যাহাতে তাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং সৎপথ অবলম্বন করে। তিনি আরও বলিলেন যে, এই 'ওয়াজ-নসীহত ও আল্লাহ্‌র দীন গ্রহণের আহ্বানের পশ্চাতে তাঁহার কোন পার্থিব স্বার্থ নাই, সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনও উদ্দেশ্য নহে, তাহাদের নিকটও তিনি কোনরূপ পার্থিব স্বার্থ দাবি করেন না, আশাও করেন না। তাঁহার পুরস্কার তো তিনি আল্লাহ্‌র নিকটই আশা করেন। তাঁহার উপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার বাণী তাহাদের নিকট পৌঁছাইবার যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তিনি সেই দায়িত্বই পালন করিতেছেন। এইরূপ নিঃস্বার্থ লোক সম্পর্কে তাহাদের বুঝা উচিত যে, তিনি কখনো মিথ্যা বলিতে পারেন না, তিনি যাহা বলেন, বিশ্বস্ততার সহিতই বলেন (আম্বিয়ায়ে কুরআন, পৃ. ২৩৬-৭)।

কিন্তু তাহারা তাঁহার দাওয়াতে সাড়া দিল না এবং (স্ত্রী ব্যতীত) পরিবারের সদস্যরা ছাড়া একটি লোকও তাহার প্রতি ঈমান আনিল না, পাপাচার হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, বরং উদ্ধত মস্তকে আরো বেপরোয়া হইয়া কদর্যতায় লিপ্ত হইল। তাহাদের নিকট প্রশংসনীয় কাজ দুর্নামের বিষয় এবং দুষ্কর্ম প্রশংসনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা আল্লাহ্‌র নবীকে অমান্য তো করিলই, তাঁহাকে দেশ হইতে উৎখাতের হুমকি দিল এবং তিনি সত্যবাদী হইয়া থাকিলে তাহাদের উপর প্রতিশ্রুত শাস্তি আনয়নের আহ্বান জানাইল (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৭৮)।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ الْمُرْسَلِيْنَ ٠

"লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিল" (২৫ ঃ ১৬০)।

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ٠

"উহারা বলিল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে" (২৬ ঃ ১৬৭)।

اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ٠

"তোমরা ইহাদেরকে তোমাদের জনপদ হইতে উচ্ছেদ কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে" (৭ ঃ ৮২)।

লূত (আ)-ও তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুসারী "পবিত্র হইতে চাহে" বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলিয়াছেন যে, তাহারা সমকামিতা হইতে পবিত্র থাকিতেন (তাফসীরে ইব্ন 'আব্বাস, পৃ. ১৩২; তাফসীরে তাবারী, ১২খ, পৃ. ৫৫০, ৪০ খণ্ডের বৃহৎ সং; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, বাংলা অনু., ৪খ, পৃ. ২৬৩)। কাতাদা (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, উক্ত কথা দ্বারা তাহারা ব্যঙ্গচ্ছলে নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিল (ইবনে কাছীর, পৃ. স্থা.)। অর্থাৎ জঘন্য পাপাচারের সমালোচনা ও তাহা পরিহার করা তাহাদের নিকট দোষের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

ইহা হইতে জানা যায় যে, লূত-সম্প্রদায় কেবল নির্লজ্জ, নৈতিকতাবর্জিত ও চরিত্রহীনই ছিল না, বরং নৈতিক অধঃপতনে তাহারা এতদূর নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা নিজেদের মধ্যে কয়েকজন নেক চরিত্রের লোক, কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী এবং অন্যায় ও পাপাচারের সমালোচনাকারী লোকের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বরদাশত করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহারা পাপে এতদূর মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, সংশোধনের কোন প্রচেষ্টাকেই তাহারা সহ্য করিত পারিত না।

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ٠

"সে (লূত) উহাদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছিল। কিন্তু উহারা সতর্ককারী সম্বন্ধে বিতর্ক করিল" (৫৪ ঃ ৩৬)।

قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ ٠

"সে (লূত) বলিল, আমি তোমাদের এই কর্মকে ঘৃণা করি" (২৬ ঃ ১৬৮)।

قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ٠

তাহারা বলিল, "আমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আনয়ন কর যদি তুমি সত্যবাদী হও" (২৯ ঃ ২৯)।

হযরত লূত (আ) বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব আপতিত হইবেই। কারণ তাহারা সৎপথের প্রদর্শক আল্লাহ্র নবীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের

চিন্তা-চেতনা এতই বিকৃত হইয়াছে যে, আল্লাহ্র ভয়ের সামান্য চিহ্নও তাহাদের অন্তরে অবশিষ্ট নাই, তাঁহার শাস্তির সতর্কবাণীকে উপহাস করিতেছে। লূত (আ) তখন আল্লাহ্র দরবারে তাহাদের নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষার জন্য দু'আ করিলেন ঃ

رَبِّ انْصُرْنِىْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ·

"হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন" (২৯ ঃ ৩০)।

তিনি তাঁহার নিজের ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার জন্যও আল্লাহ্র নিকট দু'আ করিলেন, তাহাদের ঈমানের হেফাজতের দু'আ করিলেন, যাহাতে তাহারাও তাঁহার জাতির গর্হিত কর্মে লিপ্ত হইয়া মন্দ পরিণতির শিকার না হয় ঃ

رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ·

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে, উহারা যাহা করে, তাহা হইতে রক্ষা করুন" (২৬ ঃ ১৬৯)।

মহান আল্লাহ তাঁহার রাসূলের দু'আ কবুল করিলেন এবং মু'মিনদের হেফাজতের ব্যবস্থা করিলেন, কাফেরদের ধ্বংসের জন্য হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নেতৃত্বে মীকাঈল ও ইসরাফীল (আ)-কে প্রেরণ করিলেন এবং সাদূমবাসী দ্রুত অশুভ পরিণতির দিকে অগ্রসর হইল (অবশিষ্ট বিবরণ "লূত জাতির পাপাচার" অনুচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে–নিবন্ধকার)।

বৈবাহিক জীবন

আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে দেশান্তর গমনে লূত (আ)-এর সহিত লূত-পত্নীও ছিল (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৮৩)। তবে অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে এই সময় তাঁহার সহিত লূত-পত্নী ছিল না, তবে তিনি তখন বিবাহিত ছিলেন কি না তাহা স্পষ্ট নহে। কুরআন মজীদে লূত (আ), তাঁহার জাতি ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত সংশ্লিষ্ট বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি সাদূমে পৌঁছিয়া তথাকার এক নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার বংশপরিচয় সম্পর্কে ইসলামী উৎস ও বাইবেল নীরব। তাহাদের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্পর্ক থাকার কারণে হয়তো এই জাতিকে কওমে লূত বলা হইয়াছে। লূত (আ)-এর স্ত্রী যদি দেশত্যাগের দীর্ঘ সফরে তাঁহাদের সহিত থাকিত, তবে মিসরে ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারার বেলায় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার বেলায়ও অনুরূপ না ঘটিবার কোন কারণ ছিল না। অতএব এই ঘটনা হইতে অনুমিত হয় যে, লূত (আ) তখন বিবাহিত ছিলেন না। তবে নাজ্জারের কাসাস গ্রন্থে যে হাদীছ উক্ত হইয়াছে (পৃ. ৮৪) তাহা তাঁহার বিবাহিত হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

লূত (আ) বৈবাহিক জীবনে সুখী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহার স্ত্রী তাঁহার উপর ঈমান আনে নাই; সে তাহার জ্ঞাতি সাদূমদের মত মুশরিক ছিল। লূত (আ)-এর বাড়িতে সুদর্শন যুবকের বেশে ফেরেশতাগণ আগমন করিলে তাঁহার স্ত্রীই তাহার লম্পট জাতিকে সেই খবর জানাইয়া

দিয়াছিল। তাই তাঁহার স্ত্রীও সাদূমবাসীদের উপর পতিত গযবে ধ্বংস হয় (তাফসীরে তাবারী, ১২ খ, পৃ. ৫৫)। তাহার অবাধ্যচারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও উহার পরিণতি সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۚ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۔

"আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন। উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ ও লূত উহাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। আর উহাদেরকে বলা হইল, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সহিত দোযখে প্রবেশ কর" (৬৬ ঃ ১০)।

ইব্ন কাছীর (র) লূত (আ)-এর স্ত্রীর নাম ওয়ালিহা (والهة) এবং ছা'লাবী ওয়াইলা (واعلة) উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮১; আরাইস, পৃ. ১১৩; সংক্ষিপ্ত ই.বি.-তে 'হালসাকা' উক্ত হইয়াছে, ১ম সং, ২খ, পৃ. ৪০৭)। উপরিউক্ত আয়াতে "উহারা তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল" কথার তাৎপর্য এই যে, তাহারা উভয়ে দু'জন মহান নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের দীন গ্রহণ করে নাই, বরং কুফরের উপর থাকিয়া তাঁহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। বিশ্বাসঘাতকতা অর্থ এই নহে যে, তাহারা ব্যভিচারেও লিপ্ত হইয়াছিল। কখনও নহে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোন নবীর স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিবার ক্ষমতা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ পূর্বকালের ও পরবর্তী কালের মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ বলেন, কোনও নবীর স্ত্রী কখনও ব্যভিচারে লিপ্ত হয় নাই (তাফসীর ইব্ন আব্বাস, পৃ. ৪৭৮; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৮২)। উপমহাদেশীয় আলমগণের তাফসীর গ্রন্থাবলীতেও ইব্ন আব্বাস (রা)-র মত গৃহীত হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) আরও বলেন, দুই নবীর স্ত্রীদ্বয় প্রকাশ্যে ঈমান আনিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবে ছিল মুনাফিক (পৃ. স্থা.)।

ইসলামী উৎসসমূহে হযরত লূত (আ)-এর তিন কন্যা, মতান্তরে দুই কন্যা সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়, জ্যেষ্ঠার নাম রীছা এবং কনিষ্ঠার নাম রাবিয়া (সংক্ষিপ্ত ই.বি., ১ম সং., ২খ, পৃ. ৪০৭), মতান্তরে যা'ওয়ারা'আ ও যীতাআ (কুরতুবী, ৯খ, পৃ. ৭৬; রূহুল মাআনী, ১২খ, পৃ. ১০৬; তাবারীতে জ্যেষ্ঠার নাম রীছা)। তাঁহারাও পিতার দীনের অনুসারী নেককার মহিলা ছিলেন এবং পিতার সহিত আল্লাহ্র গযবের স্থান ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে চলিয়া যান। তাঁহাদের একজন ছিলেন হযরত শু'আয়ব (আ)-এর পিতামহী এবং অপরজন ছিলেন হযরত আয়্যুব (আ)-এর মাতা (ইব্ন কুতায়বা, আল-মাআরিফ, পৃ. ৪১-৪২-এর বরাতে ই.বি., ২৩খ, পৃ. ৩৭৪)। বাইবেলে বলা হইয়াছে যে, হযরত লূত (আ)-এর সহিত সাদূম ত্যাগকারিনী তাঁহার দুই কন্যা ছিলেন অবিবাহিতা (আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ৮)। বাইবেলে আরো উক্ত হইয়াছে যে, মহান আল্লাহ হযরত লূত (আ)-কে নির্দেশ দিলেন, "তোমার জামাতা ও পুত্র-কন্যা যতজনই এই নগরে আছে, সে সকলকে এই স্থান হইতে লইয়া যাও" (আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ১২)। "তখন লূত বাহিরে গিয়া, যাহারা তাঁহার কন্যাদিগকে

বিবাহ করিয়াছিল, আপনার সেই জামাতাদিগকে কহিলেন, উঠ, এ স্থান হইতে বাহির হও, কেননা সদাপ্রভু এই নগর উচ্ছন্ন করিবেন" (আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ১৪)। এইসব উদ্ধৃতি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ দুই কন্যা ছাড়াও হযরত লূত (আ)-এর আরো পুত্র-কন্যা ছিল। "যাহারা তাহার কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিল, আপনার সেই জামাতাদিগকে..." বাক্যাংশ হইতে প্রতিভাত হয় যে, উক্ত দুই কন্যা ছাড়াও তাঁহার আরও কয়েকজন কন্যা সন্তান ছিল। কিন্তু বাইবেলে ও ইসলামী উৎসে ইহাদের সম্পর্কে কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য কুরআন মজীদ হইতে ইহার একটি দূরবর্তী সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন বলা হইয়াছে, "আমি লূত ও তাহার পরিবারের সকলকে (আজমা'ঈন) উদ্ধার করিয়াছিলাম" (৩৭ ঃ ১৩৪)। "সেথায় যেসব মু'মিন (আল-মু'মিনীন) ছিল আমি তাহাদের উদ্ধার করিয়াছিলাম" (৫১ ঃ ৩৫)। এখানে "যেসব মুমিন" বলিতে লূত পরিবারের সদস্যগণকেই বুঝানো হইয়াছে। কারণ অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, ঐ জনপদে একটি পরিবার ব্যতীত আর কোন মুসলমান পরিবার ছিল না (দ্র. ৫১ ঃ ৩৬)। লূত (আ)-এর পারিবারিক জীবন ও তাঁহার সন্তান-সন্তুতি সম্পর্কে ইহার অধিক কিছু জানা যায় না।

তাঁহার দুই কন্যার দুই পুত্রসন্তানই ফিলিস্তীনের দুইটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়–মুআব ও আম্মুন-এর আদিপিতা এবং সেই সূত্রে হযরত লূত (আ) তাহাদের সকলের আদিপিতা (Ency. Brit., 1962, vol. 14, p. 401; Americana, vol. 17, p. 758; Collier's Ency., vol. 15, p. 20)। মৃত সাগর (লূত সাগর)-এর পূর্বদিকে ট্রান্স-জর্দানের মালভূমি অঞ্চল মুআবদের বসতি এলাকা। ইহার দক্ষিণ সীমা River zered (বর্তমান ওয়াদী আল-হাসা), উত্তর সীমা সুনির্দিষ্ট নহে (Ency. Religion, vol. 10, p.1)। জর্দান ও মৃত সাগরের পূর্বে, ইদোম (Esau)-এর উত্তরে এবং আম্মুন (বর্তমান আম্মান)-এর দক্ষিণে মুআবদের বসতি (Ency. Brit., vol. 15, p. 626)। ইহারা যাযাবর জীবন যাপন করিত (পূ. গ্র., ১খ, পৃ. ৮১৯)।

আম্মুন জনগোষ্ঠীর বসতি ট্রান্স-জর্দান এলাকা, ইহা ইসরাঈলের সহিত লাগোয়া বলিয়া মনে করা হয়, বরং মোয়াব এলাকারই অধিক নিকটতর। মোয়াবের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ইহাদের বসতি ছিল এবং তাহাদের প্রধান নগরী রাব্বাহ্ আম্মুন (বর্তমান আম্মান) জাব্বাক নদীর শাখা-নদীর তীরে অবস্থিত। তাহারাও যাযাবর জীবন যাপন করিত (Ency. Brit., vol. 1, p. 819)। কন্যাদ্বয়ের সন্তানের বংশধর হওয়ার সুবাদে হযরত লূত (আ) তাহাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষ (পূ. গ্র., vol. 14, p. 401)।

কওমে লূত-এর পরিচয়

লূত (আ)-এর সম্প্রদায় নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় তাঁহার স্বগোত্রীয় ছিল না, বরং যে জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তাঁহাকে নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাদেরকে লূত সম্প্রদায় (১১ ঃ ৭০, ৭৪; ২২ ঃ ৪৩; ২৬ ঃ ১৬০; ৩৮ ঃ ১৩ এবং ৫৪ ঃ ৩৩), লূতের ভ্রাতৃবৃন্দ (৫০ ঃ ১৩); তাঁহার জাতি (৬ ঃ ৮০; ৭ ঃ ৮০; ১১ঃ৭৮; ২৭ ঃ ৫৪, ৫৬ এবং ২৯ ঃ ২৮, ২৯) এবং তাহাদের ভ্রাতা (২৬ ঃ ১৬১) বলিয়া কুরআন মজীদে সম্বোধন করা হইয়াছে। একটি আয়াতে এই সম্প্রদায়কে

আল-মু'তাফিকা' (উল্টানো জনপদবাসী, ৫৩ ঃ ৫৩) বলা হইয়াছে তাহাদেরকে প্রদত্ত শাস্তির প্রকৃতি অনুযায়ী। এই জাতির আবাস ছিল সাদূম, 'আমূদ, আরূম, সা'উর ও সাবূর। এইগুলির মধ্যে সাদূমই ছিল তাহাদের সর্ববৃহৎ শহর। আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসের সময় এসব শহরের মোট জনবসতি ছিল আনুমানিক চল্লিশ লক্ষ (আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬২; বিদায়া, ১খ. পৃ. ১৮২; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৩)। আল-কামিলে পাঁচটি শহরের নাম নিম্নরূপ ঃ সাদূম, সাব্'আ, আমুরা, দূমা ও সা'উত (পৃ. স্থা.)। আল-বিদায়া গ্রন্থে তাহাদের জনবসতির সংখ্যা সাতটি বলা হইয়াছে (পৃ. স্থা.)। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বর্তমান মৃত সাগর তাহাদের ধ্বংসাবশেষে সৃষ্ট। তৎপূর্বে এখানে কোন সমুদ্র ছিল না, তাই ইহার অপর নাম মৃতসাগর (নাজ্জারের কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১১৩)। এই জাতি ছিল চরম উচ্ছৃঙ্খল এবং পাপাচারী, যাহার কারণে তাহাদেরকে সমূলে ধ্বংস করা হইয়াছে (বিস্তারিত দ্র. লূত জাতির পাপাচার অনুচ্ছেদে)। সংক্ষিপ্ত ই.বি.-তে এলাকাগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে সাদূম, আমোরা, আদমাহ, সেবাইম ও সো'আর-রূপে। ছা'লাবীর মতে সো'আর নগরী ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। কারণ উহার অধিবাসিগণ হযরত লূত (আ)-এর প্রতি ঈমান আনিয়াছিল (১ম সং, ২খ, পৃ. ৪০৭)। বাইবেলের মতে হযরত লূত (আ) তাঁহার পরিবারবর্গসহ প্রথমে এই শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন (আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ২০-২২)। ওয়াকিদী জনবসতিগুলি নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ সাদূম, আমূরা, আদমূতা, সা'উরা ও সাবূরা (মুরূজ, ১খ, পৃ. ৫৭)।

লূত সম্প্রদায়ের পাপাচার ও তাহাদের মর্মান্তিক পরিণতি

এই সম্প্রদায় ছিল জঘন্য পাপাচারী। কুরআন মজীদে তাহাদের অন্যান্য পাপাচারের মধ্যে সর্বাধিক জঘন্য পাপকর্ম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের সমকামিতা (লাওয়াতাত)। আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, তাহারা এমন একটি নিকৃষ্ট পাপকর্মের প্রচলন করে যাহা ইতোপূর্বে কোন আদম-সন্তান অথবা অন্য কোন জীব করে নাই। তাহা হইল নারীদের ত্যাগ করিয়া পুরুষে-পুরুষে তাহাদের কামতৃপ্তি লাভ করা। সাদূমবাসীদের পূর্বে কোন মানব সন্তানের তাহাতে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, সে ইহার চিন্তাও করে নাই। দামিশক জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা উমায়্যা খলীফা ওয়ালীদ ইব্ন আবদুল মালিক বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে লূত জাতির এই কুকর্মের কথা অবহিত না করিতেন তাহা হইলে আমরা চিন্তাও করিতে পারিতাম না যে, যৌন সম্ভোগের জন্য নারী ছাড়া পুরুষকেও ব্যবহার করা যায় (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২খ, পৃ. ৩৪)। কুরআন মজীদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যকবার তাহাদের নৈতিক অবক্ষয় ও লূত (আ)-এর উপদেশ সম্পর্কে আলোচনা আসিয়াছে। ১১ ঃ ৭৮ আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাহারা নানারকম পাপাচারে লিপ্ত থাকিত। ১৫ ঃ ৫৮ আয়াতে তাহাদেরকে অপরাধী সম্প্রদায়, ২১ ঃ ৭৪ আয়াতে অশ্লীল কার্যকলাপে লিপ্ত সম্প্রদায়, ২২ ঃ ৪৩ আয়াতে রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়, ২৬ ঃ ১৬০ আয়াতে রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যানকারী ও সমকামিতায় লিপ্ত সম্প্রদায়, ২৭ ঃ ৫৪-৫৫ আয়াতে অশ্লীল কর্মে ও সমকামিতায় লিপ্ত সম্প্রদায়, ২৯ ঃ ২৮-২৯ আয়াতে অশ্লীল কর্মে, সমকামিতায়, রাহাজানিতে ও প্রকাশ্য মজলিসে ঘৃণ্যকর্মে লিপ্ত সম্প্রদায় এবং ৩৮ ঃ ১২-১৪ ও ২৯ঃ৩১ আয়াতে যালেম সম্প্রদায় এবং ৫০ ঃ ১২-১৪

ও ৫৪ঃ৩৩ আয়াতে রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায় হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। উল্লিখিত আয়াতসমূহের পাঁচ জায়গায় আল্লাহ্‌র রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান এবং তিন স্থানে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে। এই বহুবিধ গর্হিত অপরাধসমূহের মধ্যে প্রধানত মহান নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়া সমকামিতা ত্যাগ না করার পরিণতিতেই এই জাতি আল্লাহ্‌র গযবে ধ্বংস হইয়াছিল। হাকেম নীশাপুরী (র) তাহাদের মধ্যে এই ঘৃণ্য পাপাচার কিভাবে সংক্রমিত হইয়াছিল তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, যে বিষয়টি তাহাদেরকে নারীদের ত্যাগ করিয়া পুরুষদের সহিত কুকর্ম করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহা এই যে, তাহাদের আবাসিক এলাকায় এবং আবাসিক এলাকার বাহিরেও পথিপার্শ্বে তাহাদের ফলের বাগান ছিল। তাহারা দুর্ভিক্ষের শিকার হইলে তাহারা পরস্পর বলিল, তোমরা পথিপার্শ্বের বাগানসমূহের ফল পথিক-মুসাফিরদেরকে খাইতে নিষেধ করিলে তাহা দ্বারা তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা হইয়া যাইত। তাহারা বলিল, আমরা তাহাদেরকে কিভাবে নিষেধ করিব? তাহারা পরস্পরের মুখামুখী হইয়া বলিল, ঐ বাগানের ব্যাপারে তোমরা এই নীতি অবলম্বন কর যে, তোমাদের অপরিচিত কোন বিদেশী তোমাদের জনবসতিতে আসিলে তোমরা তাহার মালপত্র লুণ্ঠন করিয়া নিজ দখলে নাও এবং তাহার সহিত কুকর্ম কর। ইহা করিলে লোকেরা আর তোমাদের এলাকা দিয়া যাতায়াত করিবে না। (তাহাতে তোমাদের পথিপার্শ্বের বাগানের ফল রক্ষা পাইবে)। অতঃপর নিকটস্থ পাহাড় হইতে সুদর্শন ও সুশ্রী যুবকের বেশে শয়তান পথিকরূপে তাহাদের নিকট আবির্ভূত হইল। তাহারা তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার দিকে ধাবিত হইয়া তাহার সহিত কুকর্ম করিল এবং তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। অতঃপর সে চলিয়া গেল। ইহার পর হইতে কোন আগন্তুকের আবির্ভাব হইলেই তাহারা তাহার সহিত উক্তরূপ কদর্য আচরণ করিত এবং ইহা তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয় গেল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের নিকট লূত (আ)-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদেরকে এই কদর্য অপকর্ম হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন, তাহাদেরকে শাস্তির ভয় দেখাইলেন এবং তাহাদেরকে ইহা পরিহারের অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্ববাসীর কেহ করে নাই।... অতঃপর তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে হাদীছের অবশিষ্ট অংশ বর্ণনা করেন (আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬২)।

ইবরাহীম (আ)-এর শরীআতে আগন্তুক মেহমানের আপ্যায়নের সুব্যবস্থা করা ফরয ছিল (প্রাগুক্ত)। এই ফরয আদায় না করিয়া তাহারা আগন্তুকের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লওয়ার পর তাহার সহিত জোরপূর্বক কুকর্ম করিত এবং ইহার পরিণতিতে ঈমানের অন্যতম ভূষণ "লজ্জাশীলতা" তাহাদের চক্ষু ও চরিত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। সমকামিতার পাশাপাশি তাহারা রাহাজানি ও লুটতরাজে মাতিয়া থাকিত। তাহারা অভিনব পদ্ধতিতে ব্যবসায়ীর পণ্য লুণ্ঠন করিত। কোন ব্যবসায়ী তাহাদের এলাকায় পৌঁছিলে তাহার পণ্য হইতে তাহাদের প্রত্যেকে একটু একটু করিয়া লইয়া যাইত। এইভাবে তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইলে কোন ব্যক্তি আসিয়া বলিত, আমি তোমার এই যৎকিঞ্চিৎ মাল নিয়াছি, এই তাহা ফেরত দিলাম। বণিক বলিত, আমার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে,

আমি এই সামান্য জিনিস ফেরত লইয়া কি করিব? তুমি ইহা লইয়া যাও। অতঃপর সে উহা লইয়া চলিয়া যাওয়ার পর আরেকজন আসিয়া একই কথা বলিত। এইভাবে বণিক তাহার মূলধন হারাইয়া রিক্তহস্ত হইয়া যাইত (নাজ্জারের কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১১২)।

ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারা (রা) তাঁহার এক দাসকে হযরত লূত (আ)-এর কুশলাদি জ্ঞাত হওয়ার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। সে সাদূম শহরে পৌঁছিলে তথাকার এক ব্যক্তি তাহার মাথায় প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে রক্তাক্ত করিয়া বলে, এই রক্ত তোমার শরীরে থাকিলে তোমার ক্ষতি হইত। অতএব আমাকে রক্ত বাহির করার পারিশ্রমিক দাও। অতঃপর তাহাকে লইয়া বিচারকের দরবারে উপস্থিত হইলে সে রায় প্রদান করে যে, আহত ব্যক্তি সাদূমীকে তাহার মাথায় প্রস্তর নিক্ষেপ ও রক্তপাতের পারিশ্রমিক প্রদান করিবে। আগন্তুক ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া বিচারকের মস্তকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে আহত করিবার পর বলিল, আমি যে তোমার মাথায় প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছি উহার পারিশ্রমিক সাদূমীকে প্রদান কর। এই বলিয়া সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে (নাজ্জারের কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১১২)। ইমাম বুখারী (র) বলেন, সাদূমের কাযীর বিচার সংক্রান্ত ঘটনাটি পাঠ করিবার পরই আমি আল-মা'আররীর নিম্নোক্ত কবিতার অর্থ অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছি ঃ

وَاَىُّ امْرِئٍ فِى النَّاسِ اَلْفِىْ قَاضِيًا + وَلَمْ يَمْضِ اَحْكَامًا لِحَكَمِ سَدُوْمِ .

"কে আছে এমন যে সাদূমে প্রচলিত আইন কার্যকর করে না–এইরূপ একজন বিচারকের সন্ধান দিতে পারে" (যায়নুল আবিদীন, কাসাসুল কুরআন, পৃ. ১৪৫)!

এই ধরনের আরও বিচিত্র ঘটনা ইয়াহূদীদের তালমূদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কখনও তাহারা আগন্তুককে আশ্রয় দিয়া গোপনে তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিত। কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য চাহিলে তাহাকে তাহারা আহার তো করাইতই না, বরং সে অনাহারে মারা গেলে তাহার পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া লইত। লূত (আ) ও তাঁহার কন্যাদ্বয় অভুক্তকে আহার করাইলে তাহারা তাঁহাদেরকে ভর্ৎসনা করিত (তালমূদের বরাতে সীরাতে সারওয়ারে আলম, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ৪২-৩)। এই কয়টি ঘটনা হইতে তাহাদের নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের জঘন্য চিত্র ফুটিয়া উঠে। এই নির্লজ্জ ও আল্লাহদ্রোহী সম্প্রদায়কে সুপথে আনার জন্য হযরত লূত (আ) দীর্ঘ বিশ বৎসর (মুরূজুয যাহাব, ১খ, পৃ. ৫৭; আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬২) ধরিয়া দীনের দাওয়াত দিতে থাকেন, আল্লাহ্র গযবের ভয় দেখান, অপরাধীদেরকে পাপাচার ত্যাগ করিলে তাহাদের জন্য সৌভাগ্যের দরজা খুলিয়া যাওয়ার আশ্বাসবাণীও শুনান। তাহারা তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করা তো দূরের কথা, বরং তাহারা তাঁহার চরম শত্রু হইয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহাকে আল্লাহ্র গযব আনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। কুরআন মজীদের ভাষায় লূত (আ)-এর নসীহত এবং তাহাদের গর্হিত আচরণের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ . اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ . وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ .

"আর আমি লূতকেও পাঠাইয়াছিলাম। সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা এমন কুকর্ম করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছাড়িয়া পুরুষের নিকট গমন কর। তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, ইহাদেরকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা অতি পবিত্র হইতে চাহে" (৭ ঃ ৮০-৮২)।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِالْمُرْسَلِيْنَ . اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ . اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ . فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ . وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ . قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ . قَالَ اِنِّىْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ . رَبِّ نَجِّنِىْ وَاَهْلِىْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ .

"লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করিয়াছিল। যখন উহাদের ভ্রাতা লূত উহাদেরকে বলিল, তোমরা কি সাবধান হইবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি ইহার জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাহি না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে। বিশ্বজগতের মধ্যে তো তোমরাই পুরুষের সহিত উপগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদেরকে তোমরা বর্জন করিয়া থাক। তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। উহারা বলিল, হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হইবে। লূত বলিল, আমি তোমাদের এই কর্মকে ঘৃণা করি। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে উহারা যাহা করে, তাহা হইতে রক্ষা কর" (২৬ ঃ ১৬০-১৬৯)।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ . اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ . فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ .

"স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা জানিয়া-শুনিয়া কেন অশ্লীল কাজ করিতেছ? তোমরা কি কামতৃপ্তির জন্য নারীদের ছাড়িয়া পুরুষে উপগত হইবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু বলিল, লূত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ হইতে বহিষ্কৃত কর, ইহারা তো এমন লোক যাহারা পবিত্র সাজিতে চাহে" (২৭ ঃ ৫৪-৫৬)।

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ . اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِىْ نَادِيْكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

"স্মরণ কর লূতের কথা, সে তাহার সম্প্রদায়কে বলিয়াছিল, তোমরা তো এমন অশ্লীল কর্ম করিতেছ, যাহা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেহ করে নাই। তোমরাই তো পুরুষে উপগত হইতেছ,

তোমরাই তো রাহাজানি করিয়া থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করিয়া থাক। উত্তরে তাহার সম্প্রদায় শুধু এই বলিল, আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি আনয়ন কর–যদি তুমি সত্যবাদী হও" (২৯ ঃ ২৮-২৯)।

লজ্জা-শরম ত্যাগ করিয়া মানুষ যদি একবার বেহায়া হইতে পারে, তবে তাহার পক্ষে হেন কাজ নাই যাহা সে করিতে পারে না। লূত সম্প্রদায়ের বেলায়ও তাহাই ঘটিয়াছিল। "তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কর্ম করিয়া থাক" বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, তাহারা তাহাদের অশ্লীল ও লজ্জাকর ঘৃণ্য কর্ম প্রকাশ্যভাবে লোকজনের উপস্থিতিতে করিত। যেমন অপর আয়াতে বলা হইয়াছে, "তোমরা লোকচক্ষুর সামনে এই নির্লজ্জ কাজ করিতেছ" (২৭ ঃ ৫৪)? তাফসীরে উছমানী, তাফহীমুল কুরআন ও মাআরিফুল কুরআনে এরূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে (২৯ ঃ ২৯ আয়াতাধীন তাফসীর দ্র.)। গর্হিত কর্মে লিপ্ত হওয়া যেমন অপরাধ, তাহা প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনে করা একটি অতিরিক্ত পাপ হিসাবে গণ্য (মাআরিফুল কুরআন, পূ. স্থা.)। লজ্জাশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইহাকে সুন্নাতুল মুরসালীন তথা নবী-রাসূলগণের আদর্শ (তিরমিযী, নিকাহ, বাব ১), ঈমানের অন্যতম শাখা এবং দীন ইসলামের চরিত্র আখ্যায়িত করা হইয়াছে। মহানবী (স) বলেন ঃ

اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ.

"লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা" (বুখারী ঈমান, বাব উমূরিল ঈমান, ১খ, পৃ. ৬, কলিকাতা সং; মুসলিম, ঈমান, বাব ঃ আদাদি শুআবিল ঈমান, ১খ, পৃ. ৪৭, দেওবন্দ সং; আবূ দাঊদ, আদাব, বাব ফিল হায়া, ২খ, পৃ. ৩২১, দেওবন্দ সং; নাসাঈ, ঈমান, বাবুল হায়া; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জামে, বাব মা জাআ ফিল হায়া)।

اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَاِنَّ خُلُقَ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ .

"প্রতিটি ধর্মের একটি স্বকীয় চরিত্র আছে। ইসলামের স্বকীয় চরিত্র হইল লজ্জাশীলতা" (ইব্‌ন মাজা, যুহ্‌দ, বাবুল হায়া, ২খ, পৃ. ৩০৮, দেওবন্দ সং; বৈরূত সং, ২খ, বাব ১৭, নং ৪১৮১ ও ৪১৮২; মুওয়াত্তা, কিতাবুল জামে, বাব মা জায়া ফিল হায়া)।

اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلَى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ .

"পূর্বকালের নুবুওয়াতের কথা হইতে মানুষ যাহা লাভ করিয়াছে তাহার মধ্যে এই বাক্যটিও আছে ঃ তুমি যদি নির্লজ্জ হও তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার" (বুখারী, আম্বিয়া, সর্বশেষ বাব, ১খ, পৃ. ৪৯৫, কলিকাতা সং; আদাব, বাব ঃ ইযা লাম তাসতাহ্‌য়ি..., ২খ, পৃ. ৯০৪, করাচী সং; আবূ দাঊদ, আদাব, বাব ফীল হায়া, ২খ, পৃ. ৩২১, দেওবন্দ সং; ইব্‌ন মাজা, পূ. স্থা.)।

শাস্তির ফেরেশতার আগমন

প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ) ও পরে হযরত লূত (আ)-এর নিকট আগত মানবরূপী ফেরেশতাগণের সহিত লূত সম্প্রদায়ের আচরণেও তাহাদের কদর্য পাপাচারের চিত্র ফুটিয়া উঠে। শাস্তির ভয়াবহ বার্তাসহ ফেরেশতা আগমনের বিষয় কুরআন মজীদের চার স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ۔ فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ... فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطٍ ۔ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۔ يٰاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ قَالَ يٰقَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ۔ قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ ۔ قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ۔ قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ اِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا اَصَابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ۔

"আমার ফেরেশতাগণ তো সুসংবাদ লইয়া ইবরাহীমের নিকট আসিল। তাহারা বলিল, সালাম। সেও বলিল, সালাম। সে অবিলম্বে কাবাবকৃত এক গো-বৎস লইয়া আসিল। সে যখন দেখিল, তাহাদের হস্ত উহার দিকে প্রসারিত হইতেছে না, তখন তাহাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। তাহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা তো লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।... অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হইল এবং তাহার নিকট সুসংবাদ আসিল তখন সে লূতের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার সহিত বাদানুবাদ করিতে লাগিল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল, কোমল হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী। হে ইবরাহীম! ইহা হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে; তাঁহাদের প্রতি আসিবে এমন শাস্তি যাহা অনিবার্য। আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের আগমনে সে বিষণ্ন হইল এবং নিজকে তাহাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল, ইহা নিদারুণ দিন। তাহার সম্প্রদায় তাহার নিকট উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং পূর্ব হইতে তাহারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! ইহারা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য ইহারা পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে হেয় করিও না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নাই? তাহারা বলিল, তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, আমরা কি চাই তাহা তো তুমি জানই। সে বলিল, তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় লইতে পারিতাম! তাহারা বলিল, হে লূত! নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। উহারা কখনও তোমার নিকট পৌঁছিতে পারিবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময় তোমার স্ত্রী ব্যতীত তোমার পরিজনসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছন দিকে না তাকায়। উহাদের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে। নিশ্চয় প্রভাত উহাদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে" (১১ : ৬৯-৮১)?

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا. قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ. قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ. ...قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ. قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ. اِلَّا اٰلَ لُوْطٍ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ. اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ. فَلَمَّا جَاءَ اٰلَ لُوْطٍ الْمُرْسَلُوْنَ. قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ. قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ. وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ. وَقَضَيْنَا اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰؤُلَاءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ. وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ. قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ. قَالُوْا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ. قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنٰتِىْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ.

"আর তাহাদেরকে অবহিত কর ইবরাহীমের মেহমানদের কথা। যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সালাম, তখন সে বলিয়াছিল, আমরা তোমাদের আগমনে আতঙ্কিত। তাহারা বলিল, ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি...। সে বলিল, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে? তাহারা বলিল, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে। তবে লূতের পরিবারের বিরুদ্ধে নহে। আমরা তাহার স্ত্রী ব্যতীত তাহাদের সকলকে রক্ষা করিব। আমরা স্থির করিয়াছি যে, সে অবশ্যই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ফেরেশতাগণ যখন লূত পরিবারের নিকট আসিল, তখন লূত বলিল, তোমরা তো অপরিচিত লোক। তাহারা বলিল, না, উহারা যে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল আমরা তোমার নিকট তাহাই লইয়া আসিয়াছি। আমরা তোমার নিকট সত্য সংবাদ লইয়া আসিয়াছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তুমি তাহাদের পশ্চাদনুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পশ্চাত দিকে না তাকায়। তোমাদেরকে যেথায় যাইতে বলা হইয়াছে তোমরা তথায় চলিয়া যাও। আমি তাহাকে এই বিষয়ে ফয়সালা জানাইয়া দিলাম যে, প্রত্যূষে উহাদেরকে সমূলে বিনাশ করা হইবে। নগরবাসীরা উল্লসিত হইয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, ইহারা আমার মেহমান, অতএব তোমরা আমাকে বেইজ্জত করিও না। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমাকে হেয় করিও না। উহারা বলিল, আমরা কি দুনিয়া সুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করি নাই? লূত বলিল, একান্তই যদি তোমরা কিছু করিতে চাহ তবে আমার এই কন্যাগণ রহিয়াছে। তোমার জীবনের শপথ! উহারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হইয়া আছে" (১৫ ঃ ৫১-৭২)।

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ. قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. وَلَمَّا اَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا

لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنَجُّوْكَ وَاَهْلَكَ اِلَّا امْرَاَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

"যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহীমের নিকট আসিল, তখন তাহারা বলিয়াছিল, আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করিব। ইহার অধিবাসীরা তো যালেম। ইবরাহীম বলিল, এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে। উহারা বলিল, সেখানে কাহারা আছে তাহা আমরা ভাল জানি। আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত, সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসিল, তখন তাহাদের জন্য সে বিষণ্ন হইয়া পড়িল এবং নিজেকে তাহাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল। তাহারা বলিল, ভয় করিও না, দুঃখও করিও না, আমরা তোমাকে ও তোমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করিব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত, সে তো পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ হইতে শাস্তি নাযিল করিব, কারণ উহারা পাপাচার করিতেছিল" (২৯ ঃ ৩১-৩৪)।

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ. فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ. فَقَرَّبَهٗ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ. فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ. ......قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ. قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ. لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ. مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ.

"তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি? যখন তাহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, সালাম, তখন সেও বলিল, সালাম। ইহারা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর ইবরাহীম তাহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি ভাজা মাংসল গো-বৎস লইয়া আসিল। সে তাহা তাহাদের সামনে রাখিল এবং বলিল, তোমরা খাইতেছ না কেন? ইহাতে তাহাদের সম্পর্কে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, ভীত হইও না। অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিল...। ইবরাহীম বলিল, হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কি? তাহারা বলিল, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে– উহাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করার জন্য। সেইগুলি তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে সীমালংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত" (৫১ ঃ ২৪-৩৪)।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে লক্ষ্য করা যায় যে, ফেরেশতাগণ একটি ব্যক্তিগত সুসংবাদ ও একটি জাতিগত দুঃসংবাদসহ প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আগমন করেন। তাঁহারা তাঁহাকে একজন জ্ঞানবান পুত্রসন্তান লাভের সুসংবাদ প্রদানের পর লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের দুঃসংবাদ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিন সদস্যবিশিষ্ট ফেরেশতাগণের এই দলটির প্রধান ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ) এবং অপর দুইজন ছিলেন হযরত মীকাঈল ও হযরত ইসরাফীল (আ)

(আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯১; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৭৯)। বাইবেলেও তিনজন ফেরেশতার আগমনের কথা আছে, যদিও তাহাদের নামোল্লেখ করা হয় নাই (দ্র. আদিপুস্তক, ১৮ ঃ ২)। ফেরেশতাগণ কেন ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বার্তা অবহিত করিয়া অতঃপর লূত (আ)-এর এলাকায় পৌঁছিয়া তাঁহাকেও একই বিষয় অবহিত করিয়াছিলেন, সরাসরি তাঁহার নিকট আসিলেন না কেন? এই প্রসঙ্গে ইব্নুল আছীর (র) লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া ইবরাহীম দম্পতিকে ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ জানাইতে বলেন (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯১)। তাই তাহারা আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, হযরত লূত (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শরীআতের অনুসারী। তাঁহার উপর কোন কিতাব নাযিল হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না বা তাঁহাকে কোন স্বতন্ত্র শরীআতী ব্যবস্থাও প্রদান করা হয় নাই; বরং ইবরাহীম (আ)-এর শরীআতের বাস্তবায়নের জন্যই তাঁহার উপর সাদূম এলাকার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই হিসাবে সাদূমীরা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উম্মাতেরই একটি অংশ। আল্লাহ্ তাঁহার উম্মাতের একটি অংশকে ধ্বংস করার বিষয়টি তাঁহাকে অবহিত করিয়াছেন। কুরআন ও বাইবেল হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁহাকে সাদূমবাসীর ধ্বংসের কথা জানানো হইলে ফেরেশতাগণের সহিত তাঁহার বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার কারণ এই ছিল যে, তাঁহার উম্মাতের একটি অংশের এইরূপ করুণ পরিণতিতে তিনি বিচলিত না হইয়া পারেন না (দ্র. ১১ ঃ ৭৪ এবং ২৯ ঃ ৩২)। বাইবেলের বর্ণনাও কিঞ্চিৎ পার্থক্যসহ একইরূপ। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তিনজন পুরুষ লোক আসিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে একজন পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দিলেন। তিনি তাহাদের জন্য যথারীতি ভুনা গো-বৎস ও রুটি পেশ করিলে তাঁহারা তাহা আহার করেন। অতঃপর তাঁহারা সদোম অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ইবরাহীম (আ) তাহাদেরকে বিদায় দিতে অগ্রসর হইলেন। এই অবস্থায় সদাপ্রভু তাঁহাকে সদোমবাসীর ধ্বংসের কথা অবহিত করেন। সদাপ্রভু বলিলেন যে, সদোমের ও ঘমোরার ক্রন্দন আত্যন্তিক এবং তাহাদের পাপ অতিশয় ভারী । ইবরাহীম (আ) সদাপ্রভুর নিকট আবেদন করিয়া বলিলেন, "সেই নগরে যদি পঞ্চাশজন ধার্মিক পাওয়া যায়, তবে আপনি কি তথাকার পঞ্চশজন ধার্মিকের অনুরোধে সেই স্থানের প্রতি দয়া না করিয়া তাহা বিনষ্ট করিবেন? দুষ্টের সহিত ধার্মিকের বিনাশ করা, এই প্রকার কর্ম আপনার হইতে দূরে থাকুক.... সমস্ত পৃথিবীর বিচারকর্তা কি ন্যায়বিচার করিবেন না? সদাপ্রভু কহিলেন, আমি যদি সদোমের মধ্যে পঞ্চশজন ধার্মিক দেখি, তবে তাহাদের অনুরোধে সেই সমস্ত স্থানের প্রতি দয়া করিব" (আদিপুস্তক, ১৮ ঃ ৮-২৬)। এইভাবে ইবরাহীম (আ) ক্রমাগত ৪৫ জন, ৪০ জন, ৩০জন, ২০ জন ও ১০ জন পর্যন্ত আসিয়া একই কথা বলিলে, সদাপ্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দেন যে, দশজন মুমিন পাওয়া গেলেও তিনি সেই এলাকাবাসীকে ধ্বংস করিবেন না (বিস্তারিত দ্র. আদিপুস্তক, ১৮ ঃ ১-৩৩)। এখানেও উম্মতকে রক্ষা করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আকুতি লক্ষ্য করা যায়।

হযরত ইবরাহীম (আ) স্বভাবসুলভভাবে সম্মানিত মেহমানদের সেবা-যত্নে তৎপর হন এবং ভুনা গো-শাবক তাহাদের সামনে পেশ করেন, কিন্তু তাঁহারা আহার গ্রহণে বিরত থাকেন (দ্র. ১১ ঃ ৭০ ও ৫১ ঃ ২৬)। ইহাতে ইবরাহীম (আ)-এর মনে ভীতির উদ্রেক হইল। তখন তাহারা পরিচয় পেশ করিয়া তাহাকে অভয় দান করেন এবং তাঁহাকে একজন ভাগ্যবান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করেন, সঙ্গে সঙ্গে লূত-সসম্প্রদায়ের ধ্বংসের বার্তাও অবহিত করেন (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯০-৯১)। ইবরাহীম (আ)-এর ভীতি ভাব দূরীভূত হইলে তিনি ফেরেশতাগণের সহিত লূত-সম্প্রদায়ের ধ্বংসের ব্যাপারে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, তাহাদের মধ্যে যদি ৫০ জন ঈমানদার মানুষ থাকে, তবুও কি তাহাদেরকে ধ্বংস করা হইবে? ফেরেশতাগণ বলিলেন, তাহাদের মধ্যে পঞ্চাশজন মুমিন থাকিলে তাহাদেরকে ধ্বংস করা হইবে না। ইবরাহীম (আ) ৪০ জন, ৩০ জন, ২০ জন, এইভাবে শেষ পর্যন্ত বলিলেন, যদি ১০ জন মুমিন থাকে? ফেরেশতাগণ বলিলেন, ১০ জন মুমিন থাকিলেও তাহাদের ধ্বংস করা হইবে না (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৭০-৭৩)। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, সুদ্দী, কাতাদা ও মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে ইব্ন কাছীর যে সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ ঃ ৩০০ জন, অতঃপর ২০০ জন, অতঃপর ৪০ জন , অতঃপর ১৪ জন মুমিন থাকিলেও ফেরেশতাগণ লূত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করিবেন না বলিয়া ইবরাহীম (আ)-কে নিশ্চয়তা দেন। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, ইবরাহীম (আ) শেষ পর্যন্ত বলিলেন, যদি একজন মুমিন থাকে? ফেরেশতাগণ বলিলেন, একজন মুমিন থাকিলেও তাহাদেরকে ধ্বংস করা হইবে না (বিদায়া, ১খ , প্র. ১৭৯)। ছা'আলিবীর বর্ণনায় উক্ত সংখ্যা পর্যায়ক্রমে নিম্নরূপ ঃ ৪০০ জন, ৩০০ জন, ২০০ জন, ১০০ জন, ৪০ জন ও ১৪ জন (আরাইস, পৃ. ১১০)। অবশেষে *ইবরাহীম (আ) বলিলেন, اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا "এই জনপদে তো লূত রহিয়াছে" (২৯ ঃ ৩২)। ফেরেশেতাগণ জবাবে বলিন, نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ اِلَّا امْرَاَتَهٗ "সেথায় কাহারা আছে, তাহা আমরা ভালো জানি। আমরা তো লূতকে ও তাহার পরিজনবর্গকে রক্ষা করিবই, তাহার স্ত্রীকে ব্যতীত" (২৯ ঃ ৩২)।

লূত সম্প্রদায়ের জন্য ইবরাহীম (আ)-এর এই অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া মহান আল্লাহ তাঁহাকে চূড়ান্তভাবে জানাইয়া দিলেন যে, তিনি যেন তাহাদের জন্য কোনরূপ ওজরখাহি না করেন। কারণ তাহাদের ধ্বংসের বিষয়টি অবধারিত হইয়া গিয়াছে।

يٰاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاۤءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ.

"হে ইবরাহীম! ইহা (বাদানুবাদ) হইতে বিরত হও; তোমার প্রতিপালকের বিধান আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের প্রতি আসিবে এমন শাস্তি যাহা অনিবার্য" (১১ ঃ ৭৬)।

অতঃপর ফেরেশতাগণ লূত সম্প্রদায়ের বসতি সাদূমের দিকে রওয়ানা হইয়া গেলেন। তাহারা লূত (আ)-এর সংগে তাঁহার কৃষিভূমিতে কর্মরত অবস্থায় সাক্ষাত করেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন ঃ "আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসিল, তখন

তাহাদের আগমনে সে বিষণ্ন হইল, নিজকে তাহাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করিল এবং বলিল, ইহা নিদারুণ দিন" (১১ : ৭৭)। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বলিয়া দিয়াছেন যে, সাদূমীদের বিরুদ্ধে লূত (আ) -এর চারিবার সাক্ষ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত যেন তাহাদেরকে ধ্বংস না করা হয়। তিনি আগন্তুকদেরকে লইয়া নিজ বাড়িতে রওয়ানা হইলেন এবং পথিমধ্যে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা এই জনপদবাসীর চরিত্র সম্পর্ক অবহিত কিনা। তিনি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করিয়া তাহাদেরকে বলিলেন যে, ইহাদের তুলনায় অধিক নিকৃষ্ট ও খবীস লোক পৃথিবীতে আছে কি না তাহা তাঁহার জানা নাই।

(اَشْهَدُ بِاللّٰهِ اَنَّهَا لَشَرُّ قَرْيَةٍ فِى الْاَرْضِ وَمَا اَعْلَمُ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اُنَاسًا اَخْبَثُ مِنْهُمْ) তিনি উক্ত বাক্যের পরপর চারিবার সাক্ষ্য প্রদান করেন (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯২; বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৭৯; আরাইস, পৃ. ১১০-১১)। অপর বর্ণনায় কথিত আছে যে, তাহারা সাদূমের নগরদ্বারে পৌঁছিয়া লূত (আ) -এর কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এখানে থাকার মত কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। লূত-কন্যা এখানে ব্যবস্থা আছে, এই কথা জানাইয়া ফেরেশতাদেরকে বলিলেন যে, তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহারা যেন নগরে প্রবেশ না করেন। তিনি তাহাদের সম্পর্কে তাহার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অনিষ্টের আশংকা করিতেছিলেন। পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহাকে আগন্তুকদের কথা জানাইলেন। লূত (আ) নগরদ্বারে পৌঁছিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাহাদেরকে নিজ বাড়িতে লইয়া যান। তাঁহার বিশ্বাসঘাতকিনী স্ত্রী সাদূমীদের নিকটে খবর পৌঁছায় যে, তাহার ঘরে অত্যন্ত সুদর্শন কয়েকজন যুবক আসিয়াছে। মানবরূপী ফেরেশতাত্রয়কে দেখিয়া হযরত লূত (আ) চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া পড়েন (দ্র. ১১ : ৭৭ ও ২৯ : ৩৩)। তাঁহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ এই ছিল যে, একদিকে তাঁহার সম্প্রদায় বহিরাগতদেরকে আশ্রয় দিতে তাঁহাকে বারণ করিয়া দিয়াছিল (দ্র. ১৫ : ৭০); দ্বিতীয়ত, তাহারা ছিল পাপাচারী (দ্র. ৭ : ৮০-৮১ এবং ১১ : ৭৮)। তাহারা এই সুদর্শন যুবকত্রয়ের খোঁজ পাইলে তাহাদেরকে অপদস্ত করিতে চাহিবে এবং অপকর্মে লিপ্ত হইবে, তাহাতে বাঁধা প্রদানের ক্ষমতা তাঁহার নাই (দ্র. ১১ : ৮০)। তিনি যাহা আশংকা করিলেন বাস্তবে তাহাই ঘটিল। পাষণ্ড শহরবাসী লূত–স্ত্রীর মারফত মেহমানদের কথা অবহিত হওয়া মাত্র উল্লসিত হইয়া (দ্র. ১৫ : ৬৭) দ্রুতবেগে উদভ্রান্তের মত (দ্র. ১১ : ৭৮) ছুটিয়া আসিল এবং তথায় পৌঁছিয়া তাঁহার নিকট আগন্তুকদেরকে দাবি করিল (দ্র. ১১ : ৭৯ ও ৫৪ : ৩৭)। ইহারা ঘুণাক্ষরেও টের পাইল না যে, তাহারাই ইহাদের সমূলে ধ্বংসের বার্তাবাহী দূত (দ্র. বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৮০-৮১)। লূত (আ) ইহাদেরকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের অপদস্ত করিয়া আমাকে অপমান করিও না। এই যে আমার কন্যাগণ রহিয়াছে, যাহারা তোমাদের জন্য পবিত্র, তোমাদের মধ্যে কি একটি উত্তম লোকও নাই (দ্র. ১১ : ৭৮ এবং ১৫ : ৬৮-৬৯)। ইহারা উত্তরে বলিল, তোমার কন্যাদের আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা কি চাই তাহা তুমি অবশ্যই জান (দ্র. ১১ : ৬৯)। আমরা কি তোমাকে দুনিয়া শুদ্ধ আগন্তুকদেরকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করি নাই (দ্র. ১৫ : ৭০)? ইহারা হযরত লূত (আ)-কে

দেশ হইতে বহিষ্কারের হুমকি দিল (দ্র. ৭ ঃ ৮২; ২৭ ঃ ৫৬)। তিনি তাহাদেরকে আল্লাহ্‌র গযবের ভয় দেখাইলেন ঃ

وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ .

"লূত উহাদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছে কিন্তু উহারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বিতণ্ডা শুরু করিল" (৫৪ ঃ ৩৬)।

ইহাতে তাহারা ভীত-শংকিত না হইয়া বরং লূত (আ)-কে চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিল, তুমি সত্যবাদী হইয়া থাকিলে আল্লাহ্‌র গযব লইয়া আস (দ্র. ২৯ ঃ ২৯)। ইহারা আসলেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়া গিয়াছিল, তাই চরমভাবে দুর্বিনীত হইয়া উঠিল। মহান আল্লাহ মহানবী (স)-এর জীবনের শপথ করিয়া বলেন ঃ

لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ .

"তোমার জীবনের শপথ! উহারা তো মত্ততায় বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল ঃ" (১৫ ঃ ৭২)।

তাফসীরকারগণ বলেন, লূত (আ)-এর শত অনুনয়-বিনয় ও অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তাহারা তাঁহার মেহমানদের উপর চড়াও হইতে উদ্যত হইলে তিনি ভিতর হইতে ঘরের দরজা বন্ধ করিযা দেন এবং তাহাদেরকে ঘরে প্রবেশে যথাসাধ্য বাধা দিতে থাকেন। তাহারা ঘরের দরজায় প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া দরজা ভাঙ্গিবার উপক্রম করিলে, তিনি দরজা খুলিয়া দেন এবং দরজার আড়াল হইতে তাহাদেরকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন; অবশেষে একান্তই নিরুপায় হইয়া বলেন ঃ

لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ .

"তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় লইতে পারিতাম" (১১ ঃ ৮০)।

লূত (আ)-এর কথা শুনামাত্র মানবরূপী ফেরেশতাগণ তাঁহাকে বলিলেন, আপনার স্তম্ভ (আশ্রয়স্থল) খুবই সুদৃঢ়। তাহারা নিজেদের আসল পরিচয় ব্যক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ধ্বংসের বার্তা শুনাইয়া দিলেন ঃ

قَالُوْا يَا لُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ اِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا اَصَابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ .

"তাহারা বলিল, হে লূত! নিশ্চয় আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশতা। উহারা কখনও তোমার নিকট পৌঁছিতেই পারিবে না। সুতরাং তুমি রাত্রির কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বাহির হইয়া পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেহ যেন পিছনদিকে না তাকায়, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। উহাদের যাহা ঘটিবে তাহারও তাহাই ঘটিবে। নিশ্চয়ই প্রভাত উহাদের জন্য নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নহে" (১১ ঃ ৮১; আরও দ্র. ১৫ ঃ ৫৭-৬৬)?

উমায়্যা ইব্‌ন আবুস সালত ছন্দাকারে অতি সংক্ষেপে ঘটনাটি এভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন ঃ

ثم لوط اخو سدوم اتاها — اذ اتاها برشدها وهداها

راودوه عن ضيفه ثم قالوا — قد نهيناك ان تقيم قراها

عرض الشيخ عند ذاك بنات — كظباء بأجرا ترعاها

غضب القوم عند ذاك وقالوا — ايها الشيخ خطة ناباها

اجمع القوم امرهم وعجوز — خيب الله سعيها ورجاها

ارسل الله عند ذاك عذابا — جعل الارض سفلها اعلاها.

ورماها بحاصب ثم طين — ذى حروف مسوم اذ رماها .

"অতঃপর সাদূম ভ্রাতা লূত তাহাদের নিকট আগমন করিলেন। তিনি আগমন করিলেন তাহাদের নিকট তাহাদের জ্ঞান ও হিদায়াতসহ। (কিন্তু) তাহারা তাঁহার নিকট তাঁহার মেহমানদেরকে দাবি করিল। অতঃপর বলিল, আমরা আপনাকে নিষেধ করিয়াছিলাম জনপদে কোন মেহমানকে জায়গা না দিতে! শায়খ তখন তাহার কন্যাগণকে পেশ করিলেন, যাহারা ছিল সমতল ভূমিতে বিচরণকারী হরিণীর ন্যায়। কওম তখন রাগান্বিত হইয়া বলিল, হে শায়খ! ইহা এমন কর্ম যাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি।"

কওম ও এক বৃদ্ধা মহিলা তাহাদের সিদ্ধান্তে ঐকমত্য হইল, আল্লাহ তাহাদের প্রচেষ্টা ও কামনা ব্যর্থ করিয়া দিলেন, আল্লাহ্ তখন শাস্তি প্রেরণ করিলেন। ভূমিকে উল্টাইয়া দিলেন এবং প্রবল বাতাসের মুখে উহাকে নিক্ষেপ করিলেন, অতঃপর উহাতে বিক্ষেপ করিলেন মাটির শক্ত ঢেলা যাহাতে তাহাদের নামাংকিত ছিল" (মুজামুল বুলদান, ৩খ, পৃ. ২০১)।

শাস্তি অবতরণ

কোন জাতির নিকট নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব না পাঠানো পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা সেই জাতিকে তাহাদের অপরাধের কারণে ধ্বংস করেন না।

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰي نَبْعَثَ رَسُوْلًا .

"আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাহাকেও শাস্তি দেই না" (১৭ ঃ ১৫)।

নবী এবং তাঁহার আনীত বার্তা বান্দার অভিযোগ উত্থাপন করিতে না পারার জন্য আল্লাহর তরফ হইতে প্রমাণ (হুজ্জাত)। এই প্রমাণ পূর্ণরূপে পেশ না করা পর্যন্ত বান্দাকে শাস্তি প্রদান ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। অন্যথায় বান্দা এই আপত্তি উত্থাপন করার সুযোগ পায় যে, তাহাদেরকে অনুসরণীয় বিষয় অবহিত করা হয় নাই, তাই তাহারা শাস্তিযোগ্য হইবে কেন? অতএব ন্যায়বিচারের স্বার্থে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়া মানবজাতিকে তাঁহার বিধান অবহিত করেন এবং তাহা মানিয়া লওয়ার আহবান জানান। একটি নির্দিষ্ট কাল ব্যাপিয়া নবী-রাসূলগণ দাওয়াত দিতে থাকেন এবং

তাহাদের আহ্বানে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী সাড়া না দিলে তাহাদেরকে ক্রমান্বয়ে ছোটখাট বিপদ দ্বারা সতর্ক করা হয়। যেমন সূরা ইয়াসীনে অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হইয়াছে ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ. قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ. قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ. قَالُوْا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ. قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ. وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ. اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

"উহাদের নিকট এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর, যখন তাহাদের নিকট রাসূলগণ আসিয়াছিল। যখন উহাদের নিকট দুইজন রাসূল পাঠাইয়াছিলাম, তখন উহারা তাহাদেরকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছিল। অতঃপর আমি তাহাদেরকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা তো তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। উহারা বলিল, তোমরা আমাদের মতই মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই নাযিল করেন নাই। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলিতেছ। তাহারা বলিল, আমাদের প্রতিপালক জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। উহারা বলিল, আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করিব এবং আমাদের পক্ষ হইতে অবশ্যই তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবে। তাহারা বলিল, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, ইহা কি এইজন্য যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিতেছি? বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। নগরীর প্রান্ত হইতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিল। সে বলিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাহাদের , যাহারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যাহারা সৎপথ প্রাপ্ত" (৩৬ ঃ ১৩-২১)।

উদ্ধত সম্প্রদায় এই লোকটিকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে ধ্বংসাত্মক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করান ঃ

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ خٰمِدُوْنَ. يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ. اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ.

"আমি তাহার মৃত্যুর পর তাহার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হইতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না। উহা ছিল কেবলমাত্র এক মহানাদ। ফলে উহারা নিথর

নিস্তব্ধ হইয়া গেল। পরিতাপ বান্দাদের জন্য, উহাদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে তখনই উহারা তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছে। ইহারা কি লক্ষ্য করে না যে, উহাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠী আমি ধ্বংস করিয়াছি, যাহারা উহাদের মধ্যে আর ফিরিয়া আসিবে না" (৩৬ ঃ ২৮-৩১)?

অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আ) দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার জাতিকে বিভিন্নভাবে বুঝানোর পরও যখন তাহারা সৎপথে আসিল না, তখন আল্লাহ তাহাদেরকে ধ্বংস করেন (উদাহরণস্বরূপ দ্র. সূরা নূহ)। যে জাতির ধ্বংসের ঘটনাই কুরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে সেখানেই লক্ষ্য করা যায় যে, নবী-রাসূলগণ একটি উল্লেখযোগ্য কাল ধরিয়া তাহাদের সৎপথে আনয়নের সার্বিক চেষ্টা করার পর যখন ব্যর্থ হইয়াছেন তখনই আল্লাহ তাহাদেরকে ধ্বংস করিয়াছেন। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলার আযাব নাযিল হওয়ার বেলায় একই অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। তিনি শেষ মুহূর্তে বলিলেন ঃ

اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ·

"ইহারা আমার মেহমান। অতএব তোমরা আমাকে বেইজ্জত করিও না। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর" (১৫ ঃ ৬৮-৬৯; আরও দ্র. ১১ ঃ ৭৮)।

কিন্তু তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করার পরিবর্তে লূত (আ)-কে কঠোর ভাষায় হুমকি দিল এবং তওবার সর্বশেষ সুযোগও গ্রহণ করিল না। অথচ আযাব নাযিলের এই সর্বশেষ মুহূর্তেও যদি তাহারা তওবা করিত তবে আল্লাহ তাহাদের তওবা কবুল করিতেন, যেমন তিনি আযাব নাযিলের পূর্ব মুহূর্তে হযরত ইয়ূনুস (আ)-এর জাতির তওবা কবুল করিয়া তাহাদেরকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ·

"তবে ইয়ূনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হইল না যাহারা ঈমান আনিত এবং তাহাদের ঈমান তাহাদের উপকারে আসিত? তাহারা যখন ঈমান আনিল তখন আমি তাহাদের উপর হইতে পার্থিব জীবনের হীনতাজনক শাস্তি দূর করিলাম" (১০ ঃ ৯৮)।

উল্লেখ্য যে, নীনাওয়াবাসী হযরত ইয়ূনুস (আ)-এর দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাদের কর্মফলের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্র গযব আসিলে তাহারা অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্র দরবারে তওবা করে। আল্লাহ তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের তওবা কবুল করেন এবং তাহাদেরকে উপস্থিত শাস্তি হইতে নাজাত দেন।

এই পরিস্থিতিতে হযরত জিবরাঈল (আ) লূত সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নিজের একটি ডানা বিস্তার করিলে উহার আঘাতে পাপাচারীদের চক্ষুসমূহের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইল এবং উহারা অন্ধ হইয়া লূত (আ)-কে হুমকি দিয়া প্রাচীরের সঙ্গে ধাক্কা খাইতে খাইতে বলিতে লাগিল, আগামী কাল তাঁহাকে

দেখিয়া লইব (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯২; বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮১; আরাইস, পৃ. ১১২; বাইবেলের আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ১১)। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ·

"উহারা লূতের নিকট হইতে তাহার মেহমানদেরকে অসদুদ্দেশে দাবি করিল, তখন আমি উহাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করিয়া দিলাম এবং বলিলাম, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম" (৫৪ ঃ ৩৭)।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত লূত (আ) তাঁহার পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যাওয়ার পর তিনি ফেরেশতাগণকে তাহাদের উপর শাস্তি কার্যকর করিতে বলিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, তাহারা প্রত্যূষে তাহাদেরকে ধ্বংস করিতে আদিষ্ট (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯২; বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮১)। লূত (আ)-এর সহিত কেবল তাঁহার পরিবারের সদস্যগণই ছিলেন। কুরআন মজীদের বক্তব্য হইতে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় ঃ

اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ · اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَابِرِيْنَ · ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ·

"যখন আমি তাহাকে ও তাহার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিলাম, এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আমি অবশিষ্টদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলাম" (৩৭ ঃ ১৩৪-১৩৬)।

তাঁহার সহিত ছিলেন তাঁহার ঈমানদার কন্যাদ্বয়। তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল কিনা সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে তাঁহার সহিত শহর ত্যাগ করিয়াছিল (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮১; আরাইস, পৃ. ১১২; বাইবেলের আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ১৫)। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী লূত (আ) বাহিরে যাইয়া তাঁহার জামাতাদেরকে এই জনপদ ধ্বংস হওয়ার কথা জানাইয়া তাহাদেরকে তাঁহার সহিত শহর ত্যাগের আহবান জানাইলে তাহারা তাঁহার কথা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেয় (দ্র. আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ১৪)। নাজাতপ্রাপ্ত হিসাবে কেবল হযরত লূত (আ) ও তাঁহার কন্যাদ্বয়ের কথাই জানা যায় (দ্র. কুরআন, ৭ ঃ ৮৩)। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁহার দুই কন্যা ও স্ত্রীকে লইয়াই শহর ত্যাগ করিয়াছিলেন। লূত-পরিবার ব্যতীত ঐ জনপদে আর কোন মুসলমান ছিল না। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ· فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ·

"সেইখানে যেসব মুমিন ছিল আমি তাহাদেরকে উদ্ধার করিলাম। আমি সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী পাই নাই" (৫১ ঃ ৩৫-৩৬)।

লূত-পরিবার ব্যতীত সেখানে যে একজন মুমিনও ছিল না লূত (আ)-এর বক্তব্য হইতেও উহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ·

"তোমাদের মধ্যে কি একটি ভালো মানুষও নাই" (১১ ঃ ৭৮)?

উপরন্তু ১৫ ঃ ৫০-৬০; ২৬ ঃ ১৬৯-১৭২; ২৭ ঃ ৫৭, ২৯ ঃ ৩২-৩৩ এবং ৩৭ ঃ ১৩৪-১৩৬ আয়াতসমূহ হইতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, লূত (আ)-এর স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার পরিবারের লোকজনই কেবল আল্লাহ্র গযব হইতে রক্ষা পায়। অতএব সর্বোতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঐ জনপদে লূত-পরিবারের সদস্যগণ ব্যতীত আর কোন মুমিন লোক ছিল না । ১১ ঃ ৭৮ ও ১৫ ঃ ৭১ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِيْ (আমার এই কন্যাগণ), ইহার দ্বারা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কন্যাগণকে বুঝানো হইয়াছে।

লূত (আ)-এর প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তিনি যেন তাঁহার পরিজনসহ রাত্রিকালে সাদূম ত্যাগ করেন, পথিমধ্যে তাহাদের কেহ যেন পশ্চাতে ফিরিয়া না তাকায় এবং তাহাদেরকে যেই এলাকায় সরিয়া যাইতে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা যেন সেথায় চলিয়া যান, কারণ প্রত্যূষেই সাদূমবাসীকে সমূলে ধ্বংস করা হইবে (দ্র. ১১ ঃ ৮১; ১৫ ঃ ৬৫)। নির্দেশ মোতাবেক লূত (আ) রাত্রির অন্ধকারে সপরিবারে বসতি ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার স্ত্রী পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইলে শূন্য হইতে নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৮২; আরাইস, পৃ. ১১৩)। বাইবেলে বলা হইয়াছে যে, সে পশ্চাতে তাকাইলে একটি লবণস্তম্ভে রূপান্তরিত হইয়া যায় (দ্র. আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ২৬)। তাঁহারা নিরাপদ এলাকায় সরিয়া যাওয়ার পর ভোরবেলা সূর্য উদিত হইলে আল্লাহ্র অমোঘ নির্দেশ বাস্তবায়িত হইল (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৮১-৮২; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৩; আরাইস, পৃ. ১১২; আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ২৪)। হযরত জিবরাঈল (আ), মতান্তরে হযরত মীকাঈল (আ) তাঁহার দুইটি ডানা মাটির গর্ভে প্রবিষ্ট করাইয়া সাদূমবাসীর সমগ্র এলাকা শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন। তখন মোরগ ও কুকুরের মত প্রাণীরা গগণবিদারী আর্তনাদে চীৎকার করিয়া উঠিল, শূন্য হইতে প্রস্তর বর্ষিত হইল এবং গোটা এলাকাকে উল্টাইয়া শূন্য হইতে সজোরে নিক্ষেপ করা হইল। এভাবে মুহূর্তের মধ্যে একটি জনবসতি পৃথিবীর বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। চতুষ্পদ জন্তু হইতেও নিকৃষ্ট মানবরূপী পিশাচগুলির সঙ্গে নিষ্পাপ প্রাণীগুলিও ধ্বংস হইল (বিদয়া, ১খ, পৃ. ১৮২; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৩; আরাইস, পৃ. ১১৩; বাইবেলের আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ২৪-২৫)। চল্লিশ লক্ষ (মতান্তরে চার হাজার ও চার শত) জনবসতি সম্বলিত পাঁচটি এলাকা (বিদায়ায় সাতটি) সাদূম, সাবআ, আমুরা (বাইবেলে ঘমোরা), দূমা, সাঊত ইত্যাদি চিরকালের জন্য মানবজাতির শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে পরিণত হইল (পূর্বোক্ত বরাত)। কুরআন মজীদের বিভিন্ন সূরায় এই গযব নাযিলের বিভিষীকাময় দৃশ্য এভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে ঃ

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۔

"আমি তাহাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কি হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর" (৭ ঃ ৮৪)।

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَنْضُوْدٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ـ

"অতঃপর যখন আমার আদেশ আসিল তখন আমি জনপদকে উল্টাইয়া দিলাম. এবং উহাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করিলাম প্রস্তর কংকর, যাহা তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে চিহ্নিত ছিল। ইহা যালেমদের হইতে দূরে নহে" (১১ ঃ ৮২-৮৩।

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ـ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ـ

"অতঃপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ উহাদেরকে আঘাত করিল। আর আমি জনপদকে উল্টাইয়া উপর-নীচ করিয়া দিলাম এবং উহাদের উপর প্রস্তর কংকর বর্ষণ করিলাম" (১৫ ঃ ৭৩-৭৪)।

وَلَقَدْ اَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِيْ اُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا ـ

"উহারা তো সেই জনপদ দিয়াই যাতায়াত করে যাহার উপর বর্ষিত হইয়াছিল অশুভ বৃষ্টি। তবে কি উহারা ইহা প্রত্যক্ষ করে না? বস্তুত উহারা পুনরুত্থানের আশা করে না" (২৫ ঃ ৪০)।

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ـ

"আমি তাহাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট" (২৬ ঃ ১৭৩; আরও দ্র. ২৭ ঃ ৫৮)।

قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ـ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ـ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ـ

"তাহারা বলিল, আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হইয়াছে। যাহাতে আমরা তাহাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি, যাহা সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে চিহ্নিত" (৫১ ঃ ৩২-৩৪)।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ـ فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى ـ

"তিনি উল্টানো আবাসভূমিকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। উহাকে আচ্ছন্ন করিল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি" (৫৩ ঃ ৫৩-৫৪)।

উক্ত আয়াতে "আল-মু'তাফিকাহ" বলিতে হযরত লূত (আ)-এর শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় বুঝানো হইয়াছে অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের বসতিসমূহ যাহা তাহাদেরসহ উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে উহার উপরিভাগ নিচে এবং নিচের ভাগ উপরে করিয়া দেওয়া হইয়াছে (কুরতুবীর আহ্কামুল কুরআন, ২৭ খ, পৃ. ১২০, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ.; তাফসীরে তাবারী, ২৭খ, পৃ. ৪৭, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮; তাফসীরে কবীর, ২৯খ, পৃ. ২৪; তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, পৃ. ৪৪৮, বৈরূত সং; মুরূজুয যাহাব, ১খ, পৃ. ৫৭ তাফসীরে 'উছমানী, পৃ. পৃ. ৭০১, টীকা ৬; তাফহীমুল কুরআন, ৫৩ ঃ ৫৩ আয়াতের ব্যাখ্যাধীন, টীকা ৪৬; মা'আরেফুল কুরআন, সৌদী সং, পৃ. ১৩১১)।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ .

"আমি উহাদের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নহে, তাহাদেরকে উদ্ধার করিয়াছিলাম রাত্রের শেষাংশে" (৫৪ ঃ ৩৪)।

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ . فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ .

"প্রত্যূষে বিরামহীন শাস্তি তাহাদেরকে আঘাত করিল এবং (আমি বলিলাম,) আস্বাদন কর আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম" (৫৪ ঃ ৩৮-৩৯)।

দীর্ঘ বিশটি বৎসর (মুরূজ, ১খ, পৃ. ৫৭) ধরিয়া আল্লাহ্র রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী একটি দুষ্ট-স্বভাব জাতিকে প্রদত্ত শাস্তি ছিল কত ভয়াবহ। একদিকে বজ্র নিনাদে প্রচণ্ড ঝটিকা তাড়িত প্রস্তর বৃষ্টি, অপরদিকে গোটা জনবসতির উপর ভূ-স্তরের উল্টানো মাটির চাপ! প্রতিটি পাথরের উপর অঙ্কিত ছিল নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম এবং তদনুসারে তাহা নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর আঘাত হানে। আল্লাহ তা'আলার গযবে এলাকাটি দুর্গন্ধময় সমুদ্রে পরিণত হয়, ইহার পানি বা উপকূলের জমি কোনটিই মানুষের উপকারে আসে না (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৮২-৮৩)। ছা'আলাবী তাঁহার কাসাস গ্রন্থে একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। মহানবী (স) মেঘের গর্জন শুনিলেই লূত সম্প্রদায়ের উপর বর্ষিত সেই প্রচণ্ড ঝটিকাবাহী প্রস্তর বৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়া ভীত-বিহ্বল হইতেন ঃ

إِنِّي لَأَسْمَعُ الْعَوَاصِفَ وَالْقَوَاصِفَ مِنَ الرَّعْدِ فَأَخْشَى أَنَّهَا الْحِجَارَةُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِقَوْمِ لُوطٍ أَوْ مَنْ يَّفْعَلُ فِعْلَهُمْ .

"আমি অবশ্যি শুনিতে পাই বজ্রধ্বনিতে প্রলয়ংকরী ঝটিকার শব্দ। ফলে আমি এই কথা ভাবিয়া শংকিত হই যে, ইহা সেই প্রস্তর কিনা যাহা লূত জাতির জন্য অথবা তাহাদের অনুরূপ কুকর্মে লিপ্তদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল" (পৃ. ১১২)।

লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ ও মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা

আল্লাহ্ তা'আলা পাপাচারী যে জাতিকেই ধ্বংস করিয়াছেন, বহু কাল ব্যাপিয়া মানবজাতির শিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং তাহাদেরকে সতর্ক করার জন্য তাহা দর্শনীয় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি মানবজাতিকে অপরাধী যালেম সম্প্রদায়সমূহের ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহা হইতে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন ঃ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ .

"বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যাহারা সত্যকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে" (৬ ঃ ১১)।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ .

"আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠাইয়াছি আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার এবং তাগূতকে (সীমা লংঘনকারীকে) বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য। অতঃপর উহাদের কতকের উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হইয়াছিল। অতএব তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ, যাহারা সত্যকে মিথ্যা বলিয়াছিল তাহাদের পরিণাম কী হইয়াছে" (১৬ ঃ ৩৬)?

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ٠

"বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অপরাধীদের কী পরিণাম হইয়াছিল তাহা পর্যবেক্ষণ কর" (২৭ ঃ ৬৯; আরও দ্র. ৩ ঃ ১৩৭; ২৭ ঃ ১৪; ২৮ ঃ ৪০ ও ৩০ ঃ ৪২)।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা লূত সম্প্রদায়ের পরিণতিও স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণের জন্য মানবজাতিকে আহবান জানাইয়াছেন ঃ

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ٠

"আমি তাহাদের উপর ভীষণভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কী হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য কর" (৭ ঃ ৮৪)।

লূত সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত জনপদের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনসমূহ আল্লাহ তা'আলা বোধশক্তিসম্পন্ন, বিবেকবান ও মর্মান্তিক পরিণতি সম্পর্কে সজাগ মানুষের জন্য উপদেশ গ্রহণের বিষয় হিসাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগেও অবশিষ্ট ছিল। হিজায হইতে আরব বণিকদল যে পথ ধরিয়া সিরিয়া যাতায়াত করিত, উক্ত ধ্বংসাবশেষ সেই পথেই অবস্থিত ছিল। এই কারণে আরবগণ লূতসম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ১খ, পৃ. ২৫২)। আরবগণ, বিশেষত কুরায়শ গোত্র মহানবী (স)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকিলে মহান আল্লাহ তাহাদেরকে বারবার স্মরণ করাইয়া দেন ঃ

وَمَا هِىَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ ٠

"ইহা (ধ্বংসাবশেষ) যালেমদের হইতে দূরে নহে" (১১ ঃ ৮৩)।

অর্থাৎ এই প্রকারের শাস্তি আজও যালেমদের হইতে মোটেও দূরবর্তী নহে (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৩০৫, টীকা ১১; তাফহীমুল কুরআন, সূরা হূদ-এর ৯৩ নং টীকা)।

وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ٠ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ٠

"ইহা তো লোক চলাচলের পথিপার্শ্বে এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই ইহাতে মুমিনদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে" (১৫ ঃ ৭৬-৭)।

অর্থাৎ হিজায হইতে সিরিয়া এবং ইরাক হইতে মিসর যাওয়ার পথিপার্শ্বে এই ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত এবং যাত্রীদল এই পুরা এলাকায় ছড়াইয়া থাকা ধ্বংসাবশেষের চিহ্নাদি দেখিতে পায় (তাফহীম, সূরা হিজর, টীকা ৪২)। এই ধ্বংসাবাশেষ স্বচক্ষে দেখিয়া কেবল ঈমানদার জনগোষ্ঠীই

শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। কারণ তাহারা মনে করে যে, লূত জাতির পাপাচার ও দৌরাত্মের শাস্তিস্বরূপই এই সম্প্রদায়ের বসতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ঈমানদারগণ ব্যতীত অন্যরা যতদূর সম্ভব এই ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাকে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা অথবা উহা কোন প্রাকৃতিক কারণে ঘটিয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করে (তাফসীরে উছমানী, পৃ.৩৫২, টীকা ৫)।

وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۔

"কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই মুমিন নহে" (২৬ ঃ ১৭৪)।

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۔

"আমি বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে (ধ্বংসাবশেষে) রাখিয়াছি একটি নিদর্শন" (২৯ ঃ ৩৫)।

وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۔ وَبِالَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۔

"তোমরা তো উহাদের ধ্বংসাবশেষগুলি সকালে ও সন্ধ্যায় অতিক্রম করিয়া থাক। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করিবে না।" (৩৭ ঃ ১৩৭-৮)।

আল্লামা শাববীর আহমাদ উছমানী বলেন, উক্ত আয়াতে নাফরমান মক্কাবাসীদেরকে বলা হইয়াছে যে, তথা হইতে যেসব কাফেলা সিরিয়ায় যাতায়াত করে তাহাদের রাস্তায় তাহারা লূত সম্প্রদায়ের বিধ্বস্ত জনপদ দেখিতে পায়। অর্থাৎ রাত-দিন তাহারা এই নিদর্শনসমূহ দেখিতেছে, ইহার পরও কি তাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিবে না, তাহারা কি বুঝে না যে, এই অবাধ্য সম্প্রদায় যে করুণ পরিণতির শিকার হইয়াছে, অন্যান্য অবাধ্য সম্প্রদায়েরও অনুরূপ অবস্থা হইতে পারে (তাফসীর, পৃ. ৬০১, টীকা ৩)?

وَتَرَكْنَا فِيْهَا اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۔

"যাহারা মর্মান্তিক শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাহাদের জন্য উহাতে একটি নিদর্শন রাখিয়াছি" (৫১ ঃ ৩৭)।

অর্থাৎ এখনো তথায় বিধ্বস্ত জনপদের নিদর্শন বিদ্যমান আছে এবং লূত সম্প্রদায়ের সাংঘাতিকভাবে ধ্বংস হওয়ার ঘটনায় আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয়কারীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের উপকরণ আছে (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৬৯৩, টীকা ৫)।

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۔

"আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য ইহাতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছি" (২৯ ঃ ৩৫)।

উক্ত আয়াতসমূহ হইতে বুঝা গেল যে, লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে কেবল তাহারাই শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে, সতর্ক ও সাবধান হইতে পারিবে, যাহারা আল্লাহ্র শাস্তিতে ভীত প্রজ্ঞাবান মু'মিন।

বাইবেলের বর্ণনা, গ্রীক ও লাতিন প্রাচীনলিপি এবং আধুনিক কালের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা যায় যে, লূত সাগরের পূর্ব ও দক্ষিণের যে অঞ্চলটি জনশূন্য অবস্থায় পরিত্যক্ত আছে সেখানে বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, যাহা হইতে অনুমিত হয় যে, এক কালে এখানে মানববসতি ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনুমান এই যে, খৃ. পূ. ২৩০০-১৯০০ সাল পর্যন্ত এখানে মানববসতি ছিল এবং ঐতিহাসিকগণের ধারণা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর দুই হাজার বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই অঞ্চলটি হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ)-এর যুগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অঞ্চলের সর্বাধিক বসতিপূর্ণ ও শস্য-শ্যামল অংশকে বাইবেলে জর্দান এলাকা বলা হয়, মিসর দেশের ন্যায়, সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় জর্দান এলাকা বলা হইয়াছে যাহা সোয়র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যাহা মিসর দেশের ন্যায়, সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় সবুজ-শ্যামল ছিল, সদোম ও ঘমোরা ছিল ইহার কেন্দ্রীয় শহর (দ্র. আদিপুস্তক, ১৩ ঃ ১০)। আধুনিক কালের বিশেষজ্ঞগণের মতে এই এলাকাটি লূত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে লূত সাগর দক্ষিণ দিকে এতখানি বিস্তৃত ছিল না যতটা বর্তমানে বিস্তৃত (আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জারের মতে লূত জাতির ধ্বংসাবশেষে লূত সাগরের সৃষ্টি, পূর্বে এখানে কোন সমুদ্র ছিল না)। ট্রান্স-জর্দানের বর্তমান শহর আল-কিরক (কারাক?)-এর সম্মুখে পশ্চিম দিকে এই সাগরে আল-লিসান নামে যে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ ছিল, প্রাচীন কালে তাহা ছিল সমুদ্রের পানির শেষ সীমানা। উহার নিম্নাংশ, যাহা বর্তমানে পানির নিচে, পূর্বে ইহা ছিল শস্য-শ্যামল একটি উপত্যকা। ইহাই ছিল সিদ্দিম উপত্যকা, যেখানে লূত জাতির বড় বড় শহর সাদূম, আমুরাহ, আদমা, দাবূইন ও দুগার অবস্থিত ছিল। হযরত ঈসা (আ)-এর প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এই এলাকা মাটির নিচে ধ্বসিয়া যায় এবং মৃত সাগরের পানি উহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। তাফসীরে মাজেদীর মতে ২০৬১ খৃ. পূ. সালে (পৃ. ৩০০, টীকা ১২৮ এবং পৃ. ৩৪৩, টীকা ১১১) ইহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উক্ত তাফসীরে আরও বলা হইয়াছে যে, লূত জাতির বসতি ছিল জর্দান নদীর অববাহিকায় যেখানে আজ মৃতসাগর অবস্থিত। তাহাদের বৃহৎ শহর সাদূম ও আমূরাহ (ঘমোরা) মৃত সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল। মক্কার কুরায়শগণ সিরিয়া সফরকালে বরাবর এই পথ ধরিয়া যাতায়াত করিত (পূ. গ্র., পৃ. ৪৭৬, টীকা ১২৩; আরও দ্র. তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৬০১, টীকা ৩; তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল-হিজর, টীকা ৪২)।

বাইবেল এবং প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন রচনাবলী হইতে জানা যায় যে, কোথাও কোথাও খনিজ তৈল ও পিচ (asphall)-এর খনি ছিল এবং কোন কোন স্থান হইতে আগ্নেয় গ্যাসও উদগীরিত হইত। বর্তমান কালেও সেখানে খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় অনুমান করা হইয়াছে যে, ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোল, গ্যাস ও পিচ ভূ-অভ্যন্তর হইতে উথলিয়া উঠে এবং সমগ্র অঞ্চল উহার বিষাক্ত বাষ্পে উড়িয়া যায়। বাইবেলে বলা হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ইহার ধ্বংসের খবর পাইয়া হেবরণ (আল-খলীল) হইতে এই প্রান্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মাটির বুক হইতে ইটের ভাটার মত ধোঁয়া উড়িতেছে (তু' আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ২৮)।

লূত সম্প্রদায়ের ধ্বংসের মধ্যে ঈমানদার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত আছে। আল্লাহ তা'আলাই তাঁহার ঈমানদার বান্দাদের রক্ষক। তিনি প্রয়োজনের মুহূর্তে সঙ্গিন

পরিস্থিতির মধ্যে তাহাদের নাজাতের পথ বাহির করিয়া দেন, যেমন লূত সম্প্রদায়ের উপর আপতিত শাস্তি হইতে তিনি তাঁহার মুমিন বান্দাদের উদ্ধার করিয়াছেন।

اذْ نَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ ۔ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ ۔

"আমি লূতকে ও তাহার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, এক বৃদ্ধা (লূতের স্ত্রী) ব্যতীত, যে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৭ ঃ ১৩৪-১৩৫)।

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

"সেথায় যেসব মুমিন ছিল, আমি তাহাদেরকে উদ্ধার করিয়াছিলোম" (৫১ ঃ ৩৫)।

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّا اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ ۔

"আমি উহাদের উপর প্রেরণ করিয়াছিলাম প্রস্তর বহনকারী প্রচণ্ড ঝটিকা, কিন্তু লূত পরিবারের উপর নহে। তাহাদেরকে আমি রাত্রির শেষ প্রহরে উদ্ধার করিয়াছিলাম–আমার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ। যাহারা কৃতজ্ঞ আমি এইভাবেই তাহাদেরকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি" (৫৪ ঃ ৩৪-৩৫)।

মুক্তির উপায় ঈমান ও নেক আমল

কুরআন মজীদে আল্লাহ্র গযবে যে কয়েকটি সম্প্রদায়ের ধ্বংস হওয়ার কথা উল্লেখ আছে, তাহাতে লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তথাকার নেক বান্দাদেরকে তাঁহার বিশেষ ব্যবস্থায় গযব নাযিলের পূর্ব মুহূর্তে উদ্ধার করিয়া লইয়াছেন। অতএব মুক্তির একমাত্র উপায় হইতেছে ঈমান ও তদনুযায়ী আমল, কোন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক নহে। হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী এবং হযরত নূহ (আ)-এর স্ত্রী ও এক পুত্রের ঈমান না থাকার কারণে নবীর সহিত আত্মীয়তা সম্পর্ক সত্ত্বেও তাহারা শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই, বরং অন্যান্য পাপীদের সহিত তাহারাও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۔

"আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন। উহারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু উহারা তাহাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ফলে নূহ ও লূত উহাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না এবং উহাদেরকে বলা হইল, তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সহিত জাহান্নামে প্রবেশ কর" (৬৬ ঃ ১০)।

হযরত নূহ (আ)-এর নাফরমান পুত্র যখন ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ মহা প্লাবনে ডুবিয়া যাইতেছিল তখন তিনি বলিলেন ঃ

رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ ۔

"হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত" (১১ ঃ ৪৫)।

মহান আল্লাহ তাঁহার মহান নবীর আবেদনের উত্তরে বলিলেন ঃ

يٰنُوحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۔

"হে নূহ! সে তো তোমার পরিবারভুক্ত নহে। সে অবশ্যই অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই সেই বিষয়ে তুমি আমাকে অনুরোধ করিও না" (১১ ঃ ৪৬)।

উপরিউক্ত ঘটনাত্রয় হইতে প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা রক্তের বন্ধন কাহাকেও অপকর্মের পরিণতি হইতে রক্ষা করিতে পারে না। আল্লাহ্র অবাধ্য যেই ব্যক্তিই হউক তাহার ঠিকানা জাহান্নাম।

দীনের দাওয়াত দানকারীদের জন্য শিক্ষণীয়

হযরত লূত (আ)-এর জীবনে আল্লাহ্র দীনের দা'ওয়াত দানকারীর জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে।

(১) তিনি তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার মহান পথপ্রদর্শক হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আনুগত্য করিয়াছেন সুখে-সম্পদে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায়। যুবক বয়সে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া এবং পিতৃব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়া তিনি এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন।

২. ধৈর্যের সহিত দীর্ঘ বিশটি বৎসর ধরিয়া তিনি সাদূমবাসীদের মধ্যে আল্লাহ্র দীনের প্রচার করিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে সাদূমবাসীরা তাঁহার আহ্বানে সাড়া না দেওয়া সত্ত্বেও তিনি দা'ওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন এবং নৈরাশ্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

৩. তিনি মহাসত্যকে মানুষের সামনে পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে প্রচলিত পাপাচার ও অন্যায়-অত্যাচারের কঠোর ও তীব্র সমালোচনা করেন এবং অপরাধীদেরকে তাহা পরিহার করিয়া সচ্চরিত্রতা, সততা ও আল্লাহভীতি অবলম্বনের দা'ওয়াত দেন।

৪. আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখিয়া দা'ওয়াতী কাজের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পার্থিব উপায়-উপকরণও ব্যবহার করিতে হইবে।

৫. প্রতিকূল অবস্থায়ও পরোপকারে তৎপর থাকিতে হইবে। হযরত লূত (আ) তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের জীবন বিপন্ন করিয়াও আগন্তুকগণের নিরাপত্তার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৬. দা'ওয়াত দানকারীর দা'ওয়াত কেহ কবুল না করিলেও তিনি তাহার প্রচেষ্টার পূর্ণ প্রতিদান লাভ করিবেন এবং দা'ওয়াত দানের দায়িত্ব পালনকারীরূপে গণ্য হইবেন।

৭. হাজারও বাধা-বিপত্তির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার মুক্তির পথ বাহির করিয়া দেন।

হযরত লূত (আ)-এর দুইটি উক্তির তাৎপর্য

মানববেশে তিন ফেরেশতার আগমনে হযরত লূত (আ)-এর বাড়িতে যে এক কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে তিনি একান্তই নিরূপায় হইয়া সাদূমীদিগকে (লক্ষ্য) করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

يٰقَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ ·

"হে আমার সম্প্রদায়! ইহারা আমার কন্যা, তোমাদের জন্য ইহারা পবিত্র" (১১ ঃ ৭৮)।

هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ·

"একান্তই তোমরা যদি কিছু করিতে চাহ তবে আমার এই কন্যাগণ রহিয়াছে" (১৫ ঃ ৭১)।

হযরত লূত (আ)-এর এই কথার তাৎপর্য নির্ধারণে তাফসীরকার ও মুহাদ্দিছগণের মধ্যে তিনটি মত লক্ষ্য করা যায়। (১) ইমাম কুরতুবীর মতে, হযরত লূত (আ) এখানে তাঁহার ঔসরজাত কন্যাদেরকে বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার কথার তাৎপর্য হইল ঃ

اُزَوِّجُكُمُوْهُنَّ فَهُوَ اَطْهَرُ لَكُمْ مِمَّا تُرِيْدُوْنَ · هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ اَىْ اَحَلُّ ·

"আমি ইহাদেরকে তোমাদের সহিত বিবাহ দেই, তোমরা যাহা ইচ্ছা করিয়াছ তাহা তোমাদের জন্য হালাল হইবে" (আহ্কামুল কুরআন, ৯খ, পৃ. ৭৬)। তাবিঈগণের মধ্যে হযরত কাতাদা (র)-এর মতে উক্ত আয়াতে লূত (আ)-এর কন্যাগণকে বুঝানো হইয়াছে (তাফসীরে কবীর, ১৭খ, পৃ. ১৩২)। আল্লামা যামাখশারীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন (কাশশাফ, ২খ, পৃ. ২৮৩, বৈরূত সং)। হাসান ইবনুল ফাদল ও যাজ্জাজের মতও তাই, তবে তাহাদের মতে ইসলাম গ্রহণের শর্তে তিনি তাহাদের সহিত কন্যাগণের বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন (রূহুল মাআনী, ১২খ, পৃ. ১০৬, বৈরূত সং)। কতক তাফসীরকারের মতে, তৎকালে কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে আন্ত-বিবাহ জায়েয ছিল এবং পরে তাহা নিষিদ্ধ হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁহার কন্যা যয়নব (রা)-কে আবুল 'আস ইবনুর রবীর সহিত এবং কন্যা রুকায়্যা (রা)-কে আবূ লাহাবের পুত্র উতবার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন, অথচ দুই জামাতাই তখন পৌত্তলিক ছিল (রুহূল মাআনী, ১২খ, পৃ. ১০৬; কুরতুবী, ৯খ, পৃ. ৭৬; কাশশাফ, ২খ, পৃ. ২৮৩)।

কতক তাফসীরকারের মতে, হযরত লূত (আ) কর্তৃক তাঁহার নিজ কন্যাদেরকে প্রদান সম্পর্কিত কথার ভিন্নতর তাৎপর্য আছে। যেমন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত হইতে দেখিয়া উৎপীড়ককে বলিল, তাহাকে নির্যাতন করিও না, বরং তাহার পরিবর্তে আমাকে মার। বক্তার কথাটির তাৎপর্য এই নহে যে, নির্যাতিতকে ছাড়িয়া তাহাকেই নির্যাতন করা হউক, বরং ইহার অর্থ হইল, নির্যাতন করা হইতে নির্যাতককে বিরত করা। হযরত লূত (আ)-এর কথার তাৎপর্যও ইহাই। ইমাম রাযী, ইসফাহানী, আবুস সুঊদ প্রমুখ তাফসীরকার এবং আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ২৬৫)।

অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, হযরত লূত (আ) "ইহারা আমার কন্যা" কথাটি দ্বারা তাঁহার উম্মতের নারীদেরকে বুঝাইয়াছেন। কারণ নবীগণ স্ব স্ব উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য। অর্থাৎ তিনি সাদূমীদেরকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নারিগণই তো আছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সমকামিতা পরিহার কর। তাবিঈগণের মধ্যে মুজাহিদ ও

সাঈদ ইবন জুবায়র (র) এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন (তাফসীরে কুরতুবী, ৯খ, পৃ. ৭৬; তাফসীরে কবীর, ১৭খ, পৃ. ৩২; তাফসীরে তাবারী, ১৫খ, পৃ. ৪১৩-৪ ইত্যাদি)। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে (তাফসীরে ইবন আব্বাস, পৃ. ১৮৯ ও ২১৯)।

উপমহাদেশীয় তাফসীরকারগণ অন্যান্য মতের আলোচনা করে প্রধানত এই শেষোক্ত মতকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের মতে নবী-রাসূলগণ হইলেন নিজ নিজ উম্মাতের আধ্যাত্মিক পিতা। (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৩০৫, টীকা ২; পৃ. ৩৫৮, টীকা ১৪; তাফহীমুল কুরআন, উর্দূ, ৩খ, পৃ. ৫৭৩; তাফসীরে মাজেদী, উর্দূ, পৃ. ৪৭৫, টীকা ১১৬)।

(২) হযরত লূত (আ) শত অনুনয়-বিনয় করিয়াও যখন সাদূমীদেরকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন মনে মনে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন ঃ

لَوْ اَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ ‏.

"তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকিত অথবা যদি আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় লইতে পারিতাম" (১১ ঃ ৮০)!

"যদি আমার শক্তি থাকিত", "আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় লইতে পারিতাম" কথা দ্বারা হযরত লূত (আ) কোন শক্তির আশ্রয় লইতে চাহিয়াছেন? উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়ও মতভেদ আছে। তাফসীরকারগণ ইহার বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। একদল তাফসীরকারের মতে এখানে পার্থিব শক্তিই বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার দৈহিক শক্তি, সন্তান-সন্ততির শক্তি ও গোত্রীয় শক্তি, (তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, পৃ. ১৭৯; কুরতুবী, ৯খ, পৃ. ৭৮; তাফসীরে কবীর, ১৭খ, পৃ. ৩৪; ফী জিলালিল কুরআন, ৪খ, পৃ. ১৯১৪; তাফসীরে কাশশাফ, ২খ, পৃ. ২৮৩। ইমাম নববী (র)-ও একই কথা বলিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, লূত (আ) অন্তরে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখিয়াই বাহ্যত এই কথা বলিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ৬খ, পৃ. ৪১৬; উমদাতুল কারী, ১৫খ, পৃ. ২৭০)। উপরিউক্ত শক্তির কোনটিই লূত (আ)-এর ছিল না, তাঁহার প্রচুর সংখ্যক অনুসারীও ছিল না এবং তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারীও ছিলেন না (মা'আরিফুল কুরআন, উর্দূ, ২খ, পৃ. ৪৯৩)। উপরন্তু তিনি ছিলেন তথায় একজন মুহাজির, ইরাক হইতে হিজরত করিয়া আসিয়াছিলেন।

প্রয়োজনের সময়ে পার্থিব উপায়-উপকরণের সাহায্য গ্রহণ একটি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যাপার, যাহা শরী'আতের বিধান অনুযায়ী সম্পূর্ণ বৈধ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ ‏.

"তোমরা তাহাদের মোকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখিবে, এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করিবে আল্লাহ্র শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে" (৮ ঃ ৬০)।

ইমাম রাযী (র) বলেন, এখানে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বুঝানো হইয়াছে এবং অন্যরা বলেন, শত্রুকে প্রতিহত করার যাবতীয় শক্তি বুঝানো হইয়াছে। হাদীছ হইতেও উক্ত মতে সমর্থন পাওয়া যায়। মহানবী (স) বলেন ঃ

فَمَا بَعَثَ اللّٰهُ بَعْدَهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا فِيْ ثَرْوَةٍ مِنْ قَوْمِه ·

"আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর পর হইতে যে কোন জাতির নিকট তাহাদের মধ্যকার প্রভাবশালী বংশ হইতেই নবী পাঠাইয়াছেন" (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৮০; মুসতাদরাক হাকেম, ২খ, পৃ. ৫৬১)।

অনুরূপভাবে শুআয়ব (আ)-কে তাঁহার বংশের লোকেরা বলিয়াছিল ঃ

وَاِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ·

"এবং আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখিতেছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকিলে আমরা তোমাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া মারিয়া ফেলিতাম" (১১ ঃ ৯১)।

অতএব পার্থিব শক্তির সাহায্য গ্রহণ বৈধ (তাফসীরে কবীর, ১৭খ, পৃ. ৩৪; তাফসীরে কুরতুবী, ৯খ, পৃ. ৭৮; ফাতহুল বারী, ৬খ, পৃ. ৪১৬; উমদাতুল কারী, ১৫খ, পৃ. ২৭০; তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৪৭৫, টীকা ১১৮)। কতক তাফসীরকার বলেন যে, লূত (আ) পার্থিব শক্তি অথবা আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করিয়াছেন–এই দুই অর্থই হইতে পারে (রূহুল মাআনী, ১২খ, পৃ. ১০৭)।

অপর একদল তাফসীরকার বলেন যে, লূত (আ) আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন। ইব্ন হাজার আসকালানী ও বাদরুদ্দীন আয়নী (র) দৃঢ়তার সহিত এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন এবং পূর্বোক্ত মতেরও আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্তরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে (ফাতহুল বারী, ৬খ, পৃ. ৪১৫-৬; উমদাতুলকারী, ১৫খ, পৃ. ২৭০)।

হযরত লূত (আ)-এর ইনতিকাল

লূত (আ)-এর শেষ জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁহার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর হয়তো তিনি আর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। কারণ তিনি বেশি দিন জীবিত থাকিলে পুনরায় তাঁহার নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত অতিরিক্ত কিছু তথ্য অন্তত বাইবেল, কুরআন মজীদ ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বিদ্যমান থাকিত। এই সকল উৎসই এই ব্যাপারে নীরব। বাইবেল ভিত্তিক বর্ণনা হইতে এতখানি জানা যায় যে, তিনি গযব নাযিলের পূর্বে সপরিবারে প্রথমে সোয়ার (Zoar) নামক শহরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাহা লূত সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। অতঃপর তিনি অজ্ঞাত এক পর্বতের গুহায় দুই কন্যাসহ আশ্রয় গ্রহণ করেন (Ency. Brit., vol. 14, P. 401; Collier's Ency., vol. 15, P. 20)। তিনি এখানেই ইনতিকাল করেন কি না তাহা অজ্ঞাত এবং তাঁহার জীবনকাল সম্পর্কিত তথ্যও এখানেই শেষ। ইসলামী উৎসে বলা হইয়াছে যে, গযব নাযিলের পূর্বে তিনি সিরিয়া অভিমুখে প্রস্থান করেন (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৩; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৮১)।

লূত (আ) ছিলেন এমন একজন নবী যিনি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত না হইয়া, তাঁহার সহিত সম্পর্কহীন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে যে কোন জাতির নিকট সেই জাতিভুক্ত কোন মহান ব্যক্তিকে নবীরূপে প্রেরণ করা হইয়াছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۔

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য" (১৪ ঃ ৪)।

মহানবী (স) বলেন ঃ

فَمَا بَعَثَ اللّٰهُ بَعْدَهٗ مِنْ نَبِيٍّ اِلَّا فِىْ ثَرْوَةٍ مِّنْ قَوْمِهٖ ۔

"আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর পর হইতে যে কোনও জাতির নিকট তাহাদের মধ্যকার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী বংশ হইতেই নবী প্রেরণ করিয়াছেন" (আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৬১)।

বাইবেল ভিত্তিক বর্ণনার পর্যালোচনা

বাইবেল এবং বাইবেল ভিত্তিক সাহিত্যেও লূত (আ)-এর হিজরত, লূত জাতির কেন্দ্র, তাহাদের অপকর্ম, নবীর সতর্কবাণী, ফেরেশতাগণের আগমন, লূত (আ)-এর সপরিবারে নিরাপদ আশ্রয়ে প্রস্থান, অতঃপর তাহাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিলের বিবরণ সামান্য পার্থক্যসহ মোটামুটি কুরআন মজীদ ও ঐতিহাসিক বর্ণনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। খৃস্টান লেখকগণের রচিত বিশ্বকোষসমূহে লূত (LOT) শিরোনামের অধীনে বাইবেলের বর্ণনাই সন্নিবেশিত হইয়াছে (উদাহরণস্বরূপ দ্র. বাইবেলের আদিপুস্তক, ১১, ১২, ১৩; ১৪, ১৮ ও ১৯ অধ্যায় এবং লূক, ১৭ ঃ ২৮-২৯; আরও দ্র. Ency. Brit., ১৯৬২ খৃ, ১৪খ, পৃ. ৪০১; Collier's Ency., vol. 15, P. 20; Ency. Religion, MacMillan & Co., NewYork 1987; Americana, vol 17, P. 758)।

কিন্তু বাইবেল হযরত লূত (আ) ও তাঁহার অবিবাহিতা কন্যাদ্বয়ের প্রতি এক চরম ঘৃণার্হ অপবাদ আরোপ করিয়াছে (দ্র. আদিপুস্তক, ১৯ ঃ ৩১-৩৮), যাহা বাস্তব পরিস্থিতি, বুদ্ধি, যুক্তি ও বিবেকের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে পরিস্থিতি হইতে আল্লাহ তা'আলা লূত-পরিবারকে রক্ষা করিয়াছেন, যেই প্রকারের নৈতিক পাপাচারের কারণে আল্লাহ তাআলা সাদূমবাসীকে ধ্বংস করিয়াছেন, উন্নত নৈতিক গুণের কারণে তাহা হইতে পরিত্রাণপ্রাপ্ত একটি পরিবার কখনও নিকৃষ্ট নোংরামি ও ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হইতে পারে না। পরিস্থিতির বিশ্লেষণপূর্বক মানুষের সুস্থ বুদ্ধি এই সাক্ষ্যই দিবে। কুরআন মজীদে হযরত লূত (আ)-এর যে মহান মর্যাদার উল্লেখ রহিয়াছে এবং তাঁহার স্ত্রী ব্যতীত তাঁহার পরিবারের সদস্যগণের যে প্রশংসা করা হইয়াছে, ইহার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সেই পরিবারের প্রতি প্রচলিত বাইবেলে ঐরূপ জঘন্য একটি অপবাদ আরোপ করিয়া চরম অন্যায় করা হইয়াছে। হযরত লূত (আ) সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ تَّعْمَلُ الْخَبٰٓئِثَ.... وَاَدْخَلْنٰهُ فِيْ رَحْمَتِنَا اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔

"আর আমি লূতকে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম এমন এক জনপদ হইতে যাহার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কর্মে... এবং আমি তাহাকে আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম। সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত" (২১ ঃ ৭৪-৭৫)।

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۔

"আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ, ইয়ূনুস ও লূতকে। ইহাদের প্রত্যেককে আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম" (৬ ঃ ৮৬)।

তাঁহার পরিবার এবং তাঁহার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন বংশধর সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

"আর তাহাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে (বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম)। আমি তাহাদেরকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম" (৬ ঃ ৮৭)।

আল্লাহ তা'আলা যাহাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন, কোন শক্তিই তাহাদেরকে বিন্দুমাত্র পথভ্রষ্ট করিতে পারে না।

مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيْ

"আল্লাহ্ যাহাকে সৎপথ দেখান সে-ই সৎপথ পায়" (৭ ঃ ১৭৮; আরও দ্র. ১৭ ঃ ৯৭ এবং ১৮ ঃ ১৭)।

হযরত লূত (আ)-এর পরিবারটিকে আল্লাহ তা'আলা সৎপথ দেখাইয়াছেন এবং তাহারা গোটা সাদূমবাসীর যথেচ্ছ পাপাচারের মধ্যেও নিজেদের ঈমান ও আমল সুষ্ঠু রাখিয়া আল্লাহ্‌র নিকট হইতে মুমিন পরিবার (দ্র. ৫১ ঃ ৩৬) হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আয়াতসমূহের তরজমার জন্য আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯শ মুদ্রণ, ঢাকা ১৪১৭/১৯৯৭; (২) ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ফিত-তা'রীখ, ১ম সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা নং নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত; (৩) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকার আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি.; (৪) ছা'আলিবী, কাসাসুল আম্বিয়া, (আল-মুসাম্মা বিহি আরাইসুল মাজালিস), তা. বি.; (৫) আব্দুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, দারুল ফিকার, বৈরূত তা.বি.; (৬) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত তা.বি., ১খ, পৃ. ৪৮; (৭) হাকেম নীশাপূরী, আল-মুসতাদরাক, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি., ২খ, পৃ. ৫৬০-৫৬৩; (৮) মালিক গোলাম আলী এ্যান্ড সন্স লিঃ, আনওয়ারে আম্বিয়া, ৫ম সং, লাহোর-হায়দরাবাদ-করাচী ১৯৮৫ খৃ., পৃ. ৩৯-৪৫; (৯) মুহাম্মাদ জামীল আহ্মাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, করাচী-পেশাওয়ার-হায়দরাবাদ- লাহোর, তা.বি., ১খ, পৃ. ২৩৩-২৫৩; (১০) কাযী যায়নুল আবিদীন, কাসাসুল কুরআন, ১ম সং, দেওবন্দ ১৯৯৪ খৃ., পৃ. ১৪৩-১৫২; (১১) হিফজুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন (বাংলা অনু.), ৪র্থ মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৯৯ খৃ., ১খ, পৃ. ২০৩-২০৫, ২৫২-২৭৪; (১২) আল-মাসঊদী, মুরূজুয যাহাব ওয়া মা'আদিনুল জাওহার, দারুল আন্দালুস, ৫ম সং, বৈরূত ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৫৭-৫৮; (১৩) য়াকূত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান,

বৈরূত তা.বি., ৩খ, পৃ. ২০০-২০১; (১৪) ইব্‌ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, ১ম সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, পৃ. ২৫; (১৫) ইমাম রাযী, তাফসীরে কবীর, বৈরূত তা.বি., ১৭খ, পৃ. ৩২, ৩৪; ২২খ, পৃ. ১৯০; (১৬) আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী, বৈরূত তা.বি., ১২খ, পৃ.১০৬, ১৭খ, পৃ. ৭০; (১৭) আয-যামাখশারী, তাফসীরে কাশশাফ, বৈরূত তা.বি., ২খ, পৃ. ১৮৩, ৫৭৮; (১৮) কুরতুবী, আহ্‌কামুল কুরআন, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., ৯খ, পৃ. ৭৬, ৭৮, ২৭খ, পৃ. ১২০; (১৯) ইব্‌ন জারীর আত-তাবারী, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ৩য় সং, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, ২৭খ, পৃ. ৪৭; ১২খ, পৃ. ৫৫, ৫৬; ৮খ, পৃ. ১৬৫-৬। (মিসরীয় সংস্করণ–যাহা ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত) ১১খ, পৃ. ৫১২; ১২খ, পৃ. ৫৫০; ১৫খ, পৃ. ৪১৮-৯; (২০) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী (উর্দূ), লাহোর-করাচী তা. বি., পৃ. ৩০০ ও ৪৭৫; (২১) তাফসীরে উছমানী, সৌদী সংস্করণ, সংশ্লিষ্ট আয়াতাধীন তাফসীর; (২২) সায়্যিদ মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন (উর্দূ), সংশ্লিষ্ট সূরাসমূহের সংশ্লিষ্ট আয়াতাধীন টীকা; (২৩) মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন (উর্দূ), ২য় সং, লাহোর ১৪০২/১৯৮২, ২খ, পৃ. ৪৯৩, ৩খ, পৃ. ৭৬, ৭৭ ও ৫৭৩-৫; (২৪) সায়্যিদ কুতব শহীদ, ফী জিলালিল কুরআন, ১১শ সং, কায়রো–বৈরূত ১৪০১/১৯৮১, ৪খ, পৃ. ১৯১৪; (২৫) সহীহ আল-বুখারী, কলিকাতা সং.; (২৬) সহীহ মুসলিম, দেওবন্দ সং; (২৭) জামে আত-তিরমিযী, দিল্লী সং; (২৮) সুনান নাসাঈ (আল-মুজতাবা), দেওবন্দ সং; (২৯) সুনান আবী দাউদ, কলিকাতা সং; (৩০) আলী মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, ১ম সং, হলব ১৩৯৪/১৯৭৪, ১১ খ., পৃ. ৫০৫, নং ৩২৩৬১; (৩১) ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরূত তা. বি., ৬খ, পৃ. ৪১৫-৬; (৩২) বাদরুদ্দীন আল-'আয়নী, উমদাতুল কারী, বৈরূত তা. বি., ১৫খ, পৃ. ২৭০; (৩৩) ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, সংশ্লিষ্ট সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতাধীন ব্যাখ্যা; (৩৪) ইবনুল আরাবী, আহ্‌কামুল কুরআন, বৈরূত তা.বি., ২খ, পৃ. ৭৮৬-৭; (৩৫) আবদুর রাহমান মুবারকপুরী, তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী, মাতবা'আতুল মা'রিফা, ৫খ, পৃ. ২১; (৩৬) 'আবদুর রাহমান আল-জাযীরী, কিতাবুল ফিক্‌হ 'আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, বৈরূত তা.বি., ৫খ, পৃ. ১৩৯-১৪৪।

পাশ্চাত্য উৎস ঃ (৩৭) বাংলা বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি; (৩৮) Collier's Encyclopaedia, vol. 15, P 20; (39) Encyclopedia Americana, vol. 17, P. 758; (40) Encyclopedia of Religion, MacMillan Co., New York 1987, vol. P. 16-17, vol. 10, P. 1; (41) Encyclopaedia Britannica, 1962, vol. 1, P. 819, vol. 14, P. 401, vol. 15, P. 626.

মুহাম্মদ মূসা

৯

হযরত ইসমাঈল (আ)

حضرت اسماعیل علیه السلام

হযরত ইসমাঈল (আ)

জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত ইসমাঈল (আ) আনু. খৃ. পূ. ২০৭৪ সালে (তাফসীরে মাজেদী, ১খ, ২৩১, টীকা ৪৫২) পবিত্র ভূমি জেরুসালেমে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একমাত্র পুত্র সন্তান। মাতা হাজার (রা) ছিলেন মিসরের কিবতী রাজ-বংশীয় মহিলা এবং তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বিতীয় স্ত্রী (বাইবেলে হাগার; ইব্ন সা'দ 'আজার'ও লিখিয়াছেন, ১খ, পৃ. ৪৯ ঃ উপমহাদেশের জনগোষ্ঠীর উচ্চারণ হাজেরা)। হাদীছ শরীফ হইতেও তাঁহার মিসরীয় (কিবতী বংশীয়) হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرًا فَاسْتَوْصُوْا بِاَهْلِهَا خَيْرًا فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَّرَحِمًا قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ فَسَاَلْتُ الزُّهْرِيَّ مَا الرَّحِمُ الَّذِىْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ هَاجَرُ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ مِنْهُمْ.

"কা'ব ইব্ন মালিক আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ তোমরা যখন মিসর জয় করিবে তখন তথাকার অধিবাসীদের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে। কারণ তাহাদের জন্য রহিয়াছে একটি নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি ও রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন। ইব্ন ইসহাক বলেন, আমি ইমাম যুহ্রী (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) যে রক্তের বন্ধনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কি? তিনি বলেন, ইসমাঈল (আ)-এর মাতা হাজার (রা) ছিলেন মিসরীয়" (আরাইস, পৃ. ৮৫)।

সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ হাদীছটি সহীহ মুসলিম ও ইব্ন সা'দ-এর আত-তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থেও (১খ, পৃ. ৫০) উদ্ধৃত হইয়াছে। হাজার (রা) সম্পর্কে বিস্তারিত দ্র. "ইবরাহীম" (আ) শীর্ষক নিবন্ধ।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে (বাইবেলের আদিপুস্তক, ১৬ ঃ ১৬) ইসমাঈল (আ) ছিলেন তাঁহার একমাত্র সন্তান। তিনি বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করিলে আল্লাহ তাঁহাকে উক্ত পুত্র দান করেন। কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে, হযরত ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন; رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন" (৩৮ ঃ ১০০)। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ "অতএব আমি তাহাকে পরম সহিষ্ণু এক পুত্রের সুসংবাদ দিলাম" (৩৮ ঃ ১০১)।

ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের চৌদ্দ বৎসর পর অর্থাৎ ১০০ বৎসর বয়সে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ইরাকী স্ত্রী সারার গর্ভে ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও ছিলেন তাঁহার দু'আর ফল। দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই সন্তান লাভের পর তিনি আল্লাহ্র নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ ۔

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন" (১৪ ঃ ৩৯)।

বাইবেলেও কুরআনের মত অনুরূপ দু'আ ও তাহা কবুলের প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান আছে ঃ "ইবরাহীম কহিলেন, হে প্রভু, সদাপ্রভু! তুমি আমাকে কি দিবে? আমি তো নিঃসন্তান অবস্থায় প্রয়াণ করিতেছি...... তাহার কাছে সদাপ্রভুর বাক্য উপস্থিত হইল ...... যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে" (আদিপুস্তক, ১৫ ঃ ১-৪)। "আর ইসমাঈলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম। দেখ আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব" (ঐ, ১৭ ঃ ২০)। "পরে ইবরাহীম সদাপ্রভুকে কহিলেন, ইসমাঈলই তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক" (ঐ, ১৭ ঃ ১৮)।

অতএব বাইবলে যেমন আল্লাহ তা'আলা ইসহাক (আ) হইতে পুত্র ইয়া'কূব (আ)-এর মাধ্যমে দ্বাদশ গোত্রীয় মহাজাতি উৎপন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন, তদ্রূপ ইসমাঈল (আ– হইতেও দ্বাদশ গোত্রীয় মহাজাতি উৎপন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিলেন (আদিপুস্তক, ১৭ ঃ ২০; ২১ ঃ ১৩)। ইয়াহূদী-খৃস্টান জাতি সব সময় হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অবদানকে খাটো করিয়া দেখিয়াছে। তাহারা বাইবেল হইতে এবং তাহাদের অন্যান্য গ্রন্থ হইতে কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাস এবং তাহা মানবজাতির তাওয়াফ ও ইবাদত স্থান এবং কিবলা হওয়ার প্রসঙ্গটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বাদ দিয়াছে। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য ভাষায় যেসব বিশ্বকোষ রচিত হইয়াছে, তাহাতে ইবরাহীম (আ), ইসহাক (আ) ও ইয়া'কূব (আ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকিলেও ইসমাঈল (আ) সম্পর্ক আলোচনা তেমন গুরুত্ব পায় নাই। ইসমাঈল বংশীয় মহানবী (স) ও মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়াই তাহারা এই তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের পর ইবরাহীম (আ)-এর প্রথমা স্ত্রী সারার মনে সতীন ও সতীন-পুত্রের প্রতি স্বভাবসুলভ ঈর্ষার উদ্রেক হয়। তিনি তাহাদেরকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার জন্য ইবরাহীম (আ)-কে অনুরোধ করেন। পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আ) তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া মক্কার পথে রওয়ানা হন। এই প্রসঙ্গে সহীহ আল-বুখারীতে একটি সুদীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত আছে। মূল পাঠসহ তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَوَّلُ مَا اتَّخَذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَلِ اُمِّ اِسْمَاعِيْلَ اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لِتُعْفِيَ اَثَرَهَا عَلٰى سَارَةَ ثُمَّ جَاءَ بِهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاُمِّ اِسْمَاعِيْلَ وَبِابْنِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتّٰى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ فِيْ اَعْلَى الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ اَحَدٌ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيْهِ مَاءٌ ثُمَّ قَفّٰى اِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبِعَتْهُ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتْ يَا اِبْرَاهِيْمُ اَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهٰذَا الْوَادِى الَّذِيْ لَيْسَ فِيْهِ اِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ فَقَالَتْ لَهُ ذٰلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ اِلَيْهَا قَالَتْ لَهُ اَللّٰهُ اَمَرَكَ بِهٰذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ ثُمَّ دَعَا بِهٰؤُلَاءِ الدَّعْوَاتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ حَتّٰى بَلَغَ (يَشْكُرُوْنَ) وَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ تُرْضِعُ اِسْمَاعِيْلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا فِى السِّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ اِلَيْهِ يَتَلَوّٰى اَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ اَنْ تَنْظُرَ اِلَيْهِ فَوَجَدَتِ الصَّفَا اَقْرَبَ جَبَلٍ فِى الْاَرْضِ يَلِيْهَا فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِيْ تَنْظُرُ هَلْ تَرٰى اَحَدًا فَلَمْ تَرٰى اَحَدًا فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْوَادِيْ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْاِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ حَتّٰى جَاوَزَتِ الْوَادِيْ ثُمَّ اَتَتِ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرٰى اَحَدًا فَلَمْ تَرٰى اَحَدًا فَفَعَلَتْ ذٰلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذٰلِكَ سَعْيُ النَّاسِ (سَعَى النَّاسُ) بَيْنَهُمَا فَلَمَّا اَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَهٍ تُرِيْدُ نَفْسَهَا ثُمَّ تَسَمَّعَتْ فَسَمِعَتْ اَيْضًا فَقَالَتْ قَدْ اَسْمَعْتَ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاثٌ فَاِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ اَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ حَتّٰى ظَهَرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ تُحَوِّضُهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هٰكَذَا وَجَعَلَتْ تَغْرُفُ مِنَ الْمَاءِ فِيْ سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُوْرُ بَعْدَ مَا تَغْرُفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰهُ اُمَّ اِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ اَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرُفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا قَالَ فَشَرِبَتْ وَاَرْضَعَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ لَا تَخَافِيْ (تَخَافُوا) الضَّيْعَةَ فَاِنَّ هٰهُنَا بَيْتًا لِلّٰهِ يَبْنِيْهِ هٰذَا الْغُلَامُ وَاَبُوْهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَهْلَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْاَرْضِ كَالرَّابِيَةِ تَاْتِيْهِ السُّيُوْلُ فَتَاْخُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذٰلِكَ حَتّٰى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمٍ اَوْ اَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمٍ مُقْبِلِيْنَ مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءٍ فَنَزَلُوْا فِيْ اَسْفَلِ مَكَّةَ فَرَاَوْا طَائِرًا عَائِفًا فَقَالُوْا اِنَّ هٰذَا الطَّائِرَ لَيَدُوْرُ عَلٰى مَاءٍ لَعَهْدُنَا بِهٰذَا الْوَادِيْ وَمَا فِيْهِ مَاءٌ فَاَرْسَلُوْا جَرِيًّا اَوْ جَرِيَّيْنِ فَاِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَرَجَعُوْا فَاَخْبَرُوْهُمْ بِالْمَاءِ فَاَقْبَلُوْا

قَالَ وَأُمُّ اِسْمَاعِيْلَ عِنْدَ الْمَاءِ فَقَالُوْ اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ نَنْزِلَ عِنْدِكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلٰكِنْ لاَحَقَّ لَكُمْ فِى الْمَاءِ قَالُوْا نَعَمْ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَلْفٰى ذٰلِكَ اُمَّ اِسْمَاعِيْلَ وَهِىَ تُحِبُّ الْاُنْسَ فَنَزَلُوْا فَاَرْسَلُوْا اِلٰى اَهْلِيْهِمْ فَنَزَلُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِهَا اَهْلُ اَبْيَاتٍ مِنْهُمْ وَشَبَّ الْغُلَامُ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَاَنْفَسَهُمْ وَاَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ فَلَمَّا اَدْرَكَ زَوَّجُوْهُ اِمْرَاَةً مِنْهُمْ وَمَاتَتْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ فَجَاءَ اِبْرَاهِيْمُ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ اِسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلَمْ يَجِدْ اِسْمَاعِيْلَ فَسَاَلَ اِمْرَاَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا وَفِىْ رِوَايَةٍ يَصِيْدُ لَنَا ثُمَّ سَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرٍّ نَحْنُ فِىْ ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ فَشَكَتْ اِلَيْهِ قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِىْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقُوْلِىْ لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ اِسْمَاعِيْلُ كَاَنَّهُ اٰنَسَ شَيْئًا فَقَالَ هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ اَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا فَسَاَلَنَا عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَسَاَلَنِىْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا فِىْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ فَهَلْ اَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ اَمَرَنِىْ اَنْ اَقْرَاَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ اَبِىْ وَقَدْ اَمَرَنِىْ اَنْ اُفَارِقَكِ الْحَقِىْ بِاَهْلِكِ فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ اُخْرٰى فَلَبِثَ عَنْهُمْ اِبْرَاهِيْمُ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اَتَاهُمْ بَعْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ فَدَخَلَ عَلٰى اِمْرَاَتِهِ فَسَاَلَ عَنْهُ قَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ وَسَاَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْئَتِهِمْ فَقَالَتْ نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ وَاَثْنَتْ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ اللَّحْمُ قَالَ فَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِى اللَّحْمِ وَالْمَاءِ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبٌّ وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيْهِ قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُوْ عَلَيْهِمَا اَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ اِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ قَالَ فَاِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِىْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَمُرِيْهِ يُثَبِّتُ عَتَبَةَ بَابِهِ فَلَمَّا جَاءَ اِسْمَاعِيْلُ قَالَ هَلْ اَتَاكُمْ مِنْ اَحَدٍ قَالَتْ نَعَمْ اَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ وَاَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَاَلَنِىْ عَنْكَ فَاَخْبَرْتُهُ فَسَاَلَنِىْ كَيْفَ عَيْشُنَا فَاَخْبَرْتُهُ اَنَّا بِخَيْرٍ قَالَ فَاَوْصَاكِ بِشَيْءٍ قَالَتْ نَعَمْ يَقْرَاُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَاْمُرُكَ اَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابِكَ قَالَ ذَاكِ اَبِىْ وَاَنْتِ الْعَتَبَةُ اَمَرَنِىْ اَنْ اُمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ وَاِسْمَاعِيْلُ يَبْرِىْ نَبْلًا لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِّنْ زَمْزَمَ فَلَمَّا رَاٰهُ قَامَ اِلَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ثُمَّ قَالَ يَا اِسْمَاعِيْلُ اِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ بِاَمْرٍ قَالَ فَاصْنَعْ مَا اَمَرَكَ رَبُّكَ قَالَ وَتُعِيْنُنِىْ قَالَ وَاُعِيْنُكَ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَبْنِىَ بَيْتًا هٰهُنَا وَاَشَارَ اِلٰى اَكْمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلٰى مَا حَوْلَهَا قَالَ فَعِنْدَ ذٰلِكَ رَفَعَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ فَجَعَلَ اِسْمَاعِيْلُ يَاْتِىْ بِالْحِجَارَةِ وَاِبْرَاهِيْمُ يَبْنِىْ حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِىْ وَاِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُوْلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُوْرَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُوْلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীরা ইসমাঈল (আ)-এর মাতার নিকট হইতে সর্বপ্রথম কোমরবন্ধের ব্যবহার রপ্ত করে। তিনি তাঁহার (সতীন) সারা (রা) হইতে স্বীয় চিহ্নাদি লুকাইবার জন্য একটি কোমরবন্ধ ধারণ করেন। অতঃপর ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইসমাঈলের মাতা ও তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে (ইসমাঈল) লইয়া আসিলেন। তাহাদেরকে তিনি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিচে, মসজিদের উচ্চ ভূমিতে যমযমের স্থানে রাখিলেন। সে সময় মক্কায় কোন জনবসতি কিংবা পানির ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাহাদেরকে সেখানে রাখিলেন। আর তাহাদের পাশে এক ঝুড়ি খেজুর ও এক মশক (চামড়ার তৈরি পানির পাত্র) পানি রাখিলেন। অতঃপর ইবরাহীম (আ) তথা হইতে রওয়ানা হইলেন। ইসমাঈলের মাতা তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে এই জনপ্রাণীহীন উপত্যকায় রাখিয়া কোথায় যাইতেছেন? এখানে তো বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত পরিবেশ কিছুই নাই। তিনি তাঁহাকে এই কথা বারবার বলিতে থাকিলেন। কিন্তু ইবরাহীম (আ) তাহার কথায় ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ কি আপনাকে ইহার নির্দেশ দিয়াছেন? ইবরাহীম (আ) বলিলেন ঃ হাঁ। তখন ইসমাঈলের মাতা বলিলেন, তবে আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করিবেন না। অতঃপর তিনি স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিদায় হইলেন। তিনি তাহাদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে 'সানিয়াহ্' নামক স্থানে পৌঁছিয়া কা'বা ঘরের দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং দুই হাত তুলিয়া দু'আ করিলেনঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমি পানি ও তরুলতাশূন্য উষর এক প্রান্তরে আমার সন্তানদের একটি অংশ তোমার মহাসম্মানিত ঘরের কাছে আনিয়া বসবাসের জন্য রাখিয়া গেলাম। .... অতএব তুমি লোকদের অন্তরকে তাহাদের প্রতি অনুরক্ত করিয়া দাও, ফলমূল হইতে তাহাদেরকে খাবার দান কর, যেন তাহারা কৃতজ্ঞ ও শোকরকারী বান্দাহ হইতে পারে" (১৪ ঃ ৩৭)।

ইসমাঈলের মাতা ইসমাঈলকে বুকের দুধ পান করাইয়া লালন-পালন করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে মশকের পানি পান করিতে থাকিলেন। পরিশেষে পাত্রের পানি শেষ হইয়া গেল, তিনি নিজে এবং তাঁহার সন্তান পিপাসাকাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশু পিপাসায় ছটফট করিতেছে। তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে সাফা পাহাড়কে তিনি তাঁহার সর্বাধিক নিকটে দেখিতে পাইলেন। তিনি সাফা পাহাড়ে উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। উপত্যকার দিকে এই আশায় তাকাইলেন যে, কাহারো দেখা পাওয়া যায় কি না, কিন্তু কাহারো দেখা পাইলেন না। অতএব তিনি সাফা পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলেন এবং উপত্যকা পার হইয়া মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন।

পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া তিনি এদিক-সেদিক তাকাইয়া দেখিলেন কাহাকেও দেখা যায় কি না, কিন্তু কোন লোকজন দেখিতে পাইলেন না। এমনিভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার দৌড়াইলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ এই কারণেই লোকেরা (হজ্জের সময়) উভয় পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াইয়া (সাঈ করিয়া) থাকে। ইসমাঈলের মা (শেষবারের মত) দৌড়াইয়া মারওয়া পাহড়ে উঠিলে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কি ব্যাপার! আওয়াজ শুনিতে পাইলাম যেন। অতঃপর তিনি শব্দের প্রতি কান খাড়া করিলেন। তিনি আবার শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং মনে মনে বলিলেন, তুমি আমাকে আওয়াজ শুনাইলে, হয়তো তোমার কাছে আমার বিপদের কোন প্রতিকার আছে। হঠাৎ তিনি (বর্তমান) যমযমের কাছে একজন ফেরেশতাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার পায়ের গোড়ালি দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিলেন এবং এইভাবে পানি ফুটিয়া বাহির হইল। তিনি ইহার চারিপাশে বাঁধ দিলেন এবং অঞ্জলি ভরিয়া মশকে পানি ভরিতে লাগিলেন। তিনি মশকে পানি ভরিতে ছিলেন, এদিকে পানি উথলিয়া পড়িতে থাকিল। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি মশক ভরিয়া পানি রাখিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক। যদি তিনি যমযমকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিতেন, অথবা বলিয়াছেন ঃ তাহা হইতে যদি মশক ভরিয়া তিনি পানি না রাখিতেন, তবে যমযম একটি প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হইত। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ তিনি পানি পান করিলেন এবং তাঁহার সন্তানকে দুধ পান করাইলেন। ফেরেশতা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি ধ্বংস হইয়া যাওয়ার ভয় করিবেন না। কেননা এখানে আল্লাহ্র ঘরের স্থান নির্দিষ্ট আছে, যাহা এই ছেলে ও তাহার পিতা নির্মাণ করিবেন। আল্লাহ এখানকার বাসিন্দাদেরকে ধ্বংস করেন না। ঘটনাক্রমে বনী জুরহুমের কাফেলা অথবা বনী জুরহুম গোত্রের লোক এই পথ ধরিয়া 'কাদাআ' নামক স্থান দিয়া আসিতেছিল। তাহারা মক্কার নিম্নভূমিতে পৌঁছিলে সেখানে কিছু পাখি বৃত্তাকারে উড়িতে দেখিয়া বলিল, এসব পাখি নিশ্চয়ই পানির উপর চক্কর খাইতেছে। আমরা তো এই মরুভূমিতে আসিয়াছি অনেক দিন হইল, কিন্তু কোথাও পানি দেখি নাই। তাহারা একজন অথবা দুইজন অনুসন্ধানকারীকে খোঁজ নেওয়ার জন্য পাঠাইল। তাহারা গিয়া পানি দেখিতে পাইল এবং ফিরিয়া গিয়া তাহাদেরকে জানাইল। কাফেলার লোকেরা অনতিবিলম্বে পানির দিকে চলিয়া আসিল। ইসমাঈলের মাতা তখন পানির কাছে বসা ছিলেন। তাহারা আসিয়া তাহাকে বলিল, আপনি কি আমাদেরকে এখানে আসিয়া অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু পানির উপর তোমাদের কোন মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তাহারা বলিল, হাঁ, তাহাই হইবে। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ ইসমাঈলের মায়ের উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের সহিত পরিচিত হইয়া একটা অন্তরংগ ও সহানুভূতিসম্পন্ন পরিবেশ গড়িয়া তোলা। ঐ সকল লোক আসিয়া এখানে বসতি স্থাপন করিল এবং কাফেলার অন্যান্য লোকও তাহাদের পরিবার-পরিজনদেরকে ডাকিয়া আনিল। অবশেষে সেখানে বেশ কয়েক ঘর বসতি গড়িয়া

উঠিল। ইসমাঈল যৌবনে পদার্পণ করিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে আরবী ভাষা শিখিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য-চেহারা ও সুরুচিপূর্ণ জীবন তাহারা খুবই পছন্দ করিল। তিনি বড় হইলে ঐ লোকেরা তাহাদের এক কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিল।

ইতিমধ্যে ইসমাঈলের মা ইন্তিকাল করিলেন। ইসমাঈলের বিবাহের পর ইবরাহীম (আ) মক্কায় আসিলেন নিজের রাখিয়া যাওয়া পরিজনের খোঁজে। তিনি ইসমাঈলকে বাড়িতে পাইলেন না। তিনি পুত্রবধূর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসমাঈল কোথায় গিয়াছে? সে বলিল, খাদ্যের সংস্থান করার জন্য তিনি বাহিরে গিয়াছেন। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ তিনি শিকারে বাহির হইয়াছেন। ইবরাহীম (আ) তাহাদের জীবনযাত্রা ও সাংসারিক বিষয়াদির খোঁজ নিলেন। পুত্রবধূ বলিল, আমরা খুব খারাপ অবস্থায় আছি। কঠোরতা ও সংকীর্ণতা আমাদেরকে গ্রাস করিয়াছে। এসব কথা বলিয়া সে অভিযোগ করিল। তিনি বলিলেন, তোমার স্বামী আসিলে তাহাকে আমার সালাম জানাইয়া বলিবে, সে যেন তাহার ঘরের দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করে।

বাড়ী ফিরিয়া ইসমাঈল (আ) যেন কিছু অনুভব করিতে পারিলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ আসিয়াছিলেন নাকি? স্ত্রী বলিল, হাঁ, এরূপ একজন বৃদ্ধ লোক আসিয়াছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাকে অবহিত করিলাম। আমাদের সংসারযাত্রা কিভাবে চলিতেছে তিনি তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহাকে জানাইলাম যে, আমরা খুব কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে দিনাতিপাত করিতেছি। ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি তোমাকে কোন কথা বলিয়া গিয়াছেন? স্ত্রী বলিল, হাঁ! তিনি আমাকে আপনাকে সালাম পৌঁছাইতে বলিয়াছেন এবং আপনাকে আপনার ঘরের চৌকাঠ পরিবর্তন করিতে বলিয়াছেন। ইসমাঈল (আ) বলিলেন, তিনি আমার পিতা। তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছেন। সুতরাং তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের কাছে চলিয়া যাও। পরে তিনি তাহাকে তালাক দিলেন এবং ঐ গোত্রেরই অন্য এক মেয়েকে বিবাহ করিলেন।

আল্লাহ্র ইচ্ছামত ইবরাহীম (আ) বেশ কিছু দিন আর এদিকে আসেন নাই। পরে তিনি যখন আবার আসিলেন তখনও ইসমাঈলের সাথে তাঁহার দেখা হইল না। পুত্রবধূর কাছে গিয়া ইসমাঈলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তিনি আমাদের খাদ্যের সন্ধানে গিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেমন আছ? তিনি তাহাদের সাংসারিক জীবন ও অন্যান্য বিষয়েও জানিতে চাহিলেন। ইসমাঈলের স্ত্রী বলিল, আমরা খুব ভাল এবং স্বচ্ছল অবস্থায় দিন যাপন করিতেছি। এই কথা বলিয়া সে মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করিল। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি খাও? পুত্রবধূ বলিল, গোশ্ত। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি পান কর? সে বলিল, পানি। তখন ইবরাহীম (আ) দু'আ করিলেন ঃ হে আল্লাহ! ইহাদের গোশ্ত ও পানিতে বরকত দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন ঃ সেই সময় তাহাদের কাছে কোন খাদ্যশস্য ছিল না, যদি থাকিত তাহা হইলে ইবরাহীম (আ) তাহাদের খাদ্যশস্যেও বরকতের দু'আ করিতেন। এইজন্যই মক্কা ছাড়া অন্য কোথায়ও শুধু গোশ্ত ও পানির উপর নির্ভর করিলে তাহা স্বাস্থ্যের জন্য

অনুকূল হয় না। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, তোমার স্বামী ফিরিয়া আসিলে তাহাকে আমার সালাম জানাইয়া বলিবে, সে যেন তাহার ঘরের চৌকাঠ হিফাজত করিয়া রাখে।

ইসমাঈল (আ) ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছে কেহ কি আসিয়াছিল? স্ত্রী বলিল, হাঁ! আমার কাছে একজন সুন্দর সুঠাম বৃদ্ধ লোক আসিয়াছিলেন। স্ত্রী বৃদ্ধের কিছু প্রশংসাও করিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে আমাদের জীবিকা ও ভরণপোষণ চলিতেছে? আমি বলিলাম, আমরা বেশ ভাল আছি। ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়াছেন? স্ত্রী বলিল, হাঁ! তিনি আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং ঘরের চৌকাঠ হিফাজত করার হুকুম দিয়া গিয়াছেন। সব কথা শুনিয়া ইসমাঈল (আ) বলিলেন, তিনি আমার পিতা এবং তুমি ঘরের চৌকাঠ। তিনি আমাকে তোমার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র ইচ্ছায় বেশ কিছু দিন পর্যন্ত আর এখানে আসেন নাই। একদিন ইসমাঈল (আ) যমযম কূপের পাশে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিচে বসিয়া তাঁহার তীর ঠিক করিতেছিলেন। এমন সময় ইবরাহীম (আ) আসিলেন। ইসমাঈল (আ) পিতাকে দেখিয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলেন। অতঃপর যেভাবে পিতা পুত্রের সঙ্গে এবং পুত্র পিতার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করিয়া থাকে, তাঁহারাও তাহাই করিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়াছেন। ইসমাঈল (আ) বলিলেন, আপনার প্রভু আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দিয়াছেন তাহা আঞ্জাম দিন। তিনি বলিলেন, তুমি এই কাজে আমাকে সাহায্য কর। পুত্র বলিলেন, আমি আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করিব। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একখানা ঘর নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়াছেন। এই কথা বলিয়া তিনি একটি উঁচু টিলার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, ইহার চারিদিকে ঘর নির্মাণ করিতে হইবে। অতঃপর তাঁহারা এই ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ইসমাঈল (আ) পাথর বহিয়া আনিতেন, আর ইবরাহীম (আ) তাহা দ্বারা ভিত গাঁথিতেন। চতুর্দিকের দেয়াল অনেকটা উঁচু হইয়া গেলে ইবরাহীম (আ) এই পাথরটি আনিয়া (মাকামে ইবরাহীম) উহার উপর দাঁড়াইয়া ভিত গাঁথিতে থাকিলেন এবং ইসমাঈল (আ) পাথর আনিয়া যোগান দিতে থাকিলেন। পিতা-পুত্র উভয়ে ঘর নির্মাণকালে প্রার্থনা করিতে থাকিলেন ঃ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম কবুল করুন। আপনি সব কিছু শুনেন এবং জানেন" (২ঃ ১২৭)। রাবী বলেন, তাঁহারা নির্মাণ কাজ করিতে থাকিলেন। তাঁহারা উভয়ে কা'বা ঘরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেনঃ "হে আমাদের প্রভু! আমাদের এই প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম কবুল করুন; নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ১খ, পৃ. ৪৭৪-৬)। বুখারীর অপর বর্ণনায়ও প্রায় অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ

لَمَّا كَانَ بَيْنَ اِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ اَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِاِسْمَاعِيْلَ وَاُمِّ اِسْمَاعِيْلَ مَعَهُمْ شَنَّةٌ فِيْهَا مَاءٌ فَجَعَلَتْ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ فَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا حَتّٰى قَدِمَ مَكَّةَ فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَعَ اِبْرَاهِيْمُ

اِلٰى اَهْلِهٖ فَاتَّبَعَتْهُ اُمُّ اِسْمَاعِيْلَ حَتّٰى لَمَّا بَلَغُوْا كَدَاءَ نَادَتْهُ مِنْ وَّرَائِهٖ يَا اِبْرَاهِيْمُ اِلٰى مَنْ تَتْرُكُنَا قَالَ اِلَى اللّٰهِ قَالَتْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ فَرَجَعَتْ وَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا حَتّٰى لَمَّا فَنِىَ الْمَاءُ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّىْ اُحِسُّ اَحَدًا قَالَ فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ اَحَدًا فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا فَلَمَّا بَلَغَتِ الْوَادِىْ سَعَتْ وَاَتَتِ الْمَرْوَةَ وَفَعَلَتْ ذٰلِكَ اَشْوَاطًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ الصَّبِىُّ فَذَهَبَتْ وَنَظَرَتْ فَاِذَا هُوَ عَلٰى حَالِهٖ كَاَنَّهٗ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ فَلَمْ تُقِرُّهَا نَفْسُهَا فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّىْ اُحِسُّ اَحَدًا فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُحِسَّ اَحَدًا حَتّٰى اَتَمَّتْ سَبْعًا ثُمَّ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ فَاِذَا هِىَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ اَغِثْ اِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاِذَا جِبْرِيْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِعَقِبِهٖ هٰكَذَا وَغَمَزَ بِعَقِبِهٖ عَلَى الْاَرْضِ قَالَ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ فَدَهَشَتْ اُمُّ اِسْمٰعِيْلَ فَجَعَلَتْ تَحْفِرُ قَالَ فَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكَتْهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا قَالَ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُهَا عَلٰى صَبِيِّهَا قَالَ فَمَرَّ نَاسٌ مِّنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِىْ فَاِذَاهُمْ بِطَيْرٍ كَاَنَّهُمْ اَنْكَرُوْا ذٰلِكَ وَقَالُوْا مَا يَكُوْنُ الطَّيْرُ اِلَّا عَلٰى مَاءٍ فَبَعَثُوْا رَسُوْلَهُمْ فَنَظَرَ فَاِذَا هُمْ بِالْمَاءِ فَاَتَاهُمْ فَاَخْبَرَهُمْ فَاَتَوْا اِلَيْهَا فَقَالُوْا يَا اُمَّ اِسْمٰعِيْلَ اَتَاْذَنِيْنَ لَنَا اَنْ نَّكُوْنَ مَعَكِ اَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيْهِمْ اِمْرَاَةً قَالَ ثُمَّ اِنَّهٗ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهٖ اِنِّىْ مُطَّلِعٌ تَرِكَتِىْ قَالَ فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ فَقَالَتْ اِمْرَاَتُهٗ ذَهَبَ يَصِيْدُ قَالَ قُوْلِىْ لَهٗ اِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَابِكَ فَلَمَّا جَاءَ اَخْبَرَتْهُ قَالَ اَنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِىْ اِلٰى اَهْلِكِ قَالَ ثُمَّ اِنَّهٗ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهٖ اِنِّىْ مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ قَالَ فَجَاءَ فَقَالَ اَيْنَ اِسْمٰعِيْلُ فَقَالَتْ اِمْرَاَتُهٗ ذَهَبَ يُصِيْدُ فَقَالَتْ اَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَتَشْرَبَ فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَابُكُمْ قَالَتْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ وَشَرَابُنَا الْمَاءُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِىْ طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ فَقَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثُمَّ اِنَّهٗ بَدَا لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِاَهْلِهٖ اِنِّىْ مُطَّلِعٌ تَرِكَتِىْ فَجَاءَ فَوَافَقَ اِسْمٰعِيْلَ مِنْ وَّرَاءِ زَمْزَمَ يُصْلِحُ نَبْلًا لَهٗ فَقَالَ يَا اِسْمٰعِيْلُ اِنَّ رَبَّكَ اَمَرَنِىْ اَنْ اَبْنِىَ لَهٗ بَيْتًا قَالَ اَطِعْ رَبَّكَ قَالَ اِنَّهٗ قَدْ اَمَرَنِىْ اَنْ تُعِيْنَنِىْ عَلَيْهِ قَالَ اِذَنْ اَفْعَلُ اَوْ كَمَا قَالَ قَالَ فَقَامَا فَجَعَلَ اِبْرَاهِيْمُ يَبْنِىْ وَاِسْمٰعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ قَالَ حَتّٰى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلٰى نَقْلِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ عَلٰى حَجَرِ الْمَقَامِ فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ وَيَقُوْلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

" যখন ইবরাহীম (আ) ও তাঁহার পরিবারের (স্ত্রী সারার) মধ্যে যাহা ঘটিবার তাহা (পারিবারিক কলহ) ঘটিয়া গেল, তখন ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল ও তাহার মাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া

পড়িলেন। তাহাদের সঙ্গে একটি পানির মশক ছিল। ইসমাঈলের মা মশকের পানি পান করিতেন এবং সন্তানকে দুধ পান করাইতেন। এভাবে তাঁহারা মক্কায় পৌঁছিলেন। ইবরাহীম (আ) স্ত্রীকে একটা প্রকাণ্ড গাছের নিচে রাখিয়া পরিবার-পরিজনদের কাছে রওয়ানা হইলেন। ইসমাঈলের মাতা তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে থাকিলেন। অবশেষে 'কাদাআ' নামক স্থানে পৌঁছিয়া তিনি পিছন হইতে স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, হে ইবরাহীম! আপনি আমাদেরকে কাঁহার নিকট রাখিয়া যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র নিকট রাখিয়া যাইতেছি। ইসমাঈলের মাতা বলিলেন, আমি আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এই কথা বলিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মশকের পানি পান করিতে এবং বাচ্চাকে দুধ পান করাইতে থাকিলেন। এক সময় পানি ফুরাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, আমাকে কোথাও যাইয়া খোঁজ করা উচিৎ কোন লোক দেখা যায় কি না। নবী (সা) বলিয়াছেন ঃ এই বলিয়া তিনি রওয়ানা হইলেন এবং সাফা পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন। তিনি বারবার এদিক-ওদিক তাকাইলেন, কোন লোক দেখা যায় কি না, কিন্তু দেখা মিলিল না। তিনি ঐ পাহাড় হইতে নামিয়া মারওয়া পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হইলেন। উপত্যকার মাঝখানে পৌঁছিয়া তিনি দৌড়াইলেন এবং মারওয়া পাহাড়ে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইভাবে তিনি দুই পাহাড়ের মাঝে কয়েকবার চক্কর দিলেন। অতঃপর ভাবিলেন, গিয়া দেখিয়া আসা দরকার আমার শিশু পুত্রের কি অবস্থা! তাই তিনি চলিয়া গেলেন এবং দেখিতে প্যাইলেন বাচ্চা যেন মৃত্যুর জন্য তড়পাইতেছে। এই দৃশ্য তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, আবার গিয়া খোঁজ করা দরকার কাহাকেও পাওয়া যায় কি না। তাই তিনি সাফা পাহাড়ে গিয়া উঠিলেন এবং বারবার এদিকে ওদিক তাকাইলেন, কিন্তু কাহারো দেখা পাইলেন না। এইভাবে সাতবার পূর্ণ হইলে তিনি ভাবিলেন, গিয়া দেখা দরকার বাচ্চটি কি করিতেছে।

ইতিমধ্যে তিনি একটা শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, যদি কোন উপকার করিতে পার তাহা হইলে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আস। দেখা গেল হযরত জিবরাঈল (আ) সেখানে উপস্থিত। তিনি তাঁহার পায়ের গোড়ালি দিয়া মাটির উপরে আঘাত করার ইংগিত করিয়া আঘাত করিলেন। ইহাতে সহসা পানি ফুটিয়া বাহির হইলে ইসমাঈলের মাতা হতভম্ব হইয়া গেলেন এবং গর্ত খুঁড়িতে লাগিলেন। আবুল কাসেম (সা) বলেন ঃ হাজার (রা) যদি ইহাকে স্ব-অবস্থায় ত্যাগ করিতেন তাহা হইলে পানি ছড়াইয়া পড়িত। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর হাজার (রা) পানি পান করিতে থাকেন এবং তাঁহার শিশু সন্তানকে নিজের বুকের দুধ পান করাইতে থাকেন।

জুরহুম কবীলার একদল লোক উপত্যকা অতিক্রম করিতে করিতে এক ঝাঁক পাখি দেখিতে পাইল এবং ইহা তাহাদের নিকট অবিশ্বাস্য মনে হইল। তাহারা বলিল, পাখি তো পানির নিকটেই থাকে। তাহারা তাহাদের একজন লোক পাঠাইল এবং সে তথায় পৌঁছিয়া পানি দেখিতে পাইল। সে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদেরকে বিষয়টি অবহিত করিল। অতঃপর তাহারা হাজার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, হে ইসমাঈলের মা! আপনি কি আমাদেরকে আপনার এখানে বসবাস করার অনুমতি দিবেন? অতঃপর হাজার (রা)-এর পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ইহলে জুরহুম গোত্রের এক মেয়েকে বিবাহ করিলেন।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নির্বাসিত পরিজনের কথা তাঁহার স্মৃতিপটে উদয় হইলে তিনি তাঁহার স্ত্রী (সারা)কে বলিলেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিজন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হইতে চাই। অতঃপর তিনি (মক্কায়) পৌঁছিয়া পুত্রবধূকে সালাম দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসমাঈল কোথায়? ইসমাঈলের স্ত্রী বলিল, তিনি শিকারে গিয়াছেন। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, সে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বলিবে, "তোমার গৃহের চৌকাঠ পরিবর্তন কর"। তিনি ফিরিয়া আসিলে স্ত্রী তাহাকে বিষয়টি অবহিত করিল। তিনি বলিলেন, তুমিই সেই চৌকাঠ, তুমি তোমার বংশে ফিরিয়া যাও।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, পুনরায় নির্বাসিত পরিজনের কথা ইবরাহীম (আ)-এর মনে পড়িলে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিজনের খবর জানিতে ইচ্ছুক। অতঃপর (মক্কায়) পৌঁছিয়া (পুত্রবধূকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইসমাঈল কোথায়? তাঁহার স্ত্রী বলিল, তিনি শিকারে গিয়াছেন। আপনি কি (কিছুক্ষণ) অপেক্ষা করিবেন না, কিছু পানাহার করিবেন না? ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় কি? পুত্রবধূ জবাব দিল, গোশত আমাদের খাদ্য এবং পানি আমাদের পানীয়। তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ! ইহাদের খাদ্যে ও পানীয়ে বরকত দান করুন।" আবুল কাসেম (সা) বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর দোআর ফলেই (এখানকার খাদ্য ও পানীয়) বরকত হইতেছে।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নির্বাসিত পরিজনের কথা পুনরায় মনে পড়িলে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি আমার নির্বাসিত পরিজনের খবর লইতে ইচ্ছুক। এবার তিনি (মক্কায়) পৌঁছিয়া ইসমাঈল (আ)-এর সাক্ষাত পাইলেন। তখন তিনি যমযম কূপের পিছনে বসিয়া তাঁহার তীর-ধনুক মেরামত করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, হে ইসমাঈল! তোমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমি যেন তাঁহার জন্য একখানা গৃহ নির্মাণ করি। ইসমাঈল (আ) বলিলেন, আপনার প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করুন। ইবরাহীম (আ) বলিলেন, তিনি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমাকেও আদেশ করিয়াছেন। ইসমাঈল (আ) বলিলেন, তথাস্তু, আমি সহযোগিতা করিব। অতঃপর তাঁহারা উদ্যোগী হইলেন এবং ইবরাহীম (আ) গৃহ নির্মাণ করিতে লাগিলেন, আর ইসমাঈল (আ) তাঁহাকে পাথর আনিয়া দিতে থাকিলেন এবং উভয়ে বলিতে থাকিলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা" (২ ঃ ১২৭)। রাবী বলেন, ইতিমধ্যে দেওয়ালের ভিত উঁচু হইয়া গেলে ইবরাহীম (আ) পাথর উপরে উত্তোলন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন, তাই তিনি মাকামে ইবরাহীমের পাথরের উপর দাঁড়াইয়া দেয়াল গাথিতে লাগিলেন এবং পিতা-পুত্র বলিতে থাকিলেন ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ১খ, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭)।

আল্লামা ইব্ন কাছীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে হাদীছখানি বেশ কয়েকটি সনদে বর্ণনা করিয়াছেন বিস্তারিত আকারে। তাহাতে তথ্যের কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। ইব্ন কাছীর বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় ইসরাঈলী কথাও প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫৬)।

হযরত আলী (রা)-র হাদীছের বক্তব্যের সূচনা হইয়াছে এভাবে ঃ "আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে কা'বা ঘর নির্মাণের আদেশ প্রদান করিলে তিনি হাজার ও ইসমাঈল (আ)-কে সঙ্গে লইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। কা'বার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। স্ত্রী হাজার (রা) তাঁহাকে বলিলেন, হে ইবরাহীম! আমাদেরকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছেন? তিনি বলিলেন ঃ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতেছি। হাজার (রা) বলিলেন, তাহা হইলে আপনি চলিয়া যান, আল্লাহ আমাদেরকে ধ্বংস করিবেন না...." (তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৫৫২)। সম্ভবত আলী (রা)-র বর্ণনাটিতে ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম বারের আগমনেই কা'বা ঘর নির্মাণের যে কথা বলা হইয়াছে তাহা ছিল শুধু কা'বার চারদিকের ঘেরাও নির্মাণ এবং অতঃপর ছিল পিতা-পুত্র কর্তৃক উহার পূর্ণাঙ্গ নির্মাণ (তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, ১খ, পৃ. ৫৫৩)। তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকগণ উক্ত হাদীছদ্বয়কে তাহাদের তথ্যের উৎস হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও আলী (রা)-র বর্ণনার সহিত বাইবেলের বর্ণনার অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। উভয় সাহাবীর বর্ণনায় যেখানে বলা হইয়াছে, হযরত ইবরাহীম (আ) নিজেই তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় আসেন, সেখানে বাইবেলে বলা হইয়াছে ঃ পরে ইবরাহীম প্রত্যূষে উঠিয়া রুটি ও পানিপূর্ণ কুপা লইয়া হাজারের স্কন্ধে দিয়া বালকটিকে সমর্পণ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন (আদিপুস্তক, ২১ ঃ ১৪)। যেখানে নবী-রাসূলগণ মানবজাতির প্রতি সর্বাধিক সদয়, সহমর্মী, সহযোগী ও সাহায্যকারী হইয়া থাকেন, সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মত একজন মহান নবী তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে তাহার মাতার সহিত অসহায় অবস্থায় বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দিবেন, ইহাও কি কল্পনা করা যায়! এখানেও বাইবেল রচয়িতাদের হীন মানসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে এবং প্রকৃত তথ্য বিকৃত করা হইয়াছে। বাইবেলের পরের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ সে (হাজার) প্রস্থান করিয়া বি'র সাব'আ প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইল! কুপার পানি শেষ হইয়া গেলে সে বালকটিকে একটি ঝোপের নীচে ফেলিয়া রাখিল আর আপনি তাহার সম্মুখ অনেকটা দূরে অনুমান এক তীর দূরে তাহার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া বসিল। কারণ সে কহিল, বালকটির মৃত্যু আমি দেখিব না। আর সে তাহার সম্মুখ হইতে দূরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন সদাপ্রভু বালকটির রব শুনিলেন। তাঁহার দূত আকাশ হইতে ডাকিয়া হাজারকে বলিলেন, হাজার! তোমার কি হইল? ভয় করিও না, বালকটি যেখানে আছে সদাপ্রভু তথা হইতে তাহার রব শুনিলেন। তুমি উঠিয়া বালকটিকে তুলিয়া তোমার হাতে ধর। কারণ তাহাকে আমি এক মহাজাতি করিব। তখন সদাপ্রভু তাহার চক্ষু খুলিয়া দিলেন। তাহাতে সে পানি ভর্তি এক কূপ দেখিতে পাইল। তিনি তথায় গিয়া কুপাতে পানি ভরিয়া বালকটিকে পান করাইল। পরে সদাপ্রভু বালকটির সহবর্তী হইলেন, আর সে বড় হইয়া উঠিল এবং প্রান্তরে থাকিয়া ধনুর্দ্ধর হইল। সে পরান (ফারান পর্বত) প্রান্তরে বসতি করিল (আদিপুস্তক, ২১ ঃ ১৪-২১)। তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকগণ উক্ত বর্ণনা এবং ইসমাঈল (আ)-এর বার পুত্র ও এক কন্যা সংক্রান্ত বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছেন।

নবী-রাসূলগণ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত স্ব-উদ্যোগে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। ইহা তাঁহাদের নবুওয়াতী পদমর্যাদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হযরত ইবরাহীম (আ)-ও তাঁহার পরিবারবর্গের একাংশকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই যে মক্কার জনমানবহীন এলাকায় বসতি স্থাপন করান স্বামী-স্ত্রীর বাক্য বিনিময় হইতেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন দুগ্ধপোষ্য ইসমাঈলসহ হাজার (রা)-কে রাখিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন হাজার (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি আল্লাহ্র হুকুমে ইহা করিলেন? ইবরাহীম (রা) উত্তর দিলেন, হাঁ, আল্লাহ্র হুকুমে। তখন হাজার (রা) এই বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাহা হইলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করিবেন না।

নবী-রাসূলগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার উপর নির্ভরশীল থাকেন, আল্লাহ্র হুকুমের সামনে বিনা বাক্যব্যয়ে মাথা নত করিয়া দেন। স্ত্রী-পুত্রকে নির্জন প্রান্তরে রাখিয়া ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র কাছে দুআ করিয়াছিলেন ঃ

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ·

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি করাইলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! তাহা এইজন্য যে, তাহারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব তুমি কতক লোকের অন্তর তাহাদের প্রতি অনুরাগী করিয়া দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাহাদের রিযিকের ব্যবস্থা করিও, যাহাতে তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারে" (১৪ ঃ ৩৫-৮)।

অনন্তর তিনি স্ত্রী-পুত্রকে নিঃসঙ্গ ফেলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন নাই, মাঝে-মধ্যে সেখানে আসিয়া তাহাদের খোঁজ-খবর লইতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রিয় নবীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জন্য মু'জিযাস্বরূপ দুই পবিত্র ভূমির মধ্যকার দূরত্বকে গুটাইয়া সংকুচিত করিয়া দিতেন। ফলে তিনি অতি অল্প সময়ে ও অল্প আয়াশে এখানে আসা-যাওয়া করিতেন (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫৭; আরোহণ, পৃ. ৮৭; তারীখুল কাবীম, ৩খ)। অন্তত তাঁহার দুইবারের আগমন তো কুরআন মজীদের বক্তব্য দ্বারাই প্রমাণিত হয়। একবার ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে কুরবানী করার জন্য (দ্র. ৩৭ ঃ ১০০ ও তৎপরবর্তী আয়াত) এবং দ্বিতীয় বার কা'বা ঘরের পূর্ণাঙ্গ নির্মাণের জন্য (দ্র. ২ ঃ ১২৫-২৯; আরও দ্র. ২২ ঃ ২৬-২৭)।

মহানবী (সা)-এর হাদীছ দ্বারা হযরতর ইবরাহীম (আ)-এর দুই পবিত্র ভূমির মধ্যে যাতায়াত প্রমাণিত।

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ ·

"নবী (সা) হাসান ও হুসায়ন (রা)-এর জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন এবং বলিতেন, তোমাদের দুই জনের পূর্বপুরুষ (ইবরাহীম) ইহা দ্বারা ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-এর জন্য (আল্লাহ্র নিকট) আশ্রয় প্রার্থনা করিতেন ঃ আমি আল্লাহ্র পূর্ণ বাক্যসমূহের উসীলায় প্রতিটি শয়তান, প্রাণনাশী বিষাক্ত প্রাণী ও বদনজরের অনিষ্ট হইতে (আল্লাহ্র) আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি" (বুখারী, বাংলা অনু., আম্বিয়া, বাব ১১, নং ৩১২১, ৩খ, পৃ. ৩৬৬, তিরমিযী, তিব্ব, বাব হাসান-হুসায়নকে ঝাড়ফুক; ইব্ন মাজা, তিব্ব, বাব মা আওয়্যাযান নাবিয়্যু (সা) ওয়ামা উব্বিযা বিহি)।

'ইব্ন আব্বাস (রা)-এর দীর্ঘ হাদীছেও (ইতিপূর্বে উদ্ধৃত) তাঁহার কয়েকবার মক্কায় আগমনের কথা উল্লেখ হইয়াছে। বাইবেল হইতেও তাহাঁর মক্কা ভূমিতে একবার আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি খতনার (লিঙ্গাগ্রের ত্বকছেদন) আদেশ নাযিল হইলে তিনি নিজেও খতনা করেন এবং ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-সহ তাঁহার পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল পুরুষ লোকেরও খতনা করান (আদিপুস্তক, ১৭ ঃ ১০-১৪)।

মাতা-পুত্রের নির্বাসনের কারণ সম্পর্কিত ভিন্ন একটি ঘটনা এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ শিশুরা যেমন পরস্পর মারামারি করে, একদিন দুই শিশু ভ্রাতা ইসমাঈল ও ইসহাক তাহাই করেন। ইহাতে সারা (রা) হাজার (রা)-এর উপর অসন্তুষ্ট হন এবং ইবরাহীম (আ)-এর নিকট তাঁহাকে অন্যত্র পৃথক করিয়া দেওয়ার দাবি করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মাতা-পুত্রকে মক্কায় নির্বাসন দেওয়া হয় (আরাইস, পৃ. ৮৬; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৭৯)। ইহা হাদীছ ও ইতিহাসের বর্ণনার বিপরীত। তাই ইবনুল আছীর এই ঘটনাকে অনির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন (আল-কামিল, ১ খ, পৃ./৭৯)

ইসমাঈল (আ) কর্তৃক পবিত্র ভূমিতে আল্লাহ্র ঘর কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ, হজ্জের অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং অত্র এলাকায় একটি মানব বসতি গড়িয়া উঠা সবই ছিল আল্লাহ্র হিকমতের অন্তর্ভুক্ত।

খতনার সুন্নাত প্রবর্তন

হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে আশি, অন্য বর্ণনায় নিরানব্বই ও এক শত বিশ বৎসর বয়সে নিজের খতনা করেন এবং তাঁহার পরিবারের সকল পুরুষ লোকেরও খতনা করান। ইসমাঈল (আ)-এর তের বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার খতনা করান (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫৬)। তখন হইতে তাওহীদবাদী উম্মাতের জন্য খতনা সুন্নাত-ই ইবরাহীমরূপে একটি সুন্নাতে পরিণত হয়। মহানবী (সা) বলেনঃ

اِخْتَتَنَ اِبْرَاهِيْمُ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُوْمِ.

"নবী ইবরাহীম (আ) আশি বৎসর বয়সে বাইস দ্বারা (মতান্তরে কাদূম নামক স্থানে) নিজের খতনা করেন" (বুখারী, আম্বিয়া, বাব ১০, নং ৩১০৮, ৩খ, পৃ. ৩৫০; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫৬)। মহানবী (সা) আরও বলেন ঃ

اَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَاءُ وَيُرْوَى الْخِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ .

“চারটি বিষয় নবী-রাসূলগণের আদর্শ ঃ লজ্জাশীলতা, অপর বর্ণনায় খতনা, সুগন্ধি ব্যবহার ও বিবাহ” (তিরমিযীর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ৯৯, নং ৩৫২, কিতাবুত তাহারাত, দ্বিতীয় ফাস্ল; আরও দ্র. বুখারী, লিবাস, বাবঃ গোঁফ কাটা, নং ৫৪৬১ ও ৫৪৬৩, ৫খ, পৃ. ৪০৪-৫; মুসলিম, তাহারাত, বাব ১৬, নং ৪৮৮-৯, ২খ, পৃ. ৩০-১; আবূ দাঊদ, তারাজ্জুল, বাব ফী আখযিশ শারিব; তিরমিযী, আদাব, বাব ১৪, নং ২৬৯৩; ইব্ন মাজা, তাহারাত, বাব ৮, নং ২৯২, ২৯৪; নাসাঈ, তাহারাত, বাব ঃ ফিতরাত, তাকলীমুল আযফার, নাতফুল ইবিত; যীনাত, বাব ঃ ফিতরাত)।

মুসলমানদের ন্যায় ইয়াহূদীরাও এই সুন্নাত পালন করে। কিন্তু খৃষ্টানরা ইবরাহীম-ইসমাঈল-ইসহাক-ইয়াকূব (আ)-এর এই রীতিকে কিসের ভিত্তিতে বর্জন করিয়াছে তাহা অজ্ঞাত। অথচ বাইবেলে খতনা করাইবার প্রতি অত্যন্ত জোর দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে বলেন ঃ “তোমার সহিত ও তোমার ভাবী বংশের সহিত কৃত আমার যে নিয়ম তোমরা পালন করিবে তাহা এই যে, তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বকছেদ হইবে। তোমরা আপন আপন লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন করিবে, তাহাই তোমাদের সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকছেদ হইবে.... ত্বকছেদ অবশ্য কর্তব্য” (আদিপুস্তক, ১৭ ঃ ১০-১৪)।

বালক ইসমাঈল ও তাঁহার ভাষার পরিবর্তন

শৈশবকাল হইতে ইসমাঈল (আ) জুরহুম গোত্রের লোকদের নিকট আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। এই প্রসঙ্গে মহানবী (সা) বলেন ঃ

أَوَّلُ مَا فُتِقَ لِسَانُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ الْمُبِيْنَةِ اِسْمَاعِيْلُ وَهُوَ ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَ سَنَةً.

“সর্বপ্রথম স্পষ্ট আরবী ভাষা ইসমাঈল (আ)-এর মুখে ফুটিয়া উঠে; তখন তিনি ছিলেন চৌদ্দ বৎসরের বালক” (শীরাযীর আলকাব গ্রন্থের বরাতে কানযুল উম্মাল, ১১ খ, পৃ. ৪৯০, নং ৩২৩০৯)।

أُلْهِمَ اِسْمَاعِيْلُ هٰذَا اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ اِلْهَامًا

“ইসমাঈল (আ)-এর অন্তরে আরবী ভাষা শিক্ষার অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছিল” (ঐ গ্রন্থ, ১১খ, নং ৩২৩১১; হাকেম ও ইব্ন হিব্বানের আস-সাহীহ্ গ্রন্থের বরাতে)।

বালক ইসমাঈল (আ) তীরন্দাজী, অশ্বারোহণ, শিকার ও কুস্তি শিক্ষা করেন। বংশবিশারদ ও জীবনীকারগণ বলেন যে, ইসমাঈল (আ)-ই সর্বপ্রথম ঘোড়াকে পোষ মানাইয়া উহাকে বাহন হিসাবে কাজে লাগান। ইহার পূর্বে অশ্ব ছিল বন্য প্রাণী। মহানবী (সা) বলেন ঃ

اِتَّخِذُوا الْخَيْلَ وَاعْتَبِقُوْهَا فَاِنَّهَا مِيْرَاثُ اَبِيْكُمْ اِسْمَاعِيْلَ.

“তোমরা ঘোড়া পোষো এবং উহার প্রতি যত্নবান হও। কেননা উহা তোমাদের পূর্বপুরুষ ইসমাঈল (আ)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ” (সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-উমাবীর আল-মাগাযী গ্রন্থের বরাতে বিদায়া, ২খ. পৃ. ১৯২)।

ইসমাঈল (আ) যৌবনে একজন পারদর্শী তীরন্দায ছিলেন, বাইবেল এবং মহানবী (সা)-এর হাদীছে যাহার স্বীকৃতি বিদ্যমান। তিনি শিকারকার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন (বরাতের জন্য দ্র. ইতিপূর্বে উদ্ধৃত দীর্ঘ হাদীছ)।

কুরআন মজীদে হযরত ইসমাঈল (আ)

কুরআন মজীদের মোট নয়টি সূরায় হযরত ইসমাইল (আ) সম্পর্কে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বারো স্থানে তাঁহার নামোল্লেখসহ আলোচনা রহিয়াছে। (দ্র. ২ঃ ১২৫, ১২৭, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ ঃ ৮৪; ৪ঃ ১৬৩; ৬ ঃ ৮৬; ১৪ ঃ ৩৯; ১৯ ঃ ৫৪; ২১ ঃ ৮৫ ও ৩৮ ঃ ৪৮)। ২ঃ ১২৪-১৪১ আয়াতে পিতা-পুত্রের কা'বা ঘর নির্মাণ, তৎসংক্রান্ত দু'আ এবং ইবরাহীম পরিবারের তৌহীদী আদর্শের আলোচনা, ১৪ ঃ ৩৯-৪১ আয়াতে মাতা-পুত্রকে মক্কায় স্থানান্তর ও ইবরাহীম (আ)-এর আবেগাপ্লুত দু'আ এবং ৩৭ ঃ ১০০-১১৩ আয়াতে কুরবানী সংক্রান্ত ঘটনা আলোচিত হইয়াছে। অবশিষ্ট সূরাসমূহে তাঁহার সম্পর্কে খুবই সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে।

যমযম কূপের পূর্বকথা

ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছে বলা হইয়াছে যে, ইবরাহীম (আ) স্ত্রী ও পুত্রের জন্য যে যৎসামান্য পানি রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা ফুরাইয়া যাওয়ার পর হযরত হাজার (রা) পানি সংগ্রহের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ছুটাছুটির সময়ে মারওয়া পাহাড়ে উঠার পর একটি অদৃশ্য আহবান শুনিতে পান এবং বর্তমানে যেখানে যমযম কূপ অবস্থিত সেখানে একজন ফেরেশতাকে দেখিতে পান। ফেরেশতার পদাঘাতে বা ডানার আঘাতে মাটির অভ্যন্তর হইতে পানির উৎস নির্গত হইল। হযরত হাজার (রা) ইহার চারিপাশে আইল বাঁধিয়া উহাকে কূপের রূপ দান করিলেন (বুখারী, বাংলা অনু., ৩খ, পৃ. ৩৫৭-৮, নং ৩১১৪)। এই কূপই "যমযম কূপ" নামে ইতিহাস খ্যাত। ইহাই যমযম কূপের আদি উৎস। যমযম শব্দের আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে মতভেদ আছে। ইব্‌ন হিশামের মতে আরবদের নিকট زمزمة শব্দের অর্থ প্রাচুর্য, সঞ্চিত হইয়া জমা হওয়া। যেহেতু সূচনা হইতেই ইহাতে পানির প্রাচুর্য লক্ষ্য করা গিয়াছে এবং ব্যবহারের ফলে পানি হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাই ইহার এই নামকরণ। ভিন্ন মতে শব্দটির অর্থ গর্জন, নাদ, শব্দধ্বনি; হযরত হাজার (রা) অদৃশ্য শব্দধ্বনি শ্রবণ করিয়া কূপের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্নমতে زمة শব্দ হইতে উক্ত নামকরণ হইয়াছে। শব্দটির অর্থ অবরুদ্ধ হওয়া, শক্ত করিয়া বাঁধা। হাজার (রা) কূপের চারিদিকে বাঁধ নির্মাণ করিয়া পানি অবরুদ্ধ করিয়াছেন। বাঁধ দিয়া আটক করা না হইলে কূপের পানি মাটির উপর দিয়া গড়াইয়া যাইত। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এই মত। হারাবীর মতে زَمْزَمَةُ الْمَاءِ শব্দের অর্থ 'পানির শব্দ' এবং এজন্য কূপটির উক্ত নামকরণ। ইয়া'কূব আল-হামাবী লিখিয়াছেন যে, পানির প্রাচুর্যের কারণেই কূপটির 'যমযম' নামকরণ করা হইয়াছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আল-ফাকিহী তাঁহার "আখবার মাক্কাতা ফী ক'াদীমি'দ-দাহ্‌রি ওয়া হাদীছিহি" গ্রন্থে যমযম কূপের চৌত্রিশটি

অর্থবোধক নাম উল্লেখ করিয়াছেন (মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৫৮-৬১; তারীখু'ল-কাবীম, ৩খ, পৃ. ৯৫; মু'জামুল-বুলদান, ৩খ, পৃ. ১৪৭-৮)।

যেহেতু কা'বা শরীফ হযরত আদম (আ)-এর যুগ হইতেই বর্তমান স্থানে বিদ্যমান ছিল, হয়ত কালের প্রবাহে কখনও কখনও গৃহকাঠামো অবলুপ্ত হইয়াছে, তাই নিশ্চয়ই তখন হইতেই এখানে পানির ব্যবস্থাও বিদ্যমান থাকার কথা। আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশে পানি হইল পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম উপাদান। তাই এই মহাসম্মানিত গৃহের সংলগ্ন পানি ব্যবস্থাও নিশ্চয়ই ছিল।

সকল ঐতিহাসিকের জন্য ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র হাদীছই যমযমের আদি ইতিহাসের উৎস। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর দু'আ (দ্র. ২ ঃ ১২৬-২৯ এবং ১৪ ঃ ৩৫-৮) এবং স্বামী-স্ত্রী ও পুত্রের আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার উসীলায় এমন বরকত দান করিলেন যে, এই যমযম কূপকে কেন্দ্র করিয়া স্বল্প কালের মধ্যে মক্কার বিজন প্রান্তর মানুষের কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রাথমিক পর্যায়ে আরবের একটি আদি গোত্র 'জুরহুম' হযরত হাজার (রা)-এর অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া এখানে বসতি স্থাপন করে এবং হযরত ইসমাঈল (আ) যৌবনে পদার্পণ করিয়া এই গোত্রে বিবাহ করেন।

হাদীছ শরীফে যমযম কূপ সম্পর্কে বহু স্থানে আলোচনা বিদ্যমান থাকিলেও কুরআন মজীদে এই কূপ সম্পর্কে সরাসরি কোন বক্তব্য নাই। হজ্জ সংক্রান্ত আলোচনায় পরোক্ষভাবে ইহার উল্লেখ আছেঃ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ "যাহাতে তাহারা তাহাদের কল্যাণময় স্থানসমূহে উপস্থিত হইতে পারে" (২২ ঃ ২৮)

অতএব যমযম কূপ কা'বার চত্বরে অবস্থিত হওয়ায় ইহা একটি কল্যাণময়, মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় স্থান এবং ইহার পানি মানুষের জন্য বরকতপূর্ণ। দুগ্ধপোষ্য নবীর জীবন তো এই পানি দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়াছিল। অর্থাৎ একজন মহান নবীই সর্বপ্রথম এই কূপের পানি পান করিয়াছিলেন। তাঁহারই উত্তর পুরুষ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে মি'রাজ উপলক্ষে ঊর্ধ্বজগতে আরোহণ করানোর প্রস্তুতিকালে তাঁহার হৃদয় মুবারক যমযমের পানি দ্বারাই ধৌত করা হয়। এই সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন ঃ "আমি মক্কায় অবস্থানকালে একদিন রাত্রিবেলা আমার গৃহের ছাদ খুলিয়া গেল এবং জিবরাঈল (আ) অবতরণ করিয়া আমার বক্ষ বিদারণ করেন এবং যমযমের পানি দ্বারা তাহা ধৌত করেন, অতঃপর একখানা স্বর্ণের থালায় ঈমান ও হিকমত পরিপূর্ণ করিয়া আনিয়া আমার বক্ষমধ্যে ঢালিয়া দিয়া তাহা জোড়া লাগাইয়া দেন ......" (বুখারী, কিতাবুল হজ্জ, বাব ৭৫ ঃ যমযম সম্পর্কে যাহা কিছু উল্লিখিত ইহয়াছে, ২খ, পৃ. ১১৪)।

হাফিজ য়য়নুদ্দীন ইরাকী বলেন, যমযমের পানি দ্বারা তাঁহার বক্ষ ধৌত করার উদ্দেশ্য যাহাতে তিনি বেহেশত-দোযখসহ ঊর্ধ্ব জগত অবলোকন করিবার শক্তি অর্জন করিতে পারেন। কারণ যমযমের পানি দ্বারা অন্তরাত্মা শক্তিশালী হয় এবং ভয়ভীতি দূর হয়। বালক বয়সের বক্ষ বিদারণ কালেও যমযমের পানি দ্বারা তাঁহার বক্ষ ধৌত করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে (আযরাকীর আখবার

মাক্কা গ্রন্থের বরাতে মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৬৫)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যমযমের পানি পান করাইয়াছি। তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় তাহা পান করেন" (বুখারী, পৃ. স্থা, নং ১৫২৭; তিরমিযী, আশরিবা, বাব ১২, নং ১৮৩০, ৩খ, পৃ. ৩৫৪-৫; মুসলিম, আশরিবা, বাব ২০৮, নং ৫১০৮-১১, ৭খ, পৃ. ৪৭; নাসাঈ, মানাসিক, বাব ঃ আশ-শুরবি যামযাম ক'াইমান)।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ "যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হইবে তাহা পূর্ণ হইবে" (ইব্ন মাজা, মানাসিক, বাব ৭৮, নং ৩০৬২, ২খ, পৃ. ১০১৮; আও দ্র. মুসতাদরাক হাকেম)। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোথা হইতে আগমন করিয়াছ? সে বলিল, যমযম হইতে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পানি যেইভাবে পান করিতে হয় সেইভাবে তুমি কি তাহা পান করিয়াছ? আগন্তুক বলিল, তাহা কিভাবে? তিনি বলিলেন, তুমি ইহার পানি পান করার সময় কিবলামুখী হইবে, বিসমিল্লাহ বলিবে, তিন নিঃশ্বাসে পান করিবে, উদর পূর্তি করিয়া পান করিবে এবং পানশেষে আলহামদু লিল্লাহ বলিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

اِنَّ اٰيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ اَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُوْنَ مِنْ زَمْزَمَ.

"আমাদের ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তাহারা উদর পূর্তি করিয়া যমযমের পানি পান করে না" (ইব্ন মাজা, মানাসিক, বাব ৭৮, নং ৩০৬১)।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন ঃ

خَيْرُ مَاءٍ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ.

"পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম পানি হইল যমযমের পানি" (সহীহ ইব্ন হিব্বানের বরাতে মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৬৫)।

ইব্ন আব্বাস (রা) মহানবী (সা)–এর বাণী হিসাবে বলেন, যমযমের পানি যে উদ্দেশে পান করা হইবে তাহা পূর্ণ হইবে। তুমি উহার পানি রোগমুক্তির জন্য পান করিলে আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করিবেন এবং পিপাসা নিবারণের জন্য পান করিলে আল্লাহ তোমার পিপাসা মিটাইবেন। ইহা জিবরীল (আ)-এর পদাঘাতে ইসমাঈল (আ)-এর পানীয় হিসাবে সৃষ্টি হইয়াছে (আযরাকীর আখবার মাক্কা গ্রন্থের বরাতে মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৬৩; একই কথা মুজাহিদ (র)-এর নিজস্ব বক্তব্য হিসাবেও উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে তাহাতে আরও আছে ঃ তুমি উহা ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশে পান করিলে আল্লাহ তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবেন, পৃ. ৬২; তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬৭)। আযরাকীর গ্রন্থে আরও আছে যে, মহানবী (সা) সুহায়ল ইব্ন আমর (রা)-কে যমযমের পানি উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন (মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৬২; তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬৮)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, তোমরা পুণ্যবান লোকদের সালাতের স্থানে সালাত আদায় কর এবং দীনদার

লোকদের পানীয় পান কর। তাঁহাকে পূন্যবানদের সালাতের স্থান এবং দীনদারগণের পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, পুণ্যবানদের সালাতের স্থান হইল মীযাবের নিচে এবং দীনদারগণের পানীয় হইল যমযমের পানি (আযরাকীর বরাতে মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৬৪; তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬৮-৯; উভয় গ্রন্থে আখবার মাক্কা গ্রন্থের বরাতে)।

স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণকারী প্রবীণ সাহাবী হযরত আবূ যার আল-গিফারী (রা) মহানবী (সা)-এর নবুওয়াত লাভের সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে মক্কায় আগমন করেন। তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মক্কার কুরায়শ মুশরিকরা তাঁহাকে প্রস্তর নিক্ষেপে জর্জরিত করিয়া বেহুঁশ করিয়া ফেলে এবং তাঁহার সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হইয়া যায়। হুঁশ ফিরিয়া পাইলে তিনি যমযমের নিকট গিয়া দেহের রক্ত ধুইয়া ফেলেন এবং যমযমের পানি পান করেন। তিনি মহানবী (সা)-এর সহিত সাক্ষাতের আশায় কা'বার চত্বরে তিরিশ দিন (বর্ণনান্তরে পনর দিন) অতিবাহিত করেন। এই সময় যমযমের পানি ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন খাদ্য বা পানীয় ছিল না। তিনি উহা পান করিয়া সুস্বাস্থ্য লাভ করেন এবং এই দীর্ঘ সময়ে কখনও ক্ষুধা অনুভব করেন নাই। তাঁহার সহিত সাক্ষাত হইলে পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহার এই কয়দিনের খাদ্য-পানীয়ের খবর লইলে তিনি বলেন যে, যমযমের পানি ছাড়া আর কিছুই তাহার উদরে প্রবেশ করান নাই এবং ইহাতেই তিনি সুস্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ এই পানি ক্ষুধার সময় খাদ্যের অভাব পূর্ণ করে (দ্র. বুখারী, মানাকিংবুল আনসার, বাব ইসলাম আবী যার, ১খ., পৃ. ৫৪৪-৫; ইসাবা, ৭খ, পৃ. ৬--৬২, নং ৩৮২। সহীদ মুসলিম কিতাবুল ফাদাইলু মিন ফাদাইল আবী যার (রা), ২খ, পৃ. ২৯৫-৬; বাংলা অনু. ৮খ, পৃ. ৫-৯)।

আব্বাস (রা) বলেন, জাহিলী যুগে লোকেরা একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষের শিকার হইল। খাদ্য সংগ্রহ তাহাদের জন্য কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। এই সময় তাহারা যমযমের পানি পান করিয়া এবং তাহাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকেও পান করাইয়া নিশ্চিত মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে মুক্তি পায়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এইজন্যই যমযম কূপের অপর নাম হয় 'শাব্বাআহ' (شباعة) ক্ষুধা নিবারণকারী; (তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬৮)। যমযমের পানি দাঁড়ানো অবস্থায় পান করা সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) দাঁড়ানো অবস্থায় ইহার পানি পান করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) যমযমের পানি পানকালে নিম্নোক্ত দু'আ পড়িতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ.

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি উপকারী বিদ্যার, পর্যাপ্ত রিযিকের এবং যাবতীয় রোগব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের" (মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৭৩)। পৃথিবীর সর্বত্রই এই বরকতময় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

হাকেম তিরমিযী (র) বলেন, যমযম কূপের পানি দ্বারা উপকার লাভ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খাঁটি নিয়তের উপর নির্ভরশীল। খালেছ নিয়তে উহা পান করিলে উপকার লাভ অবশ্যম্ভাবী। আল্লামা

মুনাবী আত-তায়সীর বিশারহি' আল-জামে' আস-সাগীর গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, যমযমের উৎপত্তি হইয়াছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর সাহায্যার্থে। আজও কেহ নিষ্ঠার সহিত এই পানি ব্যবহার করিলে সেও আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত হইবে (আখবার মাক্কা গ্রন্থের বরাতে মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৬৬)।

কালের পরিক্রমায় মানুষ সত্য দীন হইতে বিচ্যুত হইয়া পথভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র কুদরতে সৃষ্ট এই বরকতময় কূপেরও বিলুপ্তি ঘটে। ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণকে পরাভূত করিয়া জুরহুম গোত্র কা'বার কর্তৃত্ব দখল করিয়া নেওয়ার পর তাহারা ক্রমান্বয়ে পথভ্রষ্ট হইতে থাকে। তাহারা পবিত্র হারাম শরীফের অসম্মান করে, হারাম শরীফে প্রদত্ত উপহার-সামগ্রী প্রকাশ্যে ও সন্তর্পণে চুরি ও আত্মসাৎ করিতে থাকে। তাহাদের গোত্রের প্রবীণ ব্যক্তি আমর ইব্ন হারিছ ইব্ন মাদাদ তাহাদেরকে এইসব অপকর্ম হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ দেন, কিন্তু তাহারা উহাতে কর্ণপাত করে নাই। তাই তিনি কা'বার ধনভাণ্ডারে রক্ষিত দুইটি স্বর্ণের হরিণের প্রতিকৃতি এবং স্বর্ণের তরবারি রাতের অন্ধকারে গোপনে কূপের মধ্যে দাফন করিয়া কূপটিকে ভরাট করিয়া ফেলেন (মুহাম্মদ তাহির আল-কুরদী, তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৫৬)। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে, মাদাদ ইব্ন আমর আল-জুরহুমী খুযাআ গোত্রের নিকট পরাজিত হইলে তিনি তাহাদেরকে পানি হইতে বঞ্চিত করার উদ্দেশে নিজের মূল্যবান দ্রব্যাদি ও স্বর্ণ দ্বারা কূপটিকে ভরাট করিয়া ফেলেন,অতঃপর মরুভূমির ধুলা-বালিতে কূপের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইয়াকূত আল-হামাবী বলিয়াছেন যে, বৃষ্টিপাতের অভাবে কূপটি শুষ্ক হইয়া যায় এবং অবশেষে ইহার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকে নাই (মু'জামুল বুলদান, ৩খ, পৃ. ১৪৯)। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, বৃষ্টিপাতের অভাবের কারণে নয়, জুরহুম গোত্রের অবাধ্যাচারের কারণে কূপটি শুকাইয়া যায় এবং পরবর্তী কালে বন্যার কারণে ইহার শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া যায় (মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ২৩-২৪)।

জুরহুম গোত্রের পর কা'বাসহ মক্কার ক্ষমতা খুযাআ গোত্রের হস্তগত হওয়ার ইতিহাস কিছুটা জানা গেলেও মহানবী (সা)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক যমযম কূপের পুনরাবিষ্কারের পূর্বে পর্যন্ত উক্ত কূপের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। মক্কা শরীফে যেহেতু কোন নদীনালা ছিল না, তাই লোকেরা সম্ভবত বিকল্প কূপ খনন করিয়া নিজেদের পানির প্রয়োজন মিটাইত। কুরায়শ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কুসায়্যি ইব্ন কিলাব চামড়ার মশকে করিয়া মক্কার বাহির হইতে পানি আনিয়া হাজ্জীদেরকে পান করাইতেন। পরে তিনি উম্মু হানী (রা)-র গৃহের স্থানে আজূল নামক কূপ খনন করিয়া পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। যমযম ছাড়া ইহাই মক্কার ভিতরের প্রথম কূপ (মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৪৬)। তখনও যমযম কূপ অনাবিষ্কৃত থাকে।

আবদুল মুত্তালিব একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে যমযম কূপের সন্ধান লাভ করেন। তিনি হিজরে ইসমাঈলে (বর্তমান হাতীম) ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে তিনবার কূপ খননের নির্দেশ লাভ করেন। স্বপ্নে

কেহ তাঁহাকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, কা'বার সম্মুখে অবস্থিত, যুগল মূর্তি বরাবর পিঁপড়ার ঢিবিতে ময়লা ও রক্তের মাঝে কাকের ঠোঁকরে সৃষ্ট ছিদ্রের মধ্যে খননকার্য চালাইয়া যমযম কূপ আবিষ্কার করা যাইবে। অতএব তিনি মসজিদুল হারামে পৌঁছিয়া স্বপ্নের লক্ষণসমূহ অবলোকন করার অপেক্ষায় ছিলেন। এই সময় হারাম শরীফ এলাকার বাইরে একটি গরু যবেহ করা হইলে উহা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে অলৌকিকভাবে ছুটিয়া আসিয়া কা'বার চত্বরে পতিত হইয়া সেখানে মারা যায়। এক পর্যায়ে কাক আসিয়া পিঁপড়ার ঢিবি বরাবর খুঁড়িতে থাকে। আবদুল মুত্তালিব তাঁহার স্বপ্নের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়া একমাত্র পুত্র হারিছকে লইয়া কূপ খনন শুরু করেন। কূপ খননের প্রাক্কালে তিনি যে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন তাহা অপসারিত করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করেন এবং বলেন যে, তিনি দশটি পুত্র সন্তান লাভ করিলে তাহাদের একজনকে আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করিবেন (ইব্‌ন হিশাম, ১খ, পৃ. ১৫৭)। আল্লাহ তাঁহার অভিযান সফল করেন এবং তিনি কূপের সন্ধান লাভ করেন। তিনি ইহাতে দাফনকৃত দুইটি সোনার হরিণের প্রতিকৃতি, একটি স্বর্ণের তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন এবং এইগুলিকে কা'বার ধনভাণ্ডারে জমা করেন (তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬-৬২, মু'জামুল বুলদান, ৩খ, ১৪৯; তারীখ মাক্কা-এর বরাতে মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৪৮-৫১)। পরবর্তী কালে আবদুল মুত্তালিব দশজন পুত্র সন্তান লাভ করেন এবং পরিণত বয়সে তাহারা কুরায়শদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি তাঁহার মানত অনুযায়ী সন্তানদের মধ্যে লটারী করেন এবং ইহাতে তাঁহার সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বকনিষ্ঠ সন্তান এবং মহানবী (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ্‌র নাম উঠে। তিনি তাঁহাকে যবেহ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহার ভ্রাতাগণের পরামর্শে তিনি একশত উষ্ট্র অথবা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যে লটারী করেন। তৃতীয়বারে এক শত উষ্ট্রের নামে লটারী উঠে। অতএব তিনি পুত্রের পরিবর্তে এক শত উষ্ট্র যবেহ করেন (তা'রীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬২)। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি উপাধি হইল ইবনু'য-যাবীহায়ন (দুই যবেহকৃতের পুত্র)। পরবর্তীকালে নরহত্যার দিয়াতস্বরূপ এক শত উট প্রদান ইসলামী শরীআতে বিধিবদ্ধ হয় (তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬২)।

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনামতে, আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপ খননে কুরায়শদের বাধার সম্মুখীন হইয়া মানত করিয়াছিলেন যে, তিনি দশটি পুত্র সন্তান লাভ করিলে এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাদের একজনকে আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করিবেন। তিনি দশটি সন্তান লাভ করার পর নিজ প্রতিশ্রুতি মুতাবিক তাহাদের একজনকে কুরবানী করিতে উদ্যোগী হইলেন। লটারীতে কনিষ্ঠ পুত্র [মহানবী (সা)-এর পিতা] আবদুল্লাহ্‌র নাম উঠে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে সাজাহ নাম্নী এক মহিলা গণকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিল এবং তদনুযায়ী তিনি তাহার শরণাপন্ন হইলেন। সে তাহাকে দশটি উট কুরবানী করার পর তাহার সন্তান ও উটের মধ্যে ভাগ্য নির্ণায়ক শর টানিবার নির্দেশ দেয়। যতক্ষণ না উট কুরবানীর পক্ষে শর নির্গত হয় ততক্ষণ প্রতিবার দশটি করিয়া উট কুরবানী করিতে হইবে। নিয়মানুযায়ী দশবারে আবদুল্লাহর পরিবর্তে উট কুরবানী করার পক্ষে শর নির্গত হয়

এবং তিনি এক শত উট কুরবানী করিলেন। ইহার পর হইতে মানুষ হত্যার দিয়াতরূপে এক শত উট ধার্য হয়, ইতিপূর্বে নরহত্যার দিয়াত ছিল দশটি উট (ইব্ন হিশাম, ১খ, পৃ. ১৫৯-১৬১)। এখানে উল্লেখ্য যে, মহানবী (সা)-এর পিতা আবদুল্লাহ আবদুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন না, বরং তিনি তাঁহার মাতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। কারণ আবদুল্লাহ্‌র কনিষ্ঠ হামযা এবং হামযার কনিষ্ঠ ছিলেন আব্বাস (রা)। অর্থাৎ আব্বাস (রা)-ই ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান এবং মহানবী (সা)-এর জন্মের সময় তাঁহার বয়স ছিল প্রায় তিন বৎসর (সীরাতে ইব্ন হিশামের ১নং টীকা, ১খ, পৃ. ১৫৯; আর-রাওদুল উনুফ-এর বরাতে; আর-রাওদুল উনুফ, ১খ, পৃ. ১৭৬)।

ইহার পর হইতে বিভিন্ন শাসকের আমলে যমযমের সংস্কারকর্ম অব্যাহত থাকে এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহা অব্যাহত আছে (বিস্তারিত আধুনিক তথ্যের জন্য দ্র. মক্কা শরীফের ইতিকথা গ্রন্থখানি)। যমযমের তলদেশে তিনটি উৎস হইতে পানি আসিয়া উক্ত কূপকে সর্বদা পানিপূর্ণ করিয়া রাখে। হাজারুল আসওয়াদ, সাফা ও আবূ কুবায়স পর্বতদ্বয় এবং মাওয়া পর্বত ইহার তিনটি উৎস। এইগুলির মধ্যে হাজারুল আসওয়াদ ঝর্ণা হইতে সর্বাধিক পরিমাণ পানি নির্গত হয় এবং ঝর্ণাটি জান্নাত হইতে প্রবাহিত বলিয়া কথিত (তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬৫; মু'জামুল বুলদান, ৩খ, পৃ. ১৪৮)।

যমযম কূপের বিশেষত্ব

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে এবং শিশু নবী হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁহার পুণ্যময়ী মাতা হাজার (রা)-এর প্রতি তাঁহার অসীম অনুগ্রহস্বরূপ সর্বাধিক সম্মানিত ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) এই কূপ প্রবাহিত করেন। একজন নবী ও তাঁহার পুণ্যবতী মাতা সর্বপ্রথম এই কূপের পানি পান করায় ইতিহাসে ইহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে (তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬৭)। কথিত আছে যে, এই পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে হযরত হাজার (রা)-এর স্তনদ্বয় তাঁহার সন্তানের জন্য দুগ্ধে পূর্ণ হইয়া যায় (তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৫৯)। এই কূপের বরকতেই ধূসর মরুতে মানববসতি গড়িয়া উঠে। হযরত আলী (রা) বলেন, পৃথিবীর বুকে সর্বোত্তম কূপ হইল যমযম (তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬৭)।

এই কূপটি কা'বা ঘরের পাদদেশ এবং আল্লাহ্‌র দুই নিদর্শন সাফা-মারওয়া পর্বতদ্বয়ের সহিত সংযুক্ত। হাজারুল আসওয়াদমুখী নালাটি জান্নাত হইতে প্রবাহিত হওয়ায় জান্নাতের কূপের সঙ্গে এই কূপের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং স্বয়ং কূপটিও আল্লাহ্‌র এক নিদর্শন।

সুদূর অতীত হইতে আম্বিয়ায়ে কিরাম, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপ্রাপ্ত মহান বান্দাগণ, সিদ্দীকীন, সালিহীন প্রমুখ এই কূপের পানি পান করিয়াছেন এবং এখনও পান করা হইতেছে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে সত্তরজন এবং মুজাহিদ (র)-এর মত পঁচাত্তরজন নবী-রাসূল (আ) কা'বা ঘরের চত্বরে আসেন এবং হযরত মূসা (আ) ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নবী উক্ত কূপের পানি পান করিয়া ইহার মর্যাদা বর্ধিত করিয়া থাকিবেন (তা'রীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ১১৫)।

মহানবী (সা)-এর যতবার শাক্কু'স-সদর (বক্ষস্থল বিদীর্ণকরণ) হইয়াছে ততবার তাঁহার কলব এই কূপের পানি দ্বারা ধৌত করা হইয়াছে। তিনি এই কূপের পানি পান করিয়াছেন এবং অন্যদেরকে তাহা পান করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন (বিস্তারিত দ্র. তা'রীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ৬৬-৭১)।

এই বরকতময় কূপ আল্লাহ্‌র রহমতে কিয়ামত পর্যন্ত অটুক থাকিবে। দাহ্‌হাক (র) বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ইহার পানির উৎস বন্ধ হইয়া যাইবে এবং এইভাবে কূপটি বিলীন হইয়া যাইবে (অযরাকীর তারীখ মাক্কা-এর বরাতে তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ.৭৫)।

যমযম কূপ সম্পর্কিত হুকুম ও ইহার পানির বহুমুখী ব্যবহার

এই কূপের চত্বর মসজিদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এখানে সালাত আদায় করা, ই'তিকাফ করা ইত্যাদি জাইয। এখানে নাপাক অবস্থায় প্রবেশ করা বা বসা, থুথু বা আবর্জনা ইত্যাদি নিক্ষেপ করা নিষিদ্ধ। ইহা হানাফী মাযহাবের অভিমত এবং অন্যান্য মাযহাবের অধিকাংশ আলিমের অভিমতও ইহাই। আবদুল মুত্তালিব যখন কূপ খনন শুরু করেন তখন কুরায়শরা তাহাকে বলিল, আমরা আপনাকে মূর্খ মনে করি না, কিন্তু আপনি আমাদের মসজিদে খননকার্য করিয়া কেন তাহা নষ্ট করিতেছেন? এই কথার দ্বারা পূর্বোক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায় (বিস্তারিত দ্র. তারীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ১০১-১০৫)।

অনুরূপভাবে যমযমের পানিও যাবতীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আছে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি যমযমের পানি দ্বারা গোসল বৈধ মনে করি না। এই পানি পান করা এবং ইহা দ্বারা উযূ করা যাইবে। আল-ফাসী লিখিয়াছেন যে, যমযমের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাইবে। ইমাম নববী এবং মাওয়ারদীও একই কথা বলিয়াছেন। ভিন্ন পানির ব্যবস্থা থাকিলে যমযমের পানি দ্বারা শৌচকার্য করা জাইয নয়। এই পানি দ্বারা শৌচকার্য সমাধা করিলে অর্শ রোগ হয় বলিয়া কথিত আছে। মাওয়ারদীর এক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, যমযমের পানি দ্বারা শৌচ করা এবং মুর্দাকে গোসল করানো জাইয নয়। মালিকী মাযহাবে ইহার পানি দ্বারা উযূ করা মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। শাফিঈ মাযহাবমতে ইহার পানি দ্বারা উযূ ও গোসল উভয়ই জাইয। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-এর এক মত অনুযায়ী যমযমের পানি দ্বারা উযূ করা মাকরূহ। ফাকিহী উল্লেখ করিয়াছেন যে, মক্কার লোকেরা মুর্দাকে গোসল করানোর পর বরকত লাভের উদ্দেশে যমযমের পানি দ্বারা মুর্দাকে আরেকবার গোসল করাইয়া থাকে। আবূ বাক্‌র আস-সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা আসমা (রা) তাঁহার পুত্র এবং হিজরতের পর প্রথম জন্মগ্রহণকারী আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)-এর লাশ যমযমের পানি দ্বারা গোসল করান। শায়খ জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ জারুল্লাহ আল-কুরায়শী তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যমযম কূপের পানি পবিত্র। তবে ইহার অর্থ এই নহে, উহা শৌচকার্যে ব্যবহার করা যাইবে না। অপরদিকে মুহিব্বুদীন আত-তাবারী জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, যমযমের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ হইলেও ইহা দ্বারা শরীরের নাপাক দূর করা জাইয নয়।

আল ফাসী বলেন, চারি মাযহাবের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী যমযম কূপের পানি অন্য স্থানে বা দেশান্তরে লইয়া যাওয়া বৈধ, বরং শাফিঈ ও মালিকী মাযহাবমতে উহা মুস্তাহাব। উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা) তাঁহার সঙ্গে করিয়া যমযমের পানি আনিতেন এবং তিনি অবহিত করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-ও উহা বহন করিয়া আনিতেন (তিরমিযী, হজ্জ, বাব ১১২, নং ৯০৫, ২খ, পৃ. ২০০)। রাসূলুল্লাহ (সা) কলসী ও চামড়ার মশকে করিয়া যমযমের পানি সঙ্গে নিয়াছেন, রুগ্ন ব্যক্তিদেরকে তাহা পান করাইয়াছেন এবং তাহাদের দেহে উহা ছিটাইয়া দিয়াছেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) সুহায়ল ইব্ন বায়দাকে যমযমের পানি উপহার দিয়াছিলেন এবং বিনিময়ে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুইটি ভারবাহী উট উপহার দিয়াছিলেন (সম্পূর্ণ আলোচনাটি আযরাকীর আখবার মাক্কাহ গ্রন্থের বরাতে মক্কা শরীফের ইতিকথা, পৃ. ৭৪-৭৫ হইতে পত্রস্থ)।

ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানীর নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যে কয়টি কঠিন পরীক্ষা গ্রহণ করেন, একমাত্র পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানীর নির্দেশ সম্বলিত পরীক্ষা তার অন্যতম। নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ মর্যাদা ও স্থান অনুযায়ী পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া থাকেন (কাসাসুল কুরআন, ১খ, পৃ. ২৩৫)। তিনি স্বপ্নযোগে নিজ পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন এবং "নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় প্রাপ্ত ওহীর সমতুল্য" (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ, পৃ. ১৮৬; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ২৩খ, পৃ. ১২৮ ইত্যাদি)। তিনি পরপর তিন রাত্র স্বপ্ন দর্শন করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ দিতেছেন (মাআরিফুল কোরআন, বাংলা. অনু. ৭খ, পৃ. ১৪৫; কাসাসুল কুরআন, ১খ, পৃ. ২৩৬)। কতক মুফাসসিরের মতে ইবরাহীম (আ) সরাসরি নিজ পুত্রকে কুরবানী করিতেছেন এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন (নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০১)। হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম যিলহজ্জ মাসের সাত তারিখ দিবাগত আট তারিখের রাত্রে এই স্বপ্ন দর্শন করেন। সারাটি দিন তাঁহার উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে অতিবাহিত হয় যে, স্বপ্নটি কি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে না ইহা শয়তানের চক্রান্ত? তাই এই দিনটি ইয়াওমুত তারবিয়াহ (উৎকণ্ঠার দিন) নামে অভিহিত হয়। আট তারিখ দিবাগত রাত্রে তিনি পুনরায় একই স্বপ্ন দর্শন করেন এবং অনুধাবন করেন যে, ইহা আল্লাহ্র একটি নির্দেশ। তাই এই দিনটির নামকরণ করা হয় ইয়াওমুন নাহ্র বা কুরবানীর দিন (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ১৫৩; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ২৩খ, পৃ. ১২৮; কুরতুবীর আহকামুল কুরআনের বরাতে মাআরিফুল কোরআন, বাংলা অনু, ৭খ, পৃ. ৪৪৫; কাসাসুল কুরআন , ১খ পৃ. ২৩৬)। স্বপ্নের ভিন্নতর ব্যাখ্যা করার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র নির্দেশের সামনে মাথা নত করিয়া দেন (তাফসীরে কবীরের বরাতে মাআরিফুল কোরআন, ৭খ, পৃ. ৪৪৫)।

কুরআন মজীদে মাত্র এক স্থানে সংক্ষেপে কুরবানী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা আছে। বাইবেলেও সংক্ষিপ্তাকারে ঘটনাটির উল্লেখ আছে। তবে সেখানে ইসহাক (আ)-কে যবেহ করার কথা বলা হইয়াছে। বাইবেলের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ "এই সকল ঘটনার পরে সদাপ্রভু ইবরাহীমের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, হে ইবরাহীম! তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালোবাস, সেই ইসহাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপর তাহাকে হোমার্থে যবেহ কর। পরে ইবরাহীম প্রত্যূষে উঠিয়া গর্দভ সাজাইয়া দুইজন দাস ও আপন পুত্র ইসহাককে সঙ্গে লইলেন, হোমের নিমিত্ত কাষ্ঠ কাটিলেন, আর উঠিয়া সদাপ্রভুর নির্দিষ্ট স্থানের দিকে গমন করিলেন। তৃতীয় দিবসে ইবরাহীম চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে সেই স্থান দেখিলেন। তখন ইবরাহীম আপন দাসদিগকে কহিলেন, তোমরা এই স্থানে গর্দভের সহিত থাক; আমি ও যুবক আমরা ঐ স্থানে গিয়া প্রণিপাত করি, পরে তোমাদের কাছে ফিরিয়া আসিব। তখন ইবরাহীম হোমের কাষ্ঠ লইয়া আপন পুত্র ইসহাকের স্কন্ধে দিলেন এবং নিজ হস্তে অগ্নি ও খড়গ লইলেন; পরে উভয়ে একত্রে চলিয়া গেলেন। আর ইসহাক আপন পিতা ইবরাহীমকে বলিলেন, হে আমার পিতা! তিনি কহিলেন, হে বৎস ! দেখ, এই আমি। তখন তিনি বলিলেন, এই দেখুন অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের নিমত্ত মেষশাবক কোথায়? ইবরাহীম কহিলেন, বৎস! সদাপ্রভু আপনি হোমের জন্য মেষশাবক যোগাইবেন। পরে উভয়ে একসঙ্গে চলিয়া গেলেন। সদাপ্রভুর নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে ইবরাহীম সেখানে যবেহ করার মঞ্চ নির্মাণ করিয়া কাষ্ঠ সাজাইলেন, পরে আপন পুত্র ইসহাককে বাঁধিয়া মঞ্চে কাষ্ঠের উপর রাখিলেন। অতঃপর ইবরাহীম হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে যবেহ করিতে খড়গ গ্রহণ করিলেন। এমন সময় আকাশ হইতে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে ডাকিলেন এবং বলিলেন, ইবরাহীম! তিনি বলিলেন, দেখুন এই আমি। তখন তিনি বলিলেন, যুবকের প্রতি তোমার হস্ত বিস্তার করিও না, তুমি সদাপ্রভুকে ভয় কর, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নও। তখন ইবরাহীম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, তাঁহার পশ্চাৎ দিকে একটি মেষ, তাহার শিং ঝোপে বদ্ধ। পরে ইবরাহীম গিয়া সেই মেষটি লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্তে হোমার্থে যবেহ করিলেন।..... পরে সদাপ্রভু কহিলেন..... আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করিব এবং আকাশের তারকারাজি ও সমুদ্র তীরস্থ বালুকার ন্যায় তোমার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব..." (বাইবেলের যাত্রাপুস্তক, ২২ ঃ ১-১৯)। যবীহুল্লাহ সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনায় স্ববিরোধিতা রহিয়াছে। কুরআন মজীদে এই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ۔ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ۔ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۔ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ۔ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ۔ سَلٰمٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ۔ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ۔

"অতঃপর সে যখন তাহার পিতার সহিত কাজ করিবার বয়সে উপনীত হইল তখন ইবরাহীম বলিল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবেহ করিতেছি। অতএব তোমার অভিমত কি বল। সে বলিল, হে আমার পিতা! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন। যখন তাহারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করিল এবং ইবরাহীম তাহার পুত্রকে কাৎ করিয়া শোয়াইল তখন আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই পালন করিলে। আমি এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। নিশ্চয় ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। আমি ইহা পরবর্তীদের স্মরণে রাখিয়াছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। এইভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম" (৩৭ ঃ ১০২-১১১)।

ইতিহাস ও তাফসীর ভিত্তিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে, হযরত ইসমাঈল (আ) তখন তের বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন (মাআরিফ, ৭/৪৪৬) (মাযহারী)। কুরআন হইতে তের বৎসর বয়স সংক্রান্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন বলা হইয়াছে "সে যখন তাহার সহিত কাজ করিবার মত বয়সে উপনীত হইল।" অতএব তের বৎসর বা তাহার কাছাকাছি বয়সই সমর্থনযোগ্য। এই বয়সের বালকের মধ্যে পূর্ণ বুদ্ধির উন্মোষ না ঘটিলেও ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি এবং উপকারী ও ক্ষতিকারক বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়া থাকে। ইসলামী শরী'আতে এই বয়সের শিশুদেরকে "সাগীর মুমায়্যিয" বলা হয় (দ্র. মু'জাম লুগাতিল ফুকাহা, পৃ. ২৭৪, শিরো. সাগীর; কাওয়াইদুল ফিক্হ, পৃ.৩৪৯, শিরো. ঐ)। হযরত ইবরাহীম (আ) সুযোগ্য পুত্রের সামনে পরামর্শ লাভের ভঙ্গিতে স্বপ্নের বিষয় পেশ করেন ঃ "আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি তোমাকে যবেহ করিতেছি"। যেমন পিতা তেমন সন্তান এবং ভাবী নবী। পিতার বক্তব্য শোনামাত্র তিনি জবাব দিলেন, "আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাইবেন" (নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০১)। এই কথার মধ্য দিয়া কিশোর ইসমা'ঈল (আ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও উপলব্ধি করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে এই কচি বয়সে কি পরিমাণ মেধা ও জ্ঞান দান করিয়াছিলেন (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫৮)। কোন কোন বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কুরবানী করার নির্দেশ প্রাপ্তির পর পুত্রকে বলিলেন, বৎস! দড়ি ও ছুরি লও, আমরা পরিবারের জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহের নিমিত্ত ঐ উপত্যকায় যাই। তিনি উপত্যকার নির্জন স্থানে পৌঁছিয়া পুত্রকে কুরবানীর বিষয়টি অবহিত করেন (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৮৬; আরাইস, পৃ. ৯৯-১০০)। তাফসীর ও ইতিহাসের বর্ণনা হইতে আরও জানা যায় যে, শয়তান হাজার (রা), ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-কে প্রতারিত করার ব্যর্থপ্রয়াস চালায়। প্রতিবারই তিনি শয়তানের প্রতি সাতটি করিয়া পাথর নিক্ষেপ করিয়া অভিশপ্তকে বিতাড়িত করেন। এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতিস্বরূপ মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপ মহান হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে (মাআরিফুল কোরআন, ৭খ, পৃ. ৪৪৮; আল-কামিল, ১খ, পৃ.

৮৬)। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে আবুত তুফায়ল বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ) নিজ পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশপ্রাপ্ত হইলে পর শয়তান 'মাশআরুল হারাম' নামক স্থানে ইবরাহীম (আ)-এর মুখামুখি হয় এবং তিনি তাহাকে পরাস্ত করেন। অতঃপর জামরাতুল আকাবায় পৌঁছিয়া শয়তান তাঁহাকে প্রতারিত করিতে চাহিলে তিনি তাহার প্রতি পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া উহাকে বিতাড়িত করেন। একইভাবে জামরাতুল উসতায় এবং অবশেষে জামরাতুল কুবরায় পৌঁছিয়া শয়তান তাঁহার প্রতিবন্ধক হইলে তিনি উভয় স্থানে ইহার প্রতি পরপর সাতটি করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ইহাকে তাড়াইয়া দেন এবং অতঃপর আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যকর করিতে উদ্যোগী হন (আরাইস, পৃ. ১০১)।

আবু হুরায়রা (রা) কা'ব আল-আহ্বারের সূত্রে এবং ইব্ন ইসহাক কতিপয় সূত্রে শয়তানের ধোঁকা প্রদানের ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার পুত্রকে কুরবানী করার স্বপ্ন দর্শনের পর শয়তান ইবরাহীম (আ) পরিবারকে ধোঁকা দিতে বদ্ধপরিকর হইল। সে মানুষের বেশে হযরত হাজার (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, তুমি কি জান ইবরাহীম তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া গিয়াছে? তিনি বলেন, কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য এই উপত্যকায় গিয়াছেন। শয়তান শপথ করিয়া বলিল, সে তাহাকে যবেহ করিতে লইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, কখনও নহে, তিনি তাহার প্রতি আমা হইতে অধিক স্নেহশীল ও মমতাময়। শয়তান বলিল, ইবরাহীমের ধারণা যে, তাহাকে তাহার প্রভু ইহা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তখন হাজার (রা) বলিলেন, আল্লাহ যদি তাঁহাকে এই হুকুম দিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি আল্লাহ্র আনুগত্য করিতে এবং তাঁহার নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে উত্তম কাজই করিয়াছেন। এই উত্তরে নিরাশ হইয়া শয়তান ইসমাঈল (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে বলিল, হে বালক! তুমি কি জান তোমার পিতা তোমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে? তিনি বলিলেন, ঐ উপত্যকায় কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য। সে শপথ করিয়া বলিল, তিনি তোমাকে যবেহ করিতে এখানে আনিয়াছেন। কারণ তিনি ধারণা করেন যে, আল্লাহ তাঁহাকে ইহা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ইসমাঈল (আ) বলিলেন, যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করুন। এই উত্তরে শয়তান নিরাশ হইয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে বৃদ্ধ! কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, একটি প্রয়োজনে এই উপত্যকায়। সে বলিল, আমি অবশ্যই মনে করি যে, শয়তান আপনাকে পুত্র কুরবানীর স্বপ্ন দেখাইয়াছে। ইবরাহীম (আ) শয়তানকে চিনিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, হে অভিশপ্ত! আমার নিকট হইতে দূর হও। আল্লাহ্র শপথ! আমি আমার প্রভুর নির্দেশ অবশ্যই পালন করিব (দ্র. কুরতুবীর আহ্কামুল কুরআন, ১৫খ, পৃ. ১০৫-৬; রূহুল মাআনী, ২৩ খ, পৃ. ১৩২; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩খ, পৃ. ১৮৭; তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ১৫৩; মাআরেফুল কোরআন, ৭খ, পৃ. ৪৪৮)। হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্রের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁহার হাত-পা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া উপুড় করিয়া শোয়াইলেন, অতঃপর তাহার গলায় নিজ হস্তে দ্রুত ছুরি চালাইলেন কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও এক গাছি পশমও কাটিতে পারেন নাই। পিতা-পুত্রের এইরূপ কঠিন পরীক্ষা চলা অবস্থায়

আল্লাহ তা'আলা ডাক দিলেন ঃ "হে ইবরাহীম ! তুমি তো স্বপ্নকে সত্য প্রমাণিত করিয়া দেখাইলে"। ইমাম সুদ্দী (র) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা পিতার ছুরি ও পুত্রের কণ্ঠনালীর মাঝখানে একটি তাম্রপাত রাখিয়া দিয়াছিলেন। ফলে ছুরি কণ্ঠনালী স্পর্শ করিতে পারে নাই (আরাইস, পৃ. ১০০)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "আমি এইভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি"। হে ইবরাহীম! এই তোমার পুত্রের পরিবর্তে তোমার যবেহ করার প্রাণী। ইহাকে তুমি যবেহ কর। ইবরাহীম (আ) দৃষ্টি ফিরাইয়া একটি হৃষ্টপুষ্ট দুম্বাসহ হযরত জিবরাঈল (আ)-কে উপস্থিত দেখিতে পান। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, ইহা ছিল জান্নাতের একটি দুম্বা যাহা চল্লিশ বৎসর ধরিয়া জান্নাতে বিচরণ করিয়াছে। অপর বর্ণনায় আছে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন যে, ইবরাহীম (আ) যে দুম্বা যবেহ করেন তাহা ছিল আদম (আ)-এর পুত্র হাবীল কর্তৃক কুরবানীকৃত দুম্বা, যাহা আল্লাহ কবুল করিয়াছিলেন (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ১৫৮; তাফসীরে রূহুল মাআনী, ২৩ খ, পৃ. ১৩২)।

ইবরাহীম (আ) পুত্রকে ছাড়িয়া দিলেন এবং দুম্বাটি মিনার কুরবানীর স্থানে যবেহ করিলেন (আরাইস, পৃ. ১০০; মাআরেফুল কোরআন, ৭খ, পৃ. ৪৪৯)। তখন হইতে কিয়ামতকাল পর্যন্ত তৌহীদবাদী মানবজাতির জন্য প্রতি বৎসর দশ যুলহিজ্জা পশু কুরবানী করার ঐতিহ্য চালু হইয়াছে। এইভাবে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে পিতা-পুত্রের এক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্তকে। "নিশ্চয় ইহা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাহাকে মুক্ত করিলাম এক কুরবানীর বিনিময়ে। আমি ইহা পরবর্তীদের জন্য স্মরণে রাখিয়াছি" (৩৭ ঃ ১০৬-৭)।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তো পুত্রকে কুরবানী করার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, অথচ তিনি তাহাকে কুরবানী করেন নাই। তাহা হইলে নবীর স্বপ্ন সত্য হইল কিভাবে? বস্তুত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে পুত্রকে যবেহ করিতে দেখিয়াছেন, যবেহ করিয়া তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা দেখেন নাই। অতএব তিনি তাঁহার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করিয়াছেন অর্থাৎ স্বপ্নে যবেহ করিতে দেখিয়াছিলেন এবং বাস্তবেও তিনি ছুরি হাতে লইয়া পুত্রের গলায় তাহা সজোরে চালাইয়াছেন কিন্তু যেহেতু তিনি যবেহকর্ম সমাপ্ত করিয়াছেন এইরূপ স্বপ্ন দেখেন নাই, তাই বাস্তবেও যবেহ সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। আল্লাহ তাঁহাকে যতদূর স্বপ্ন দেখাইয়াছেন, তিনি ততটাই বাস্তবায়িত করিয়াছেন (দ্র. তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ১৫৫; তাফহীমুল কুরআন, ৩৭ ঃ ১০২ ও ১০৫ আয়াত সংশ্লিষ্ট ৫৮ ও ৬৩ নং টীকা)।

ইয়াহূদী-খৃস্টানগণ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রতি বিদ্বেষবশত এই কুরবানীর ঐতিহ্যকে ত্যাগ করিয়াছে। আরবদের মধ্যে ইহা চালু থাকিলেও কালক্রমে তাওহীদের বিশ্বাস হইতে তাহাদের বিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথাও বিকৃত হইয়া যায়। তাহারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানী করার পরিবর্তে তাহাদের মনগড়া দেব-দেবীর নামে পশু উৎসর্গ করিত। যেমন কুরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে ঃ

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ .

"এবং যাহা মূর্তিপূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় (তাহাও তোমাদের জন্য হারাম)" (৫ ঃ ৩)।

জাহিলী যুগে আরব মুশরিকরা কা'বা ঘরে স্থাপিত মূর্তির নামে পশু যবেহ করিত এবং উহার রক্ত সেগুলির দেহে মর্দন করিত। অন্যান্য স্থানেও তাহারা অনুরূপ কুরবানগাহ স্থাপন করিয়াছিল (ফী জিলালিল কুরআন, ২খ, পৃ. ৮৪০)। ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, অর্থাৎ মূর্তিপূজার বেদীতে যাহা যবেহ করা হয়। মুজাহিদ ও ইব্‌ন জুরায়জ বলেন, কা'বা গৃহের পার্শ্বে অবস্থিত একটি পাথরকে 'নুসুব' বলা হয়। ইব্‌ন জুরায়জ আরও বলেন, জাহিলী যুগে সেখানে ৩৬০টি পূজার বেদী ছিল। সেইগুলির উপর তাহারা পশু বলি দিত এবং তাহারা কাবাগৃহের নিকটবর্তী বেদীগুলিতে বলিকৃত পশুর রক্ত কাবাগৃহে ছিটাইয়া দিত এবং ঐগুলির গোশত বেদীমূলে রাখিয়া দিত (তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, সংক্ষিপ্ত সং, ১খ, পৃ. ৪৮১; বৃহৎ সং, ২খ, পৃ. ৪৮৬)।

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.

"যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হয় নাই তাহার কিছুই তোমরা আহার করিও না" (৬ ঃ ১২১)।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আতা (র) বলেন, এখানে সেইসব জন্তুর গোশত ভক্ষণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, যাহা কুরায়শ সম্প্রদায় তাহাদের দেব-দেবীর নামে যবেহ করিত (তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, উক্ত আয়াতাধীন; ফী জিলালিল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১১৯৭)।

মহানবী (স) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর এই মহান কুরবানীকে পুনর্জীবিত করেন এবং ইহা আবহমান কাল পর্যন্ত ইসলামী শরীআতে একটি অবশ্য পালনীয় প্রথারূপে বিধিবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.

"সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর" (১০৮ ঃ ২)।

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

"যাহাতে তাহারা তাহাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হইতে পারে এবং তিনি তাহাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হইতে যাহা রিযিক হিসাবে দান করিয়াছেন উহার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করিতে পারে। অতঃপর তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং দুঃস্থ-অভাবগ্রস্তকে আহার করাও" (২২ঃ২৮)।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ.

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করিয়া দিয়াছি। তিনি তাহাদেরকে রিযিকরূপে যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দান করিয়াছেন, সেগুলির উপর যেন তাহারা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে" (২২ ঃ ৩৪)।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.

"এবং উষ্ট্রকে করিয়াছি আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলির অন্যতম, তোমাদের জন্য উহাতে রহিয়াছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় উহাদের উপর তোমরা আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। যখন এইগুলি কাত হইয়া পড়িয়া যায় তখন তোমরা উহা হইতে আহার কর এবং ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাবগ্রস্তকেও আহার করাও" (২২ ঃ ৩৬)।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই কুরবানী কি?" তিনি বলেন ঃ سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ "তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সুন্নাত" (সুনান ইব্‌ন মাজা, আদাহী, বাব ছাওয়াবিল উদহিয়্যা)।

কুরবানী করা হইয়াছিল ইসমাঈলকে, ইসহাককে নয়

কুরআন মজীদে কুরবানীর যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহাতে নামোল্লেখ করিয়া বলা হয় নাই যে, হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করিয়াছেন, না ইসহাক (আ)-কে। এই বিষয়ে হাদীছের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীতেও সহীহ সনদসূত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন বক্তব্যও বিদ্যমান নাই। ইয়াহূদী-খৃস্টান সম্প্রদায় দাবি করে যে, হযরত ইসহাক (আ)-কে কুরবানী করা হইয়াছিল, ইসমাঈল (আ)-কে নয়। এই বিষয়ে বাইবেলের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ "তুমি আপন পুত্রকে, তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসহাককে লইয়া মোরিয়া দেশে যাও এবং তথাকার যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব, তাহার উপর তাহাকে হোমার্থে কুরবানী কর" (আদিপুস্তক, ২২ ঃ ২ এবং উক্ত অধ্যায়ে কুরবানীর ঘটনাও বিধৃত হইয়াছে)। উপরিউক্ত বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার অদ্বিতীয় অর্থাৎ একমাত্র পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল। অথচ হযরত ইসহাক (আ) কোনও কালেও তাঁহার একমাত্র বা অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন না। স্বয়ং বাইবেল হইতেই প্রমাণিত যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-ই ছিলেন দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একমাত্র ও অদ্বিতীয় পুত্র। বাইবেল বলে, "ইবরাহীমের ছিয়াশি বৎসর বয়সে হাগার ইবরাহীমের নিমিত্তে ইসমাঈলকে প্রসব করিল" (আদিপুস্তক, ১৬ ঃ ১৬)। "ইবরাহীমের এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়" (আদিপুস্তক, ২১ ঃ ৫)। "ইবরাহীমের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদনকালে তাঁহার বয়স নিরানব্বই বৎসর, আর তাঁহার পুত্র ইসমাঈলের লিঙ্গাগ্রের ত্বক ছেদনকালে তাঁহার বয়স তের বৎসর" (আদিপুস্তক, ১৭ ঃ ২৪-২৫)। অতএব এখানেও লক্ষ্য করা যায় যে, ইবরাহীম (আ) নিরানব্বই বৎসর বয়সে যখন খতনা করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন তখনও তাঁহার পরিবারে একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ) এবং তাঁহার বয়স তখন তের বৎসর। অতএব ইহাই যুক্তিসঙ্গত যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ও অদ্বিতীয় পুত্র ইসমাঈল (আ)-কেই কুরবানী করিতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

একদল খৃস্টান পাদ্রী উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য বলিয়া থাকে যে, ইসমাঈল (আ) দাসীপুত্র হওয়ায় তাহার মাংসে রক্ত-মাংসের (কামনা-বাসনা) আধিক্য ছিল এবং ইসহাক (আ) স্বাধীনা মহিলার সন্তান হওয়াতে তিনিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত পবিত্র সন্তান (দ্র. বাইবেলের নূতন নিয়ম, গালাতীয় পুস্তক, ৪ ঃ ২২-২৬)। এই কথা মোটেই সত্য নহে যে, ইসমাঈল (আ)-এর মাতা হাজার

(রা) দাসী ছিলেন, বরং তিনি ছিলেন রাজবংশীয়া (এই বিষয়ে তথ্যনির্ভর আলোচনার জন্য দ্র. "ইবরাহীম" শীর্ষক নিবন্ধ)। বাইবেলে বহুবার হযরত ইসমাঈল (আ)-কে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র বলা হইয়াছে, যেভাবে হযরত ইসহাক (আ)-কে বলা হইয়াছে। "পরে ইবরাহীম আপন পুত্র ইসমাঈলকে..." (আদিপুস্তক, ১৭ ঃ ২৩); "ইবরাহীম ও তাঁহার পুত্র ইসমাঈল..." (ঐ, ১৭ ঃ ২৬); "আর তাঁহার পুত্র ইসমাঈলের..." (ঐ, ১৭ ঃ ২৫)। উপরন্তু ইসহাক (আ)-এর জন্য বাইবেলে যেরূপ 'বিরাট ভবিষ্যতের' প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান, ইসমাঈল (আ)-এর জন্যও তদ্রূপ বিরাট ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

"সদাপ্রভুর দূত তাহাকে (হাজারকে) আরও বলিলেন, আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি করিব যে, বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে..." (আদিপুস্তক, ১৬ ঃ ১০)।

"আর ইসমা'ঈলের বিষয়েও তোমার (ইবরাহীমের) প্রার্থনা শুনিলাম। দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব, তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে এবং আমি তাহাকে বড় জাতি করিব" (আদিপুস্তক, ১৭ ঃ ২০)।

অনুরূপভাবে হযরত ইসমাঈল (আ)-ও ইসহাক (আ)-এর মতই ইবরাহীম (আ)-এর প্রতিশ্রুত সন্তান। ইবরাহীম (আ) নিঃসন্তান হওয়ার অভিযোগ করিলে "সদাপ্রভুর বাক্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল... যে তোমার ঔরসে জন্মিবে সে তোমার উত্তরাধিকারী হইবে" (আদিপুস্তক, ১৫ ঃ ৪)। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পরপরই হযরত ইসমাঈল (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে এবং তথায় হযরত হাজার (রা)-কে পুত্র সন্তান প্রসবের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে (দ্র. আদিপুস্তক, ১৬ ঃ ১-১৬)।

ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কর্তৃক আল্লাহ্র মহান ঘর কা'বা শরীফ নির্মাণ ও ইহাকে কেন্দ্র করিয়া আল্লাহ তা'আলা তৌহীদের পতাকাবাহী মানবগোষ্ঠীর হজ্জ অনুষ্ঠানের যে মহান ইবাদতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেই ধারাবাহিক ইতিহাসকে বাইবেলে যেভাবে বিলুপ্ত করা হইয়াছে, তদ্রূপ কুরবানী সংক্রান্ত ইতিহাসকেও বিলোপ না করিলেও উহার ব্যাপক তথ্যগত বিকৃতি সাধন করা হইয়াছে। বাইবেলে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই হাজার (রা)-কে দাসী আখ্যায়িত করা হইয়াছে, কুরবানীর এলাকা মারওয়া পাহাড়কে মোরিয়া বলা হইয়াছে এবং 'ইসমাঈল'-এর স্থলে 'ইসহাক' শব্দ প্রবিষ্ট করা হইয়াছে। বাস্তবিকই ইসহাক (আ) যবীহুল্লাহ হইয়া থাকিলে ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কোন না কোনভাবে এত বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনার স্মৃতি জাগরূক থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। এই মহান মর্যাদাপূর্ণ ঘটনার ইতিহাস কেবল মুসলমানগণই জাগরূক রাখিয়াছে (দ্র. তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৫৯৯, টীকা ৬; তাফহীমূল কুরআন, পৃ. স্থা.। অবশ্য ইসহাক (আ)-ই যদি 'যবীহুল্লাহ' হইতেন, তাহাতেও মুসলমানদের কোন আপত্তি থাকিত না। কারণ মুসলমানগণ সকল নবীর প্রতিই সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁহাদের অবদানকে গৌরবের সহিত স্মরণ করিয়া থাকে, তিনি ইসরাঈলী বংশোদ্ভূতই হউন অথবা অ-ইসরাঈলী।

"আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে কোনও তারতম্য করি না" (২ ঃ ২৮৫; আরও দ্র. ২ ঃ ১৩৬; ৩ ঃ ৮৪)।

হযরত ইসমাঈল (আ)-ই 'যবীহুল্লাহ' ছিলেন বলিয়া মুসলিম উম্মাহ্র প্রায় সকলেই একমত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক, আলী, ইব্ন উমার, ইব্ন আব্বাস, আবু হুরায়রা ও মুআবিয়া (রা) এবং তাবি'ঈগণের মধ্যে ইকরিমা, মুজাহিদ, ইউসুফ ইব্ন মিহ্রান, হাসান বাসরী, মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল-কুরাজী, শা'বী, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, দাহ্হাক, মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইবনুল হুসায়ন, রাবী ইব্ন আনাস, আহ্মাদ ইব্ন হামবাল (র) প্রমুখ এই মত পোষণ করেন (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ২৯৮, টীকা ৬৭)। কুরআন মজীদে এবং সহীহ্ হাদীছে যবীহুল্লাহ কে ছিলেন তাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হইলেও ঘটনা-পরম্পরা যেভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, ইসমাঈল (আ)-ই ছিলেন যবীহুল্লাহ (নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০১)।

(১) আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ.

"আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চলিলাম। তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করিবেন" (৩৭ ঃ ৯৯)।

ইহার পর তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট সন্তান কামনা করেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান করুন" (৩৭ ঃ ১০০)।

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) সিরিয়ার প্রবাস জীবনের একাকীত্ব দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি পুত্রসন্তান প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনাকালে তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। আর এই বিষয়ে ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই একমত যে, ইসমাঈল (আ) ছিলেন ইসহাক (আ)-এর বয়জ্যেষ্ঠ (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩খ, পৃ. ১৮৬; তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ১৫৪)। কুরআন মজীদেও দুই ভ্রাতার উল্লেখের ক্রম নিম্নরূপ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন" (১৪ ঃ ৩৯)।

অতএব প্রমাণিত হয় যে, উক্ত দুআর ফসল হইলেন ইসমাঈল (আ)। অতঃপর যবেহ সংক্রান্ত ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যবীহুল্লাহ্ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)।

(২) আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার ৩৭ ঃ ১১৩ আয়াতের ভিত্তিতে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি যুক্তি পেশ করিয়াছেন। উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

وَبٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحٰقَ .

"আমি তাহাকে বরকত দান করিয়াছিলাম এবং ইসহাককেও" (৩৭ ঃ ১১৩)।

উক্ত আয়াতে عليه-এর সর্বনাম (দামীর)-এর مرجع (প্রত্যাবর্তন স্থল) হইল "যবীহ পুত্র" এবং ইহার পর ইসহাক-এর উল্লেখ দ্বারা এই দাবি আরো জোরালো হয় যে, যবীহ ও ইসহাক স্বতন্ত্র দুই ব্যক্তি (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০২)। সংশ্লিষ্ট আয়াতের পরবর্তী অংশ হইতেও তাঁহার ঐ যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِيْنٌ.

"তাহাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী" (৩৭ ঃ ১১৩)।

"তাহাদের উভয়ের বংশধর" বলিতে হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-এর বংশধরগণকে বুঝানো হইয়াছে (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৬০০, টীকা ২; তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৩০১, টীকা ৬৮)। যদিও কতক তাফসীরবিদ হযরত ইবরাহীম ও ইসহাক (আ)-এর বংশধর বলিয়াছেন, কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাহা তাৎপর্যহীন। কারণ ইসহাকের বংশধরগণ ইবরাহীম (আ)-এরই বংশধর (তাফসীরে উছমানী, পৃ. স্থা.)।

(৩) কুরআন মজীদে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, যেসব স্থানে হযরত ইসহাক (আ) সম্পর্কে সুসংবাদ আসিয়াছে সেইসব স্থানে তাঁহার সহিত ইল্‌ম (জ্ঞান)-এর বৈশিষ্ট্যও যুক্ত হইয়াছে ঃ

لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ.

"তুমি ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি" (১৫ ঃ ৫৩)।

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ.

"তাহাদের মনে উহাদের সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, ভীত হইও না। অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দিল" (১ ঃ ২৮)।

কিন্তু কুরবানীর ঘটনার পূর্বাভাষ পর্যায়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছিল তাহার সহিত ধৈর্য বা সহিষ্ণুতার গুণ যুক্ত করা হইয়াছে ঃ

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ.

"অতঃপর আমি তাহাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম" (৩৭ ঃ ১০১)।

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর দুই পুত্র সন্তানের সহিত স্বতন্ত্র দুইটি গুণের সমাহার ঘটানো হইয়াছে। আর যবেহ করার নির্দেশ জ্ঞানী পুত্রের বেলায় ছিল না, ছিল ধৈর্যশীল পুত্রের ক্ষেত্রে। উপরন্তু কুরআন মজীদের অন্য এক স্থানেও ধৈর্যের গুণ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সহিত যুক্ত করা হইয়াছে ঃ

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ.

"এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফল-এর কথা, তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল" (২১ ঃ ৮৫)।

পিতা তাঁহার এই ধৈর্যশীল পুত্রকে কাৎ করিয়া যবেহ করিতে উদ্যত হইলে তখন তিনি চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং এই বিষয়ে পিতাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, "হে পিতা! আপনি যাহার জন্য আদিষ্ট হইয়াছেন তাহাই করুন" (৩৭ ঃ ১০২) রক্ষা করিয়াছেন (দ্র. তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ১৫৩-৫৪)। তাই কুরআন মজীদের এক স্থানে তাঁহাকে "প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী" ছিলেন বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ·

"স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা, নিশ্চয় সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী" (১৯ ঃ ৫৪)।

(৪) কুরআন মজীদে হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মগ্রহণের সুসংবাদ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঔরসে হযরত ইয়া'কূব (আ)-এর জন্মগ্রহণের সুসংবাদও প্রদান করা হইয়াছে ঃ

فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاۤءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ·

"অতএব আমি তাহাকে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরবর্তী ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম" (১১ ঃ ৭১)।

যে পুত্রের জন্মগ্রহণের সুসংবাদ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ঔরসে এক যোগ্য সন্তানের জন্মগ্রহণের সুসংবাদও দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহার সম্পর্কে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি যবেহ করার নির্দেশদান যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ তাঁহাকে তো স্পষ্ট বাক্যেই জানানো হইয়াছে যে, তাঁহার পুত্রের ঔরসে আরও একজন নবীর আবির্ভাব হইবে। অতএব ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-ই ছিলেন যবীহুল্লাহ (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ১৫৪; মাআরেফুল কোরআন, বাংলা সংস্করণ, ৭খ, পৃ. ৪৫০; তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ২৯৯, ৬৭ নং টীকার ৩য় প্যারা; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৫৯৯, টীকা ৬; নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০১ ও ১০৩; বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ১৫৯)। ইসহাক (আ) যবীহুল্লাহ হইলে সুসংবাদ ও কুরবানীর নির্দেশের মধ্যে একটি বৈপরিত্য দেখা দেয়। একদিকে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত পুত্রের ঔরসে ইয়া'কূব নামে একজন নবী জন্মগ্রহণ করিবেন, অপরদিকে পুত্রসন্তান জন্মের পূর্বেই তাঁহাকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করা হইতেছে। কিন্তু ইসমাঈল (আ) যবীহুল্লাহ হইলে এই বৈপরিত্যের প্রশ্ন থাকে না (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫৯; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০৩)।

(৫) কুরবানীর সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ·

"আমি তাহাকে সুসংবাদ দিয়াছি ইসহাকের, সে ছিল সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৭ ঃ ১১২)।

এই আয়াত হইতে প্রমাণিত হয় যে, ৩৭ ঃ ১০১ আয়াতে যে পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল তিনি এই শেষোক্ত আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া পুত্র হইতে স্বতন্ত্র। হযরত ইবরাহীম (আ)

প্রথমোক্ত পুত্রকে কুরবানী করার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আরেকজন মহান পুত্রসন্তান দানের সুসংবাদ প্রদান করেন। এই পুত্র যে হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন এবং যবীহুল্লাহ যে হযরত ইসমাঈল (আ) ছিলেন তাহা অধিক যুক্তিসঙ্গত (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৩০০, টীকা ৬৭/৪; মাআরেফুল কোরআন, বাংলা অনু., ৭খ, পৃ. ৪৫০; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৬০০, টীকা ১)।

(৬) পিতা-পুত্র কর্তৃক কা'বা ঘর নির্মাণকালে যে দু'আ করেন তাহাতে তাঁহারা বলেন, وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ "তুমি আমাদের দুইজনকে তোমার একান্ত অনুগত বানাও" (২ঃ ১২৮)। আর কুরবানী সংক্রান্ত ঘটনায় বলা হইয়াছে, فَلَمَّا اَسْلَمَا "যখন তাহারা দুইজনে আনুগত্য প্রকাশ করিল" (৩৭ঃ ১০৩)। উভয় স্থানে একই শব্দের দ্বিবচন (তাছনিয়া)-এর ব্যবহার হইতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-ই ছিলেন যবীহুল্লাহ (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৬০০, টীকা ৬)। একইভাবে 'হালীম' (حَلِيْمٌ = পরম ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু) শব্দটির ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। কুরআন মজীদে নবীদের ক্ষেত্রে কেবল হযরত ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর সহিত শব্দটি যুক্ত করা হইয়াছে, অন্য কোন নবীর প্রতি প্রযুক্ত হয় নাই (দ্র. ৯ঃ ১১৪ এবং ১১ঃ ৭৫, ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি প্রযুক্ত)। আবার কুরবানীর ঘটনা বিবৃত হইবার পূর্বে প্রতিশ্রুত পুত্রের সহিতও উক্ত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইসহাক (আ)-এর সহিত জ্ঞানবান হওয়ার বিশেষণ যুক্ত করা হইয়াছে। অতএব ইহা হইতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)।

(৭) বহু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর রক্তের বিনিময়ে যে দুম্বা যবেহ করা হইয়াছিল তাহার শিং হযরত আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)-র কাল পর্যন্ত কা'বা ঘরে সুরক্ষিত ছিল, কোন কোন বর্ণনামতে কা'বা ঘরের মীযাবের সহিত লটকানো ছিল। অতঃপর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা)-কে অবরোধ করিবার কালে কা'বা ঘর অগ্নিদগ্ধ হইলে তখন ঐ শিংও নষ্ট হইয়া যায়। ইব্ন আব্বাস (রা) ও আমের আশ-শা'ব (র) সাক্ষ্য দেন যে, তাঁহারা স্বচক্ষে কা'বা ঘরে ঐ শিং দেখিতে পাইয়াছেন (ইব্ন কাছীর-এর বরাতে তাফহীমুল কুরআন, পৃ. স্থা; আরও দ্র. আল-কামিল, ১ খ, পৃ. ৮৫; তাফসীরে কবীর, ২৬ খ, পৃ. ১৫৪; আরাইস, পৃ. ১০০; বিদায়া, ১ খ, পৃ. ১৫৮; তাফসীরে তাবারী, ২৩ খ, পৃ. ৫৬; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩ খ, পৃ. ১৮৮)।

(৮) শত শত বৎসর ধরিয়া আরবদেশে কুরবানীর এই ঘটনা একটি সুরক্ষিত বর্ণনা হিসাবে চলিয়া আসিয়াছে। সেই সুদূর অতীত হইতে মহানবী (স)-এর আবির্ভাবকাল পর্যন্ত লোকেরা হজ্জের সহিত কুরবানীর অনুষ্ঠানও পালন করিত। ইবরাহীম (আ) যেখানে কুরবানী করিয়াছিলেন, লোকেরাও তথায় পশু যবেহ করিত। রাসূলুল্লাহ (স)-ও নবুওয়াত প্রাপ্তির পর এই সুন্নাত বহাল রাখেন এবং বর্তমান কাল পর্যন্ত তাহা অব্যাহত আছে। সাড়ে চার হাজার বৎসর ধরিয়া অব্যাহত এই সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-পুত্রের কুরবানীর উত্তরাধিকারী ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণ,

ইসহাক (আ)-এর বংশধরগণ নয়। ইসহাক বংশীয়গণের মধ্যে কোন কালেই কুরবানীর স্মৃতিস্বরূপ এই প্রথা কখনও উদযাপিত হয় নাই (তাফহীমুল কুরআন, পৃ. স্থা)।

আল-আসমাঈ বলেন, আমি আবূ আমর ইবনুল 'আলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, যবীহুল্লাহ কে ছিলেন? তিনি বলেন, হে আসমা'ঈ! তোমার জ্ঞান কি লোপ পাইয়াছে! ইসহাক (আ) কখন মক্কায় ছিলেন? ইসমা'ঈল (আ)-ই তো মক্কায় বসবাস করিতেন, তিনি স্বীয় পিতার সঙ্গে একত্রে কা'বা ঘর নির্মাণ করেন এবং কুরবানীর স্থান (মানহার) ও তো মক্কায় অবস্থিত (তাফসীরে কবীর, ২৬ খ, পৃ. ১৫৩)।

অতএব সার্বিক প্রেক্ষাপট, ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং আদিকাল হইতে মক্কায় কুরবানীর অনুষ্ঠান উদযাপন (পৃথিবীর অন্য কোথাও নহে) ইত্যাদি বিবেচনা করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)।

অবশ্য কতক তাফসীরকারের মতে হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন যবীহুল্লাহ। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত উমার, আলী, ইব্ন মাসউদ, আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, ইব্ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) এবং তাবিঈগণের মধ্যে কাতাদা, ইকরিমা, হাসান বসরী, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, শাবী, মাসরূক, মাকহুল, যুহ্‌রী আতা, মুকাতিল, সুদ্দী, কাব আল-আহবার ও যায়দ ইব্ন আসলাম (র) প্রমুখের মতে যবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আ) (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ২৯৮, টীকা ৬৭)। আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র) এই মতের প্রবক্তা (তাফসীরে তাবারী, ২৩ খ, পৃ. ৪৮-৫৩ দ্র.)। ইসহাক (আ) কুরবানীর পাত্র ছিলেন, ইহার পক্ষে যেসব যুক্তিপ্রমাণ পেশ করা হইয়াছে তাহা কেবল ধারণাপ্রসূত, দৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে (কাসাসুল কুরআন, ১খ)। ইব্ন জারীর তাবারী (র) বলেন, ৩৭ ঃ ১০১ আয়াতে প্রথমে হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে, অতঃপর তিনি আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের অভিপ্রায়ে কুরবানী হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলে ইহার পুরস্কারস্বরূপ ৩৭ ঃ ১১২ আয়াতে তাঁহার নবী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয় (তাফসীরে তাবারী, ২৩খ, পৃ. ৫৫; তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ১৫৪)। তাবারী আরও বলেন, ইসহাক (আ)-এর ঔরসে ইয়া'কূব (আ) জন্মগ্রহণ করার পর ইবরাহীম (আ) যবেহ সংক্রান্ত স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন (তাফসীরে তাবারী, ২৩ খ, পৃ. ৫৫)। ইমাম তাবারীর এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ঃ

(১) কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে, "অতঃপর সে (বালক) যখন পিতার সহিত শ্রম করিবার বয়সে উপনীত হইল" (৩৭ ঃ ১০২), সেই সময় যবেহ করার স্বপ্ন দেখানো হইয়াছিল। উক্ত আয়াতের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকাইলে এক বালকের ছবিই অন্তরলোকে ভাসিয়া উঠে; পূর্ণ বয়স্ক, বিবাহিত ও সন্তানের অধিকারী ব্যক্তির ছবি নহে (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ২৯৯-৩০০, টীকা ৬৭/৩)। উপরন্তু যেই সন্তানকে যবেহ করার নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল তাহার অল্পবয়স্ক ও অবিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে প্রায় সকল তাফসীরকারের মধ্যে মতৈক্য বিদ্যমান (বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.)।

(২) তাবারীর এই বক্তব্যও অপ্রাসঙ্গিক যে, প্রথমে ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে, পরে তিনি কুরবানী হইবার জন্য রাজি হইলে তাঁহাকে নবুওয়াত প্রদানের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ সংশ্লিষ্ট আয়াতে (৩৭ ঃ ১১২) প্রথমেই সুসংবাদ প্রদান করা হইয়াছে পুত্র ইসহাকের, অতঃপর বলা হইয়াছে যে, তিনিও নবী হইবেন। শুধু নবী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হইলে হয়তো এইভাবে বলা হইত, "তোমার এই পুত্র নবী হইবে"। অতএব হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর তাঁহাকে আরও এক পুত্র সন্তান দানের সুসংবাদ প্রদান করা হয় এবং এই শেষোক্ত পুত্র হইলেন ইসহাক (আ) (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৩০০, টীকা ৬৭/৪)।

এখানে উল্লেখ্য যে, কতক সাহাবী ও তাবিঈর নাম দুই মতের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য করা যায়। হইতে পারে তাঁহারা পূর্বে যে মত পোষণ করিতেন পরে তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য মত গ্রহণ করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র সূত্রে তাঁহার শাগরিদ ইকরিমা (র) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই পুত্র হইলেন ইসহাক (আ)। তাঁহার তাফসীর গ্রন্থেও তাঁহার এই মত দৃষ্ট হয় (তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস, দ্র.)। অপরদিকে আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র নিম্নোক্ত মত উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

زَعَمَتِ الْيَهُوْدُ اَنَّهُ اِسْحَاقَ وَكَذَبَتِ الْيَهُوْدُ ـ

"ইয়াহূদীরা ধারণা করে যে, তিনি ছিলেন ইসহাক (আ)। ইয়াহূদীরা মিথ্যা ধারণা করে" (তাফহীমুল কুরআন, পৃ. স্থা.)।

প্রশ্ন হইল, এতসব সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে হযরত ইসহাক (আ) যবীহুল্লাহ হওয়ার ধারণা কিভাবে অনুপ্রবেশ করিল? এই প্রসঙ্গে আল্লামা ইব্‌ন কাছীর তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে বলেন, প্রকৃত বিষয় আল্লাহ তাআলাই অবগত, তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে, যেসব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে ইসহাক (আ)-কে যবীহুল্লাহ সাব্যস্ত করা হয় তাহার সবই কা'ব আল-আহ্‌বার (র) হইতে বর্ণিত ও উদ্ধৃত। তিনি হযরত 'উমার (রা)-র খিলাফতকালে (১৭ হি.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন ইয়াহূদী পণ্ডিত। তিনি ইয়াহূদী প্রাচীন কিতাবাদির কথা কখনও কখনও লোকদের নিকট বর্ণনা করিতেন। উমার (রা)-ও তাহা শুনিতেন। এই কারণে জনগণও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত এবং তিনি ভালো-মন্দ যাহা বর্ণনা করিতেন লোকেরও তাহা বর্ণনা করিত। তাঁহার এইসব বিবৃতির কিছুই মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য প্রয়োজনীয় ছিল না (ইব্‌ন কাছীরের বরাতে তাফহীমুল কুরআন, পৃ. স্থা.; ই.বি., ৬খ, পৃ. ৬১৯-২০, কা'ব সম্পর্কে)।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল-কুরাযী (র) বলেন, একদা আমার উপস্থিতিতে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, কাহাকে যবেহ করিতে চাওয়া হইয়াছিল, ইসহাক (আ)-কে না ইসমাঈল (আ)-কে? ঐ মজলিসে এমন এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন যিনি পূর্বে ইয়াহূদী আলিম ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়া খাঁটি মুসলমান হন। সেই ব্যক্তি বলিলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্‌র শপথ! ইসমাঈল (আ)-ই ছিলেন যবীহুল্লাহ। ইয়াহূদীরা এই কথা ভালো করিয়াই

জানে। কিন্তু আরবদের প্রতি বিদ্বেষবশত তাহারা ইসহাক (আ)-কে যবীহুল্লাহ বলিয়া দাবি করে (তাফসীর ইব্ন জারীর তাবারী, ২৩খ, পৃ. ৫৪; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৬০; আরাইস, পৃ. ৯৭-৮; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ, পৃ. ১৮৮; তাফহীমুল কুরআন, পৃ. স্থা.)। অনন্তর রাসূলুল্লাহ (স) নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আনা ইবনু'য-যাবীহায়ন' (আমি যবেহকৃত দুই ব্যক্তির পুত্র)। এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-কে 'ইয়া ইবনা'য-যাবীহায়ন' (হে দুই যবেহকৃতের পুত্র) বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি মুচকি হাসি দেন। এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপ খননকালে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে মানত করেন যে, আল্লাহ তাহার জন্য কাজটি সহজসাধ্য করিয়া দিলে তিনি তাহার এক পুত্রকে যবেহ করিবেন। যবেহর জন্য লটারীতে মহানবী (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ্র নাম উঠে। কিন্তু তাঁহার ভাইগণ তাহাকে ইহা করিতে নিষেধ করেন এবং পুত্রের পরিবর্তে এক শত উট যবেহ করার পরামর্শ দেন। অতএব তিনি তাহার পরিবর্তে এক শত উট যবেহ করেন এবং অপর যবেহকৃত হইলেন হযরত ইসমাঈল আলায়হিস সালাম (উভয় উদ্ধৃতির বরাতের জন্য দ্র. তাফসীরে কবীর, ২৬ খ, পৃ. ১৫৩; তাফসীরে তাবারী, ২৩ খ, পৃ. ৫৪)। অতএব হযরত ইসমাঈল (আ)-ই যে ছিলেন যাবীহুল্লাহ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বৈবাহিক জীবন ও সন্তান-সন্ততি

হযরত ইসমাঈল (আ) যৌবনে পদার্পণ করিয়া দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হন। ইব্ন আব্বাস (রা)-র দীর্ঘ হাদীছে বলা হইয়াছে, ইসমাঈলও (ক্রমান্বয়ে) বড় হইলেন এবং জুরহুমীদের নিকট হইতে আরবী ভাষা শিখিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিলে তিনি তাহাদের অধিক আগ্রহের পাত্র হইলেন এবং তাহাদের এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। অতঃপর ইসমাঈলের মাতা ইনতিকাল করেন। একদা ইবরাহীম (আ) তাঁহার পরিজনকে দেখিতে আসিয়া ইসমা'ঈল (আ)-কে বাড়িতে পাইলেন না। এদিকে তিনি তাঁহার পুত্রবধূর কথাবার্তা ও আচরণে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া তাহার নিকট ইঙ্গিতে পুত্রকে জানাইয়া যান যে, তিনি যেন এই স্ত্রীকে বিদায় করিয়া দেন। পিতার নির্দেশমত তিনি প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া একই গোত্রের আরেক কন্যাকে বিবাহ করেন। এক সময় ইবরাহীম (আ) পুনরায় পুত্রের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়া শেষোক্ত পুত্রবধূর কথাবার্তা ও আচরণে সন্তুষ্ট হন এবং তাহার প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য পুত্রকে নির্দেশ দিয়া যান (বুখারী, আম্বিয়া, বাব ১১, নং ৩১১৪, ৩য় খণ্ড)। ইব্ন কাছীর লিখিয়াছেন যে, ইসমাঈল (আ) যৌবনে পদার্পণ করিয়া প্রথমে আমালিক গোত্রের উমারাহ নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং পরে পিতার নির্দেশে তাহাকে ত্যাগ করেন। সে ছিল সা'দ ইব্ন উসামা ইব্ন আকীল আল-আমালিকীর কন্যা। অতঃপর তিনি মাদাদ ইব্ন আমর আল-জুরহুমীর কন্যা সায়্যিদা (মতান্তরে ছালিছা)-কে বিবাহ করেন। ইব্ন সা'দ ও ইবনুল আছীরের মতে তাঁহার উভয় স্ত্রীই ছিল জরহুম গোত্রীয়। ইব্ন ইসহাকের মতে শেষোক্ত স্ত্রীর নাম রি'লা বিন্ত মাদাদ ইব্ন আমর এবং আল-কালবীর মতে রি'লা বিন্ত ইয়াশজাব ইব্ন ইয়া'রাব (তাবাকাত, ১খ, পৃ. ৫১)। তাঁহার গর্ভে ইসমাঈল (আ)-এর ১২ জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৯২-৯৩; আরাইস, পৃ. ১০৭; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৫)। তাঁহাদের নাম ঃ

নবায়ত (نابت) কেদর (قيذر) অদবেল (اذبل) মিবসাম (ميشى) মিশ্‌ম (مسمع) দূমা (دوما) মসা (ماش) হদদ (هدار) তেমা (طيما) যিটূর (يطور) নাফীশ (نبش) ও কেদমা (قيذما) (বাইবেলের আদিপুস্তক, ২৫ ঃ ১৪-১৫; ১ বংশাবলী, ১ ঃ ৩০-৩১; বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ১৯৩; ২খ, পৃ. ১৮৪; আরাইস, পৃ. ১০৭; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৫; তাবাকাতুল কুবরা, ১খ, পৃ. ৫১; কোন কোন নামের উচ্চারণে যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে)।

নাসামা (نسمة) নাম্নী তাঁহার এক কন্যা সন্তানও ছিল। মৃত্যুর সময় ইসমাঈল (আ) হযরত ইসহাক (আ)-কে ওসিয়ত করিয়া যান যে, তাঁহার পুত্র এষৌ-এর সহিত তাঁহার কন্যাকে (বাইবেলে নাম বাসমৎ, আদি, ৩৬ ঃ ৩) যেন বিবাহ দেন। তাঁহার ওসিয়ত কার্যকর হয় (আদিপুস্তক, ৩৬ ঃ ৩; আরাইস, পৃ. ১০৭; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৯৩; আরও দ্র. পৃ. ১৮৫; আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ৬৬)। এই কন্যার গর্ভে রূম, ইউনানা ও ইশবাস (মতান্তরে ফারিস) নামে তিন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৯৩; আরও দ্র. ২খ, পৃ. ১৮৫)।

কথিত আছে যে, সমস্ত আরবজাতি ইসমাঈল (আ)-এর দুই পুত্র নাবিত (নবায়ত) ও কায়যার (কেদর)-এর বংশধর (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮৪; আরও দ্র. ১খ, পৃ. ১৯৩; আরাইস, পৃ. ১০৭)।

كُلُّ الْعَرَبِ مِنْ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ .

"সকল আরব ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর" (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ-এর বরাতে কানযুল উম্মাল, ১১খ, পৃ. ৪৯০, নং ২২৩১০, আলী ইব্‌ন আবূ রাবাহ-এর সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণিত)। কিন্তু বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ মত এই যে, মূল আরবজাতি (আল-আরাবুল আরিবাহ) হযরত ইসমাঈল (আ)-এর আগমনের পূর্বেই আরবে বসবাসরত ছিল। আদ, ছামূদ, তাস্‌ম, জাদীস, আমীম, জুরহুম, আমালীকসহ নাম না জানা অনেক গোত্র-গোষ্ঠী ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে এবং তাঁহার যুগেও আরবে বসবাসরত ছিল। কিন্তু আরবী ভাষাভাষীতে রূপান্তরিত জাতি (আল-'আরাবুল মুসতা'রিবা) অর্থাৎ হিজাযবাসী আরবগণ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৫৬)। অবশ্য ইয়ামনবাসী আসলাম গোত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর বলিয়া হাদীছ হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় উক্ত গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى نَفَرٍ مِّنْ اَسْلَمَ يَنْتَضِلُوْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْمُوْا يَابَنِيْ اِسْمَاعِيْلَ فَاِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا اِرْمُوْا وَاَنَا مَعَ بَنِيْ فُلَانٍ قَالَ فَاَمْسَكَ اَحَدُ الْفَرِيْقَيْنِ بِاَيْدِيْهِمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ لَا تَرْمُوْنَ قَالُوْا كَيْفَ نَرْمِيْ وَاَنْتَ مَعَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْمُوْا فَاَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ .

"সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আসলাম গোত্রের একদল লোককে অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন এবং তাহারা তখন তীরন্দাজির প্রতিযোগিতা করিতেছিল। নবী (স) বলিলেন ঃ হে ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানগণ! তোমরা তীরন্দাজি কর। কেননা তোমাদের

পিতাও তীরন্দায ছিলেন। অবশ্য আমি অমুক গোত্রের সঙ্গে আছি। রাবী বলেন, ইহাতে একদল তীরন্দাযি বন্ধ করিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের কি হইল যে, তোমরা তীরন্দাযি করিতেছ না? তাহারা বলিল, আমরা কিভাবে তীরন্দাজি করিতে পারি যখন আপনি তাহাদের সঙ্গে আছেন! নবী (স) বলিলেন ঃ তোমরা তীরন্দাযি কর, আমি তোমাদের সকলের সঙ্গে আছি" (বুখারী, জিহাদ, ৩খ, পৃ. ১২৮, বাব ৭৭, নং ২৬৮৫; আম্বিয়া, ৩খ, পৃ. ৩৬৮, বাব ১৩, নং ৩১২৩; মানাকিব, ৩খ, পৃ. ৪৪৩, বাব ৬, নং ৩২৪৪)।

হযরত ইসমাঈল (আ) যে তীরন্দায ছিলেন তাহার প্রমাণ বাইবেলেও বিদ্যমান আছে (দ্র. আদিপুস্তক, ২১ ঃ ২০)।

বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানগণ নামানুসারে গ্রাম ও তাঁবুপল্লী অনুসারে তাহাদের এই জাম তাহারা আপন আপন জাতি অনুসারে দ্বাদশজন অধ্যক্ষ ছিলেন...। তাঁহার সন্তানগণ হবীলা অবধি আশূরিয়ার দিকে মিসরের সম্মুখস্থ শূর পর্যন্ত বসতি করিল (আদিপুস্তক, ২৫ ঃ ১৬-১৮)। আনওয়ারে আম্বিয়ার গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ইসমাঈল (আ)-এর বারজন সন্তান নিজ নিজ বংশের প্রধান ছিলেন। হযরত মূসা (আ)-এর যুগে (১৫০০ খৃ. পূ.) ইসমাঈল বংশীয়গণ হিজায, সিরিয়া, ইরাক, ফিলিস্তীন ও মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের তৎকালীন বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ বন্দরসমূহ ইসমাঈল বংশীয়দের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আরবের মূল ভূখণ্ডও তাহাদের অধিকারে ছিল। ইসমাঈল (আ)-এর পুত্র কায়যার (কেদর) খুবই প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। প্রাচীন আসিরীয় ও গ্রীক ভূগোলে তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। কায়যারের বংশধর মক্কাতে বসবাস করিত এবং তাহার শাখাগোত্র আদনান হইতে শেষ যমানার নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) আবির্ভূত হন (পৃ. ৬৫-৬৬)। ইব্ন কাছীর (র) বলেন, উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যেও বারজন মহান নেতার আবির্ভাবের সুসংবাদ রহিয়াছে। মহানবী (স) বলেন ঃ "বারজন শাসকের আবির্ভাব হইবে, তাহারা সকলেই কুরায়শ বংশীয়" (ইয়াকূনু ইছনা আশারা আমীরান কুল্লুহুম মিন কুরায়শ-বুখারী ও মুসলিম)। তাঁহাদের পাঁচজন হইলেন যথাক্রমে চার খুলাফায়ে রাশিদীন এবং উমার ইবন আবদুল আযীয (র)। অবশিষ্টদের মধ্যে কয়েকজন বনু আব্বাসের অন্তর্ভুক্ত। শী'আ সম্প্রদায় এই বারজন ইমাম তাহাদের মধ্য হইতে আবির্ভূত হওয়ার যে দাবি করে তাহা ভিত্তিহীন। কারণ তাহারা যাহাদেরকে তাহাদের বারো ইমাম বলিয়া দাবি করে, উম্মাতের উপর তাহাদের কোন সার্বিক (রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি) কর্তৃত্ব কখনও ছিল না (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫৩-৪)।

কা'বা শরীফ নির্মাণে ইসমাঈল (আ)-এর অংশগ্রহণ

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-কে সঙ্গে লইয়া আল্লাহ তা'আলার মহিমান্বিত ঘর কা'বা শরীফ স্থায়ীভাবে নির্মাণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম কা'বা ঘর নির্মাণ করেন নাই, বরং পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন, যাহা ১৪ ঃ ৩৭ আয়াত হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়। এই ঘরের সম্পূর্ণরূপে নূতন নির্মাণে হযরত ইসমাঈল (আ) পিতার সহযোগিতা করেন। কুরআন মজীদে তাহা এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَعَهِدْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

"এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করিলাম যে, তোমরা দুইজনে আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ" (২ঃ ১২৫)।

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা ঘরের প্রাচীর তুলিতেছিল তখন তাহারা বলিয়াছিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা" (২ঃ ১২৭)।

তাফসীর ও ইতিহাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, হযরত ইসমাঈল (আ) কা'বা ঘর নির্মাণে প্রয়োজনীয় পাথর ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির যোগান দিতেন। কা'বা ঘর আগে নির্মিত হইয়াছে না কুরবানীর ঘটনা আগে ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তবে কা'বা ঘর নির্মাণকালেও ইসমাঈল (আ) যে তরুণ যুবক ছিলেন তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায় কা'বা ঘর নির্মাণে তাঁহার সহযোগী ভূমিকা হইতে। ইব্ন সা'দ লিখিয়াছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) এক শত বৎসর বয়সে কা'বা ঘর নির্মাণের নির্দেশ প্রাপ্ত হন এবং তখন ইসমাঈল (আ)-এর বয়স ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল (আত-তাবাকাতুল-কুবরা, ১খ, পৃ. ৫২)। তবে কা'বা শরীফ নির্মাণকালে ইবরাহীম (আ.)-এর বয়স সংক্রান্ত এই বর্ণনাটি সন্দেহমুক্ত নহে। কা'বা ঘর নির্মাণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ হযরত ইবরাহীম (আ) শীর্ষক নিবন্ধে দ্র.।

১১. নবুওয়াত প্রাপ্তি ঃ হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহ তা'আলার একজন মহান নবী ও রাসূল ছিলেন। তাঁহার দা'ওয়াতের কর্মক্ষেত্র ছিল হিজায, ইয়ামান, হাদারামাওতসহ সমগ্র আরব উপদ্বীপ। তিনি কত বৎসর বয়সে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন তাহা নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যায় না। তাঁহার নবুওয়াত ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ـ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا

"আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা। সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল ও নবী। সে তাহার পরিবারবর্গকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তাহার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন" (১৯ঃ ৫৪-৫৫)।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ ـ

"বল, আমরা আল্লাহ্তে এবং আমাদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি" (৩ঃ ৮৪)।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ ·

"তোমরা বল, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্তে এবং যাহা আমাদের উপর নাযিল হইয়াছে এবং যাহা ইবরাহীম ও ইসমাঈলের উপর নাযিল হইয়াছে....." (২ ঃ ১৩৬)।

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ·

"আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব...... নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম" (৪ ঃ ১৬৩)।

অনুরূপভাবে ৬ ঃ ৭৪-৯০ আয়াত অবধি হযরত ইবরাহীম (আ) প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত হইয়া ধারাবাহিকভাবে অন্যান্য নবীগণের প্রসঙ্গও উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেখানে হযরত ইসমাঈল (আ)-ও অন্তর্ভুক্ত আছেন। অতএব তাঁহার নবুওয়াতপ্রাপ্তিও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। পিতা-পুত্র কর্তৃক নির্মিত তাওহীদবাদী মানবজাতির কিবলা ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ঘর কা'বা শরীফকে কেন্দ্র বানাইয়া হযরত ইসমা'ঈল (আ) গোটা আরবভূমিতে দীন ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত করেন (আরাইস, পৃ. ১০৭; বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৯৩)। বুখারীর কিতাবুল আম্বিয়ায় সন্নিবিষ্ট ৩১১৪ নম্বর হাদীছ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ) ও তাঁহার মাতাকে দেখিবার জন্য দুইবার মক্কায় আসিয়াছিলেন এবং পুত্রকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দান করিয়া যান। হযরত ইসমাঈল (আ) তাঁহার মায়ের ভাষা কিবতী (কপটিক) এবং পিতার ভাষা হিব্রুও জানিতেন এবং আরবে আসিয়া আল্লাহ্র অনুগ্রহে আরবী ভাষাও শিক্ষা করেন। ফলে ঐ তিন ভাষাভাষী জাতির মধ্যে আল্লাহ্র দীন প্রচার তাঁহার জন্য সহজসাধ্য হয়, অন্তত ভাষাগত দিকের বিবেচনায় (আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ৬৫)। তাঁহার তত্ত্বাবধানে বাৎসরিক হজ্জের অনুষ্ঠানও উদযাপিত হইতে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, পিতা-পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র সকলের ধর্মীয় নীতিমালা ছিল একই এবং বলা যায়, ইবরাহীম (আ) ছিলেন তিনজন নবীর ইমাম। সেই কালেও হজ্জ করা ফরয ছিল। যেমন কুরআন মজীদ হইতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নির্দেশ প্রদান করিয়া বলেন ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ·

"এবং তুমি মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করিয়া দাও, তাহারা তোমার নিকট আসিবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, তাহারা আসিবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া" (২২ ঃ ২৭)।

কিন্তু ইয়াহূদীরা হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁহার মাতার প্রতি অনর্থক বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া বাইবেল হইতে কা'বা ঘরের নির্মাণ, হজ্জের মহাসমাবেশ ও কুরবানীর উৎসবকে সম্পূর্ণরূপে গায়েব করিয়া দিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা নিজদিগকে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর ও তাঁহার

আদর্শের উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবি করিলেও তাহারা এই নবীগণের নিকট অবতীর্ণ সহীফাসমূহ অবলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

কালের পরিক্রমায় জুরহুম গোত্র ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর হইতে কা'বা শরীফসহ মক্কার কর্তৃত্ব ছিনাইয়া লয়। এখানে উল্লেখ্য যে, জুরহুম গোত্র হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীন গ্রহণ করিয়াছিল। জুরহুমীরা ছিল কাহ্তান গোত্রীয় এবং সেই সূত্রে হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র সাম-এর বংশধর। তাহারা মক্কায় পৌঁছিয়া হযরত হাজার (রা)-এর অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া কু'আয়কি'আন পর্বতের পাদদেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিল। জুরহুমীরা ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্র অবাধ্যচারী, অত্যাচারী, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ও ধর্মদ্রোহী হইয়া উঠে। কথিত আছে যে, এক পর্যায়ে তাহাদের বংশীয় আসাফ ও নাইলা নামক একজোড়া নারী-পুরুষ বায়তুল হারামের অভ্যন্তরে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্র গযবে নিপতিত হইয়া অভিশপ্ত পাথর মূর্তিতে পরিণত হয়। এই ঘটনা হইতে অনুমান করা যায় যে, জুরহুমীদের নৈতিক অবস্থা কত ঘৃণ্য পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। তাহারা উহা কা'বার চত্বরে স্থাপন করে এবং কালক্রমে একটি তাওহীদবাদী সম্প্রদায় মূর্তিপূজায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। সাবা' রাজ্যের অধিবাসী ইয়ামানী খুযাআ গোত্র বন্যা কবলিত হইয়া (সায়লু 'আরিম, দ্র. ৩৪ ঃ ১৬) মক্কায় আসে এবং যুদ্ধ করিয়া জুরহুমীদেরকে পরাজিত করিয়া তাহাদেরকে মক্কা হইতে উৎখাত করে এবং নিজেরা হারাম শরীফের চারিদিকে বসতি স্থাপন করে। এই খুযাআ গোষ্ঠী ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর বলিয়া একটি মত আছে (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮৫; এই সম্পর্কিত একটি হাদীছ নিবন্ধের ৯ম অনুচ্ছেদে দ্র.)। কালের পরিক্রমায় খুযাআ গোত্রও পথভ্রষ্ট হইতে থাকে এবং এই গোত্রের প্রভাবশালী ধনাঢ্য নেতা আমর ইব্ন আমের ইব্ন লুহায়্যি সর্বপ্রথম জনগণকে মূর্তিপূজার দিকে আহ্বান করে (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮৭)। সে কোন কার্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করে এবং বালকা অঞ্চলের মাআব নামক স্থানে পৌঁছিয়া আমালীক গোষ্ঠীকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখিতে পায়। তাহাদের মূর্তিপূজার আচার-অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হইয়া সে তাহাদের নিকট হইতে 'হুবাল' নামক একটি মূর্তি চাহিয়া আনে এবং উহাকে মক্কায় স্থাপন করিয়া জনগণকে উহার পূজা করিতে ও উহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নির্দেশ দেয় (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮৭-৮)। আরবজাতি এইভাবে ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর তাওহীদভিত্তিক দীন হইতে বিচ্যুত হইয়া পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হইয়া পড়ে। সুহায়লী প্রমুখের মতে আম্র ইব্ন আমের সর্বপ্রথম হজ্জের তালবিয়ার শেষাংশে এই কথা যোগ করে ঃ

اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ

অভিশপ্ত শয়তান তাহাকে ইহা শিখাইয়া দেয় (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮৮)। তাহার সম্পর্কে মহানবী (স) বলেন

رَاَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِبْنِ لُحَىٍّ الْخُزَاعِىَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِى النَّارِ وكَانَ اَوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ.

"আমি খুযা'আ গোত্রের আম্র ইব্ন আমের ইব্ন লুহায়্যিকে দোযখের মধ্যে তাহার (পেট হইতে বাহির হইয়া আসা) নাড়িভুড়ি হেঁচড়াইয়া ফিরিতে দেখিয়াছি। এই ব্যক্তিই সর্বপ্রথম দেব-দেবীর উদ্দেশে উষ্ট্রী ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা চালু করে" (বুখারী, মানাকিব, বাব ১১, নং ৩২৫৮; মুসলিম.

সালাতু'ল-কুসূফ, নং ১৯৬১; সিফাতিল জান্নাত, বাব ৫৩১, নং ৬৯২৯; আরও দ্র. নং ৬৯২৮; বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮৮)। ৮ম হিজরীতে মহানবী (স) পিতা-পুত্র ইবরাহীম-ইসমাঈল (আ)-এর তাওহীদের কেন্দ্র যখন দখল করিলেন তখন কা'বা ঘরের মধ্যে ইবরাহীম (আ), ইসমাঈল (আ) ও মারয়াম (আ)-এর প্রতিকৃতি দেখিতে পান এবং সেই প্রতিকৃতিতে পিতা-পুত্রের হাতে ছিল ভাগ্য নির্ণায়ক তীর। এইসব প্রতিকৃতি মুছিয়া না ফেলা পর্যন্ত মহানবী (স) কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন নাই (দ্র. বুখারী, আম্বিয়া, বাব ১০, নং ৩১০৩ ও ৩১০৪, ৩খ, পৃ. ৩৪৯)। পিতা-পুত্রের সম্মিলিত দু'আর (দ্র. ২ : ১২৯) বরকতে হযরত মুহাম্মাদ (স) কর্তৃক তাঁহার পিতৃপুরুষের তাওহীদের কেন্দ্র কিয়ামত কালের জন্য প্রতিমামুক্ত হইয়া আবার মিল্লাতে ইবরাহীমীর কেন্দ্রে পরিণত হইল।

১২. হযরত ইসমাঈল (আ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী ও মর্যাদা : কুরআন মজীদে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর নবুওয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে উল্লেখ বিদ্যমান (দ্র. ১৯ : ৫৪; ৩ : ৮৪; ২ : ১৩৬ এবং ৪:১৬৩)। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, পরম সহিষ্ণু ও আত্মত্যাগী বান্দা এবং পিতা-মাতার একান্ত অনুগত। পিতার পরামর্শে তিনি তাঁহার প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাঁহার জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা। কাষ্ঠ সংগ্রহ ও শিকার করিয়া তিনি পারিবারিক ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতেন। তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে ছিলেন অতীব নিষ্ঠাবান। নিজে যেমন ইবাদত-বন্দেগীতে অভ্যস্ত ছিলেন, তদ্রূপ পরিবারের সদস্যগণকেও বিশেষভাবে সালাত ও যাকাত আদায়ে বিশেষ তাগিদ দিতেন এবং তাঁহার নির্মল চরিত্র ও কর্তব্য নিষ্ঠার জন্য তিনি ছিলেন আল্লাহ্র সন্তোষভাজন।

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمٰعِيْلَ . اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا . وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا .

"স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা। সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নবী। সে তাহার পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তাহার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন" (১৯ : ৫৪-৫৫)।

সূরা আম্বিয়ায় অপরাপর নবী-রাসূলগণের সহিত ইসমাঈল (আ)-এর বিশেষ দুইটি গুণ উল্লিখিত হইয়াছে :

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ . وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

"এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফ্ল-এর কথা। তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। আর আমি তাহাদেরকে আমার অনুগ্রহভাজন করিয়াছিলাম। তাহারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ" (২১ : ৮৫-৮৬)।

অর্থাৎ ইসমা'ঈল (আ) ছিলেন একান্ত ধৈর্যশীল বান্দা এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে তাঁহার নেককার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেন। তাঁহার সৎকর্মপরায়ণতা, ধৈর্যশীলতা ও পরম সহিষ্ণুতার গুণাবলী পরোক্ষভাবে অন্য এক জায়গায় উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. ৩৭ : ১০০-১০১)। অন্যত্র তাঁহাকে সৌন্দর্যময় ব্যক্তিত্ব ও গুণীজনদের মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে :

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ هٰذَا ذِكْرٌ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ـ

"এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুল-কিফ্‌লের কথা। তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন; ইহা এক স্মরণীয় বর্ণনা। মুত্তাকীদের জন্য রহিয়াছে উত্তম আবাস" (৩৮ ঃ ৪৮-৪৯)।

সবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করিয়াছেন ঃ

وَاِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ـ وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

"আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ, ইউনুস ও লূতকে; তাহাদের প্রত্যেককে বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদের পূর্বপুরুষ, বংশধর ও ভ্রাতৃবৃন্দকেও। আমি তাহাদেরকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম" (৬ ঃ ৮৬-৮৭)।

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় হইতে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত নবীগণকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন, তাই তাঁহারা সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল হইতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাদেরকে মানবজাতির উপর এক বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধর ও তাঁহাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠীকেও হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিয়াছেন ও বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছেন। বিশ্ববাসীর নিকট, বিশেষত তৌহীদবাদী মানবগোষ্ঠীর নিকট তাঁহারা শ্রেষ্ঠ মানবরূপে মর্যাদাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার নিদর্শন এই যে, তাঁহার বংশেই আল্লাহ তা'আলা সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন ওয়া খাতামান নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব ঘটাইয়াছেন, যাঁহার উম্মত এককভাবে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব (আ)-এর "একমাত্র ইলাহ" (২ ঃ ১৩৩)-এর ধারক ও বাহক হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে। উপরন্তু পৃথিবীর এক বিরাট মানবগোষ্ঠী তাঁহাকে নিজেদের আদিপুরুষ বলিয়া গৌরব বোধ করে। ইহা এক অতুলনীয় মহান মর্যাদা।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ইনতিকাল

বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত ইসমা'ঈল (আ) ১৩৭ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন (দ্র. আদিপুস্তক, ২৫ ঃ ১৭)। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও উক্ত তারিখ উদ্বৃত করিয়াছেন (দ্র. বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ১৯৩; তাবারী, তারীখুল উমাম, ১খ, পৃ. ১৬২-এর বরাতে আন্ওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ৬৬; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৯৫; আরাইস, পৃ. ১০৭)। ইনতিকালের সময় তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ইসূর সহিত নিজ কন্যার বিবাহের ওসিয়ত করিয়া যান এবং তাহা প্রতিপালিত হয় (আরাইস, পৃ. ১০৯; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৫; বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ, পৃ. ১৯৩)। মুসলিম

ঐতিহাসিকগণের মতে ইসমাঈল (আ) মক্কা শরীফেই ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার মাতার কবরের পাশে রুকন ও কা'বার মাঝখানে হিজরে মীযাবের নিচে দাফন করা হয় (আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ, পৃ. ৫২; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৫; বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৯৩; আরাইস, পৃ. ১০৭; তারীখ তাবারী, ১খ-এর বরাতে কাসাসুল কুরআন, ১খ, পৃ. ২৪৭)। আল্লামা হিফজুর রহমান লিখিয়াছেন, তাওরাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কবর ফিলিস্তীনেই অবস্থিত এবং তিনি এখানেই ইনতিকাল করেন (কাসাসুল কুরআন, ১খ, পৃ. ২৪৭)। তিনি সম্ভবত নাজ্জারের কাসাসুল আম্বিয়ার বক্তব্য উদ্বৃত করিয়াছেন। কারণ উহাতে এইরূপ একটি বক্তব্য বিদ্যমান (পৃ. ১০১)। কিন্তু বাইবেলের আদিপুস্তকের ২৫শ অধ্যায়সহ উক্ত পুস্তকের কোথায়ও অনুরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিত নাই (নিবন্ধকার)।

উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ইসমাঈল (আ) আল্লাহ্র নিকট মক্কাভূমির উষ্ণ আবহাওয়ার অভিযোগ করিলে তাঁহার মহান প্রতিপালক ওহী মারফত বলেন, তোমাকে যেখানে দাফন করা হইবে, আমি সেখান হইতে তোমার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দিব এবং কিয়ামত পর্যন্ত তোমার আত্মার প্রতি উহার শান্তিধারা প্রবাহিত হইতে থাকিবে (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৯৩; আরাইস, পৃ. ১০৭)। ইব্ন সা'দ বলেন, তিনজন নবীর কবরের স্থান সম্পর্কেই জানা যায় ঃ ইসমাঈল (আ)-এর কবর কা'বার চত্বরে, হূদ (আ)-এর কবর ইয়ামানের কোন এক পর্বতোপরি, যেখানে মাটি সিক্ত করার উপযোগী একটি বৃক্ষ আছে, যে স্থানের উষ্ণতা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক এবং মহানবী (স)-এর রওযা মুবারক (তাবাকাত, ১খ, পৃ. ৫২)।

ইসমাঈল (আ) ও তাঁহার মাতার দাফন স্থান 'হিজর ইসমাঈল' নামে পরিচিত। বর্তমান কা'বা সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বের অর্ধ-বৃত্তাকার দেওয়ালের মধ্যকার গোলাকার স্থানটিকে "হিজর ইসমা'ঈল" বলা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) বিশ্রাম গ্রহণের জন্য যে চালা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহাই হিজর ইসমাঈল। ইহা পরে ইসমাঈল (আ)-র ভেড়া-বকরীর খোঁয়াড় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহার বর্তমান নাম 'হাতীম' (ভগ্নাংশ)। উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি বায়তুল্লাহ্র অভ্যন্তরে সালাত আদায় করিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ (স) আমার হাত ধরিয়া আমাকে 'হিজর ইসমাঈল'-এ প্রবেশ করান এবং বলেন, যদি তুমি কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করিতে চাও তাহা হইলে এখানেই সালাত আদায় কর। কারণ ইহা কা'বার-ই অংশ (নাসাঈ, কিতাবুল হজ্জ)। ইসমাঈল (আ)-এর কন্যাগণকেও হিজরে দাফন করা হয় এবং হযরত নূহ, হূদ, সালিহ ও শুআয়ব (আ)-এর কবরও হিজর ও যমযমের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া কথিত। অপর বর্ণনায় আছে যে, নিরানব্বই জন নবী হজ্জ করিতে আসিয়া এখানে ইনতিকাল করেন এবং তাঁহাদের কবরও এখানেই অবস্থিত (তা'রীখুল কাবীম, ৩খ, পৃ. ১১৫; বিস্তারিত দ্র. পৃ. ১১৬-৭)।

হিজরে ইসমাঈল
حجر
سيدنا اسماعيل
عليه السلام

কা'বা ঘর
হাজরে আসওয়াদ
حجر اسماعيل
হিজরে ইসমাঈল
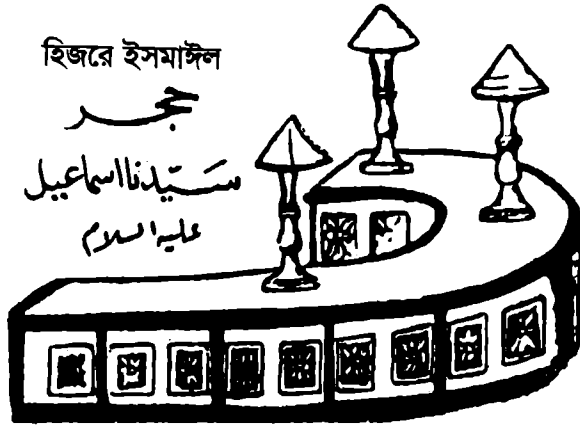
গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯শ মুদ্রণ, ১৪১৭/১৯৯৭, আয়াতসমূহের তরজমার জন্য; (২) তাফসীর ইব্ন কাছীর, বাংলা অনু., ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৪১৩/১৯৯২ (দ্বিতীয় সংস্করণ); (৩) মুখতাসার তাফসীর ইব্ন কাছীর, মুহাম্মাদ 'আলী আস-সাবূনী সম্পা., ৫ম সং, বৈরূত ১৪০০ হি., ৩খ, পৃ. ১৮৬-৯; ঐ, বৃহৎ সংস্করণ, দারুল আন্দালুস, বৈরূত ১৪০২/১৯৮৪, ২খ, পৃ. ৪৮৬; (৪) 'আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী, তাফসীরে কবীর, বৈরূত তা.বি., ২৬খ, পৃ. ১৫৩ প; (৫) কুরতুবী, আল-জামে' লিআহকামিল কুরআন, বৈরূত তা.বি., ১৫খ, পৃ. ১০৫-৬; (৬) সায়্যিদ মাহ্মূদ আল-আলূসী, রূহুল মাআনী, দেওবন্দ, (ভারত), তা.বি., ২৩খ, পৃ. ১২৮-৩২; (৭) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তাফসীর, ৩য় সং, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, ২৩ খ, ৩৭ ঃ ৯৯-১১৩ আয়াতের অধীন বিস্তারিত আলোচনা; (৮) সায়্যিদ আবুল 'আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন (উর্দূ), ১১শ সং, লাহোর ১৯৮১, ৪খ, ৩৭ ঃ ৯৯-১১৩ আয়াতের অধীন বিস্তারিত আলোচনা; (৯) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাআরিফুল কোরআন (বাংলা সংস্করণ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪র্থ সং, ঢাকা ১৪১৫/১৯৯৪, ৭খ, পৃ. ৪৪৪-৪৫৪; (১০) তাফসীরে উছমানী (উর্দূ), সৌদী আরব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ, ৩৭ ঃ ৯৯-১১৩ আয়াতের অধীন টীকাসমূহ; (১১) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু., ই.ফা.বা., ঢাকা, ১খ, পৃ. ২৩১, টীকা ৪৫২।

হাদীছের গ্রন্থাবলী ঃ (১) সহীহ আল-বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী সং, ৬ খণ্ডে সমাপ্ত; (২) সহীহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সংস্করণ, ৮ খণ্ডে সমাপ্ত; (৩) জামে আত-তিরমিযী, ইসলামিক সেন্টার সংস্করণ, ৬ খণ্ডে সমাপ্ত; (৪) সুনান আবী দাউদ, মূল আরবী সংস্করণ; (৫) সুনান নাসাঈ, মূল আরবী সংস্করণ; (৬) সুনান ইব্ন মাজা, মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকী সম্পাদিত, বৈরূত তা.বি.; (৭) আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী, কানযুল উম্মাল, ১ম সং, আলেপ্পো ১৩৯৪/১৯৭৪, ১১খ, পৃ. ৪৯০-৯১।

ইসলামী ইতিহাস ও অন্যান্য ঃ (১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকার আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি., ১খ, পৃ. ১৫৩-৬৩, ১৯১-৩; ২খ, পৃ. ১৫৬ প; ১৫৪-৮; (২) ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১ম সংস্করণ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ, পৃ. ৭৮-৯৫; (৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত তা.বি., ১খ, পৃ. ৪৮-৫২; (৪) ছাআলাবী, কাসাসুল আম্বিয়া (আল-মুসাম্মা বি-আরাইস); তা.বি., পৃ. ৮৩-১০৯; (৫) আনওয়ারে আম্বিয়া (লেখকের নাম অজ্ঞাত), ৫ম সং, লাহোর ১৯৮৫, পৃ. ৬০-৬৬; (৬) আল্লামা হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, লাহোর তা.বি., ১খ, পৃ. ২২৪-২৪৭; (৭) আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত তা.বি., পৃ. ৯২-৯৪, ১০১-১০৯; (৮) ইয়াকূত আল-হামাবী, মুজামুল বুলদান, দারু সাদির, বৈরূত,

তা.বি., ৩খ, পৃ. ১৪৭-৪৯; (৯) মুহাম্মাদ তাহির আল-কুর্দী, আত-তারীখুল-কাবীম লি-মাক্কাতা ওয়া বায়তিল্লাহিল কারীম, ১ম সংস্করণ, মক্কা ১৩৮৫ হি, ৩খ.; (১০) এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, মক্কা শরীফের ইতিকথা, ৩য় প্রকাশ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ১৯৯৮ খৃ.; (১১) ড. মুহাম্মাদ রাওয়াস ও ড. হামিদ সাদিক কানীবী, মুজাম লুগাতিল ফুকাহা, করাচী তা.বি., পৃ. ২৭৪; (১২) মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহ্সান, কাওয়াইদুল ফিক্হ, ১ম সং, উত্তর প্রদেশ (ইন্ডিয়া) ১৩৮১/১৯৯১, পৃ. ৩৪৯।

অমুসলিম উৎস ঃ (১) বাইবেল, বাংলা সংস্করণ, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা; (২) বুতরুস আল-বুস্তানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, বৈরূত তা.বি., ২৪, ৩খ, পৃ. ৬১২-১৫।

মুহাম্মদ মূসা

১০

হযরত ইসহাক (আ)

حضرت اسحاق عليه السلام

হযরত ইসহাক (আ)

হযরত ইসহাক (আ) একজন বিশিষ্ট নবী। তিনি মহান নবী হযরত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার বংশতালিকা হইল ঃ ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন তারিহ (বা আযর) ইব্‌ন নাহূর ইব্‌ন সারুগ ইব্‌ন রাউ ইব্‌ন ফালিগ ইব্‌ন আবির ইব্‌ন শালিখ ইব্‌ন আরফাখশাজ ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ) (ইব্‌ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, পৃ. ১৯)। সাম ইব্‌ন নূহ ('আ)-এর বংশধরগণ ইতিহাসে সামী বা সেমিটিক জাতি হিসাবে পরিচিত। সুতরাং হযরত ইসহাক (আ)-এর পূর্বপুরুষগণ সেমিটিক জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে সাম ইব্‌ন নূহ ('আ) এবং হযরত ইসহাক ('আ)-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল এক হাজার বৎসরেরও অধিক (মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী, আন-নুবুওয়াত ওয়া'ল-আম্বিয়া, পৃ. ১৪৬)।

নমরূদের অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া হযরত ইব্‌রাহীম ('আ) ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত লূত (আ)-সহ তাঁহার পরিবার-পরিজনকে লইয়া দেশত্যাগ করিয়া ইরাকের বাবিল শহর হইতে শাম (সিরিয়া) চলিয়া যান। বিদেশ-বিভূঁইয়ে পৌঁছিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি কানআন (ফিলিস্তীন) অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন (ইব্‌ন কুতায়বা, পৃ. ২০)। তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল এবং তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট দুআও করিয়াছিলেন ঃ

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর" (৩৭ ঃ ১০০)।

তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সারা বিন্‌ত লাবান ইব্‌ন বাছবীল ইব্‌ন না'হুর, যিনি ইবরাহীম ('আ)-এর পরিবারের সহিত সম্পৃক্ত ছিলেন (ইব্‌ন হাবীব, আল-মুহাব্‌বার, পৃ. ৩৯৪; আল-মাস'উদী, মুরূজু'য-যাহাব, ১খ., পৃ. ৮৫)। তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। অতঃপর তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী হাজার (হাজিরা)-এর গর্ভে তাঁহার প্রথম সন্তান হযরত ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর দীর্ঘকাল পর কানআনে অবস্থানকালেই তাঁহার প্রথমা স্ত্রী সারার গর্ভে তাঁহার দ্বিতীয় সন্তান হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্ম-সংক্রান্ত আল-কুরআনে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে উহার সারাংশ হইল ঃ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর নিকট কিছু সম্মানিত মেহমান (ফেরেশতা) আসিলেন। তিনি তাঁহাদের জন্য একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে খাইতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা হাত গুটাইয়া রাখিলেন। ইহাতে ইব্‌রাহীম (আ) কিছুটা ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ভয় করিবেন না, আমাদিগকে লূত ('আ)-এর মহল্লায় প্রেরণ করা হইয়াছে"। ইহার পর তাঁহারা হযরত ইব্‌রাহীম ('আ)-কে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। আল-কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَامْرَاَتُهُ قَائِمَةٌ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ .

"তাহার স্ত্রী তথায় দণ্ডায়মান ছিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তীতে ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম" (১১ ঃ ৭১)।

আরও উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهُ فِىْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ *

"তখন তাহার স্ত্রী চিৎকার করিতে করিতে সম্মুখে আসিল এবং গাল চাপড়াইয়া বলিল, এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হইবে" (৫১ঃ ২৯)?

তখন হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর বয়স ছিল এক শত বৎসর এবং হযরত সারার বয়স ছিল নব্বই বৎসর। হযরত ইসহাক (আ)-এর বয়স যখন আট দিন তখন তাঁহাকে খত্‌না করানো হয় (হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ১খ., ২৫০)। হযরত ইসহাক (আ) হযরত ইসমাঈল (আ) হইতে বয়সে ১৩/১৪ বৎসর ছোট ছিলেন।

কানআনের হেবরন (অপর নাম আল-খালীল)-এ হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনুমান করা হয়। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) মিসর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সেখানে বসবাস শুরু করেন (ইব্‌ন খালদূন, তারীখ, ১খ., ৫২)।

হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁহার স্ত্রীকে বৃদ্ধ বয়সে দেওয়া হইয়াছিল। ইসহাক শব্দটির ইব্‌রানী (হিব্রু) উচ্চারণ হইল য়াসহাক (يصحك)। আর য়াসহাক শব্দটির আরবী সমার্থক শব্দ হইল য়াদহাক (يضحك, মূল অর্থ হাসি)। হিব্রু ভাষায় ض অক্ষরের ব্যবহার নাই। তাই ض-এর পরিবর্তে ص ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ك আর ق উচ্চারণের দিক হইতে খুবই কাছাকাছি। কালক্রমে يضحك পরিবর্তিত হইয়া اسحاق-এ রূপান্তরিত হয়। এই ভিত্তিতে ইসহাক তাঁহার মাতার দেওয়া নাম। হযরত সারা বলিয়াছিলেন, "আল্লাহ তাআলা আমাকে হাসাইলেন (য়াসহাক) এবং আমার সহিত যাহারা ইহা শ্রবণ করিবে তাহারাও হাসিবে" (আদি পুস্তক, ২১ঃ৭)। কুরআন কারীমে উল্লিখিত হইয়াছে, وَامْرَاَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ "তখন তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়াছিল এবং সে হাসিল" (১১ ঃ ৭১)।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যখন হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তাঁহার স্ত্রী হযরত সারা, যিনি নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন, খুশীতে হাসিতে লাগিলেন। ইংরেজী ভাষায় ইসহাক-কে Isaac (আইজাক) নামে অভিহিত করা হইলেও প্রাচ্যবিদদের এই ধারণা সঠিক নহে যে, তাওরাতেও ইসহাক (আ)-এর এই নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

ইসরাঈলী রিওয়ায়াতে (কাহিনীতে) উল্লিখিত হইয়াছে যে, হযরত ইসহাক (আ) "ঈদুল ফাসহ"-এর দিন জন্ম গ্রহণ করেন। আর মুসলিম ঐতিহাসিকদের রিওয়ায়াত অনুযায়ী তিনি 'আশূরা'-র রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৬০; আল-কিসাঈ, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১০০)। প্রকৃতপক্ষে ইহার কোনটিই ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় না। অবশ্য বাইবেলের

আদিপুস্তক ৪৫ অনুচ্ছেদে এতটুকু উল্লেখ আছে যে, হযরত ইসহাক ('আ)-এর জন্মের এক বৎসর পূর্বে হযরত সারাকে তাঁহার জন্মের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। ইসরাঈলী রিওয়ায়াতে উল্লিখিত আছে যে, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষকে আহার না করাইয়া নিজে খাদ্য গ্রহণ করিতেন না। একবার পনের দিন পর্যন্ত কোন মেহমান আসিল না। অতঃপর একদিন তিনজন অপরিচিত লোক আসিয়া হাযির হইলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহাদের জন্য একটি ভুনা গো-বৎস লইয়া আসিলেন। তাহারা বলিলেন, আমরা মূল্য পরিশোধ না করিয়া কোন কিছু খাইব না। আর সে মূল্য হইল, প্রথমে আমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর আদায় করিব এবং শেষে তাঁহার প্রশংসা করিব। অবশেষে তাঁহারা তাঁহাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলেন। কুরআন কারীমেও এই ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে, তবে কিছুটা ভিন্নভাবে ঃ

وَلَقَدْ جَائَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا . قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ. فَلَمَّا رَاٰى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً . قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ . وَامْرَاَتُهُ قَائِمَةٌ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ .

"আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ লইয়া ইব্‌রাহীমের নিকট আসিল। তাহারা বলিল, 'সালাম'। সেও বলিল, 'সালাম'। সে অবিলম্বে এক কাবাব করা গো-বৎস আনিল। সে যখন দেখিল তাহারা উহার দিকে হাত বাড়াইতেছে না, তখন তাহাদিগকে অবাঞ্ছিত মনে করিল এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। তাহারা বলিল, 'ভয় করিও না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হইয়াছি'। তখন তাহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিল এবং সে হাসিল। অতঃপর আমি তাহাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তীতে ইয়া'কূবের সুসংবাদ দিলাম" (১১ ঃ ৬৯-৭১)।

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ * اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا . قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ * فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ * فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ . فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ . وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ *

"তোমার নিকট ইব্‌রাহীমের সম্মানিত অতিথিদিগের বৃত্তান্ত আসিয়াছে কি? যখন উহারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলিল, 'সালাম'। তাহার মনে হইল, ইহারা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর ইব্‌রাহীম তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া তাহার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গো-বৎস ভাজা লইয়া আসিল ও তাহাদের সামনে রাখিল এবং পরে বলিল, 'তোমরা খাইতেছ না কেন'? ইহাতে উহাদিগের সম্পর্কে তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। উহারা বলিল, 'ভীত হইও না'। অতঃপর উহারা তাহাকে এক গুণী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল" (৫১ ঃ ২৪-২৮)।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) ও তাঁহার স্ত্রী হযরত সারা উভয়েরই বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান জন্মদানের বিষয়টিতে হযরত সারা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে ঃ

قَالَتْ يَاوَيْلَتَا ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا اِنَّ هٰذَا شَىْءٌ عَجِيْبٌ *

"সে (সারা) বলিল, কী আশ্চর্য! সন্তানের জননী হইব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার

স্বামী বৃদ্ধ! ইহা অবশ্যই একটি অদ্ভূত ব্যাপার” (১১ ঃ ৭২)।

আরও বলা হইয়াছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ .

“(ইব্‌রাহীম বলিল) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্দ্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করিয়াছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন” (১৪ ঃ ৩৯)।

অন্যত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلاً جَعَلْنَا صَالِحِيْنَ .

“আমরা তাহাকে (ইব্‌রাহীমকে) দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়া'কূব এবং প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ” (২১ ঃ ৭২)।

কুরআন কারীমের উল্লিখিত আয়াতসমূহে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল তিনিই হযরত ইসহাক (আ)। সূরা হূদ-এ (আয়াত ৭১) তাঁহার নামও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচ্যবিদগণ তাওরাতের ভাষ্য মিদরাস (R. Gena, ৫৫, Tachuna Gen., ৪০)-এর কোন কোন বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়া বলেন যে, সেই মেহমানগণ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইহাও বলিলেন যে, ইহাকে আল্লাহ্‌র নামে কুরবানীর নিমিত্ত যবেহ করিতে হইবে। এই বর্ণনা সঠিক নহে। অনুরূপভাবে এই বর্ণনাও সঠিক নহে যে, ইসহাক ('আ)-এর বয়স সাত বৎসর হইলে ইব্‌রাহীম (আ) তাঁহাকে বায়তুল মাকদিস লইয়া যান, সেখানে তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, উহাকে আল্লাহ্‌র রাহে কুরবানী কর। সকালে তিনি একটি ষাঁড় আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করিলেন। কিন্তু রাত্রে পুনরায় গায়েব হইতে আওয়ায আসিল, “আল্লাহ ইহার চেয়ে অধিক মূল্যবান বস্তুর কুরবানী চাহেন।” সুতরাং তিনি এইবার একটি উট যবেহ করিলেন। পরের রাত্রে তিনি এই আওয়ায শুনিলেন, আল্লাহ তোমার পুত্রের কুরবানী চাহেন। প্রাচ্যবিদগণ উপরিউক্ত ঘটনাকে ইসহাক (আ)-এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করত তাঁহাকে যাবীহুল্লাহ (আল্লাহ্‌র নামে কুরবানীকৃত) বলিয়া আখ্যায়িত করেন। অথচ তাওরাত ও কুরআন কারীমের ঘটনা দ্বারা এই উভয় রিওয়ায়াতই প্রত্যাখ্যাত হইয়া যায়।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে তাঁহার “একমাত্র পুত্র”-কে কুরবানী করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন, যাহা বাইবেলেও (আদি পুস্তক) উক্ত হইয়াছে "Thine Only Son" (Genesis, 22 : 2)। আর ইসহাক (আ) ইব্‌রাহীম (আ)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন না। তাঁহার পূর্বে ইসমাঈল (আ) জন্মগ্রহণ করেন। Genesis, ১৬ ঃ ১৬ অনুযায়ী ইব্‌রাহীম (আ)-এর ৮৬ বৎসর বয়সে ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম এবং Genesis ২১ ঃ ৫ অনুযায়ী তাঁহার ১০০ বৎসর বয়সে ইসহাক (আ)-এর জন্ম। অতএব ইসমাঈল (আ) ইসহাক (আ) হইতে ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র এই নির্দেশকালে ইসমাঈল (আ)-ই ছিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র। অতএব তাঁহাকেই যবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয় [বিস্তারিত দ্র. ইসমাঈল (আ) শীর্ষক নিবন্ধ]।

কুরআন কারীমের যে সকল আয়াতে ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-এর কথা বর্ণনা করা হইয়াছে সেখানে প্রথমে ইসমাঈল এবং পরে ইসহাক-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. ২ ঃ ১৩৩, ১৩৬, ১৪০, ৩ ঃ ৮৪; ৪ঃ ১৬৩; ১৪ ঃ ৩৯)। তদুপরি হযরত সারাকে যখন ইসহাক-এর সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন ইব্রাহীম (আ) ফিলিস্তীনে এবং ইসমাঈল (আ) হিজাযে বসবাসরত ছিলেন। সুতরাং ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হিজাযে অবস্থানরত ইসমাঈল (আ)-ই যাবীহুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দুই পুত্রকে দুইটি খেতাবে ভূষিত করিয়াছেন, একজনকে غلام حليم (ধৈর্যশীল পুত্র সন্তান, ৩৭ ঃ ১০১) এবং অপরজনকে غلام عليم (জ্ঞানী পুত্র সন্তান, ১৫ ঃ ৫৩)। আর জ্ঞানী পুত্র দ্বারা যে হযরত সারার গর্ভজাত ইসহাক (আ)-কে বুঝানো হইয়াছে তাহা কুরআন কারীমের বর্ণনায় সুস্পষ্ট। ইসহাক (আ) সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে, "অতঃপর উহারা তাহাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল" (৫১ ঃ ২৮; আরও দ্র. ১৫ ঃ ৫৩)। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আ)-এর দুআর পরিপ্রেক্ষিতে যে "ধৈর্যশীল পুত্র"-এর সুসংবাদ দিয়াছিলেন তিনি ছিলেন তাঁহার প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)। আর তাঁহার সম্পর্কেই যবেহ-এর কথা বলা হইয়াছে (৩৭ ঃ ৯৯-১০৭)।

কুরআন কারীমে অন্যত্র আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-এর নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَاالْكِفْلِ، كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ *

"এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুলকিফ্ল-এর কথা; তাহাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল" (২১ ঃ ৮৫)। সুতরাং ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-ই যাবীহুল্লাহ। খলীফা উমার ইব্ন আবদিল আযীয (র) একদা ইসলামে দীক্ষিত একজন ইয়াহূদীকে এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "ইয়াহূদীরা জানে যে, ইসমাঈল (আ)-ই প্রকৃত যাবীহ, কিন্তু তাহারা আপনাদের প্রতি ঈর্ষাবশত ইহা স্বীকার করে না" (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া'ন-নিহায়া, ১খ., পৃ. ১৬০)।

হযরত ইসহাক (আ)-এর জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ইসরাঈলী রিওয়ায়াতও বেশীর ভাগই যবেহ-এর ঘটনায় পরিপূর্ণ। তিনি ফিলিস্তীনের হেবরন নামক স্থানে তাঁহার পৈতৃক আবাসস্থলেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন (আস-সাবূনী, আন-নুবুওয়াতু ওয়া'ল-আম্বিয়া, পৃ. ২৪৪; তাফহীম, ২খ., পৃ. ৩৮১)। সেখানে তিনি তাঁহার পিতার স্থলাভিষিক্তরূপে বসবাস করিতে থাকেন। হযরত ইব্রাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-কে মক্কায়, ইসহাক (আ)-কে ফিলিস্তীনে (কানআনে) ও লূত (আ)-কে মরু সাগর (জর্দান) অঞ্চলে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। হযরত ইসহাক (আ)-এর জীবনকাল আনুমানিক খৃ.পূ. ১৭৬১ হইতে ১৫৮১ সন পর্যন্ত। কুরআন কারীমে তাঁহার নবুওয়ত সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحَاقَ ٠

"আমি তাহাকে (ইব্রাহীমকে) সুসংবাদ দিয়াছিলাম ইসহাকের, সে ছিল একজন নবী. সৎকর্মপরায়ণদিগের অন্তর্ভুক্ত। তাহাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করিয়াছিলাম" (৩৭ ঃ ১১২-১১৩)।

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِ وَالْاَبْصَارِ.

"স্মরণ কর আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূবের কথা, উহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী" (৩৮ ঃ ৪৫)।

ইমাম বুখারী 'আম্বিয়া' অধ্যায়ে হযরত ইসহাক (আ) সম্পর্কে ইব্ন উমার ও আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْرَمُهُمْ اَتْقَاهُمْ قَالُوْايَا نَبِىَ اللّٰهِ لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِىَ اللّٰهِ اِبْنُ نَبِىَ اللّٰهِ اِبْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ اِبْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ .

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, 'সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে'? তিনি বলেন, সর্বাধিক খোদাভীরু ব্যক্তিই সর্বাধিক সম্মানিত'। তাঁহারা (সাহাবীগণ) বলেন, আমরা এই বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তিনি বলিলেন, 'সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হইলেন হযরত ইউসুফ (আ)। তিনি হইলেন আল্লাহ্র নবী এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণও হইলেন বংশপরম্পরায় আল্লাহ্র নবী'। অর্থাৎ তাঁহার পিতা হযরত ইয়া'কূব (আ) এবং তাঁহার পিতা হযরত ইসহাক (আ) এবং তাঁহার পিতা হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ সকলেই আল্লাহর নবী ছিলেন (আল-বুখারী, আল-জামি', ১খ., পৃ. ৪৭৮)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ الْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بنِ اِسْحَاقَ بْنِ ابراهِيْمَ .

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করেন, নবী (স) বলেন ঃ বংশপরম্পরায় সম্মানিত ব্যক্তি হইলেন হযরত ইউসুফ (আ), তাঁহার পিতা হযরত ইয়া'কূব (আ), তাঁহার পিতা হযরত ইসহাক (আ) এবং তাঁহার পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ); সবাই ছিলেন সম্মানিত (আল-বুখারী, আল-জামি', ১খ., পৃ. ৪৭৯)।

অনুমান করা হয় যে, চল্লিশ বৎসর বয়সে হযরত ইসহাক রিফ্কা (Rebeeca)-এর সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন (আল-ইয়া'কূবী, তারীখ, ১খ., পৃ. ২৮)। হযরত ইব্রাহীম (আ) হযরত ইসহাক (আ)-কে নিজ গোত্রে বিবাহ করিতে ওসিয়ত করিয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহার চাচা নাহূর ইব্ন তারেখ-এর মেয়ে রিফকাকে বিবাহ করেন (ইব্ন কুতায়বা, পৃ. ২২)। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহাদের কোন সন্তান হয় নাই। অবশেষে বিশ বৎসর পর 'ঈসু (বা 'ঈস) এবং ইয়া'কূব নামে দুই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন (আল-ইয়া'কূবী, ১খ., ২৯; ইব্ন খালদূন, ১খ., ৫৮)। তাঁহারা উভয়ে ছিলেন জমজ। বলা হইয়াছে যে, প্রথমে 'ঈসুর জন্ম হয় এবং পরে ইয়া'কূব-এর। রিওয়ায়াতে

উল্লিখিত আছে যে, আজীবন উভয়ের মধ্যে কিছুটা মন কষাকষি ছিল। পিতা অনেকটা ঈসূর প্রতি ছিলেন আকৃষ্ট, আর মাতা ইয়া'কূবের প্রতি। এই সব কাহিনীর উপর গুরুত্ব দেওয়া সঙ্গত নহে। কারণ ইহা ইসরাঈলী কাহিনী। বানূ ইসরাঈল তাহার নবীগণকে তাহাদের নিজেদের জীবনধারার আলোকে মূল্যায়ন করিয়াছে। কিছু সংখ্যক মুসলিম ঐতিহাসিক ও জীবন-চরিত রচয়িতাও নির্বিচারে সব ধরনের রিওয়ায়াতই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান আদৌ করেন নাই, করিলেও খুব অল্প।

ইয়াহূদী বিশ্বকোষ Jewish Encyclopaedia-তে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইসহাক (আ)-এর বাসস্থান লাহায়রে (Lahai-rai) নামক বি'র (কূপ) অঞ্চলে। যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তখন আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে মিসর না যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং ফিলিস্তীনের সীমানায় অবস্থান করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন যে, সেখানে তিনি এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততি খুবই সুখে-শান্তিতে বসবাস করিবেন। তাই হযরত ইসহাক (আ) জিওয়ার (Bera)-এর সন্নিকটে ফিলিস্তীনীদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন এবং সেখানেই চাষাবাদ করিতে থাকেন। সেখানে ধীরে ধীরে তিনি এতই উন্নতি লাভ করেন যে, ফিলিস্তীনবাসী তাঁহার প্রতি হিংসা করিতে লাগিল। কিন্তু হযরত ইসহাক (আ) তাহাদের এই দুর্ব্যবহার হাসিমুখে বরদাশত করিতেন। অবশেষে তিনি "বি'রু'স-সাবআ" (Beer Sheba) চলিয়া যান। সেইখানে আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বরকত দেন। এইখানে হযরত ইসহাক (আ) একটি ইবাদতখানা (বায়ত ঈল=আল্লাহ্র ঘর) নির্মাণ করেন। ইহার পর তিনি এতই প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেন যে, ফিলিস্তীনের বাদশাহও তাঁহার সহিত সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হন।

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বংশধরদেরকে নবুওয়াত ও কিতাব দান করার ঘোষণা দিয়াছেন ঃ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ "আমি তাহার বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব দান করিয়াছি" (২৯ ঃ ২৭)। বস্তুত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) ও হযরত ইসহাক (আ) এবং তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যেই হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত নবুওয়াত সীমাবদ্ধ থাকে। হযরত মুহাম্মাদ (স) ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। হযরত লূত (আ) ছাড়া অন্য সকল নবী ছিলেন হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশধর। ঈসূ-এর বংশধরের মধ্যে দুইজন নবী হযরত আইয়ূব (আ) ও তাঁহার পুত্র হযরত যুল-কিফ্ল (আ)-এর আবির্ভাব ঘটে। অন্যদিকে হযরত ইয়া'কূব (আ), যাঁহার অপর নাম ছিল ইসরাঈল (আল্লাহ্র বান্দা)। তিনি ছিলেন ইসরাঈলীদের আদি পিতা। তাঁহার পুত্র হযরত যূসুফ (আ) মিসরে গমন করিলে তাঁহার অন্যান্য ভাইয়েরাও তথায় চলিয়া যান। তাঁহারাই হইলেন বনূ ইসরাঈল। কয়েক শতাব্দী মিসরের ফির'আওনের অধীনে থাকিয়া অবশেষে হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে বনূ ইসরাঈল পুনরায় ফিলিস্তীনে প্রত্যাবর্তন করে।

ইসরাঈলী কল্পিত কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে, হযরত ইসহাক (আ)-এর বৃদ্ধ জীবন বেশী সুখে অতিবাহিত হয় নাই। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পুত্রগণ অর্থাৎ ঈসূ এবং হযরত ইয়া'কূবের বিরূপ সম্পর্ক লইয়াও তিনি চিন্তিত ও মনক্ষুণ্ন থাকিতেন। হযরত ইসহাক (আ)-এর দুই

ছেলের মধ্যে বড়জন ঈসূ শিকার করিয়া বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে খাওয়াইতেন। ছোট ছেলে ইয়া'কূব মাতা-পিতার সঙ্গে গৃহেই অবস্থান করিতেন। একদিন ঈসূ শিকার লাভে ব্যর্থ হইয়া ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় বাসায় আসিয়া ইয়া'কূবের কাছে কিছু খাবার চাহিলেন। ইয়া'কূব তাহাকে বলেন, "ফিলিস্তিনীদের রীতি অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ সন্তানই মাতা-পিতার উত্তরাধিকার লাভ করে। তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারের দাবি ত্যাগ কর তাহা হইলে তোমাকে খাবার দিব।" ঈসূ তাহার দাবি ত্যাগ করেন এবং ইয়া'কূব তাহার খাবারের ব্যবস্থা করেন।

হযরত ইসহাক (আ) বৃদ্ধ ও ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া পড়িলে তাঁহার দ্বারা একবার ঈসূ এজন্য বরকত লাভের দোআ করিতে চাহিলেন। ইসহাক (আ) শিকার করিয়া উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে ঈসূকে আদেশ করিলেন। রিফ্‌কা একথা শুনিয়া বরকত লাভের জন্য ইয়া'কূবকে উত্তম খাবারের ব্যবস্থা করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত করিতে পরামর্শ দেন। ইয়া'কূব মায়ের পরামর্শ অনুযায়ী পিতার অজান্তে কৌশলে বরকত লাভে সমর্থ হন। ঈসূ এ ঘটনা জানিতে পারিয়া খুবই মর্মাহত হন। ফলে দুই ভ্রাতার মধ্যে বিরোধ ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

রিফ্‌কা ইয়া'কূবকে তাঁহার মামা লাবান-এর সঙ্গে বসবাস করিতে পরামর্শ দেন। সুতরাং ইয়া'কূব লাবানের নিকট যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন এবং তথায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অন্যদিকে ঈসূ আপন চাচা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কাছে চলিয়া যান এবং তথায় চাচাত বোন 'বাশামা' (বা বাছিমা)-কে বিবাহ করেন এবং নিজ পরিবারসহ 'সায়ীর' নামক স্থানে গিয়া বসবাস করতে থাকেন। ঈসূ তথায় 'আদুম' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাই ঈসূর বংশধর বনূ আদুম নামে পরিচিতি লাভ করে (হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ১খ., ২৫১-২৫২)। তবে এই ধরনের কাহিনী বস্তুত নবী-রাসূলগণের শানের পরিপন্থী (তু. জামীল আহমাদ, আম্বিয়া-ই কুরআন, ১খ., পৃ. ২৮৫)। হযরত ইসহাক দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ১৮০ বৎসর (ইব্ন কুতায়বা, পৃ. ২২)। তিনি হেবরন (আল-খালীল)-এ ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই হযরত ইব্রাহীম (আ) ও হযরত সারা (রা)-র পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) কুরআন মজীদ, স্থা., তাফসীরসহ.; (২) আয-যামাখ্‌শারী, ১খ., ২২৪; (৩) আল-বায়দাবী, ১খ., ২৩৩; (৪) বাইবেল, স্থা., ঢাকা; (৫) আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, কায়রো ১৩১২ হি., পৃ. ৪৮-৬০; (৬) আল-কিসাঈ, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ১৩৬-১৪০; (৭) আত-তাবারী, তারীখ, লাইডেন সং, ১খ., ২৭২-২৯২; (৮) আল-মাসউদী, মুরূজুয যাহাব, প্যারিস ১৮৬১ খৃ., ১খ., পৃ. ৮৫; (৯) আল-য়া'কূবী, তারীখ, বৈরূত ১৩৭৯ হি., ১খ., ২৮-২৯; (১০) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল ফীত-তারীখ, ১খ., ৮৭-৮৯; (১১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়া আন-নিহায়া, ১খ., ১৬০-৬২; (১২) ইব্ন খালদূন, তারীখ, মিসর ১৯৩০ খৃ., ১খ., ৫৮; (১৩) ইব্ন হাবীব, আল-মুহাব্বার, হায়দরাবাদ ১৯৪২ খৃ., পৃ. ৩৯৪; (১৪) ইব্ন কুতায়বা, আল-মা'আরিফ, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ২০-২৫; (১৫) আল-বুখারী, আল-জামি আস-সাহীহ, দিল্লী ১৩৭৭ হি., ১খ., ৪৭৮; (১৬) আবদুল ওয়াহ্‌হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, কায়রো ১৯৫৩

খৃ., পৃ. ১০৩-৫; (১৭) মুহাম্মাদ আলী আস-সাবূনী, আন-নুবুওয়াত ওয়াল-আম্বিয়া, মক্কা ১৯৮০ খৃ., পৃ. ১৪৬, ২৪৪-৪৫; (১৮) সায়্যিদ আবুল আলা মাওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ২খ., ৩৮১; (১৯) Grunebaum, Beitrage, পৃ. ১১০-১২০; (২) Ency. Hebrew, নিউইর্য়ক, ৫খ., ১৮, শিরো. Isaco; (২২) Jewish Ency., শিরো.; (২৩) Ency. of Islam, ৪খ., ১০৯-১০; (২৪) মাওলানা হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, করাচী ১৩৬৯ হি., ১খ., পৃ. ২৪৮-২৫৪।

ড. রফিক আহমদ

১১

হযরত ইয়াকূব (আ)

حضرت يعقوب عليه السلام

হযরত ইয়াকূব (আ)

জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত ইয়াকূব (আ) আনু. ১৮৩৬ খৃ. পূ. সালে কান্‌আন (বর্তমান ফিলিস্তীন)-এ জন্মগ্রহণ করেন (বাইবেল ডিকশনারী, পৃ. ২৩)। তাঁহার সময়কাল সাধারণ হিসাব অনুসারে খৃ. পূ. ১৮শ শতক (Collier's Encyclopedia, ১৩ খ., পৃ. ৪২৭) এবং তাফসীরে মাজেদীর বর্ণনামতে খৃ. পূ. ২০০০ সাল হইতে ১৮৫৩ খৃ. পূ. (১খ., পৃ. ২৪৬, টীকা ৪৭৫, ই. ফা.-র বাংলা সং)। তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পৌত্র। এই বংশলতিকা কুরআন মজীদ কর্তৃক স্বীকৃত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً.

"আমি ইব্রাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং অতিরিক্ত পৌত্ররূপে ইয়াকূব" (দ্র. ২১ ঃ ৭২)।

হাদীস শরীফে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান। রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তির জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেনঃ

فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِيُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِيِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ.

"সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি হইলেন আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ, তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী (ইয়াকূব)-এর পুত্র, ইয়াকূব (আ) ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী (ইসহাক)-এর পুত্র" (বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৭৮, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ১৫; মুসলিম, ফাদাইল, বাংলা অনু., ৭খ., পৃ. ৩৬৮)।

বুখারীর অন্যত্র হাদীছটি এভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ الْكَرِيْمُ بْنُ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ بْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

"ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ মর্যাদাবান ব্যক্তি, মর্যাদাবান ব্যক্তির পুত্র, মর্যাদাবান ব্যক্তির পুত্র, মর্যাদাবান ব্যক্তির পুত্র ইউসুফ ইব্‌ন ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম আলায়হিমুস সালাম (আম্বিয়া, বাব ১৯, নং ৩১৩২, ৩খ., পৃ. ৩৭২; আরও দ্র. তাফসীর সূরা ১২, নং ৪৩২৭, ৪খ., পৃ. ৪৩০)।

তাঁহার মাতার নাম রিফ্‌কা (রিবকা)। তিনি ছিলেন পিতা-মাতার জমজ সন্তান। বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুসারে ইয়াকূব (পাদগ্রাহী) শব্দটি হিব্রু বিশেষ্যপদ 'আকিব' (পায়ের গোছা) হইতে গৃহীত।

কারণ তিনি তাঁহার মাতার গর্ভ হইতে তাঁহার জমজ ভ্রাতা এসূ-এর পাদমূল ধরিয়া ভূমিষ্ঠ হন (দ্র. বাইবেলের আদিপুস্তক, ২৫ ঃ ২৬)। আরবী ভাষায়ও উক্ত শব্দের অর্থ 'পায়ের গোছা' ও পশ্চাদবর্তী (দ্র. অভিধান)।

হযরত ইয়াকূব (আ) ও তাঁহার পিতা হযরত ইসহাক (আ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁহার স্ত্রী সারার জন্য আল্লাহ তাআলার দানস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلاًّ هَدَيْنَا ·

"আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব, ইহাদের প্রত্যেককে আমি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম" (৬ ঃ ৮৪; আরও দ্র. ২১ ঃ ৭২; ২৯ ঃ ২৭; ১১ঃ ৭১)।

কতক তাফসীরকারের মতে হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার দাদা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সূরা বাকারার ১৩২ নম্বর আয়াতে উদ্ধৃত ইয়াকূব শব্দটিকে মাফউল (কর্মকারক)-এর পরিবর্তে ফাইল (কর্তৃকারক) হিসাবে পাঠ করেন। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ·

"এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এই সম্বন্ধে তাহাদের পুত্রগণকে ওসিয়ত করিয়াছিলেন" (২ ঃ ১৩২)।

ইহা হইল আয়াতের সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ। কিন্তু ইয়াকূবকে মাফউল সাব্যস্ত করিলে আয়াতের অর্থ হয় ঃ "এবং ইবরাহীম এই সম্বন্ধে তাহার পুত্রগণকে ও ইয়াকূবকে ওসিয়াত করিয়াছিলেন"। তাফসীরে ইব্ন কাছীর-এ এই মতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইয়াছে এবং ইহার সমর্থনে ইব্ন কাছীর ১১ঃ ৭১; ২৯ ঃ ২৭ ও ২১ঃ ৭২ আয়াতত্রয় পেশ করিয়াছেন। উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আ)-কে 'দান করিয়াছেন' বলা হইয়াছে। আর দান তো জীবদ্দশায়ই হইয়া থাকে (বিস্তারিত দ্র. তাফসীরে ইব্ন কাছীর, বাংলা অনু., ১খ., পৃ. ৫৭৩; বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৫)।

বাইবেল ও বাইবেল ভিত্তিক রচনাবলীর বর্ণনা অনুসারে হযরত ইসহাক (আ) এসূকে অধিক স্নেহ করিতেন এবং স্ত্রী রিফ্কা অপর পুত্র ইয়াকূবকে অধিক স্নেহ করিতেন। এক পর্যায়ে রেষারেষির সৃষ্টি হইলে মাতা তাহাকে নিজ ভ্রাতা লাভান-এর নিকট হাররান বা পাদ্দান আরাম (বর্তমান উত্তর মেসোপটামিয়া)-এ পাঠাইয়া দেন (বাইবেলের আদিপুস্তক, ২৭ ঃ ৪১-৬) তথায় তিনি মামার মেষপাল চরাইতেন। ইহার দ্বারা মহানবী (স)-এর একটি বাণী স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন ঃ "এমন কোন নবী নাই যিনি মেষপাল চরান নাই"। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে দুই সহোদর মামাতো বোনকে বিবাহ করেন এবং পরবর্তী কালে দুই স্ত্রী ও তাহাদের দুই দাসীকে লইয়া কানআনে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎকালীন শরীআতে দুই সহোদরাকে একইসঙ্গে বিবাহ করা বৈধ ছিল। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ·

"এবং আরও এই যে, দুই ভগিনীকে একত্রে বিবাহ করা, পূর্বে যাহা হইয়াছে তো হইয়াছে" (৪ ঃ ২৩; আল-কামিল, ১খ., পৃ. ৯৬)।

মামার বাড়িতে যাওয়ার পথে তিনি এক স্থানে যাত্রাবিরতি করিলেন এবং রাত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন দেখিতে পাইলেন যে, আল্লাহ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি সদাপ্রভু, তোমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতিপালক প্রভু। তুমি যে ভূমিতে শুইয়া আছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরগণকে দান করিব ...." (দ্র. বাইবেলের আদিপুস্তক, ২৮ ঃ ১০-২২)।

ইব্ন কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারীর মতে স্বপ্নের বিষয়বস্তু এই যে, মহামহিম আল্লাহ তাঁহার নিকট ওহী পাঠাইলেন যে, "আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোনও ইলাহ নাই, তোমার ইলাহ এবং তোমার পূর্বপুরুষগণের ইলাহ। আমি তোমাকে এই পবিত্র ভূমির উত্তরাধিকারী বানাইলাম এবং তোমার পরে তোমার বংশধরগণকেও। আমি তোমাকে ও তাহাদেরকে প্রাচুর্য দান করিলাম, তোমাদের মধ্যে কিতাব, হিকমাত ও নবওুয়াত দান করিলাম। আমি এই স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আছি এবং আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলাম। তুমি ইহাতে একটি ঘর বানাও যাহাতে তুমি ও তোমার বংশধরগণ আমার ইবাদত করিবে। ইহাই বায়তুল মাকদিস" (আল-মাআরিফ, পৃ. ২৩)।

কুরআন মজীদে হযরত ইয়াকূব (আ)

কুরআন মজীদে নামসহ ষোলবার হযরত ইয়াকূব (আ)-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হইয়াছে এবং সর্বনামরূপে আরও কয়েক স্থানে তাঁহার প্রসঙ্গ আসিয়াছে। যেমন ২ঃ ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, ১৪০; ৩ ঃ ৮৪; ৪ ঃ ১৬৩; ৬ ঃ ৮৪; ১১ ঃ ৭১; ১২ ঃ ৬, ৩৮, ৬৮; ১৯ ঃ ৬, ৪৯; ২১ ঃ ৭২; ২৯ ঃ ২৭; ১৮ ঃ ৪৫। এইসব স্থানে হযরত ইয়াকূব (আ) সম্পর্কে যে তথ্যাবলী উক্ত আছে তাহা মূল পাঠসহ নিবন্ধের সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে উদ্ধৃত হইয়াছে।

২. ইয়াকূব (আ)-এর বৈবাহিক জীবন ও সন্তান-সন্ততি

ইয়াকূব (আ) মাতুলালয়ে পৌঁছিয়া তাহার গবাদিপশু লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মামার দুই কন্যা ছিল, বড়জনের নাম লিয়া এবং ছোটজনের নাম রাহীল। সাত বৎসর পর ইয়াকূব (আ) মামার ছোট কন্যা রাহীলকে বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মামা তাঁহার সহিত জ্যেষ্ঠা কন্যা লিয়ার বিবাহ দিলেন। কারণ জ্যেষ্ঠা কন্যাকে অবিবাহিত রাখিয়া কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহদান তাহাদের রীতিবিরুদ্ধ ছিল (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৫)। অবশ্য পরে আরো সাত বৎসর (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৫; বাইবেলের আদিপুস্তক, ২৯ ঃ ২৭) মামার পশুপাল চরাইবার পর তিনি তাঁহার কাঙ্খিত মামাত ভগিনী রাহীলকেও বিবাহ করিতে সক্ষম হইলেন। তৎকালে একত্রে দুই বোনকে বিবাহ করা বৈধ ছিল। তাহার কন্যা লিয়ার সহিত জুলফা (সিল্পা) ও রাহীলের সহিত বিলহা নাম্নী দুইটি দাসীও দান করেন। পরে দুই স্ত্রী স্ব স্ব দাসীকেও ইয়াকূব (আ)-এর সহিত বিবাহ দেন (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৫)।

আল্লাহ্ তা'আলা এই চারজন স্ত্রীর গর্ভে ইয়াকূব (আ)-কে দ্বাদশ পুত্র ও এক কন্যা সন্তান দান করেন। প্রথম স্ত্রী লিয়ার গর্ভে রূবিল (রূবেন=পুত্রকে দেখ), শাম'উন (শিমিয়ন=শ্রবণ), লাবী (লেবী=আসক্ত), ইয়াহূযা (যিহূদা=স্তব), ঈসাখর, অপর বর্ণনায় ইনসাখর (ইযাখর=বেতন) ও যাঈলূন (সবূলূন= বসবাস) নামে পাঁচ পুত্র সন্তান এবং রাহীলের গর্ভে হযরত ইউসুফ (যোশেফ=

বৃদ্ধি) ও বিনয়ামীন (বিন্যামিন=দক্ষিণ হস্তের পুত্র), তৃতীয় স্ত্রী এবং রাহীলের দাসী বিলহার গর্ভে দান (বিচার) ও নাফতালী (মল্লযুদ্ধ), চতুর্থ স্ত্রী এবং লিয়ার দাসী যুলফার গর্বে জাদ, অপর বর্ণনায় হায (গাদ=সৌভাগ্য) ও আশীর (ধন্য) জন্মগ্রহণ করে (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৭; আরও দ্র. পৃ. ১৯৫; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৫-৬; তাফসীরে তাবারী, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ৩৬৭-৮; বাইবেলের আদিপুস্তক, ২৯ ঃ ৩২-৩৫; ৩০ ঃ ১-২৪; ৩৫ ঃ ১৮ ও ২৩-২৬)। বিনয়ামীন ব্যতীত ইয়াকূব (আ)-এর সকল সন্তান তাঁহার মাতুলালয় হাররানে (তাবারীর মতে বাবিলে) জন্মগ্রহণ করেন।

ইয়াকূব (আ)-এর উসীলায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মামার সম্পদে, বিশেষত গবাদিপশুতে প্রচুর বরকত ও প্রাচুর্য দান করেন। তিনি মোট বিশ বৎসর মাতুলালয়ে অবস্থান করেন (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৫)। পরে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইয়াকূব (আ)-কে তাঁহার পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দান করেন এবং তাঁহাকে সহায়তা দানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৫)। তদনুযায়ী তিনি সপরিবারে প্রচুর সম্পদসহ পিতৃভূমি হেব্রনে ফিরিয়া আসেন। আসার পথে রাহীল "আফরাছ" (ইফরাত বা বেথেলহাম) নামক স্থানে বিনয়ামীনকে প্রসব করার পরপরই ইনতিকাল করেন। ইয়াকূব (আ) তাহাকে এখানেই দাফন করেন এবং তাহার কবরের উপর একটি প্রস্তর স্তম্ভ স্থাপন করেন (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৭; বাইবেলের আদিপুস্তক, ৩৫ ঃ ১৬-২০)।

ইব্‌ন কাছীর (র) আহলে কিতাবের বরাতে উল্লেখ করেন যে, কানআনে বসবাসকালে ইয়াকূব (আ)-এর একমাত্র কন্যা দীনাকে এতদঞ্চলের রাজপুত্র শিখীম অপহরণ করে। শিখীমের পিতা জামূর (হমোর) তাহার পুত্রের সহিত এই কন্যাকে বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রগণ বলিলেন যে, তাহারা খাতনাহীনদের সহিত আত্মীয়তা করেন না। যদি তাহারা সকলে খাতনা করিতে সম্মত হয় তবে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহারা খাতনা করিবার তৃতীয় দিনে অসুস্থ হইয়া পড়িল। এই সুযোগে ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রগণ রাজ-পরিবারে আক্রমণ চালাইয়া শিখীম ও তাহার পিতাসহ বহু লোককে হত্যা করেন। এই আক্রমণে রাজবংশের শক্তি খর্ব হইয়া যায় (দ্র. আদিপুস্তক ৩৪ ঃ ১-৩১)। বাইবেলে বর্ণিত এই ঘটনাটি নবী পরিবারের মর্যাদার পরিপন্থী বিধায় গ্রহণযোগ্য নহে।

কুরআন মজীদ হইতেও ইয়াকূব (আ)-এর বারজন পুত্র থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইউসুফ (আ) তাঁহার পিতার নিকট তাঁহার স্বপ্নের কথা এইভাবে ব্যক্ত করেন ঃ

يٰأَبَتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ.

"হে আমার পিতা! নিশ্চয় আমি দেখিয়াছি একাদশ নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রকে, আমি এইগুলিকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায় দেখিয়াছি" (১২ ঃ ৪)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র মতে একাদশ নক্ষত্র অর্থ ইউসুফ (আ)-এর একাদশ ভ্রাতা এবং সূর্য ও চন্দ্র অর্থ তাঁহার পিতা-মাতা (তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস, পৃ. ১৯৩; তাফসীরে উছমানী, সৌদী সং, পৃ. ৩১২, টীকা ২; মাআরেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত সৌদী সং, পৃ. ৬৫১, কলাম ২; তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইউসুফ, ৪ নং টীকা)। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র মতে ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন দর্শনকালে তাঁহার

মাতা রাহীল জীবিত ছিলেন (তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, পৃ. ১৯৩)। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হইয়াছে যে, তখন তাঁহার মাতা জীবিত ছিলেন না, তাঁহার সৎমাতা লিয়া জীবিত ছিলেন। শেষোক্ত মত সত্য হইলে ইয়াকূব (আ) সপরিবারে মিসর গমনকালেও লিয়া জীবিত ছিলেন। কারণ ইউসুফ (আ)-এর রাজ-দরবারে তাহাদের উপস্থিতি প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا ـ

"এবং ইউসুফ তাহার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাইল এবং তাহারা সকলে তাহার সম্মানে সিজদায় লুটাইয়া পড়িল" (১২ঃ ১০০)।

বাইবেল হইতে জানা যায় যে, লিয়া ইয়াকূব (আ)-এর জীবদ্দশায় মারা যান (আদিপুস্তক, ৪৯ঃ ৩১)। তাঁহার অপর স্ত্রীদ্বয় কখন মৃত্যুবরণ করেন সেই সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

হযরত ইয়াকূব (আ) পুত্রগণের মধ্যে বৃদ্ধ বয়সের পুত্র ইউসুফ (আ)-কে সর্বাধিক স্নেহ করিতেন। স্বপ্নের বিবরণ শুনিয়াই তিনি তাঁহাকে নিজ ভ্রাতাদের নিকট তাহা গোপন রাখার উপদেশ দেন, যাহাতে তাহারা তাঁহার ক্ষতিসাধন করিতে না পারে (দ্র. ১২ ঃ ৫)। ১২ ঃ ৬ হইতে ১৮ আয়াত পর্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে সৎ ভ্রাতাদের ষড়যন্ত্র ও তাহা বাস্তবায়নের ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। সর্বাধিক প্রিয় সন্তানকে হারাইয়া হযরত ইয়াকূব (আ) পুত্রশোকে এক পর্যায়ে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলেন এবং পরবর্তী কালে ইউসুফ (আ)-এর জামা তাঁহার মুখমণ্ডলে স্পর্শ করাইলে তিনি পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন (দ্র. ১২ ঃ ৮৪ ও ৯৬)। এক সময়ে কানআনে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইলে ইয়াকূব (আ) তাঁহার দশ পুত্রকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিসরে প্রেরণ করেন। ইউসুফ (আ) তাহাদেরকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখেন, অবশ্য তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই (দ্র. ১২ ঃ ৫৮)। তিনি তাহাদেরকে পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য দান করেন, গোপনে তাহাদের ক্রয়মূল্য ফেরত দেন এবং তাহারা পুনর্বার আসিলে তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য জোর তাগিদ দেন (দ্র. ১২ ঃ ৫৯-৬২)। তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ইউসুফ (আ)-এর সহোদর বিন্‌য়ামীনই ছিলেন তখন ইয়াকূব (আ)-এর সর্বাধিক স্নেহের পাত্র। মিসর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহারা পিতাকে মিসরের শাসনকর্তার অনুরোধ সম্পর্কে অবহিত করিল এবং বিন্‌য়ামীনকে তাহাদের সঙ্গী করা হইলে তাহার নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিও প্রদান করিল (১২ঃ ৬৩)। ইয়াকূব (আ) বিদায়কালে বলিলেন ঃ

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

"আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু" (১২ ঃ ৬৪)।

দ্বিতীয়বার তাহারা মিসর পৌঁছিলে ইউসুফ (আ) তাঁহার সহোদরকে সুকৌশলে নিজের কাছে রাখিয়া দেন এবং নিজের পরিচয় সহোদরের নিকট ব্যক্ত করেন (দ্র. ১২ ঃ ৬৯-৭৯)। বিন্‌য়ামীন মিসর হইতে প্রত্যাবর্তন না করায় ইয়াকূব (আ) আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ইঙ্গিত পাইলেন যে, তাঁহার স্নেহের ধন ইউসুফ (আ) এখনো জীবিত আছেন। তিনি পুত্রদের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এইজন্য তাঁহার অপর পুত্রগণ তাঁহার প্রতি অনুযোগ (দ্র. ১২ ঃ ৮৬) করিলে তিনি বলেন ঃ

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ·

"আমি আমার অসহনীয় বেদনা এবং আমার দুঃখ শুধু আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিতেছি। আমি আল্লাহ্‌র নিকট হইতে জানি যাহা তোমরা জান না" (১২ঃ ৮৬)। তৃতীয়বার তাহারা মিসর পৌঁছিলে ইউসুফ (আ) তাহাদের সামনে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেন, তাহাদের পূর্বের কৃতকর্মের কথা স্মরণ করাইয়া দেন এবং তাহাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং তাহাদের সকলকে সপরিবারে মিসরে চলিয়া আসিতে বলেন (দ্র. ১২ ঃ ৮৬-৯৩)।

তখন তিনি স্পষ্টভাবে ইউসুফ (আ)-এর নাম উচ্চারণ পূর্বক তাহাদেরকে পুনরায় মিসরে যাইতে বলেন। তাহারা ইউসুফ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহাদের জন্য রসদ সরবরাহের আবেদন জানায়। তিনি তাহাদের সঙ্গে পিতার জন্য নিজের জামা প্রেরণ করেন (দ্র. ১২ ঃ ৯৩)। চতুর্থবারের সফরে হযরত ইয়াকূব (আ) সপরিবারে মিসর গমন করেন। তাঁহারা শহরদ্বারে পৌঁছিলে ইউসুফ (আ) পিতা-মাতাকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাইয়া নির্ভয়ে ও নিরাপদে রাজধানীতে প্রবেশ করিতে বলেন। রাজ-দরবারে তিনি পিতা-মাতাকে তাঁহার পাশে বসান এবং দশ ভ্রাতা তাঁহাকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সিজদা করে (দ্র. ১২ঃ ৯৯-১০০)। তখন ইউসুফ (আ) বলেন ঃ

يٰاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا ·

"হে আমার পিতা! ইহাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার প্রতিপালক উহাকে সত্যে পরিণত করিয়াছেন" (১২ঃ ১০০)

দ্বাদশ পুত্র হইতে দ্বাদশ গোত্র

হযরত ইয়াকূব (আ)-এর দ্বাদশ পুত্র হইতে আল্লাহ তা'আলা দ্বাদশ গোত্রের উন্মেষ ঘটান। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান ঃ

وَقَطَّعْنٰهُمُ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَمًا ·

"আমি তাহাদেরকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করিয়াছি" (৭ ঃ ১৬০; আরও দ্র. ৫ ঃ ১২; এবং ২ ঃ ৬০)।

পুত্রগণের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহার অবশিষ্ট ভ্রাতাগণ নবী ছিলেন কি না সেই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে তাহারা নবী ছিলেন না (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৯৮)। অবশ্য কতক তাফসীরকার নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাহারাও নবী ছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ ·

"এবং যাহা নাযিল হইয়াছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণের উপর" (২ঃ ১৩৬)।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ ـ

"বল, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে ...." (৩ঃ ৮৪)।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ ـ

"এবং আমি ওহী প্রেরণ করিয়াছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণের প্রতি" (৪ঃ ১৬৩)।

উক্ত আয়াতসমূহে উদ্ধৃত 'আসবাত' শব্দটির (এ.ব. সিব্ত) অর্থ বংশধরও হইতে পারে এবং ইয়াকূব (আ)-এর বারজন পুত্রও হইতে পারে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন জারীর তাবারী (র)-এর মতে আসবাত হইল ইয়াকূব (আ)-এর পুত্রগণ (তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, ৩ ঃ ৮৪, পৃ. ৫১; তাফসীরে তাবারী, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ৩৬৭)। তাবারী আরও বলেন, আসবাত দ্বারা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে যাহারা নবী ছিলেন তাহাদেরকে বুঝায় (পৃ. ৩৬৬)।

ইব্ন কাছীর (র) বলেন, 'আসবাত' শব্দটি তাহাদের নবুওয়াত লাভের শক্তিশালী দলীল হইতে পারে না। কেননা 'আসবাত' অর্থ শুউব বানী ইসরাঈল (ইসরাঈল-সন্তানগণের গোত্রসমূহ)। তাহাদের কাহারও প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যেভাবে ইউসুফ (আ) সম্পর্কে পাওয়া যায় (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৮-৯)।

সূরা ইউসুফের ঘটনাবলী হইতেও এই শেষোক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। পার্থিব স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া নবী-রাসূলগণের পরস্পরের মধ্যে কখনও সংঘাত বাঁধিবার কোন নযির ইসলামী ইতিহাসে বিদ্যমান নাই। অথচ ইউসুফ (আ)-এর সৎ ভ্রাতাগণ তারুণ্যে ও যৌবনে তাঁহাকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করিয়া সন্ধ্যায় পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বানোয়াট বিবৃতি প্রদান করেন (দ্র. ১২ ঃ ৮-১৮)। প্রাপ্ত বয়সে মিসরে ইউসুফ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতা বিন্‌য়ামীনের প্রতি চৌর্যবৃত্তির মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেন (দ্র. ১২ ঃ ৭৭) এবং ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষাত পরিচয় পাওয়ার পর তাহারা মিসর হইতে পিতার নিকট কানআনে ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাদেরকে ইউসুফ (আ)-এর ঘ্রাণ পাইতেছেন বলিয়া জানাইলে তাহারা সত্য ঘটনাকে অস্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে পিতাকে বিভ্রান্ত বলিয়া আখ্যায়িত করেন (দ্র. ১২ ঃ ৮৮-৯৫)। অথচ নবী-রাসূলগণ শিশুকাল হইতেই সরল-সহজ ও সৎ মানুষ হিসাবে বাড়িয়া উঠেন (এই সম্পর্কে তাফসীরে 'উসমানী, সৌদী সং, পৃ. ৩১২, টীকা ৩ দ্র.)। অবশ্য তাঁহার সৎ ভ্রাতাগণ আল্লাহর নিকট তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং পিতা ও ইউসুফ (আ)-ও তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন (দ্র. ১২ঃ ৯২ ও ৯৭-৮)।

হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নবুওয়াত লাভ

ইয়াকূব (আ) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার একজন সম্মানিত মহান পয়গাম্বর, তিনি বিশেভভাবে কান্‌আনবাসীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র দীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং এখানেই তিনি

জীবনের অধিকাংশ কাল দীন ইসলামের প্রচার করেন (কাসাসুল কুরআন, উর্দূ., ১খ., পৃ. ২৭৯)। মহান আল্লাহ তাঁহার নবুওয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ـ

"এবং আমি তাহাকে দান করিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নবী করিলাম" (১৯ ঃ ৪৯)।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ ـ

"আমি ওহী পাঠাইয়াছি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণের নিকট " (৪ঃ ১৬৩)।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ ـ

"বল, আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্তে এবং আমাদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে" (৩ঃ ৮৪; আরও দ্র. ২ঃ ১৩৬ ও ২১ঃ ৭২)।

নবী-রাসূলগণের প্রধান দায়িত্ব হইল মানবজাতির নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাহা কিভাবে কার্যকর করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দেওয়া। হযরত ইয়াকূব (আ) নবী হিসাবে নিশ্চয় এসব দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কিভাবে তাঁহার এলাকাবাসীর মধ্যে দীনের দাওয়াত পেশ করিয়াছেন এবং তাহা কতদূর ফলপ্রসূ হইয়াছে, ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে ইহার কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এতখানি জানা যায় যে, তাঁহার এলাকায় তখনও পৌত্তলিক কান্আন বংশীয়রা রাজত্ব করিত। তিনি সপরিবারে তাঁহার মাতুলালয় হইতে কান্আনে ফিরিয়া আসিবার পর তাহার কন্যাকে কান্আন বংশীয় এক রাজপুত্র অপহরণ করিয়াছিল। পরবর্তীতে ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানগণের হাতে উক্ত রাজবংশের পতন ঘটে (দ্র. আদিপুস্তক, ৩৪ঃ ১-৩১)। এই ঘটনার পর হইতে অত্র এলাকায় ইয়াকূব (আ)-এর দাওয়াতের বরকতে পৌত্তলিকতার অবসান ঘটিতে থাকে এবং জনগণ দীন ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকে। এক পর্যায়ে এই এলাকা মুসলিন সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ইয়াকূব (আ) এখানে আল্লাহর ঘর বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেন। বর্তমান কালে ইহা ইয়াহূদী-খৃস্টান-মুসলিম এই তিন জাতির পবিত্র স্থানরূপে স্বীকৃত।

ইহা ব্যতীত নিবন্ধের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার নবুওয়াতের বিষয় সংক্রান্ত আয়াতসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নবী জীবনের অধিকাংশ বিবরণ সূরা ইউসুফ-এ হযরত ইউসুফ (আ)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট।

হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মিসর গমন ও অন্তিম জীবন

হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁহার মাতৃভূমি মেসোপটামিয়া হইতে সপরিবারে প্রত্যাবর্তনের পর জন্মভূমি কান্আনেই (ফিলিস্তীন) বসবাস করিতে থাকেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে খৃ. পূ. ১৭০৬ অব্দে

(বাইবেল ডিকশনারী, পৃ. ২৩), পুত্র ইউসুফ (আ)-এর আবেদনক্রমে ৭০ সদস্যবিশিষ্ট (Americana, ১৫/৬৫) পরিবার-পরিজনসহ তিনি মিসরে গমন করেন (আহ্‌লে কিতাব মতে), ভিন্নমতে ৭৩, অপর মতে ৮৩, আরেক মতে ৩৯০ জন (বিদায়া, ১খ., পৃ. ২১৮)। ৮০ বৎসর পর, হাসান বসরীর (র) মতে ৮৩ বৎসর, কাতাদার (র) মতে ৩৫ বৎসর, ইব্‌ন ইসহাকের (র) মতে ১৮ বৎসর এবং আহ্‌লে কিতাবমতে ৪০ বৎসর পর পিতা-পুত্রের পুনর্মিলন হয় (বিদায়া, ১খ., পৃ. ২১৭)।

ইব্‌ন ইসহাক আহ্‌লে কিতাবের বরাতে বলেন, হযরত ইয়াকূব (আ) মিসরে আগমনের পর এখানে ১৭ বৎসর জীবিত ছিলেন (বিদায়া, ১খ., পৃ. ২২০; আদিপুস্তক, ৪৭ ঃ ২৮)। কিন্তু Collier's Enyclopedia-তে সাত বৎসর উল্লেখ করা হইয়াছে (১৩ খ., পৃ. ৪২৭)। এই সময়কালে পিতা-পুত্র মিসরে ব্যাপক ভিত্তিতে ইসলাম প্রচার করেন। ফলে গরিষ্ঠ সখ্যক মিসরবাসী দীনে হানীফের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বস্তুত নবী-রাসূলগণের প্রধান কাজই হইল মানবজাতির নিকট আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত পৌঁছানো। তাই তাঁহারা সর্বাবস্থায় দীনের দাওয়াত দিয়াছেন, এমনকি হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে তো কুরআন মজীদেই বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞার সহিত যুক্তি সহকারে জেলখানায় বন্দী অবস্থায়ও তাঁহার সহ-কয়েদীদের মধ্যে দীনের প্রচারকার্য অব্যাহত রাখেন (দ্র. ১২ ঃ ৩৭-৪০)।

ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন, আহলে কিতাবমতে মিসরে গমনকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ১৩০ বৎসর (বিদায়া, ১খ., পৃ. ২২০), কিন্তু তিনি তাঁহার বয়স মোট ১৪০ বৎসর উল্লেখ করিয়াছেন (পৃ. ২২০)। অথচ বাইবেলে তাঁহার মোট বয়স ১৪৭ বৎসর বর্ণিত হইয়াছে (আদিপুস্তক, ৪৭ঃ ২৮; Collier's Ency., ১৩ খ, পৃ. ৪২৭; Americana, ১৫খ, পৃ. ৬৫৫; Ency. Relig., ৭খ, পৃ. ৫০৩)। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ইউসুফ (আ)-কে ওসিয়াত করিয়া যান যে, তাঁহার লাশ যেন তাঁহার পিতৃপুরুষ ইসহাক ও ইবরাহীম (আ)-এর কবরস্থানে দাফন করা হয় এবং তাঁহার ওসিয়াত প্রতিপালিত হয় (বিদায়া, ১খ., পৃ. ২২০; আদিপুস্তক, ৪৯ ঃ ৩০-৩৩; আরও দ্র. Collier's Ency., ১৩খ, পৃ. ৪২৭; Ency. Relig., ৭খ., পৃ. ৫০৪; Americana, ১৫খ, পৃ. ৬৫৫)। ইউসুফ (আ)-ই তাঁহার পিতার লাশ কানআনে বহন করিয়া আনেন এবং হেবরনে (বর্তমান আল-খলীল) দাফন করেন (বিদায়া, ১খ., পৃ. ২২০)। মিসরবাসী তাঁহার জন্য ৭০ দিন শোক পালন করে (ঐ, পৃ. ২২০; আদিপুস্তক, ৫০ ঃ ৩)।

অন্তিম উপদেশ

হযরত ইয়াকূব (আ) যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অন্তিম মুহূর্ত নিকটবর্তী, তিনি তাঁহার সন্তানদেরকে ডাকিয়া সেই উপদেশ দান করিলেন যাহা তাঁহার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার পুত্রগণকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ এই ছিল যে, "আল্লাহ এক, তাঁহার কোনও শরীক নাই"। এই মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দীন ইসলামকে আমৃত্যু আকড়াইয়া ধরিতে হইবে। কুরআন মজীদে বিষয়টি এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَوَصّٰى بِهَا اِبْرَاهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ . يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ .

"এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এই সম্বন্ধে তাহাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়া বলিয়াছিল, হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এই দীনকে মনোনীত করিয়াছেন। অতএব তোমরা আমৃত্যু মুসলমান থাকিবে। ইয়াকূবের নিকট যখন মৃত্যু আসিল তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? সে যখন তাহার পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করিবে, তখন তাহারা বলিল, আমরা আপনার ইলাহ্-এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ-এর ইবাদত করিব। তিনিই একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী" (২ ঃ ১৩২-৩)।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে "আল্লাহ্ এক এবং তাঁহার কোনও শরীক নাই", এই দাওয়াত দিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, ইহাই ইবরাহীম (আ)-এর একনিষ্ঠ ধর্ম (দীনে হানীফ), তখন ইয়াহূদী ও খৃস্টানরা দাবি করিল যে, তাহারাই তো ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসারী। শুধু তাহাই নহে, ইয়াহূদী-খৃস্টানরা তো মুসলমানদেরকে নূতন ধর্ম ত্যাগ করিয়া তাহাদের নিজ নিজ ধর্মের অনুসরণ করিতে বলিতে লাগিল এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব (আ) ও তাঁহার বংশধরগণ ইয়াহূদী-খৃস্টান ছিল বলিয়া দাবি করে। মহান আল্লাহ্র ভাষায় ঃ

اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْنَصٰرٰى قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ .

"তোমরা কি বল, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণ ইয়াহূদী কিংবা খৃস্টান ছিল? তুমি বল, তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ" (২ ঃ ১৪০)?

পূর্বোক্ত আয়াত নাযিল পূর্বক ইয়াহূদী-খৃস্টানদের উপরিউক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করিয়া আসল সত্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে। আয়াতে প্রদত্ত প্রশ্নাকারে প্রতিবাদের তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য দুইটি বিষয় বিবেচনায় রাখিতে হইবে। (এক) ইয়াহূদী ও খৃস্টান ধর্মের বর্তমান যে কাঠামো তাহা পরবর্তী কালের সৃষ্টি। ইয়াহূদী ধর্মের নামকরণ, উহার ধর্মীয় বিশেষত্ব, অনুষ্ঠানমালা ও নিয়ম-কানুন খৃস্টপূর্ব ৩য়-৪র্থ শতাব্দীতে রূপ লাভ করিয়াছে। অনুরূপভাবে যেসব ধারণা-বিশ্বাস ও বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সমষ্টিকে খৃস্টবাদ বলা হয় তাহা হযরত ঈসা (আ)-এর বহু পরবর্তী কালে উদ্ভাবিত হইয়াছে। সুতরাং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁহার বংশধরের ইয়াহূদী বা খৃস্টান হওয়ার দাবি অসার কল্পনামাত্র। (দুই) স্বয়ং ইয়াহূদী-খৃস্টানদের নিজস্ব ধর্মীয় গ্রন্থাবলী হইতেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-সহ উক্ত নবীগণ এক আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর ইবাদত, উপাসনা, আনুগত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে কাহাকেও অংশীদার করিতেন না। অতএব এই কথা সুস্পষ্ট যে, ইয়াহূদীবাদ ও খৃস্টবাদ উভয়ই পূর্বোক্ত নবীগণের আচরিত চিরসত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে (তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারার ১৩৫ নং আয়াতের ১৩৫ নং টীকা)।

বাইবেলে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মৃত্যুকালীন অবস্থা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত থাকিলেও তাহাতে কুরআন মজীদে উক্ত এই মূল্যবান অন্তিম উপদেশের কোনও উল্লেখ নাই। অবশ্য

ইয়াহূদীদের তালমূদ গ্রন্থে যে দীর্ঘ উপদেশমালা বর্ণিত আছে, কুরআনের উপদেশের সহিত উহার যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে। তাহাতে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর এই কথাগুলি পাওয়া যায় ঃ "তোমরা সদাপ্রভু আল্লাহ্র ইবাদত করিতে থাকিবে। তিনি তোমাদেরকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, যেমন করিয়াছেন তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে। নিজ সন্তানদেরকে সদাপ্রভুকে ভালোবাসিতে এবং তাঁহার নির্দেশ মান্য করিয়া চলিতে শিক্ষা দিবে, যাহাতে তাহাদের জীবনের অবকাশ দীর্ঘতর হয়। কেননা যাহারা সত্যের সহিত সকল কাজ সম্পন্ন করে এবং সত্যের পথে ঠিকভাবে চলে, আল্লাহ তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন"। উত্তরে সেই সন্তানগণ বলিল, "আপনি যেই উপদেশ দিলেন তাহা আমরা মান্য করিব, আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন।" তখন ইয়াকূব (আ) বলিলেন, "তোমরা যদি সদাপ্রভুর সহজ সরল পথ হইতে ডানে-বায়ে ভ্রষ্ট হইয়া না যাও, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সহায় হইবেন" (তাফহীমুল কুরআন, ২ঃ ১৩৩ আয়াতের ১৩৩ নং টীকা)।

বায়তুল মাকদিস নির্মাণ

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের বরাতে লিখিয়াছেন যে, হযরত ইয়াকূব (আ) সর্বপ্রথম বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করেন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৫৭৩)। বাইবেলের আদিপুস্তকে উল্লিখিত আছে ঃ "পরে যাকোব প্রত্যূষে উঠিয়া বালিশের নিমিত্ত যে প্রস্তর রাখিয়াছিলেন, তাহা লইয়া স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়া তাহার উপর তৈল ঢালিয়া দিলেন। আর সেই স্থানের নাম বৈথেল (বায়ত ঈল=আল্লাহ্র ঘর) রাখিলেন ---- এবং এই যে প্রস্তর আমি স্তম্ভরূপে স্থাপন করিয়াছি, ইহা আল্লাহ্র ঘর হইবে" (২৮ঃ ১৮-২২)।

অতএব হযরত ইয়াকূব (আ)-ই বায়তুল মাকদিস-এর প্রথম নির্মাতা, অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) ইহা পুনর্নির্মাণ করেন (বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ১৯4 ও ১৯৬; আল-মাআরিফ, পৃ. ২৩)।

হযরত আবু যার আল-গিফারী (রা) বলেন, আমি বলিলাম,

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِى الْاَرْضِ اَوَّلُ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَلْتُ ثُمَّ اَىٌّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قَالَ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ سَنَةً ٠

"হে আল্লাহ্র রাসূল! পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মিত হয়? তিনি বলেন ঃ মসজিদুল হারাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ মসজিদুল আকসা (বায়তুল মাকদিস)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মসজিদ নির্মাণের মধ্যকার (কালের) ব্যবধান কত ছিল? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ বৎসর" (বুখারী, আম্বিয়া, বাব ১০, নং ৩১১৬; বাব ৪০, নং ৩১৭৩; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ১০৪২-৩; নাসাঈ, মাসাজিদ, বাব আয়্যু মাসজিদ উদিআ আওয়ালান; ইব্ন মাজা, মাসাজিদ, বাব ৭, নং ৭৫৩)।

বাইবেলের বিবরণ ও উক্ত হাদীছের বিষয়বস্তু হইতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কাবা ঘর নির্মিত হওয়ার চল্লিশ বৎসর পর তাঁহার পৌত্র হযরত ইয়াকূব (আ) বায়তুল

মাকদিস নির্মাণ করেন। উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে ইব্ন হিব্বান মত প্রকাশ করেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের মধ্যে মাত্র চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান ছিল। তিনি ধারণা করেন যে, হযরত সুলায়মান (আ)-ই বায়তুল মাকদিসের নির্মাতা। তাঁহার এই ধারণা যথার্থ নহে। বস্তুত হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগ ও হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগের মধ্যে পার্থক্য হাজার বৎসরের অধিক। সুলায়মান (আ) উহা পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন মাত্র (তাফসীর ইব্ন কাছীর, বাংলা অনু, ১খ, পৃ. ৫৭৪)।

উটের গোশত ভক্ষণ সংক্রান্ত বিবরণ

হযরত ইয়াকূব (আ) রুচিগত কারণে অথবা অজ্ঞাত কোন ব্যাধির কারণে (কোনও কোনও ভাষ্যকার ও ঐতিহাসিক সাইটিকা নামক বাতরোগের কথাও বলিয়াছেন) উটের গোশত ভক্ষণ করিতেন না এবং উহার দুধ পান করিতেন না। তিনি ইহা ব্যক্তিগতভাবে নিজের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে ইসরাঈলীরা উটের গোশত ও দুগ্ধ নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া লয়। বিষয়টি সম্পর্কে কুরআন মজীদে এইভাবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ঃ

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اِلاَّ مَا حَرَّمَ اِسْرَاءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰةُ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰةِ فَاتْلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ. قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

"তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্য যাহা হারাম করিয়াছিল তাহা ব্যতীত বনূ ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। তুমি বল, তোমরা সত্যবাদী হইয়া থাকিলে তাওরাত আন এবং তাহা পাঠ কর। ইহার পরও যাহারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাহারাই যালিম। তুমি বল, আল্লাহ সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ হইয়া ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহে" (৩ঃ ৯৩-৯৫)।

দীন ইসলামের মূল ভিত্তি যেসব জিনিসের উপর স্থাপিত, সেই বিবেচনায় পূর্ববর্তী নবীগণের শিক্ষা ও মহানবী (স)-এর শিক্ষার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন পার্থক্য নাই। কুরআন মজীদ ও মহানবী (স)-এর আদর্শ ও শিক্ষ সম্পর্কে ইয়াহূদী আলিমগণ যখন নীতিগত কোনও আপত্তি উত্থাপনের সুযোগ পাইল না, তখন তাহারা কতিপয় শরীআতী আইনগত আপত্তি উত্থাপন করিতে থাকে। এই প্রসঙ্গে তাহারা প্রশ্ন তুলিল যে, এমন অনেক জিনিসকে হযরত মুহাম্মাদ (স) হালাল ঘোষণা করিয়াছেন, যাহা পূর্বকালের নবীগণের শরীআতে সম্পূর্ণ হারাম ছিল, ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? এখানে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলা হইয়াছে যে, আহারের জন্য ইসলামী শরীআতে যে সমস্ত জিনিস হালাল তাহা বনূ ইসরাঈলের জন্যও হালাল ছিল। অবশ্য কোনও জিনিস এমনও ছিল যাহা তাওরাত কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে বনূ ইসরাঈল স্ব-উদ্যোগে নিজেদের জন্য হারাম ঘোষণা করিয়াছিল। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে এই প্রসঙ্গে ইহা বলিতে নির্দেশ দিলেন ঃ "তোমরা তাওরাত আন এবং উহা পাঠ কর" (৩ ঃ ৯৩)। কিন্তু তাহারা সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে দুঃসাহস

দেখায় নাই। মূলত উটের গোশত ও দুধ তাওরাতে ইয়াহূদীদের জন্য হারাম ঘোষণা করা হয় নাই, হইয়া থাকিলে প্রসঙ্গক্রমে কুরআন মজীদের এই স্থানে তাহার উল্লেখ থাকিত। খাদ্যের মধ্যে কোন্ কোন্ বস্তু তাহাদের জন্য হারাম ছিল কুরআন মজীদে তাহার উল্লেখ আছে এবং তাহাও তাহাদের অবাধ্যাচরণের কারণে শাস্তিস্বরূপ হারাম করা হইয়াছিল। যেমন ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۔ وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۔

"উত্তম জিনিসসমূহ যাহা ইয়াহূদীদের জন্য হালাল ছিল, তাহাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে আমি তাহা তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছি, আল্লাহ্র পথে অনেক লোককে বাধা প্রদানের জন্য, তাহাদের সূদ গ্রহণের জন্য, যাহা তাহাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল এবং অন্যায়ভাবে জনগণের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য" (৪ঃ ১৬০-১৬১)।

وَعَلَي الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ وَّمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَا اِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَا اَوِ الْحَوَايَا اَوْمَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۔

"আমি ইয়াহূদীদের জন্য নখরযুক্ত সমস্ত পশু হারাম করিয়াছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাহাদের জন্য হারাম করিয়াছিলাম, তবে এইগুলির পৃষ্ঠের অথবা অন্ত্রের কিংবা অস্থিসংলগ্ন চর্বি ব্যতীত, তাহাদের অবাধ্যতার দরুন তাহাদেরকে এই প্রতিফল দিয়াছিলাম। নিশ্চয় আমি সত্যবাদী" (৬ ঃ ১৪৬)।

উক্ত আয়াতসমূহ হইতে পরিষ্কার প্রতিভাত হয় যে, ইয়াহূদীদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জন্য এই বিধান দেন। অনন্তর তাহাদের জন্য উটের গোশত ও দুধ হারাম করা হইলে তাহা অবশ্যই উক্ত আয়াতসমূহে উদ্ধৃত হইত। তাহা ছাড়া তাওরাতে উক্ত বিধান বিদ্যমান থাকিলে ৩ ঃ ৯৩ আয়াতের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া তাহারা মহানবী (স)-এর সামনে তাওরাত কিতাব আনিয়া হাযির করিয়া দেখাইয়া দিত, কিন্তু তাহারা তাহা করিতে অপারগ ছিল। বাইবেলে যে উট ও খরগোশের গোশত হারাম (বাইবেলের লেবীয় পুস্তক, ১১ ঃ ৪-৬; দ্বিতীয় বিবরণ, ১৪ ঃ ৭) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে তাহা পরবর্তী কালের সংযোজন হইতে পারে (তাফহীমুল কুরআন, ৩ ঃ ৯৩-৯৫ আয়াতের ৭৬, ৭৭ ও ৭৮ নং টীকা এবং ৬ ঃ ১৪৬ নং আয়াতের ১২২ নং টীকা; শায়খুল হিন্দের তরজমায় শাববীর আহমাদ উছমানীর টীকাভাষ্য, ৩ ঃ ৯৩ আয়াতের ২ ও ৩ নং টীকা, পৃ. ৭৯; ৬ঃ ১৪৬ আয়াত সংশ্লিষ্ট ২ নং টীকা, পৃ. ১৯৬)।

ইয়াহূদীদের দ্বিতীয় আপত্তি এই ছিল যে, তোমরা মুসলমানগণ বায়তুল মাকদিসকে ত্যাগ করিয়া কা'বা ঘরকে কেন কিবলা বানাইয়াছ, অথচ পূর্বকালের নবী-রাসূলগণের কিবলা তো ছিল এই বায়তুল মাকদিস? তাহা হইলে তোমরা কিভাবে মিল্লাতে ইবরাহীমীর অনুসারী হওয়ার দাবি করিতে পার? ইহার উত্তর সূরা আল-বাকারায় (২ঃ ১৪২-৪৫) দেওয়া ছাড়াও উহার উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াত (৩ঃ ৯৬) অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ـ

"নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায় (মক্কায়), উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। উহাতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। যেমন মাকামে ইবরাহীম।"

অতএব কা'বা ঘর তো হযরত মূসা (আ)-এর আট-নয় শত বৎসর পূর্বে তোমাদের ইসরাঈলীদের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীপতি হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করিয়াছেন এবং ইহাকে কিবলা বানাইয়াছেন। সুতরাং কা'বা ঘরের সর্বাগ্রগণ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অথচ বায়তুল মাকদিস পূর্ণাঙ্গ ইবাদতখানা হিসাবে নির্মিত হইয়াছে হযরত মূসা (আ)-এর চার শত বৎসর পর (তাফহীমুল কুরআন, ৩ ঃ ৯৬ আয়াত সংশ্লিষ্ট ৭৯ নং টীকা অবলম্বনে)।

ইয়াকূব (আ)-এর চারিত্রিক গুণাবলী

নবী-রাসূলগণ হইলেন মানবজাতির মধ্যে আদর্শ মানব। সরাসরি আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের জীবন সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়। সততা, নিষ্ঠা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধৈর্য, সৎকর্মশীলতা, তাওয়াক্কুল সার্বিক দিক হইতে তাঁহারা মানবজাতির অনুসরণীয় আদর্শ। নবী হিসাবে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বাইবেল যেখানে নবী-রাসূলগণের মহত গুণাবলীর যৎসামান্য বর্ণনা করার পাশাপাশি তাঁহাদের উপর এমন কালিমা লেপন করিয়াছে যে, তাঁহাদের মহৎ গুণাবলী ম্লান হইয়া গিহয়াছে, কুরআন মজীদ সেখানে তাঁহাদের মহৎ গুণাবলী তুলিয়া ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রতি আরোপিত অপবাদসমূহ জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কুরআন মজীদ হযরত ইসহাক (আ) ও ইয়াকূব (আ)-সহ বেশ কয়েকজন নবীর উল্লেখ পূর্বক বলিয়াছে ঃ كُلًّا هَدَيْنَا "ইহাদের প্রত্যেককে আমি সৎপথে পরিচালিত করিয়াছি" (৬ঃ ৮৪); كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ "ইহাদের প্রত্যেকেই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত" (৬ ঃ ৮৫), كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ "ইহাদের প্রত্যেককে আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি" (৬ঃ ৮৬)।

وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ

"আমি তাহাদেরকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম" (৬ ঃ ৮৭)।

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ـ

"আমি তাহাদেরকে কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করিয়াছি" (৬ঃ ৮৯)।

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ ـ

"ইহাদেরকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। সুতরাং তুমি (মুহাম্মাদ) তাহাদের পথের অনুসরণ কর" (৬ ঃ ৯০)।

ইয়াকূব (আ)-এর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য দেন ঃ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ "এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল, কারণ আমি তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলাম" (১২ ঃ ৬৮)।

তাঁহার ধৈর্য সম্পর্কে দুই স্থানে বলা হইয়াছে ঃ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ 'পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়' (১২ঃ ১৮ ও ৮৩)।

অর্থাৎ প্রাণপ্রিয় পুত্র ইউসুফ (আ)-এর নিখোঁজ সংবাদ শ্রবণ করিয়া এবং মিসর সম্রাটের হাতে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামীন চুরির দায়ে গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ শুনিয়া হযরত ইয়াকূব (আ) এই কথা বলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো বলেন ঃ

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ٠

"তোমরা যাহা বলিতেছ সেই বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ আমার সাহায্যস্থল" (১২ঃ ১৮)। আল্লাহ্র কাছেই তিনি সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। মহানবী (স) ইহাই আমাদেরকে শিক্ষা দিয়াছেন ঃ

وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ ٠

"তোমার সাহায্য চাওয়ার প্রয়োজন হইলে আল্লাহ্র নিকটই সাহায্য প্রার্থনা কর" (তিরমিযী, বাংলা অনু., ৪খ, পৃ. ৩১৩, বাব ৫৯, নং ২৪৫৬, কিয়ামত অধ্যায়)।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর অনুরোধে ইউসুফ (আ)-এর সহোদর বিনয়ামীনকে ইয়াকূব-পুত্রগণ তাহাদের সঙ্গে মিসরে লইয়া যাইতে চাহিলে তাহাদের পক্ষ হইতে পিতাকে বিনয়ামীনের পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় (১২ ঃ ৬৩)। তখন তিনি নবীসুলভ কণ্ঠে বলিয়া উঠেন ঃ

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ٠

"আল্লাহ-ই সর্বোত্তম নিরাপত্তাবিধায়ক এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু" (১২ঃ ৬৪)।

পুত্রের নিরাপত্তার জন্য পার্থিব নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য পুত্রগণের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের এবং তাহাদের মিসরে প্রবেশের প্রয়োজনীয় পরার্মশ প্রদানের (১২ঃ ৬৬-৭) পর আল্লাহ্র মহা ক্ষমতার ও ভরসাস্থল হওয়ার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন ঃ

وَمَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ٠

"আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করিতে অক্ষম। বিধান আল্লাহ্রই। আমি তাঁহারই উপর ভরসা করি এবং যাহারা ভরসা করিতে চাহে তাহারা যেন আল্লাহ্র উপরই ভরসা করে" (১২ঃ ৬৭)।

ইউসুফ (আ)-এর নিখোঁজ হওয়ার দীর্ঘ বিচ্ছেদ বেদনায় হযরত ইয়াকূব (আ)-এর হৃদয় ছিল দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাঁহার জন্য সৃষ্টিগত স্বভাবসুলভ শোকে তাঁহার দৃষ্টিশক্তিও লোপ পাইয়াছিল (১২ঃ ৮৪)। তাঁহার দশ পুত্র এই অবস্থা দেখিয়া বলিল, ইউসুফের জন্য এইভাবে সদাসর্বদা মনস্তাপ করিতে থাকিলে হয় আপনার স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে অথবা আপনি মারা যাইবেন। ইয়াকূব (আ) উত্তরে বলেন ঃ

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ ٠

"সে বলিল, আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ কেবল আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি আল্লাহ্র নিকট হইতে জ্ঞাত আছি যাহা তোমরা জ্ঞাত নও" (১২ঃ ৮৬)।

হযরত ইয়াকূব (আ)-এর এইরূপ অসহনীয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ওহীর মাধ্যমে শেষ পর্যায়ে জানাইয়া দিলেন যে, ইউসুফ (আ) জীবিত আছেন এবং মহাসম্মানে ও প্রতিপত্তির সহিত মিসরে শাসনকার্য করিতেছেন। উক্ত আয়াতের শেষাংশে সেই জ্ঞানের কথাই বলা হইয়াছে। বাইবেলীয় পণ্ডিতগণের মতে পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদকাল ছিল বাইশ বৎসর (খৃ. পূ. ১৭২৮-১৭০৬ সাল; বাইবেল ডিকশনারী, পৃ. ২৩) এবং কোনও কোনও তাফসীরকারের মতে চল্লিশ বৎসর (বিস্তারিত দ্র. ইউসুফ শীর্ষক নিবন্ধ)। দুঃখ ও মনস্তাপ সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ধারণ করিলেন এবং সন্তানদেরকে আশার বাণী শুনাইলেন ঃ

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلاَ تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لاَ يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ.

"হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাহার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্র দয়া হইতে তোমরা নিরাশ হইও না। কারণ আল্লাহ্র দয়া হইতে কেবল কাফেররাই নিরাশ হয়" (১২ঃ ৮৭)।

সংবাদবাহক আসিয়া যখন ইউসুফ (আ)-এর খবর জানাইল এবং ইউসুফ (আ)-এর জামা তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে রাখিতেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইলেন, তখন দশ পুত্র আসিয়া পিতার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইল। তিনি বলিলেন ঃ

سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

"আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তিনি তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়" (১২ঃ ৯৮)।

নবী-রাসূলগণ হইলেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের মূর্ত প্রতীক। তাঁহারা আল্লাহ্র বিধানের সীমালংঘনের অপরাধ ব্যতীত ব্যক্তিগত কারণে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, বরং অপরাধীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনাই করেন। রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনও ব্যক্তিগত কারণে কাহারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই।

وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ اِلاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"রাসূলল্লাহ (স) ব্যক্তিগত কারণে কখনও প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই, তবে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিলে শাস্তি দান করিতেন" (বুখারী, বাংলা অনু., মানাকিব, বাব ২৪, নং ৩২৯৬, ৩খ., পৃ. ৪৬৩; আদাব, বাব ৮০, নং ৫৬৮৬, ৫খ, পৃ. ৪৯৩; হুদূদ, বাব ১০, নং ৬৩১৭, ৬খ, পৃ. ১৭৬; মুসলিম, বাংলা অনু., ফাদাইল, বাব ৩৩৪, নং ৫৮৩৮, ৭খ, পৃ. ৩৩০; নং ৫৮৪২, পৃ. ৩৩১, বাব ৩৩৫; আবূ দাউদ; আদাব, বাব ৪, আল-আফবু; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জামে, বাব হুসনিল খুলুক)।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ত্যাগ-তিতীক্ষা, হিজরত, কঠিন পরীক্ষায় সাফল্য লাভ ইত্যাদি কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সহিত তাঁহার পুত্রগণ ও পৌত্র ইয়াকূব (আ)-কে উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং অনুগ্রহ ধন্য করেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا .

"এবং আমি তাহাদেরকে দান করিলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাহাদের সুনাম-সুখ্যাতি সমুচ্চ করিলাম" (১৯ঃ ৫০)।

মাওলানা শাববীর আহ্মাদ উছমানী (র) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহের এক বিরাট অংশ তাঁহাদের দান করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে তাঁহাদের স্মরণ অব্যাহত রাখিয়াছেন। ফলে সকল ধর্মের অনুসারীরা তাঁহাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাঁহাদের গুণগান করে। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত স্থায়ীভাবে তাহাদের নামাযে দুরূদ শরীফের মাধ্যমে তাঁহাদেরকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করেন। বস্তুত ইহা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সেই দো'আ কবুল হওয়ার ফল ঃ

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ .

"আমাকে তুমি পরবর্তীদের মধ্যে যশস্বী কর" (২৬ঃ ৮৪; শায়খুল হিন্দের তরজমা, উক্ত আয়াতের ২নং টীকা, পৃ. ৪১২, সৌদী সংস্করণ)।

আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূব (আ)-কে তাঁহার পিতা ও প্রপিতার সঙ্গে নানামুখী অনুগ্রহে ধন্য করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদেরকে সৎকর্মপরায়ণ, মানবজাতির নেতা, পথপ্রদর্শক ও ইবাদতপ্রিয় বান্দা হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ . وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءَ الزَّكٰوةِ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ .

"এবং আমি ইবরাহীমকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকূব; আর প্রত্যেককেই করিয়াছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। আমি তাহাদেরকে করিয়াছিলাম নেতা। তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করিত। আমি তাহাদের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম সৎকর্ম করিতে, নামায কায়েম করিতে এবং যাকাত প্রদান করিতে। তাহারা আমারই ইবাদতকারী ছিল" (২১ঃ ৭২-৩)।

প্রপিতামহ, পিতামহ ও পুত্রের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আরো কতক অনুগ্রহের বর্ণনা এভাবে প্রদত্ত হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ . اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ .

"স্মরণ কর আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, তাহারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাহাদেরকে অধিকারী করিয়াছিলাম এক বিশেষ গুণের, তাহা ছিল পরকালের স্মরণ। অবশ্যই তাহারা ছিল আমার মনোনীত উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত" (৩৮ঃ ৪৫-৭)।

"শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী" বলার তাৎপর্য এই যে, পিতা-পুত্র-পৌত্র তিন পয়গাম্বর বড়ই সৎকর্মশীল ছিলেন। আল্লাহ্র আনুগত্যে অবিচল থাকা এবং বিপদ-মুসীবতে দৃঢ়পদ থাকার বিরাট

শক্তি তাঁহাদেরকে দান করা হইয়াছিল। আল্লাহ্‌র দীন প্রচারে তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অন্তর-দৃষ্টি ও বিবেক-বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাই তাঁহারা ছিলেন সত্যদর্শী। "পরকালের স্মরণ" বলিতে তাঁহারা নিজেরাও আখিরাতের জিন্দেগীর কথা স্মরণ করিতেন এবং অন্যদেরকেও স্মরণ করাইয়া দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে পার্থিব মোহ ও লোভ-লালসার নাম-গন্ধও ছিল না। তাঁহাদের সব চিন্তা-ভাবনা ও চেষ্টা-সাধনা ছিল আখিরাতমুখী (তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাদ-এর ৪৮-৪৯ নং টীকা অবলম্বনে; আল-জামি লি-আহ্‌কামিল কুরআন, ১৫ খ., পৃ. ২১৭-১৮; তাফসীরে কবীর, ২৬ খ., পৃ. ২১৬-১৭; তাফসীরে তাবারী, ১০ম বালাম, ২৩ খ, পৃ. ১০৯-১০; তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর (সংক্ষিপ্ত), ৩খ, পৃ. ২০৬-এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার বিস্তারিত রূপ)।

বনী ইসরাঈলের পরিচয়

হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বংশধরগণ বনূ ইসরাঈল নামে পরিচিত। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর অপর নাম ইসরাঈল। ইসর (اسر) অর্থ বান্দা (عبد) এবং (ايل) অর্থ আল্লাহ্, অতএব "ইসরাঈল শব্দের অর্থ "আল্লাহ্‌র বান্দা" (তাফসীরে তাবারী, বাংলা অনু, ১খ, পৃ. ৩৭০; তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৩০১; মাআরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত সং, পৃ. ৩৪; শায়খুল হিন্দের তরজমা, উছমানীর টীকাভাষ্য, টীকা নং ৫, পৃ. ৯; তাফহীমুল কুরআন, ২ ঃ ৪০ আয়াতের ৫৬ নং টীকা)।

কুরআন মজীদের এক আয়াতে বলা হইয়াছে, "তাহারা ছিল আমারই ইবাদতকারী" (২১ঃ ৭৩), এই কারণেও তাঁহার উক্ত নামকরণ হইতে পারে। ইবনুল আছীর বলিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক নিহত হওয়ার ভয়ে তিনি রাত্রে বাড়ি হইতে পলায়ন করিয়া মামার বাড়ি যান। পথিমধ্যে তিনি রাত্রে ভ্রমণ করিতেন এবং দিনের বেলা নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম করিতেন। এই রাত্রি ভ্রমণের জন্য তাঁহার উক্ত নামকরণ হয় (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৯৬)। কুরআন মজীদে ইদাফাত ছাড়া একবার মাত্র এই নামের উল্লেখ আছে (দ্র. ৩ ঃ ৯৩)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইসরাঈল অর্থ আল্লাহ্‌র বান্দা (তাবারী, ১খ, পৃ. ৩৭০)। একটি হাদীছ হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। একদল ইয়াহূদী নবী করীম (স)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইয়াকূব (আ)-ই যে ইসরাঈল তাহা কি তোমরা জান? তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা তাহা জানি। নবী (স) বলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন (আবূ দাউদ তায়ালিসীর বরাতে তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, বাংলা অনু, ১খ., পৃ. ৩০১)। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর বলেন, একদা মানুষের বেশে একজন ফেরেশতা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হন। ফেরেশতা পরাজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, আপনার নাম কি? তিনি বলেন, ইয়াকূব। ফেরেশতা বলেন, এখন হইতে আপনার নাম "ইসরাঈল"। ইয়াকূব (আ) তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অদৃশ্য হইয়া যান। তখন তিনি বুঝিতে পারেন যে, ইনি আল্লাহ্‌র ফেরেশতা (বিদায়া, ১খ., পৃ. ১৯৬)। ইহা বাইবেলের বিকৃত ঘটনার মার্জিত রূপ বলিয়া মনে হয়। কারণ বাইবেলের হাস্যাস্পদ বিবরণ অনুযায়ী 'ইসরাঈল' অর্থ "আল্লাহ্‌র সহিত যুদ্ধকারী" এবং তাহাতে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত আছে (দ্র. আদিপুস্তক, ৩২ঃ ২৪-৩০)। অতএব 'বনূ ইসরাঈল' অর্থ ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর।

কুরআন মজীদে ১৬টি সূরায় মোট ৪০ বার 'বনী ইসরাঈল' যৌগিক শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে। চার স্থানে ইয়া বানী ইসরাঈল (হে বনূ ইসরাঈল) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং একটি সূরার নামকরণ করা হইয়াছে 'সূরা বনী ইসরাঈল'। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বারো পুত্র হইতে উদ্ভূত বারোটি গোত্রের সমষ্টিই একসঙ্গে বনূ ইসরাঈল নামে অভিহিত। কুরআন মজীদে যত গোত্র ও সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা আসিয়াছে, তন্মধ্যে বনূ ইসরাঈলের আলোচনা সর্বাধিক। অবশ্য এইসব আলোচনায় তাহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বিবৃত করা হয় নাই, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে যেসব অবিস্মরণীয় সুযোগ-সুবিধা দান করিয়াছেন, তাহাদের আল্লাহ্র দীনের ধারক-বাহক ও প্রচারক হিসাবে যে দায়িত্ব প্রদান করিয়াছেন, সেই দায়িত্ব পালনে তাহারা যে অনীহার পরিচয় দিয়াছে, আল্লাহ্র বিধান বেপরোয়াভাবে লংঘন করিয়াছে, এমনকি নবী-রাসূলগণকে হত্যা পর্যন্ত করিয়াছে, এক পর্যায়ে শিরকে লিপ্ত হইয়াছে, এইসব বিষয়ের আলোচনা আসিয়াছে। তাহাদেরকে এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, মুহাম্মাদ (স) যে দীনসহ প্রেরিত হইয়াছেন তাহা পূর্বকালের নবীগণেরই দীন। অতএব তাহাদেরই সর্বাগ্রে এই দীন গ্রহণ করা উচিৎ।

ইয়াকূব (আ)-এর দ্বাদশ পুত্র হইতে উদ্ভূত দ্বাদশ গোষ্ঠী হইল ঃ রূবেন, শিমিয়ন, লেবী, যিহূদা, দাম, নপ্তালী, গাদ, আশোর, ইযাখর, সবূলূন, ইউসুফ (যোসেফ) ও বিন্যামিন-এর বংশধর। হযরত মূসা (আ)-এর যুগে তাঁহার নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ করিয়া সিনাই উপদ্বীপে পৌঁছার পর তাহাদের আদমশুমারি করা হয়। ইহাতে লেবীর বংশের জনগোষ্ঠী ব্যতীত তাহাদের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৬,০৩,৫৫০ জন যুদ্ধে গমনযোগ্য পুরুষ; নারী ও শিশুদের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় নাই (দ্র. বাইবেলের গণনাপুস্তক, ১ ঃ ১-৪৬)। উল্লেখ্য যে, কুরআন মজীদে নাম উল্লেখ ছাড়া এই বারো গোত্রের উল্লেখ আছে (দ্র. ৫ ঃ ১২; ২ ঃ ৬০)। কুরআন মজীদে তাহারা সমষ্টিগতভাবে "ইয়াহূদ" নামেও উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. ২ ঃ ১১৩; ১২০; ৩ ঃ ৬৭; ৫ ঃ ১৮, ৫১, ৬৪, ৮২; ৯ঃ ৩০)। এই বনী ইসরাঈল ইয়াহূদী বা Jews নামে পরিচিত।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মিসরীয় স্ত্রী হাজার (هاجر) (বাইবেলে হাগার)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধারা বনূ ইসমাঈল নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের অধিবাস ছিল আরব উপদ্বীপে। তাঁহার ইরাকী স্ত্রী সারার (বাইবেলে সারি) গর্ভজাত হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশধারা পুত্র ইয়াকূব (আ)-এর মাধ্যমে বনূ ইসরাঈল নামে পরিচিত এবং তাঁহাদের অধিবাস ছিল সিরিয়ায় (শাম)। প্রাচীন ভূগোলে ফিলিস্তীন নামে স্বতন্ত্র কোন দেশের অস্তিত্ব ছিল না। ঐ নামের বর্তমান ভূখণ্ড ছিল সিরিয়ার অংশ। হযরত ইবরাহীম (আ) নিজ জন্মভূমি (উর/মেসোপটামিয়া) হইতে সস্ত্রীক মিসর গমন করেন এবং তথা হইতে সিরিয়ায় পৌঁছিয়া বর্তমান ইসরাঈলের হেব্রনে (বর্তমান নাম আল-খলীল) বসতি স্থাপন করেন এবং এখানেই তাঁহার পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈল (আ) আরব উপদ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক (আ) সিরিয়ায় থাকিয়া যান (বিস্তারিত দ্র. ইবরাহীম নিবন্ধে)। তাঁহার পুত্র ইয়াকূব (আ)-এর বংশধর বনী ইসরাঈলই ইতিহাসে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই গোষ্ঠীকে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দীনের প্রচার এবং সে দীন অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করার

জন্য মনোনীত করেন। মহান আল্লাহ এই বংশে চার হাজার নবী-রাসূল প্রেরণ করেন। মহানবী (স) বলেন ঃ

بَعَثَ اللّٰهُ ثَمَانِيَةَ اٰلاَفٍ نَبِيٍّ اَرْبَعَةُ اٰلاَفٍ مِنْهُمْ اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ ·

"আল্লাহ তা'আলা আশি হাজার নবী প্রেরণ করেন, তম্মধ্যে চার হাজার নবী প্রেরণ করেন বনী ইসরাঈলে" (কানযুল উম্মাল, ১১খ., পৃ. ৪৮২, নং ৩২২৭৮; আরও দ্র. নং ৩২২৮০, পৃ. ৪৮৩)। মশহুর রিওয়ায়াতে নবীদের (আ) সংখ্যা ১ লাখ ২৪ হাজার (ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ১খ., ৪৬৫)।

কুরআন মজীদে সর্বপ্রথম (বিন্যাসক্রম অনুসারে) সূরা আল-বাকারায় ইহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলা হয় ঃ

يٰبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِىْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّاىَ فَارْهَبُوْنِ · وَاٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلاَ تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ وَلاَ تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلاً وَّاِيَّاىَ فَاتَّقُوْنِ ·

"হে নবী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যদ্দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করিয়াছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিব। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। আমি যাহা নাযিল করিয়াছি তোমরা তাহাতে ঈমান আন। ইহা তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার প্রত্যয়নকারী। আর তোমরা উহার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হইও না এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করিও না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর" (২ঃ ৪০-৪১)।

উক্ত আয়াত হইতে শুরু করিয়া সূরা বাকরার বিস্তারিত অংশ জুড়িয়া বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের খণ্ডচিত্র, তাহাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, তাহাদের অবাধ্যাচারিতা এবং সর্বশেষে মহানবী (স)-এর নবুওয়াত প্রত্যাখ্যান করার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথমেই তাহাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার কথা স্মরণ করিতে আহবান জানানো হইয়াছে। তাহাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ হইল, তাহাদেরকে মানবজাতির নেতৃত্বদানের পদে সমাসীন করা হইয়াছিল এবং একইসঙ্গে নবুওয়াত ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করা হইয়াছিল। ২ ঃ ৪৭ আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে ঃ "তোমাদেরকে বিশ্বের সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম" (আরও দ্র. ২ ঃ ১২২)।

ইহার পর তাহাদেরকে আল্লাহ্‌র সহিত কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার আহ্বান জানানো হইয়াছে। তাফসীরকারগণ বলেন যে, তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ প্রদত্ত শরীআত অনুসরণের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং বিনিময়ে তাহাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য দানের জন্য আল্লাহ ওয়াদা করেন (যেমন ২ ঃ ৬৩ ও ৯৩; ৪ ঃ ১৫৪ ও ৫ ঃ ৭ আয়াত)। মুফাসসিরগণ আরও বলেন যে, তাহাদের নিকট হইতে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত স্বীকার করিয়া তাহার অনুসরণ করার অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। এই মত অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কারণ পরের আয়াতেই (২ঃ ৪১) তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর শরীআত মান্য করার এবং তাহা প্রত্যাখ্যান না করার

নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। বাইবেল হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত মূসা (আ) তাঁহার জাতিকে সম্বোধন করিয়া প্রদত্ত ভাষণে বলেন ঃ "প্রভু, তোমার সদাপ্রভু তোমার মধ্য হইতে, তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে, তোমার জন্য আমার সদৃশ একজন নবী উৎপন্ন করিবেন। তোমরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিও ..... তখন সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তাহারা ভালোই বলিয়াছে। আমি তাহাদের জন্য তাহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ একজন উৎপন্ন করিব এবং তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব। আর আমি তাহাকে যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি তাহাদেরকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব" (বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ঃ ১৫-১৯)।

হযরত ঈসা (আ)-এর ভাষায় বাইবেলের নূতন নিয়মের বহু স্থানে মহানবী (স)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে। তিনি তাঁহার অনুসারীদেরকে বলেন, "যাহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসেন, যখন সেই সহায় আসিবেন, তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন" (বাইবেলের যোহন, ১৫ঃ ২৬)।

"তথাপি আমি তোমাদেরকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল। কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিব" (যোহন ১৬ঃ ৭; আরও দ্র. ১৪ঃ ১৬-১৭; ২৫-২৬; ১৬ঃ ১২-১৫)। কুরআনের ভাষায় হযরত ঈসা (আ) বনী ইসরাঈলকে এইভাবে সম্বোধন করিয়াছেন ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا

بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاۤءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۔

"মরিয়ম-তনয় ঈসা যখন বলিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল, আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে আহ্‌মাদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাঁহার সুসংবাদ বহনকারী। পরে সে যখন স্পষ্ট নির্দশনসমূহসহ তাহাদের নিকট লইয়া আসিল তখন তাহারা বলিতে লাগিল, ইহা তো এক স্পষ্ট জাদু" (৬১ঃ ৬)।

মহানবী (স)-এর একটি নাম 'আহ্‌মাদ', হাদীছেও তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে (দ্র. বুখারী, বাংলা অনু., মানাকিব, বাব ১৮, নং ৩২৬৮, ৩খ., পৃ. ৪৫৫; তাফসীর সূরা ৬১, নং ৪৫২৮, ৪খ, পৃ. ৫৬৮; মুসলিম, বাংলা অনু., ফাদাঈল, বাব ৩৪৩, নং ৫৮৯৪, ৫৮৯৫, ৫৮৯৭, ৭খ., পৃ. ৩৪৬; তিরমিযী, বাংলা অনু., আদাব, বাব ৬৭, নং ২৭৭৭, ৫খ., পৃ. ৮১; মুওয়াত্তা, জামে, বাব আসমাউন নবী (স); দারিমী, রিকাক, বাব ৫৯, নং ২৭৭৫, ২খ., ৪০৯)। উল্লেখ্য যে, মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স) সবচেয়ে মারাত্মক বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন ইয়াহূদীদের পক্ষ হইতে। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে তূর পাহাড়ে গেলে পেছনে তাঁহার উম্মাত গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়। তিনি তূর

হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রতি রহমাত বর্ষণের জন্য যে দোআ করেন (৭ ঃ ১৪২-১৫৬), উহার জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "আমার শাস্তি যাহাকে ইচ্ছা দিয়া থাকি এবং আমার দয়া-তাহা তো প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি উহা তাহাদের জন্য নির্ধারণ করিব যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিবে, যাকাত দিবে এবং আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনিবে। যাহারা অনুসরণ করিবে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাহাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইনজীলে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাহাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা দেয়, যে তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে, যে তাহাদেরকে তাহাদের গুরুভার ও শৃংখল হইতে মুক্ত করে, যাহা তাহাদের উপর ছিল। অতএব যাহারা তাহার উপর ঈমান আনে, তাহাকে সম্মান করে, তাহাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তাহার সহিত নাযিল হইয়াছে উহার অনুসরণ করে তাহারাই সফলকাম" (৭ ঃ ১৫৬-৭)।

অতএব তাওরাত ও ইনজীলে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি বনী ইসরাঈলের ঈমান আনয়নের এই যে আহবান কুরআন মজীদে বিবৃত হইয়াছে, তাহার ইঙ্গিত বর্তমান বাইবেলেও বিদ্যমান আছে (যাহার কয়েকটি বরাত ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আরও দেখা যাইতে পারে নিম্নোক্ত স্থান ঃ যোহন, ১ ঃ ১৯-২৩)।

বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা ছিল, তাহারা কেবল এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবে, তাঁহার সহিত কোন কিছুকে অংশীদার বানাইবে না এবং ইহার সহিত আরও কতিপয় সৎকর্মের অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ اِلاَّ اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ.

"স্মরণ কর, যখন ইসরাঈল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়াছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত করিবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে এবং মানুষের সহিত সদালাপ করিবে, সালাত কায়েম করিবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলে" (২ ঃ ৮৩)।

তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও শিরক-এর মূলোচ্ছেদ সম্পর্কে বর্তমান বাইবেলেও অত্যন্ত জোরালো নির্দেশ বিদ্যমান। "আমার সাক্ষাতে (বা ব্যতিরেকে) তোমার অন্য কোন মাবূদ না থাকুক। তুমি নিজের জন্য খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না, উপরিস্থিত আকাশে, নীচস্থ পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর নিম্নে পানিতে যাহা যাহা আছে তাহাদের কোন মূর্তি নির্মাণ করিও না। তুমি তাহাদের সামনে সিজদা করিও না এবং তাহাদের ইবাদত করিও না। কেননা আমি আল্লাহ তোমার সদাপ্রভু নিজ গৌরব রক্ষণে উদ্যোগী" (বাইবেলের যাত্রাপুস্তক ২০ঃ ৩-৫; বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ, ৫ ঃ ৭-৯)।

"হে ইসরাঈল শুন! খোদাওয়ান্দ আমাদের সদাপ্রভু, একই সদাপ্রভু। আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ এবং তোমার সমস্ত শক্তি দ্বারা আপন প্রভু, সদাপ্রভুর প্রেম করিবে" (দ্বিতীয় বিবরণ, ৬ঃ ৪-৬)।

"তুমি আপন প্রভু সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে এবং তাঁহারই নাম লইয়া দিব্য করিবে। তোমরা অন্য দেবগণের চারদিকের জাতিদের দেবগণের অনুগামী হইও না। কেননা তোমার মধ্যবর্তী তোমার খোদা সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী প্রভু। সাবধান পাছে তোমার রব সদাপ্রভুর ক্রোধ তোমার প্রতিকূলে প্রজ্জ্বলিত হয়, আর তিনি ভূমণ্ডল হইতে তোমাকে উচ্ছিন্ন করেন" (দ্বিতীয় বিবরণ, ৬ঃ ১৩-১৫)।

ইয়াহূদী বিশ্বকোষে (Jewish Encyclopedia) লিখিত আছে, বনী ইসরাঈলের উপর আরোপিত বিশেষ দায়িত্ব এই ছিল যে, তাহারা আল্লাহ্র একত্ববাদের দাওয়াত দিতে থাকিবে এবং সূর্যপূজা, চন্দ্রপূজা ও তারকাপূজার বিরুদ্ধে জিহাদ করিতে থাকিবে (উক্ত বিশ্বকোষ, ৬খ., পৃ. ১১-এর বরাতে তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু, ১খ., পৃ. ৯৪, টীকা নং ১৬২)। বনী ইসরাঈলের একমাত্র দায়িত্ব ছিল পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষীরূপে বসবাস করা (পূ. গ্র., ৬খ, পৃ. ২; মাজেদী, ঐ; আরও দ্র. বাইবেলের যিশাইয়, ৪৩ ঃ ১০ ও ১১)। তৌহীদপন্থী জাতি মাত্রই পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ। মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۔

"এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, যাহাতে তোমরা মানবজাতির জন্য (আল্লাহ্র) সাক্ষীস্বরূপ হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয়" (২ঃ ১৪৩; আরও দ্র. ৪ঃ ১৩৫; ৫ঃ ৮ এবং ২২ঃ ৭৮)। মহানবী (স) মুসলমানদেরকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

اَنْتُمْ شُهَدَاءُ لِلّٰهِ فِى الْاَرْضِ ۔

"তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্র সাক্ষীস্বরূপ" (বুখারী, জানাইয, বাবঃ মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা, নং ১২৭৬, ১খ., পৃ. ১৮৩; শাহাদাত, বাব ৬, নং ২৪৫০, ২খ, মুসলিম, জানাইয, নং ২০৬৭, ৩খ., পৃ. ৩২৯-৩০; তিরমিযী, জানাইয, বাব ৬২, নং ৯৯৬, ২খ, পৃ. ২৫৪-৫; নাসাঈ, জানাইয, বাবঃ মৃতের প্রশংসা, ১ ও ২ নং হাদীস; ইব্ন মাজা, জানাইয, বাব ২০, নং ১৪৯১-২; যুহ্দ, বাব ২৫, নং ৪২২১)।

একই বিশ্বকোষে আরও বলা হইয়াছে, "আল্লাহ্র ইবাদতকারী তৌহীদপন্থী সম্প্রদায় হিসাবে বনী ইসরাঈল ছিল মুশরিক সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর" (ঐ বিশ্বকোষ, ৬খ., পৃ. ১১; মাজেদী, ১খ, পৃ. ৯৪)। "রাজনৈতিক জাতিপুঞ্জের মধ্যে সর্বপ্রথম হিব্রুভাষীরাই তাহাদের নবীগণের শিক্ষার মাধ্যমে তৌহীদের (আল্লাহ্র এককত্ব) শিক্ষায় উপনীত হইয়াছিল (হিব্রু বিশ্বকোষ, ৮খ., পৃ. ৬৫৯-এর বরাতে তাফসীরে মাজেদী, পূ. স্থা.)।

খৃস্টান ঐতিহাসিকগণও উপরিউক্ত ঐতিহাসিক সত্যের পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। The Historians' History of the world গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ

বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝেই তাওহীদের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল (২খ, পৃ. ৩)। খৃস্টীয় বা ইসলামী যাহাই হউক, মানবসভ্যতার বর্তমান সব কয়টি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের সুগভীরে এই

তৌহীদেরই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, যাহার আহ্বান ব্যাপকভাবে জানাইয়াছিল সর্বপ্রথম ইসরাঈলী সম্প্রদায়" (ঐ গ্রন্থ, ২খ., পৃ. ২)। কিন্তু তৌহীদের ধারক ও বাহক এই ইসরাঈলীরা ইয়াহূদী ও খৃস্টান দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আজ প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এমনকি খৃস্টান সম্প্রদায় তাহাদের উপাসনালয়ে মরিয়ম (আ) ও ঈসা (আ)-এর কল্পিত মূর্তি পর্যন্ত স্থাপন করিয়াছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ. اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ وَمَا اُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

"ইয়াহূদীরা বলে, উযায়র আল্লাহ্র পুত্র এবং খৃস্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহ্র পুত্র। ইহা তাহাদের মনগড়া কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল ইহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ ইহাদেরকে ধ্বংস করুন। কোন্ দিকে ইহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে! ইহারা আল্লাহ ব্যতীত ইহাদের পণ্ডিতগণকে (রিব্বী) ও সংসার বিরাগীদেরকে (পাদ্রী) ইহাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মরিয়ম-পুত্র মসীহ্কেও। অথচ তাহারা এক ইলাহ্-এর ইবাদত করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি অতীব পবিত্র" (৯ ঃ ৩০-৩১)।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَا بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَّمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلاَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

"যাহারা বলে, আল্লাহ্ই মরিয়ম-তনয় মসীহ্, তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে। অথচ মসীহ বলিয়াছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লাহ্র ইবাদত কর। কেহ আল্লাহ্র সহিত শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য অবশই জান্নাত হারাম করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম। যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। যাহারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা অবশ্যই কুফরী করিয়াছে। যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই" (৫ঃ ৭২-৭৩)।

আল্লাহ্কে এক ও অদ্বিতীয় ইলাহ মানিয়া লইয়া একনিষ্ঠভাবে তাঁহার ইবাদত করার সঙ্গে সঙ্গে বনী ইসরাঈলকে সালাত কায়েম, যাকাতদান ইত্যাদিরও নির্দেশ প্রদান করা হয়। তাহাদেরকে সত্যকে মিথ্যার সহিত এবং জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন করিতে নিষেধ করা হয় এবং তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে আল্লাহ্র কিতাবকে বিক্রয় (বিকৃত) করিতে নিষেধ করা হয় (দ্র. ২ ঃ ৪১-৪২)। বাইবেলেও অনুরূপ নির্দেশ বিদ্যমান আছে ঃ "তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও" (যাত্রাপুস্তক, ২০ ঃ ১২; দ্বিতীয় বিবরণ, ৫ঃ ১৬)। "আপনার দরিদ্র ভ্রাতার প্রতি আপন হস্ত (দান) রুদ্ধ করিও না,

কিন্তু (বরং) তাহার প্রতি মুক্ত হস্ত হইয়া তাহার অভাবজনিত প্রয়োজনানুসারে তাহাকে অবশ্য ঋণ দিও" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৫ঃ ৮-৯)। "এবং বিদেশী, পিতৃহীন ও বিধবা তোমার নগরদ্বারের মধ্যবর্তী এই সকল লোক আসিয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইবে" (ঐ, ১৪ঃ ২৯)। "তুমি আপন দেশে তোমার ভ্রাতার প্রতি, তোমার দুঃখী ও দীনহীনের প্রতি তোমার হাত অবশ্য খুলিয়া রাখিবে" (ঐ, ১৫ঃ ১১)। আল্লাহ্র কিতাবকে বিকৃত না করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাহারা উহার বিকৃতি সাধণ করে। "তাহারা কুৎসিৎ লাভের অনুরোধে অনুপযুক্ত শিক্ষা দিয়া ঘরকে ঘর বরবাদ করিয়া ফেলে" (বাইবেলের নূতন নিয়মাধীন তীত, ১ঃ ১১)।

বনী ইসরাঈলের নিকট হইতে এই মর্মেও অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল যে, তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিবে না, আপনজনদেরকে স্বদেশভূমি হইতে বিতাড়ন করিবে না (দ্র. ২ঃ ৮৪)। কিন্তু তাহারা এই নির্দেশ লংঘন করিয়া পরস্পরকে হত্যা করে, স্বদেশ হইতে উচ্ছেদ করে এবং মুক্তিপণ আদায় করে (দ্র. ২ ঃ ৮৫)। রক্তপাতের এই নিষেধাজ্ঞা বর্তমান বাইবেলেও একাধিক স্থানে পরিদৃষ্ট হয়ঃ "তুমি নরহত্যা করিও না" (যাত্রাপুস্তক, ২০ ঃ ১৩)। "তোমার প্রতিপালক সদাপ্রভু অধিকারার্থে তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, তোমার সেই দেশের মধ্যে নির্দোষ রক্তপাত না হয়, আর তোমার উপরে রক্তপাতের অপরাধ না বর্তে" (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৯ ঃ ১০)। "নরহত্যা করিও না। ব্যভিচার করিও না। চুরি করিও না। তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না, প্রতিবাসীর স্ত্রীতে কিংবা তাহার দাসে কি দাসীতে কিংবা তাহার গরুতে কি গর্দভে, প্রতিবাসীর কোনও বস্তুতেই লোভ করিও না" (যাত্রাপুস্তক ২০ ঃ ১৩-১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৫ ঃ ১৭-২১)।

ইসরাঈলীরা বাইবেলের এই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া শুধু সাধারণ মানুষকেই হত্যা করে নাই, বরং তাহারা আল্লাহ্র নবীগণকেও পর্যন্ত হত্যা করিয়াছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"যখনই কোন রাসূল তোমাদের নিকট তোমাদের অমনঃপূত কিছুসহ আসিয়াছে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ এবং কতককে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ ও কতককে হত্যা করিয়াছ" (২ ঃ ৮৭; আরও দ্র. ২ ঃ ৬১, ৯১; ৩ ঃ ২১; ১১২; ৪ ঃ ১৫৫; ৫ ঃ ৭০)।

রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার উপর নাযিলকৃত বিষয়ের উপর ঈমান আনার জন্য ইসরাঈলীদেরকে আহবান করিলে তাহারা উত্তরে বলে যে, তাহাদের উপর যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে তাহারা ঈমান আনিয়াছে। তাহাদের এই ঈমানকে চ্যালেঞ্জ করিয়া নবী (স) জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তোমরা অতীতে আল্লাহ্র নবীগণকে কেন হত্যা করিয়াছিলে (দ্র. ২ ঃ ৯১)? আবার কখনও তাহারা বলিত, "আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন কোন রাসূলের প্রতি ঈমান না আনি, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানী উপস্থিত না করিবে যাহা আগুনে গ্রাস করিবে" (৩ ঃ ১৮৩)। আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (স)-কে তাহাদের এই দাবিকে প্রত্যাখান করিয়া বলিতে বলেন, "আমার পূর্বে তো অনেক রাসূল স্পষ্ট নিদর্শনসমূহসহ এবং তোমরা যাহা বলিতেছ তাহাসহ তোমাদের নিকট আসিয়াছিল। যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাহাদেরকে হত্যা

করিয়াছিলে" (৩ ঃ ১৮৩)? শুধু তাহাই নহে, তাহারা তো নির্ভীকভাবে তাহাদের বংশেরই নবী হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করার প্রকাশ্য দাবি করিয়াছে (যদিও তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে নাই); "আমরা আল্লাহ্র রাসূল মরিয়ম-পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি", (৪ ঃ ১৫৭)। বাইবেলের একাধিক স্থানে নবী হত্যার উল্লেখ রহিয়াছে। "কিন্তু তাহারা সদপ্রভুর রাসূলগণকে উপহাস করিত, তাঁহার বাক্য তুচ্ছ করিত এবং তাঁহার নবীগণকে বিদ্রূপ করিত। তন্নিমিত্ত শেষে আপন প্রজাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ উত্থিত হইল। অবশেষে আর প্রতিকারের উপায় রহিল না' (বাইবেলের ২ বংশাবলী, ৩৬ ঃ ১৬)। "তোমাদেরই খড়গ বিনাশক সিংহের ন্যায় তোমাদের ভাববাদীগণকে গ্রাস করিয়াছে" (বাইবেলের যিরমিয় ২ ঃ ৩০)। "হে ইয়াকূবের কুল, হে ইসরাঈল কুলের সমুদয় গোষ্ঠী! সদাপ্রভুর বাক্য শোন। সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আর কি অন্যায় দেখিয়াছে যে, তাহারা আমা হইতে দূরে গিয়াছে, অসারতার অনুগামী হইয়া অসার হইয়াছে" (ঐ, ২ ঃ ৪)? তথাপি তাহারা অবাধ্য হইয়া তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিল, তোমার ব্যবস্থা পশ্চাত দিকে ফেলিল এবং তোমার যে ভাববাদীগণ তোমার প্রতি তাহাদেরকে ফিরাইবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেন তাহাদেরকে বধ করিল এবং মহা অসন্তোষকর কর্ম করিল" (বাইবেলের নহিমিয়, ৯ ঃ ২৬)।

বাইবেলের খৃস্টান ধর্মীয় অংশেও অনুরূপ সাক্ষ্য বিদ্যমান ঃ "হে শক্ত গ্রীবেরা এবং হৃদয়ে ও কর্মে অচ্ছিন্নত্বকেরা .... তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কোন্ ভাববাদীকে তাড়না না করিয়াছে? তাহারা তাহাগিকেই বধ করিয়াছে" (বাইবেলের প্রেরিতদের কার্য, ৭ঃ ৫১-৫২)। "ইহাতে তোমরা তোমাদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিতেছ যে, যাহারা ভাববাদীগণকে বধ করিয়াছিল, তোমরা তাহাদেরই সন্তান। ... হাঁ যেরুসালেম যেরুসালেম! তুমি ভাববাদীগণকে বধ করিয়া থাক ও তোমার নিকটে যাহারা প্রেরিত হয় তাহাদিগকে পাথর মারিয়া থাক" (বাইবেলের মথি, ২৩ঃ ৩১-৩৭; আরও দ্র. লূক, ১৩ ঃ ৩৪)। ইয়াহূদী রাজা হেরোধ এক নর্তকীর আবদার রক্ষা করিতে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করায় (তু. মথি, ১৪ঃ ১-১২; মার্ক, ৬ঃ ১৪-২৯; লূক, ৯ ঃ ৭-৯)। ইউশা, ইয়ারমিয়া ও যাকারিয়া (আ)-কেও তাহারা হত্যা করে। অবশ্য ইহার প্রতিশোধও তাহাদের উপর নামিয়া আসে। তাহারা নবীদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও পরিহাস করিত। তাঁহাদের বাক্যকে তুচ্ছ ও বিদ্রূপ করিত। ফলে শেষ পর্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ উত্থিত হইল। তিনি কালদীয়দের রাজাকে তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন এবং তাহারা তাহাদের যুবকদিগকে তাহাদের উপসনালয়ে খড়গ দ্বারা হত্যা করে এবং যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ সকলের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে। সে তাহাদের জনপদ ও উপাসনালয় লুণ্ঠন করিল এবং উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগ করিল (তু. ২ বংশাবলী, ৩৬ঃ ১৫-২১)। বনী ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত হযরত ঈসা (আ) এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছে এবং অভিশাপের অসহনীয় বোঝা তাহারা আজও বহন করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَاءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۔ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۔

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা দাঊদ ও মরিয়ম-পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল। কারণ তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তাহারা যেসব গর্হিত কাজ করিত তাহা হইতে তাহারা একে অপরকে বারণ করিত না। তাহারা যাহা করিত তাহা কতই না নিকৃষ্ট" (৫ঃ ৭৮-৭৯)।

দাঊদ (আ)-এর অভিশাপ যাবূর ৭৮ ঃ ২১-২৩-এ এবং ঈসা (আ)-এর অভিশাপ মথি, ২৩ ঃ ৩১-৩২-এ পরোক্ষভাবে উল্লিখিত আছে। কুরআন মজীদে মোট নয়বার ইহাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ (লানত) উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. ২ঃ ৮৮, ৮৯; ৪ঃ ৪৬, ৪৭, ৫২; ৫ঃ ১৩, ৬০ ও ৬৪)।

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ۔

"আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাহিরে যেখানেই তাহাদেরকে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহারা লাঞ্ছিত হইয়াছে। তাহারা আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হইয়াছে এবং হীনতাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা এইহেতু যে, তাহারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করিত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করিত। ইহা এইজন্য যে, তাহারা অবাধ্য হইয়াছিল এবং সীমালংঘন করিত" (৩ঃ ১১২)।

বনী ইসরাঈল প্রসঙ্গে আরও দ্র. নিবন্ধ হযরত মূসা (আ), হযরত দাঊদ (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত মুহাম্মাদ (স)। মোটকথা নবী-রাসূলগণের অবমাননা এবং তাহাদেরকে হত্যা করার অভিযোগ কুরআন মজীদই সর্বপ্রথম ইয়াহূদীদের প্রতি আরোপ করে নাই, বরং তাহাদের নিজস্ব কিতাবই তাহাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম উক্ত অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে। কুরআন কেবল উহার পুনরুক্তি করিয়াছে এবং উহার সত্যতা সমর্থন করিয়াছে।

ইসরাঈলীদের, বিশেষত তাহাদের আলিম সম্প্রদায়ের আরেকটি মারাত্মক অপকর্ম এই যে, তাহারা তাহাদের নবীগণের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহের বিকৃতি সাধন (তাহ্রীফ) করিয়াছে শব্দগতভাবে, অর্থগতভাবে, মূল শব্দ অপসারণ করিয়া অথবা তদস্থলে নূতন শব্দ প্রবিষ্ট করাইয়া বা আসল তথ্য গোপন করিয়া। তাহাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল যে, তাহারা যেন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে আল্লাহ্র কিতাব বিক্রয়ের ব্যবসায় না করে (২ঃ ৪১), সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত না করে এবং জ্ঞাতসারে সত্যকে গোপন না করে (২ঃ ৪২)। কিন্তু তাহারা তাওরাত ও ইনজীলের সম্ভাব্য সকল প্রকার তাহ্রীফ সাধন করিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় নাই।

وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

"অথচ তাহাদের একদল আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তাহারা উহা হৃদয়ঙ্গম করার পরও সজ্ঞানে উহার বিকৃতি সাধন করে" (২ঃ ৭৫)।

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ.

"ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলি স্থানচ্যুত করিয়া বিকৃত করে" (৪ ঃ ৪৬; আরও দ্র. ৫ঃ ১৩ ও ৪১)।

বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে আসমানী কিতাব বিকৃতির অভিযোগ শুধু কুরআনই উত্থাপন করে নাই, বাইবেলেও এই অভিযোগ করা হইয়াছেঃ "কারণ অনেক অদম্য লোক অসার বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক লোক আছে, বিশেষত ত্বকছেদীদের মধ্যে আছে.... তাহারা কুৎসিত লাভের অনুরোধে অনুপযুক্ত শিক্ষা দিয়া কখন কখন একেবারে ঘর উল্টাইয়া ফেলে" (তীত, ১ঃ ১০-১১)। তাহারা এতটা দুঃসাহস দেখাইয়াছে যে, নিজেদের পক্ষ হইতে মনগড়া কিছু রচনা করিয়া তাহা আল্লাহ্‌র কিতাবের অংশ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে।

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ.

"অতএব দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে। তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য রহিয়াছে তাহাদের ধ্বংস এবং তাহারা যাহা উপার্জন করে তাহার জন্যও তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য" (২ঃ ৭৯)।

বনী ইসরাঈলের এই বেপরোয়াভাবে মারাত্মক অপরাধ কর্মে লিপ্ত হওয়ার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহাদের একটি ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস। তাহারা মনে করে যে, তাহারা যাহাই করুক না কেন, সেজন্য তাহাদেরকে দোযখবাসী হইতে হইবে না, তাহাদের মহান পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) দোযখের দরজায় দণ্ডায়মান থাকিবেন এবং তিনি তাহাদেরকে তথা হইতে উদ্ধার করিয়া জান্নাতে পৌছাইয়া দিবেন। তাহা ছাড়া তাহারা দোযখের দরজায় পৌছিয়া নিজেদের অপরাধ কর্মের স্বীকারোক্তি করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা হইবে। কারণ তাহারা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র এবং তাঁহার সন্তান (দ্র. ৫ঃ ১৮)। যদিও বা তাহারা দোযখে প্রবেশ করে তবে সামান্য কয়েক দিনের জন্য (দ্র. ২ঃ ৮০)। ইয়াহূদী বিশ্বকোষে তাহাদের বিশ্বাস এইভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে ঃ দোযখের আগুন ইয়াহূদী জাতির পাপীদিগকে স্পর্শও করিবে না। কেননা তাহারা জাহান্নামের দরজায় পৌছা মাত্রই নিজেদের পাপের স্বীকারোক্তি করিবে এবং প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিবে" (৫খ., পৃ. ৫৮৩)। ইয়াহূদীদের তালমুদ গ্রন্থের নির্বাচিত সংকলন Every man's Library Series-এ লিপিবদ্ধ আছে ঃ কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ) দোযখের দরজায় উপস্থিত থাকিবেন এবং কোনও খাতনাকৃত ইয়াহূদীকে তাহাতে পতিত হইতে দিবেন না" (পৃ. ৪০৪)। "দোযখের আগুন ইয়াহূদী পাপীদের উপর কোনও ক্ষমতা রাখে না" (পৃ. ৪০৫; তিনটি উদ্ধৃতিই তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু., ১খ., পৃ. ১৪৬-৭ হইতে গৃহীত)। মহান আল্লাহ্ তাহাদেরকে সতর্ক করিয়া বলেন ঃ

بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ۔

"হাঁ, যাহারা পাপকার্য করে এবং যাহাদের পাপরাশি তাহাদেরকে বেষ্টন করিয়াছে তাহারা দোযখবাসী, যেখানে তাহারা স্থায়ী হইবে" (২ঃ ৮১; আরও দ্র. ২ ঃ ৮৬ ও ৯০)।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّ تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاَ تَنْفَعُهَا شَفٰعَةٌ وَّلاَهُمْ يُنْصَرُوْنَ۔

"এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কাহারও কোনও উপকারে আসিবে না, কাহারও নিকট হইতে কোনও বিনিময় গ্রহণযোগ্য হইবে না, কোনও সুপারিশ কাহারও পক্ষে লাভজনক হইবে না এবং তাহারা সাহায্যপ্রাপ্তও হইবে না" (২ঃ ১২৩; আরও দ্র. ২ঃ ৪৮)।

যেহেতু বনী ইসরাঈল (ইয়াহূদী ও খৃস্টান উভয় ধর্মাবলম্বী) চূড়ান্তভাবে আল্লাহ্র কিতাবের নির্দেশ ত্যাগ করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত এবং তাঁহার উপর নাযিলকৃত কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহারা হেদায়াত লাভের সর্বশেষ সুযোগও হারাইয়াছে, সেহেতু আল্লাহ তা'আলা এই অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিতে মুসলমানদেরকে কঠোর ভাষায় নিষেধ করিয়াছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۔

"হে মুমিনগণ! তোমারা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তাহারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেহ তাহাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (৫ঃ ৫১)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

"হে মুমিনগণ! তোমাদের পূর্বে যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমাদের দীনকে উপহাস ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাহাদেরকে ও কাফেরদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক" (৫ঃ ৫৭)।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔

"হে মুমিনগণ! যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তোমরা যদি তাহাদের দলবিশেষের আনুগত্য কর, তবে তাহারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফির বানাইয়া ছাড়িবে। কিরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করিতে পার যখন আল্লাহ্র আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁহার রাসূল রহিয়াছে? কেহ আল্লাহ্কে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিলে সে অবশই সরল পথে পরিচালিত হইবে" (৩ঃ ১০০-১০১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আল-কুরআন ও তাফসীর ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯শ মুদ্রণ ১৪১৭/১৯৯৭, আয়াতসমূহের তরজমার জন্য; (২) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু., ১খ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ সংস্করণ, প্রকাশকাল ১৪১৫/১৯৯৪; (৩) তাফসীরে উছমানী, সৌদী সংস্করণ, শায়খুল হিন্দের অনুবাদ এবং শাব্বীর আহমাদ উছমানীর টীকাভাষ্য; (৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাআরেফুল কোরআন, সৌদি সংস্করণ; (৫) আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর; (৬) ইব্ন কাছীর, তাফসীর, বাংলা অনু, ১খ; (৭) আমীন আহ্সান ইসলাহী, তাদাববুরে কুরআন, তাজ কোম্পানি, দিল্লী, ১ম সং ১৯৮৯, ১খ।

ইতিহাস ও ইসলামী সাহিত্য ঃ (১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিকার আল-আরাবী, বৈরূত তা. বি., ১খ.; (২) আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, দারুল ফিকার, বৈরূত তা. বি; (৩) ইব্ন কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, আল-মাআরিফ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, ১ম সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭; (৪) হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন (উর্দূ), ৪র্থ সং, দিল্লী ১৪০০/১৯৮০, ১খ., পৃ. ২৭৭-৭৯; (৫) গোলাম নবী অনূদিত আনওয়ারে আম্বিয়া, ৫ম সং, লাহোর তা. বি, পৃ. ৭০-৭৩; (৬) কাদী যায়নুল আবিদীন, কাসাসুল কুরআন, ১ম সং, দেওবন্দ ১৯৯৪; (৭) ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১ম সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ, পৃ. ৯৫-৯৬; (৮) সহীহ আল-বুখারী, আরবী-বাংলা, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ৬ খণ্ডে সমাপ্ত; (৯) সহীহ মুসলিম, আরবী-বাংলা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৮ খণ্ডে সমাপ্ত; (১০) জামে আত-তিরমিযী, আরবী-বাংলা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৬ খণ্ডে সমাপ্ত; (১১) আবূ দাউদ, আরবী সংস্করণ; (১২) নাসাঈ, আরবী; (১৩) ইব্ন মাজা, ফুআদ আবদুল বাকী সম্পাদিত, আরবী, বৈরূত, ২ খণ্ডে; (১৪) সুনানুদ দারিমী, আরবী, ফাওয়ায আহমাদ প্রমুখ সম্পাদিত, কাদীমী কুতুবখানা, করাচী, ২ খণ্ড, (১৫) মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, আরবী সংস্করণ; (১৬) ইব্ন মানজূর, লিসানুল আরাব, বৈরূত সং, ৪খ, পৃ. ৩০৩০, কালাম ২ ও ৩।

পাশ্চাত্য উৎস ঃ (১) বাইবেল, সংশ্লিষ্ট অধ্যায়, যাহা নিবন্ধ গর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে; বাংলা, আরবী ও উর্দু তিন ভাষার বাইবেলের সমন্বয়ে বক্তব্য নকল করা হইয়াছে; (২) বাইবেল ডিকশনারী, ইংরেজি বাইবেলের কেমব্রিজ সংস্করণের পরিশিষ্ট আকারে মুদ্রিত; (৩) Collier's Encyclopedia, ১৩ খ, নিউইয়র্ক; (৪) Americana, ১৫খ, পৃ. ৬৫৫, ৫৩৮; (৫) The Encyclopedia of Religion, ম্যাকমিলান কোম্পানি, নিউ ইয়ার্ক; (৬) The Historians' History of the world, logos press, New Delhi, Repr. 1987, vol. 2, P 2-3; (7) Encyclopaedia Britannica, 1962, XII, P. 856-7.

মুহাম্মদ মূসা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ